আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্বের ইতিহাস

(১৮৭১-১৯৫০)

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ

মৌ লি ক লা ই ব্রে রী

প্রকাশকঃ— শ্রীদীপ্তেন্দ্র নাথ মৌলিক, মৌলিক লাইব্রেরী ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা— ৭০০ ০৭৩

দ্বিতীয় সংস্করণ—২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

মুদ্রাকর—টি. ঘোষ, "লিপিমালী" ২জি, নিলমনি রো, কলিকাতা—৭০০ ০০২

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বি-বার্ষিক পাঠক্রম অনুসারে বর্তমান গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। ১৮৭১ হইতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব-ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি এই যুগের ইতিহাস রচনায় রতী বিশেষজ্ঞদের মতামত অবলম্বনে যথাসম্ভব আলোচনা করা হইয়াছে। যদিও ১৮৭১ হইতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কালে ইওরোপের ইতিহাসের বিভিন্ন ধারার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, তথাপি ইওরোপের বহির্ভূত বিশ্ব-ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের যথাযথ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। নিকট-প্রাচ্য, সুদূর-প্রাচ্য ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি যথাসম্ভব পর্যালোচনা করা হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। প্রধানতঃ, দ্বি-বার্ষিক স্নাতক পরীক্ষার্থীদের উপযোগী করিয়া গ্রন্থখানি রচিত হইলেও অনার্স (Honours) ছাত্র-ছাত্রীগণও ইহাতে অনার্স পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনায় উপকৃত হইবে আশা করি। গ্রন্থখানির উন্নতিকল্পে অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণের মূল্যবান মতামত কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করার আশ্বাস জানাই।

ইতি —

শ্রীঅতুল চন্দ্র রায়

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় ঃ

জার্মান সাম্রাজ্য (১৮৭১--১৯১৪)—নূতন সংবিধান—বিসমার্কের অভ্যন্তরীণ নীতি (১৮১৭--১৮৯০)—সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে বিসমার্কের সংগ্রাম—বিসমার্কের ঔপনিবেশিক নীতি—বিসমার্কের পররাষ্ট্র-নীতির সমালোচনা—বিসমার্কের কৃতিত্ব ও কূটনৈতিক প্রতিভা—কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম—চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ নীতি —পররাষ্ট্র-নীতি—নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত। ১—৩০

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

ইটালীর ইতিহাস—অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন—ইটালীর পররাষ্ট্র-নীতি—ঔপনিবেশিক নীতি—নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ৩১—৩৮

ফ্রান্সের তৃতীয় সাধারণতন্ত্র (১৮৭১--১৯১৪)—সেডানের যুদ্ধের পর ফ্রান্সের অবস্থা—অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন—তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের বিপত্তি—সাধারণতন্ত্র ও চার্চ—ঔপনিবেশিক নীতি—পররাষ্ট্র-নীতি —মরক্কোসংকটের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব—নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত। ৩৯—৫০

ইওরোপের অর্থনৈতিক অগ্রগতি—ইওরোপের রাজনীতির ক্ষেত্রে শিল্পের প্রভাব—নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত। ৫১—৫৬

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

বিশ্বে ইওরোপের বিস্তৃতি—বিশ্ব-রাজনীতির যুগ - ইওরোপের বাহিরে ইওরোপীয় দেশগুলির উপনিবেশ বিস্তার- ঔপনিবেশিক বিস্তারের ফলাফল—আফ্রিকায় ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির উপনিবেশ বিস্তার- আফ্রিকা বিভাগ—আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদের ফলাফল—উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নীতি—নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত। ৫৭—৭৬

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

সুদূর-প্রাচ্য—চীন ও জাপান—সুদূর-প্রাচ্য ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য —চীনে বিদেশীদের আগমণ—প্রথম চীন যুদ্ধ—দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ —তিয়েনসিনের সন্ধি হইতে সিমোনসেকির সন্ধি পর্যন্ত চীনের ইতিহাস—বক্সার-বিদ্রোহ—১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপানের ইতিহাস —জাপানের দ্বার উদ্ঘাটন—জাপানে গণ-বিপ্লব ও রাষ্ট্র ও সমাজ-গঠন—অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন—জাপানের পররাষ্ট্র-নীতি—চীন-

বিষয় **পৃষ্ঠা**

জাপান যুদ্ধ—সিমোনসেকির সন্ধি—যুদ্ধের ফলাফল—ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী—রুশ-জাপান যুদ্ধ—পোর্টসমাউথের সন্ধি—যুদ্ধের ফলাফল —জাপানের পররাষ্ট্র-নীতি (১৯০৫—১৯)—চীনের নবজাগরণ— চীনের গণ-বিপ্লব (১৯১১)—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও চীন নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত। ৭৭—১০৬

সপ্তম অধ্যায়ঃ

নিকট-প্রাচ্য সমস্যা নিকট-প্রাচ্য সমস্যা (১৮৫৬ ১৮৭৮)—বল্কানের বিদ্রোহ ও রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ বল্কান ও ইওরোপীয় শক্তিবর্গ—রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ (১৮৭৭-৭৮) সান-স্টিফানোর সন্ধি— বার্লিন সন্ধি বার্লিন সন্ধির সমালোচনা—নিকট-প্রাচ্য সমস্যা— বার্লিন সন্ধি হইতে বুখারেস্ট সন্ধি পর্যন্ত—প্রথম বল্কান যুদ্ধ—দ্বিতীয় বল্কান যুদ্ধ বল্কান যুদ্ধের ফলাফল নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত। ১০৭-১২৩

অষ্টম অধ্যায়ঃ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ—ভার্সাই-সন্ধি ১৯১৪—১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যুগের বৈশিষ্ট্য বিপর্যয়ের দিকে ইওরোপ বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইওরোপ জার্মানীর উচ্চাভিলাষ জার্মানীকে এই যুদ্ধের জন্য সর্বোতভাবে দায়ী করা অনুচিত ইংল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্নতার অবসান আন্তর্জাতিক সংকট মরক্কোসংকট বল্কান সংকট প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলী—প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন—সম্মেলনের নেতৃবর্গ সম্মেলনের প্রাথমিক সমস্যা শান্তি স্থাপনের ভিত্তি—উইলসনের চৌদ্দ-দফা শর্ত উইলসনের চার-দফা নীতি উইলসনের প্রস্তাবিত শান্তি শর্তাদির সমালোচনা—গোপন সন্ধিসমূহ—ভার্সাই-সন্ধির খসড়া—ভার্সাই-সন্ধির প্রধান শর্তাদি— ভার্সাই-সন্ধির সমালোচনা ভার্সাই-সন্ধির সমর্থনে যুক্তি—ভার্সাই-সন্ধি কি জবরদস্তিমূলক শান্তি-অন্যান্য সন্ধি—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ও গুরুত্ব—প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির সাফল্যের কারণ— প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের কারণ নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত। ১২৪-১৮৩

নবম অধ্যায়ঃ

রাশিয়ার ইতিহাস (১৮৮১-১৯৩৯) জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার—রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতি—জার দ্বিতীয় নিকোলাস রাশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতি (১৮১৪-১৯১৭)—রুশ বিপ্লব ও জারতন্ত্রের পতন—বিপ্লবের কারণ—রুশ বিপ্লবের প্রথম অধ্যায়—রুশ বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায় রুশ বিপ্লবের আন্তর্জাতিক

বিষয় **পৃষ্ঠা**

গুরুত্ব - বলশেভিক সরকার - অভ্যন্তরীণ-নীতি পররাষ্ট্র-নীতি (১৯১৭—১৯)—সোভিয়েট সংবিধান—রাশিয়ার অর্থনৈতিক পুনর্গঠন—যোসেফ স্টালিনের উত্থান—অর্থনৈতিক পুনর্গঠন - প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল—১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের শাসনতন্ত্র—শিক্ষা ও ধর্ম - সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতি (১৯১৯-৩৯)—নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত। ১৮৪-২১২

দশম অধ্যায় ঃ

যুদ্ধোত্তর ইওরোপ ও বিশ্ব (১৯১৯-৩৯)- যুদ্ধোত্তর বিশ্বের প্রধান সমস্যা—নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত। ২১৩-২১৬

একাদশ অধ্যায় ঃ

ক্ষতিপূরণ সমস্যা—ক্ষতিপূরণের ভিত্তি - ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত সন্ধির শর্তাদি—প্যারিস প্রস্তাব—লণ্ডন সিডিউল—ডাওয়েজ পরিকল্পনা—ইয়ং পরিকল্পনা—ক্ষতিপূরণের অবসান—অর্থনৈতিক বিপর্যয়—নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত। ২১৭-২২৯

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিধানের প্রচেষ্টা ঃ নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা—ভূমিকা—নিরাপত্তার সমস্যা—লীগ অফ নেশনস্-এর মাধ্যমে নিরাপত্তা বিধানের প্রচেষ্টা—পরস্পর সাহায্য সংক্রান্ত চুক্তির খসড়া জেনিভা প্রটোকল লোকার্নো চুক্তিসমূহ—লোকার্নো চুক্তির সমালোচনা—কেলোগ্-ব্রিয়াঁ চুক্তি—জেনারেল অ্যাক্ট—লীগ অফ নেশনস্-এর বাহিরে নিরাপত্তা বিধানের প্রচেষ্টা—নূতন রাষ্ট্রজোটের উৎপত্তি—হিটলারের অভ্যুত্থান ও নূতন মৈত্রীজোটের উদ্ভব—যুগ্ম নিরাপত্তা বিধানের ব্যর্থতার কারণ—নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা—নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত। ২৩০-২৪৮

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ

জার্মানীর ইতিহাস (১৯১৮ - ৩৯)—ভূমিকা—জার্মান-বিপ্লব ও ভাইমার সাধারণতন্ত্র -ভাইমার সাধারণতন্ত্রের কৃতিত্ব—পররাষ্ট্র-নীতি (১৯১৯-৩০)—ভাইমার সাধারণতন্ত্রের ব্যর্থতা - হিটলার ও নাৎসী আন্দোলন—নাৎসী আন্দোলনের সাফল্যের কারণ—নাৎসী-দলের আদর্শ ও নীতি—হিটলারের অভ্যন্তরীণ-নীতি—হিটলারের পররাষ্ট্র-নীতি—নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত। ২৪৯-২৭০

চতুর্দশ অধ্যায় ঃ

ইটালীর ইতিহাস (১৯১৯-১৯৩৯)—ইটালীর ভৌগোলিক অবস্থিতির গুরুত্ব—যুদ্ধোত্তর ইটালীর অবস্থা—মুসোলিনী ও ফ্যাসিস্ট আন্দোলন—ফ্যাসিস্ট সরকারের অভ্যন্তরীণ নীতি—পররাষ্ট্র-নীতি—ইটালীর পররাষ্ট্র-সম্পর্ক (১৯২২-৪৫)—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঃ ইটালী ও জার্মানী—নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত। ২৭১-২৯৬

বিষয় পৃষ্ঠা

পঞ্চদশ অধ্যায় :

ফ্রান্সের ইতিহাস (১৯১৯-১৯৩৯)—ভূমিকা—ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ সমস্যা—ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-নীতি—নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত। ২৯৭-৩০৪

ষোড়শ অধ্যায় :

স্পেনের ইতিহাস (১৯১৯-১৯৩৯)—ভূমিকা—সামরিক এক-নায়কতন্ত্র—প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা—স্পেনের অন্তর্বিপ্লব—স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ—জাতীয়তাবাদীগণের সাফল্য—স্পেনে ফ্যাসিস্ট সরকার গঠন—নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত। ৩০৫-৩১৪

সপ্তদশ অধ্যায় :

নিকট ও মধ্য-প্রাচ্য—নিকট ও মধ্য-প্রাচ্যে জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি—তুরস্ক—মুস্তাফা কামাল—কামালের অভ্যন্তরীণ সংস্কার—কামালের পররাষ্ট্র-সম্পর্ক—মিশর-প্যালেস্টাইন—প্যালেস্টাইন সমস্যা—প্যালেস্টাইন সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা—আরব জাতীয়তাবাদ—জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত—নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত। ৩১৫-৩৩৪

অষ্টাদশ অধ্যায় :

সুদূর-প্রাচ্য (১৯১৯-১৯৩৯)—সুদূর-প্রাচ্যের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব—দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তী কালে চীনের ইতিহাস—শান্তি-সম্মেলনে চীন—ওয়াশিংটন বৈঠকে চীন—সমালোচনা—চীনের অভ্যন্তরীণ ইতিহাস—চীনের পররাষ্ট্র-নীতি (১৯২২-৩৯)—চৈন কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যুত্থান—দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তী কালে জাপানের ইতিহাস—ওয়াশিংটন বৈঠকের পটভূমিকা—ওয়াশিংটন-সম্মেলন—ওয়াশিংটন সম্মেলনের গুরুত্ব—জাপানের পররাষ্ট্র-নীতি—জাপানের পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্যের কারণ—নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত। ৩৩৫-৩৫৯

ঊনবিংশ অধ্যায় :

লীগ অফ নেশনস্—উৎপত্তি—লীগ অফ নেশনস্-এর উদ্দেশ্য—লীগ অফ নেশনস্-এর সংগঠন—লীগ অফ নেশনস্-এর প্রকৃতি—লীগ অফ নেশনস্-এর কার্যাবলী—লীগ অফ নেশনস্ ও বিশ্ব-শান্তি—লীগ অফ নেশনস্-এর অন্যান্য কার্যাদি—লীগ অফ নেশনস্-এর কৃতিত্ব—লীগ অফ নেশনস্-এর ব্যর্থতার কারণ—নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত। ৩৬০-৩৭১

বিংশ অধ্যায় :

প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি (১৯৩০-৩৯)—আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি—জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল—জার্মানীর সামরিক প্রস্তুতি—ইঙ্গ-জার্মান চুক্তি—ইটালী কর্তৃক ইথিওপিয়া দখল—রোম-বার্লিন-টোকিও মৈত্রী—জাপানের চীন অভিযান—জার্মানী কর্তৃক অস্ট্রিয়া গ্রাস—চেকোশ্লোভাকিয়ার বিলুপ্তি সাধন

বিষয় পৃষ্ঠা

—ইওরোপ প্রতিক্রিয়া -জার্মানী কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণ -দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ—নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত। ৩৭২-৩৮৩

একবিংশ অধ্যায়ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঃ শান্তি-চুক্তি—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আদর্শগত সংঘাত -দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি -দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলী —পশ্চিম-ইওরোপে যুদ্ধ- ফ্রান্সের পতনের ফলাফল—ব্রিটেনের যুদ্ধ —পূর্ব-ইওরোপের যুদ্ধ—আফ্রিকা ও নিকট-প্রাচ্যে যুদ্ধ· মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ -সুদূর-প্রাচ্যে যুদ্ধ—ভূমধ্যসাগরে যুদ্ধ প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ—জার্মানীর পতনের কারণ · যুদ্ধকালীন সম্মেলন · শান্তির আলোচনা—শান্তি-চুক্তি পরাজিত জার্মানী ও মিত্রপক্ষ—জার্মানীর নিরস্ত্রীকরণ—জাপান ও মিত্রপক্ষ—নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত। ৩৮৪-৪১৪

দ্বাবিংশ অধ্যায়ঃ

চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লব ঃ চীনা-প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা- চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লব—কমিউনিস্টদের সাফল্যের কারণ · নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত। ৪১৫-৪২০

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ঃ

সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান—উৎপত্তি —ইউনাইটেড নেশনস্-এর সংগঠন—নিরাপত্তা পরিষদের সহিত সাধারণ সভার সম্পর্ক—ইউনাইটেড নেশনস্-এর কার্যাদি—ইউনাইটেড নেশনস্ ও লীগ অফ নেশনস্—ইওরোপে ঐক্যবদ্ধতার আন্দোলন - নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত। ৪২১-৪৩৫

চতুর্বিংশ অধ্যায়ঃ

যুদ্ধোত্তর ইওরোপ (১৯৪৫-১৯৫০) · যুদ্ধোত্তর পশ্চিম-ইওরোপের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ—ভূমিকা—ব্রিটেন—ফ্রান্স—ইটালী—পশ্চিম-ইওরোপের অন্যান্য ক্ষুদ্ররাষ্ট্র—যুদ্ধোত্তর পূর্ব-ইওরোপে কমিউনিস্ট একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা—নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত। ৪৩৬-৪৪৯

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ঃ

আমেরিকার ইতিহাস—স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে আমেরিকার সমস্যা—আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত কারণ—যুদ্ধের ঘটনাবলী—গৃহযুদ্ধের ফলাফল—গৃহযুদ্ধের পর আমেরিকা—অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন—অভিবাসন সমস্যা—গৃহযুদ্ধের পর আমেরিকা পররাষ্ট্র-নীতি—বিংশশতকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতি—আমেরিকার অভ্যন্তরীণ ইতিহাস—দক্ষিণ-আমেরিকার ইতিহাস—নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত। ৪৫০-৪৮৫

আধুনিক

ইওরোপ ও বিশ্বের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায় — জার্মান সাম্রাজ্য (১৮৭১-১৯১৪)

German Empire (1871-1914)

১.১. **নূতন সংবিধান ঃ** ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের ফলে জার্মানীর রাষ্ট্রীয় ঐক্য সম্পন্ন হয়। বিসমার্ক প্রাশিয়া-রাজের জন্য সাম্রাজ্যসূচক উপাধি গ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তাঁহার পীড়াপীড়ির ফলে প্রাশিয়া-রাজ কাইজার প্রথম উইলিয়াম ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের পর জার্মান সাম্রাজ্যের জন্য এক নূতন সংবিধানের প্রয়োজন হয় এবং বিসমার্ক-এর একক প্রচেষ্টায় এই সংবিধান রচিত হয়। বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত জার্মানীর রাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রয়োজন বিসমার্ক উপলব্ধি করেন এবং নূতন সংবিধানে তাহা প্রতিফলিত করার প্রয়োজনও তিনি উপলব্ধি করেন। তিনি জানিতেন যে জার্মানীর প্রতিটি রাষ্ট্র নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে বদ্ধপরিকর ছিল। সুতরাং তাঁহার রচিত সংবিধানে কেন্দ্রীয়করণ ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে একটি আপোসমূলক মীমাংসা করা হয়।

প্রাশিয়ার রাজাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা

নূতন সংবিধানে জার্মানীকে পঁচিশটি রাষ্ট্রের সমবায়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করার কথা ঘোষিত হয়। সেই কারণে এই যুক্তরাষ্ট্রকে জার্মান সাম্রাজ্যরূপেও ঘোষণা করা হয়। কতকগুলি বিষয় ছাড়া সাম্রাজ্যের অঙ্গরাজ্যগুলিকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়। নব-গঠিত জার্মান সাম্রাজ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহা কতকগুলি রাজতন্ত্র-শাসিত রাজ্যগুলিকে লইয়া গঠিত হয়। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের নিজস্ব সংবিধান, আইন-আদালত ও আইনসভা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়।

কাইজার-এর সাংবিধানিক পদ-মর্যাদা ছিল অদ্ভুত ধরনের। বস্তুতঃ তিনি বংশানুক্রমিক সম্রাট ছিলেন না। সংবিধানে বলা হয় যে প্রাশিয়ার রাজাই জার্মানীর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি হইবেন এবং এই অধিকার বলে তিনি জার্মান সম্রাটরূপে স্বীকৃত হইবেন। সমগ্র জার্মানীর প্রশাসনিক ক্ষমতা জার্মান সম্রাট এবং তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত চ্যান্সেলারের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। সম্রাট সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইলেন না। এই ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সভা (Bundesrat)-এর মাধ্যমে পরিচালনা করার ব্যবস্থা হয়। বুন্দাসরাত-এ প্রাশিয়ার আধিপত্য ছিল প্রবল এবং ইহার মাধ্যমে প্রাশিয়ার রাজা আইনতঃ সম্রাট হিসাবে তাঁহার ক্ষমতা ব্যবহার করার সুযোগ পান। সম্রাট হিসাবে প্রাশিয়ার রাজা বুন্দাসরাত কর্তৃক মনোনীত কমিটির সাহায্যে বিদেশ-নীতি

সম্রাটের পদ-মর্যাদা

পরিচালনা করিতেন, বৈদেশিক শক্তিগুলির ব্যাপারে সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করিতেন, সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতেন এবং যুদ্ধ ও শান্তি ঘোষণা করিতেন। নূতন সংবিধান অনুসারে জার্মান সম্রাট হইলেন সামরিক ও নৌ-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তিনি চ্যান্সেলার ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত করার অধিকার লাভ করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এই কার্যনির্বাহক ক্ষমতা ছিল সীমিত এবং বুন্দাসরাতও কার্যনির্বাহক ক্ষমতার অংশীদার ছিল।

জার্মান সাম্রাজ্যের কার্যনির্বাহক ক্ষমতা সম্রাট এবং সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত চ্যান্সেলারের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য কোন ইম্পিরিয়াল ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভা ছিল না। চ্যান্সেলার ছিলেন একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রী। চ্যান্সেলারের কোন সহকর্মী ছিল না, তবে তাঁহার অধীনে কয়েকজন অধস্তন মন্ত্রী নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হয়। প্রকৃতপক্ষে নূতন সংবিধানে সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রশাসনের জন্য পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির ব্যবস্থা করা হয় নাই এবং রাইখস্ট্যাগ-এর সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের অনাস্থা-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে চ্যান্সেলার পদত্যাগ করিতেও বাধ্য ছিলেন না। যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের সর্বোচ্চে ছিলেন চ্যান্সেলার। তিনি বুন্দাসরাত বা কেন্দ্রীয় সভায় সভাপতিত্ব করিতেন এবং রাইখস্ট্যাগ বা কেন্দ্রীয় গণ-সভায় বিতর্কে অংশ গ্রহণ করিতেন।

চ্যান্সেলার

কেন্দ্রীয় আইনসভা ছিল দুই কক্ষযুক্ত—যথা বুন্দাসরাত (Bundesrat) ও রাইখস্ট্যাগ (Reichstag)। জার্মানীর বিভিন্ন রাষ্ট্র ও নৃপতিগণ বুন্দাসরাত-এ প্রতিনিধিত্ব করিতেন। ইহা ভিন্ন বিভিন্ন রাষ্ট্রের নৃপতিগণ কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধিগণ এই সভায় যোগদান করিতেন। রাইখস্ট্যাগ বা কেন্দ্রীয় গণসভা জার্মানীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনগণের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত ছিল। এই সভার সদস্যসংখ্যা ছিল ৩৯৭ এবং ইঁহারা পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইতেন। এই সভার ক্ষমতা ছিল সীমিত। মন্ত্রিগণ ইহার নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য ছিলেন না। আইন-প্রণয়ণের ক্ষমতা একমাত্র বুন্দাসরাত-এর হস্তে ন্যস্তই ছিল। ইহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট প্রস্তুত করা, আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ করা, গণসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া প্রভৃতি ক্ষমতার অধিকার একমাত্র কেন্দ্রীয় সভা বা বুন্দাসরাত-এরই ছিল। তবে অঙ্গ-রাজ্যগুলির আইনসভার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের কোন আইন করার অধিকার ছিল না।

ঐ আইনসভা

জার্মান সাম্রাজ্যের কার্যনির্বাহক ক্ষমতা একমাত্র প্রাশিয়ার রাজার হস্তেই ন্যস্ত ছিল যিনি সাম্রাজ্যের সম্রাটরূপে অভিহিত হন (Deutscher Kaiser)। কিন্তু প্রকৃত কার্যনির্বাহক ক্ষমতা প্রাশিয়ার চ্যান্সেলারের হস্তেই ন্যস্ত হয় যিনি সাম্রাজ্যের নামে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। বিসমার্ক ১৮৭০ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত থাকেন। চ্যান্সেলার পার্লামেণ্ট বা কেন্দ্রীয় আইন

চ্যান্সেলারের কার্য-নির্বাহক ক্ষমতা

সভার নিকট জবাবদিহি ছিলেন না। তবে সম্রাটের সন্তুষ্টির উপরই চ্যান্সেলারের চাকুরির স্থায়িত্ব নির্ভর করিত।

জার্মান যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি সর্বোচ্চ আদালত ছিল (Reichgericht)। যুক্তরাষ্ট্রের আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারে এই আদালতের কোনরূপ ক্ষমতা ছিল না।

সর্বোচ্চ আদালত

জার্মান যুক্তরাষ্ট্র বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্র ছিল না কারণ যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ বা বৈশিষ্ট্য বলিতে যাহা বোঝা যায় জার্মান যুক্তরাষ্ট্রের সেই সকল বৈশিষ্ট্যের একান্তই অভাব ছিল। জার্মান যুক্তরাষ্ট্রে একদিকে আইনের কেন্দ্রীয়করণ ও অপর দিকে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের এক অদ্ভুত সমন্বয় দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে জার্মান যুক্তরাষ্ট্র গঠিত ছিল না। একদিকে ছিল অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ও সমৃদ্ধ প্রাশিয়া ও অপর দিকে নিতান্তই ক্ষুদ্র ও দুর্বল অন্যান্য রাজ্য। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের তথা সাম্রাজ্যের সকল ব্যাপারেই প্রাশিয়ার প্রাধান্য ছিল প্রবল। তৃতীয়তঃ, জার্মান যুক্তরাষ্ট্র ছিল কতকগুলি রাজতন্ত্র শাসিত রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত এবং বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের নৃপতিগণই পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ বুন্দাসরাত-এ প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের সর্বোচ্চে ছিলেন সম্রাট। এই সম্রাট-পদ পাইবার একমাত্র অধিকারী ছিলেন প্রাশিয়ার রাজা। সুতরাং রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দিক দিয়া প্রাশিয়ার রাজাই ছিলেন শ্রেষ্ঠ মর্যাদার একমাত্র অধিকারী। চতুর্থতঃ, কেন্দ্রে তথা অন্য রাজ্যে মনোনীত মন্ত্রিগণই কার্যনির্বাহক ক্ষমতা ও দায়-দায়িত্ব পরিচালনা করিতেন। মন্ত্রী নির্বাচন করার কোন ধারা সংবিধানে ছিল না। সুতরাং জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহি করার কোন ব্যবস্থা সংবিধানে ছিল না। পঞ্চমতঃ, আয়তন, জনসংখ্যা ও ক্ষমতার দিক দিয়া প্রাশিয়াই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধিক শক্তিশালী রাষ্ট্র। সুতরাং জার্মান সাম্রাজ্য বলিতে প্রাশিয়ার রাজ্যই বুঝাইত।

সংবিধানের ত্রুটি

১.২. বিসমার্কের অভ্যন্তরীণ নীতি (১৮৭১-১৮৯০) : (Domestic Policy of Bismarck 1871-1890) : সাম্রাজ্যের সংহতি আনয়নের চেষ্টা : ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্যবন্ধন সম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু তখনও দেশের মধ্যে সামাজিক বা জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে বহুবিধ বিশৃঙ্খলা বর্তমান ছিল। প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন বিসমার্ক দেশের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন, রক্ষণশীলতা এবং দেশের সমৃদ্ধিবর্ধন এই তিনটি আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের ২৫টি প্রদেশ কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যাপার ছাড়া সকল বিষয়েই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করিত। ফলে বহুক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে প্রাদেশিক মনোভাব বর্তমান ছিল। সুতরাং বিসমার্কের প্রথম কর্তব্য হইল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া তাহাদের মধ্যে অখণ্ড জাতীয়তাবোধ জাগরিত করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিসমার্ক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিয়া প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় শাসনের প্রত্যক্ষ অধীনে আনয়ন করিতে সচেষ্ট হন।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হয়। দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলি সরকারীভাবে উত্তর জার্মান রাষ্ট্রসংঘে যোগদান করিল। জার্মান রাষ্ট্রসংঘ অতঃপর প্রাশিয়া-রাজের সভাপতিত্বে যুক্তরাষ্ট্রে রূপান্তরিত হইল। সমগ্র জার্মানীর (অস্ট্রিয়া ও লাক্সেমবুর্গ ছাড়া) শাসনকার্যের ক্ষমতা জার্মান সম্রাট এবং তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত চ্যান্সেলারের উপর ন্যস্ত হইল। সম্রাট সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না, এই ক্ষমতার অধিকারী ছিল কেন্দ্রীয় সভা (Bundesrat)। কেন্দ্রীয় সভার পরামর্শক্রমেই সম্রাট পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালনা, যুদ্ধ ও শান্তি ঘোষণা এবং রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করিতেন। চ্যান্সেলারই (Chancellor) ছিলেন একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রী। তিনি অন্যান্য মন্ত্রী ও বিভাগীয় সচিবের (Secretaries) সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু বিসমার্ক মন্ত্রিপরিষদ (Cabinet) গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন না। চ্যান্সেলারই ছিলেন সাম্রাজ্যের একমাত্র উচ্চপদস্থ দায়িত্বশীল কর্মচারী। বিসমার্ক গণতান্ত্রিক মতবাদের বিরোধী ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে তিনি কেবলমাত্র একটি কেন্দ্রীয় সভা (Bundesrat) এবং একটি কেন্দ্রীয় গণসভার (Reichstag) ব্যবস্থা করেন। কেন্দ্রীয় সভা আমেরিকার সেনেটের (Senate) ন্যায় জার্মানীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকগণের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিগণকে লইয়া এবং কেন্দ্রীয় গণসভা জার্মানীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনগণের প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত হয়। আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রীয় সভার হস্তেই রাখা হয়। ইহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট প্রস্তুত করা, আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ করা, গণসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া প্রভৃতি ক্ষমতার অধিকার একমাত্র কেন্দ্রীয় সভার হস্তেই ন্যস্ত হয়। এক কথায় বলিতে গেলে এই শাসনপদ্ধতিতে গণতন্ত্রের কোন আভাস পাওয়া যায় না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র

সাম্রাজ্যের সংহতি আনয়নের জন্য বিসমার্ক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপদ্ধতি সর্বত্র প্রবর্তন করেন। বিসমার্ক জার্মানীর আইন-সংক্রান্ত সংস্কার প্রবর্তন করেন। বিচারের সুবিধার জন্য জার্মানীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয় কিন্তু সেই সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষমতা যাহাতে ব্যাহত না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হয়। ইহার পর বিসমার্ক বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের মুদ্রানীতি বাতিল করিয়া সর্ব-জার্মান মুদ্রানীতির প্রবর্তন করেন। সমগ্র জার্মানীর রেলপথের তথা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব-জার্মান রেল-পরিষদ গঠন করা হয় এবং রেল, ডাক ও তার বিভাগ সরাসরি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়।

বিসমার্কের উন্নয়নমূলক কার্য

বিসমার্ক ব্যাংকিং-ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর তিনি প্রাশিয়ার সামরিক পদ্ধতি সকল রাষ্ট্রে প্রবর্তন করেন।

সাম্রাজ্যের সংহতির পথে সর্বাধিক অন্তরায় ছিল অ-জার্মান জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধ মনোভাব। জার্মান সাম্রাজ্য বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সমন্বয়ে গঠিত ছিল, যেমন,

স্লেসউইগের ডেনগণ, পূর্ব প্রাশিয়ার পোলগণ এবং আলসাস্-লোরেনের ফরাসীগণ। বিসমার্ক ও তাঁহার সহকর্মীগণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর উপর জার্মানীকরণ (Germanisation) নীতি প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে জার্মান ভাষাভুক্ত করা। কিন্তু জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ এই জাতিগোষ্ঠী জার্মানীকরণ-নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইল। স্লেসউইগের ডেনগণ ডেনমার্কের সহিত সংযুক্ত করার দাবি জানাইল। লোরেনের ফরাসী অধিবাসীগণ জার্মান সাম্রাজ্যের সহিত তাহাদের অন্তর্ভুক্তি চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করে নাই এবং তাহারা বাধ্যতামূলক জার্মানীকরণ-নীতির বিরোধিতা করিল। কিন্তু সর্বাধিক গোলযোগের সৃষ্টি হইল পোলিশ অধিবাসীগণকে লইয়া। পোল-অধ্যুষিত অঞ্চলে জার্মানভাষা প্রচলিত করিতে গিয়া বিসমার্ক অবশেষে বিফল হন।

জার্মানীর সংহতির পথে অন্তরায় ও বিসমার্কের জার্মানীকরণ-নীতি

কুল্টুরক্যাম্পফ্ বা ক্যাথলিক চার্চের সহিত বিরোধঃ উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য ইওরোপে নূতন করিয়া যে ক্যাথলিক আন্দোলন শুরু হয়, জার্মানীতে ক্যাথলিকদের আন্দোলন সেই বৃহত্তর আন্দোলনের অংশবিশেষ। জার্মানীতে প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মমতের প্রসারের সময় হইতে জার্মানগণ ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট—এই দুই ধর্মীয় গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া যায়। জার্মানীতে রোমান ক্যাথলিকগণ সংখ্যালঘু হইলেও, উহারা ছিল সুসংবদ্ধ ও শক্তিশালী। ব্যাভেরিয়া, সাইলেশিয়া, রাইনল্যাণ্ড ও ওয়েস্টফেলিয়া—প্রভৃতি অঞ্চলে ক্যাথলিকদের শক্ত ঘাঁটি ছিল।

জার্মান সাম্রাজ্যের সংহতির জন্য বিসমার্ককে দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। জার্মানীতে রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে এই সংগ্রাম 'কুল্টুরক্যাম্পফ্' (Kulturkampf) বা 'সভ্যতার সংগ্রাম' নামে খ্যাত। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সহিত বিসমার্কের বিবাদের কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, জার্মানীর ক্যাথলিকগণ অস্ট্রিয়ার প্রতি অনুরক্ত ছিল। অস্ট্রিয়া-প্রাশিয় যুদ্ধে (১৮৬৬) প্রাশিয়া জয়লাভ করিলে ক্যাথলিকদের সহিত প্রাশিয়ার সম্পর্ক তিক্ত হয়। এই যুদ্ধে রোমের পোপ-অস্ট্রিয়ার সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহার পর ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধে (১৮৭০) জার্মানীর ক্যাথলিক চার্চ ক্যাথলিক রাষ্ট্র ফ্রান্সের অনুকূলে ছিল। বিসমার্ক বিশ্বাস করিতেন যে জার্মানীর জেসুইটগণ প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে সাহায্য করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, জার্মান ক্যাথলিকগণ প্রোটেস্টাণ্ট রাষ্ট্র প্রাশিয়ার কর্তৃত্ব মানিয়া লইতে অসম্মত ছিল। তৃতীয়তঃ, ক্যাথলিকগণ উহাদের ধর্মগুরু পোপকে ইটালীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার পক্ষপাতী ছিল। পোপের রাজ্য ঐক্যবদ্ধ ইটালীর অঙ্গীভূত হওয়া সত্ত্বেও পোপ ক্রমাগত তাঁহার হৃতরাজ্যের উপর দাবি জানাইয়া আসিতেছিলেন এবং জার্মান ক্যাথলিকগণও এই দাবি সমর্থন করিয়া আসিতেছিল। জার্মান ক্যাথলিকদের ব্যবহারে জার্মানী ও

ক্যাথলিকদের সহিত বিসমার্ক-এর বিরোধের কারণ

মিত্ররাষ্ট্র ইটালীর মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইতে পারে, এই আশংকা করিয়া বিসমার্ক উহাদিগকে দমন করিতে বদ্ধপরিকর হন। চতুর্থতঃ, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোমের ভ্যাটিকান শহর হইতে পোপ নবম পায়াস তাঁহার 'অভ্রান্তবাদ' (Papal Infallibility 1870) ঘোষণা করিলে ক্যাথলিকদের সহিত বিসমার্কের বিরোধ সংকটের পর্যায়ে পেঁছায়। এই ঘোষণাপত্রকে উপলক্ষ করিয়া জার্মানীর ক্যাথলিকগণ দুইটি পরস্পর-বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং উহাদের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। যাহারা পোপের 'অভ্রান্তবাদ' গ্রহণে অসম্মত হইল উহারা 'ওল্ড-ক্যাথলিক' (Old Catholic) নামে পরিচিত হয়। ফলে ক্যাথলিকদের দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ তীব্র হইয়া উঠে। পোপ ওল্ড-ক্যাথলিকদের নিন্দা করিয়া জার্মানীর ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃক পরিচালিত সকল স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উহাদের পদত্যাগের হুকুম দেন। দক্ষিণ জার্মানীতে পোপের সমর্থকদল পোপের নির্দেশক্রমে ওল্ড-ক্যাথলিকগণকে চার্চ ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে বিতাড়িত করে। এই অবস্থায় রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার্থে বিসমার্ক ওল্ড-ক্যাথলিকদের পক্ষাবলম্বন করিয়া পোপের সমর্থকদের সহিত 'কুল্টুরক্যাম্পফ্' বা সভ্যতার সংগ্রামে অবতীর্ণ হন।

বিসমার্ক পোপের ঘোষণাপত্রকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের উপর চার্চের হস্তক্ষেপ বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি ইহাকে রাষ্ট্রের উপর বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ বলিয়াও অভিহিত করেন। সুতরাং চার্চের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে তিনি পোপবিরোধী নীতি গ্রহণ করেন।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জেসুইটগণ জার্মানী হইতে বিতাড়িত হইল এবং পোপের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা হইল। অতঃপর ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাথলিকগণের বিরুদ্ধে বিখ্যাত মে-আইন (May Laws) রচিত হইল। এই মে-আইনের বিধান অনুসারে 'সিভিল ম্যারেজ' আবশ্যিক করা হইল; ধর্মযাজকদের শিক্ষা-ব্যবস্থা রাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে আনা হইল এবং রাষ্ট্রের ব্যাপারে চার্চের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ হইল। পোপ (নবম পায়াস) 'মে-আইন'কে অন্যায় ও ধর্মবিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিলে ক্যাথলিকদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইল এবং দেশব্যাপী অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। কিন্তু ক্যাথলিকগণ শ্রমিক ও সমাজতন্ত্রবাদীদের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিলে বিসমার্ক আতংকিত হইলেন। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার্থে অগত্যা তিনি ক্যাথলিকগণের সহিত আপোস করিতে সম্মত হইলেন। বিসমার্ক ক্যাথলিকবিরোধী আইনসমূহ প্রত্যাহার করিলেন এবং পোপের (ত্রয়োদশ লিও) সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করিলেন।

ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

মে-আইন (১৮৭৩)

সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে বিসমার্কের সংগ্রাম: ক্যাথলিকদের ন্যায় সমাজতন্ত্রীগণের (Socialists) প্রতিও বিসমার্ক অত্যন্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন।

সমাজতান্ত্রিক দল জার্মানীর মধ্যে সর্বাধিক বলশালী ও সুসংবদ্ধ ছিল। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে সমাজতন্ত্রীদের প্রতিপত্তিতে আতঙ্কিত হইয়াই বিসমার্ক ক্যাথলিকদের সহিত আপোস করিয়াছিলেন। আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের জনক ছিলেন কার্লমার্ক্স (Karlmarx) যিনি সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ ওকর্মসূচী নিরূপণ করিয়াছিলেন। জার্মানীতে কার্লমার্ক্সের বহু অনুগামী ছিল। কিন্তু জার্মান সমাজতন্ত্রীগণ দুইটি দলে বিভক্ত ছিল—যথা, মার্ক্সের অনুগামীগণ যাহারা সমাজতন্ত্রের বিপ্লবী আদর্শে বিশ্বাসী ছিল। অপর দলের নেতা ছিলেন ফার্ডিনাণ্ড লাসেল (Ferdinand Lassale) যিনি সমাজতন্ত্রবাদের বিপ্লবী আদর্শ ও আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। যাহা হউক, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্ক্স ও লাসেল-এর অনুগামীগণ যুগ্মভাবে সামাজিক গণতান্ত্রিক দল গঠন করে এবং এই দল রাইখস্ট্যাগে ১২টি স্থান দখল করে। এই দলের আদর্শ ছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রব্যবস্থার পুনর্গঠন করা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার করা এবং সামরিক অপেক্ষা প্রজাকল্যাণমূলক বে-সামরিক খাতে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ করা। কিন্তু তাহাদের এই আদর্শ ছিল বিসমার্কীয়-নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। জার্মানীতে সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার ও সমাজতন্ত্রীদের কার্যকলাপ শাসকগোষ্ঠীর মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে—কারণ সমাজতন্ত্রীদের লক্ষ্য ছিল প্রচলিত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া বৈপ্লবিক আদর্শের ভিত্তির উপর নূতন যুগের সৃষ্টি করা। কাইজার প্রথম উইলিয়াম সমাজতন্ত্রীগণকে তাঁহার ব্যক্তিগত শত্রু বলিয়া মনে করিতেন এবং উহাদের ধ্বংস করার জন্য তাঁহার উপর ঈশ্বরের আদেশ ছিল বলিয়া মনে করিতেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বিসমার্কের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা নীতি ছিল না, যদিও বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি উহাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। লাইবনেক্ট (Liebkneiht), বেবেল (Bebel) প্রভৃতি সমাজতন্ত্রী নেতাগণ-ইতিপূর্বেই উত্তর-জার্মান রাষ্ট্রসমবায় (North German Confedration) গঠন, ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ (১৮৭০-৭১) ও আলসাস্-লোরেনের দখল ইত্যাদি ব্যাপারে প্রবল প্রতিবাদের ধ্বনি তুলিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে সমাজন্ত্রীগণ জার্মানীর তদানীন্তন বিধি-ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। এই অবস্থায় জার্মানীর নূতন স্রষ্টা বিসমার্কের সহিত উহাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে। উপরন্তু সমাজতন্ত্রীগণ ছিল গণতন্ত্রের উগ্র সমর্থক ও গণতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু বিসমার্ক ছিলেন গণতন্ত্রের ঘোর বিরোধী। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান সম্রাটকে দুইবার হত্যা করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে সমগ্র জার্মানীতে এক দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। জার্মান সমাজতন্ত্রীগণ ইহার নিন্দা করিলেও, জনমত উহাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়া উঠে। বিসমার্ক সেই সুযোগে সমাজতন্ত্রীদের ধ্বংস করিতে উদ্যোগী হন। এই সম্পর্কে তিনি দুইটি উপায়

সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে বিসমার্কের নীতি
(১) দমন (২) শ্রমিক-উন্নয়ন

অবলম্বন করেন—যথা সমাজতন্ত্রীদের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা এবং শ্রমিকগণকে উহাদের অবস্থার উন্নয়ন করার আশ্বাস দিয়া সমাজতন্ত্রীদের নিকট হইতে উহাদের বিচ্ছিন্ন করা। এই উদ্দেশ্যে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দমনমূলক আইন লিপিবদ্ধ করা হয়। এই আইনের দ্বারা সমাজতান্ত্রিকগণের পক্ষে দলবদ্ধ হওয়া, সভাসমিতি করা ও পুস্তকাদি প্রকাশ করা নিষিদ্ধ হইল। এমন কি তাহাদের সংগৃহীত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইল এবং বহু সমাজতন্ত্রী নেতাকে কারারুদ্ধ করা হইল। কঠোর আইন প্রবর্তন করিয়াও বিসমার্ক ইহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে দমন করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি শ্রমিকশ্রেণীকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে সরকার উহাদের দাবিদাওয়ার প্রতি মোটেই উদাসীন নহে। তিনি সমাজতন্ত্রীদের প্রভাব হইতে শ্রমিকশ্রেণীকে মুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি শ্রমিক-কল্যাণমূলক আইন প্রবর্তন করেন। এই বাবদে রাষ্ট্রের যে ব্যয় হয় তাহা তিনি শিল্পপতি, শ্রমিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। অবশেষে শ্রমিকগণের সহানুভূতি লাভের আশায় তিনি নিজেই বহু সমাজতান্ত্রিক আইন রচনা করেন।

শ্রমিক-কল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থা বা স্টেট সোস্যালিজম

শ্রমিকদের আর্থিক উন্নয়নকল্পে এবং ব্যাধি, দুর্ঘটনা, বার্ধক্যজনিত দুরবস্থা হইতে উহাদের রক্ষার জন্য বিসমার্ক স্টেট সোস্যালিজম (State Socialism) নীতি গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৮৩ হইতে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বহু আইন প্রবর্তন করিয়া বিসমার্ক মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর আর্থিক ও দৈহিক অবস্থার উন্নতিসাধন করেন। কারখানা আইন (factory laws) প্রবর্তন করিয়া শ্রমিকদের কাজের সময় নির্দিষ্ট করা হইল, রুগ্ন ও বার্ধক্যগ্রস্ত শ্রমিকদের জন্য অসুস্থতা বীমা ও বার্ধক্য বীমা প্রভৃতি আইন প্রবর্তিত হইল। বিসমার্কের এই শ্রমিক-উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করিয়া ভবিষ্যতে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি শ্রমিক-কল্যাণ আইন প্রবর্তন করিয়াছিল।

এই সকল শ্রমিক-কল্যাণমূলক আইন প্রবর্তন করিতে যাইয়া বিসমার্ককে রাইখস্ট্যাগ ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। শ্রমিক-কল্যাণ খাতে সকল ব্যয় রাষ্ট্র বহন করুক বিসমার্কের ইহাই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এই খাতে রাষ্ট্রের অতিরিক্ত ব্যয় বহন করার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে রাইখস্ট্যাগ অসম্মত হইলে বিসমার্ক শ্রমিক-নিয়োগকারী মালিকদের উপর কিছু কিছু দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। কর্মরতকালে শ্রমিকের দুর্ঘটনা ঘটিলে উহার সকল ব্যয়ভার নিয়োগকর্তা বা মালিকের বহন করা বাধ্যতামূলক করা হইল। শ্রমিকের জীবন-বীমার ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের অর্ধাংশ মালিকের পক্ষে বহন করাও বাধ্যতামূলক করা হইল।

সমাজতন্ত্রীগণ শ্রমিক-কল্যাণমূলক আইনগুলি অপর্যাপ্ত বলিয়া অভিহিত করে এবং বিসমার্কের সহিত সহযোগিতা করা হইতে বিরত থাকে। বিসমার্ক শ্রমিকদের কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়া সমাজতন্ত্রীদলকে দুর্বল করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এই দল ক্রমেই জনপ্রিয়তা ও শক্তি অর্জন করিতে থাকে।

শিল্প-সংরক্ষণ নীতি : জার্মানীর অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে বিসমার্ক শিল্প-বাণিজ্যে সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করিয়া শিল্পপ্রসারে উৎসাহ প্রদান করেন। এই নীতির পশ্চাতে তাঁহার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ, বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে জার্মানীর শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করিয়া জার্মানীকে উন্নত শিল্পরাষ্ট্রে পরিণত করা। দ্বিতীয়তঃ, আর্থিক উন্নতি সাধন করিয়া জার্মানীর সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা। ইহা অনস্বীকার্য যে বিসমার্কের শুল্কনীতি কেন্দ্রীয় শাসনকে শক্তিশালী করিতে এবং সাম্রাজ্যের ঐক্যবন্ধন সুদৃঢ় করিতে সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অর্থনৈতিক নীতি উদারপন্থীগণকে অসন্তুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল এবং এই কারণেই বিসমার্ক ক্যাথলিকগণের সহিত আপোস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

উদ্দেশ্য : শিল্পোন্নতি ও সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন

১.৩. **বিসমার্কের ঔপনিবেশিক নীতি** (Colonial Policy) : জার্মানীর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ভিত্তি বিসমার্কের আমলেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে, তিনি প্রথমে এই নীতির বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স আলসাস্-লোরেনের পরিবর্তে জার্মানীকে অন্যত্র উপনিবেশ ছাড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিলে বিসমার্ক তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি মনে করিতেন যে সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার জন্য সকল শক্তি নিয়োজিত করা প্রয়োজন। উপনিবেশ স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেই অন্যান্য রাষ্ট্রের বিশেষ করিয়া ইংল্যাণ্ডের বিরোধিতা অনিবার্য হইয়া উঠিবে। কিন্তু শিল্প-সংরক্ষণ নীতি গৃহীত হইলে বিসমার্ক উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। শিল্প-উৎপাদন অভূতপূর্ব ভাবে বৃদ্ধি পাইলে উদ্বৃত্ত পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য বৃহত্তর বাজারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আর্থিক প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীকে বিশ্বের অন্যতম রাষ্ট্রে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষাও দেশে দেখা দেয়। কারণ তৎকালীন ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব উহার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির উপর নির্ভর করিত। অধিকন্তু জার্মানীর ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যা সমস্যার সমাধানকল্পেও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপন অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিসমার্ক উপনিবেশ স্থাপনে উদ্যোগী হন। ধর্মপ্রচারকগণ ও বণিকগণ প্রথমে পথ দেখাইল। একাধিক বণিক কোম্পানীর উদ্ভব হইল এবং উহারা ক্রমশঃ পারস্পরিক বন্দোবস্ত ও চুক্তি দ্বারা দক্ষিণ সাগরীয় উপকূলে এবং আফ্রিকার টোগোল্যাণ্ড, ক্যামেরুন প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির সহিত আফ্রিকার ব্যবচ্ছেদ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতেও বিসমার্ক দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জার্মানীর আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকিয়া যাওয়ায় পরবর্তী কালে বহু আন্তর্জাতিক সংকটের উদ্ভব হইয়াছিল।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা

জার্মানীর উপনিবেশসমূহ

১.৪. বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত (Foreign Policy of Bismarck) : ১৮৬২ হইতে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাশিয়ার অধীনে সমগ্র জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করা। কিন্তু এই উদ্দেশ্যসাধনের পথে বহু বিঘ্ন ছিল। (১) ভিয়েনার ব্যবস্থা দ্বারা জার্মানীতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। জার্মানীকে খন্ডিত রাখিয়া আপন প্রতিপত্তি বজায় রাখাই ছিল অস্ট্রিয়ার উদ্দেশ্য। সুতরাং অস্ট্রিয়া জার্মানীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিল। (২) ইহা ছাড়া ঐক্য স্থাপনের পথে অন্তরায় ছিল জার্মানীর অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি। ইহারা আপন আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্য জার্মান ঐক্য-আন্দোলনের সর্বদাই বিরোধিতা করিত। (৩) অপরদিকে ইওরোপের শক্তিসাম্য (balance of power) রক্ষা করার জন্য ফ্রান্স সর্বদাই প্রাশিয়ার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিত। এই সকল কারণে জার্মানীর ঐক্য সাধনের জন্য বিসমার্ককে তিনটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ, স্লেসউইস-হলস্টিন সমস্যার সুযোগ লইয়া অস্ট্রিয়ার সহযোগিতায় তিনি ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন (১৮৬৪ খ্রীঃ)। ইহার ফলে জার্মানীর ঐক্যবন্ধনের পথ সুগম হয় এবং বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ সুনিশ্চিত করেন। দ্বিতীয়তঃ, অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া তিনি কূটনৈতিক প্রস্তুতি আরম্ভ করেন ; তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত মিত্রতা স্থাপন ও অস্ট্রিয়া-বিরোধী জারের সমর্থন অর্জন করিয়া বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন (১৮৬৬ খ্রীঃ)। স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করিয়া বিসমার্ক প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জার্মান রাষ্ট্রসংঘ গঠন করেন। তৃতীয়তঃ, জার্মানীর ঐক্যবন্ধন সম্পূর্ণ করার জন্য বিসমার্ক অতঃপর ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য করিয়া তোলেন। কারণ অস্ট্রিয়ার ন্যায় ফ্রান্সও এই ঐক্যবন্ধনের অন্তরায় ছিল। যুদ্ধানুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়া বিসমার্ক ফ্রান্সকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করেন (১৮৭০ খ্রীঃ)। সেডানের যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হইলে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানী একটি ঐক্যবদ্ধ অখন্ড রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্ক সমগ্র জার্মান রাষ্ট্রের ইম্পিরিয়াল চ্যান্সেলার (Imperial Chancellor) পদে নিযুক্ত হন।

পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য জার্মানীর ঐক্যবন্ধন

জার্মানীর ঐক্যসাধনের জন্য তিনটি যুদ্ধ

১.৫. বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি, ১৮৭১-১৮৯০ (Foreign Policy of Bismarck) : ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের পর বিসমার্ক প্রায় কুড়ি বৎসর জার্মানীর পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করিয়া জার্মানীকে ইওরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান সাম্রাজ্য গঠিত হইবার পর হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্কের পদচ্যুতি পর্যন্ত এই সময়কে বিসমার্কের যুগ (Age of Bismarck) বলা হয়। ("Germany under Bismarck's guidance was the pivot of European Politics")। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সমর-

নীতি (Policy of blood and iron) অনুসরণ করিয়া প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জাতীয় সংহতি সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে তিনি অতঃপর শান্তি ও 'যথা পূর্বং' নীতি গ্রহণ করেন। তিনি প্রচার করেন যে জার্মানীর অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে (Germany is a satiated country)। জার্মানীর পক্ষে আর রাজ্যবৃদ্ধির কোন প্রয়োজন নাই। জার্মানীর সামরিক শক্তি এবং রাজ্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেইদিকে তিনি অতঃপর মনোযোগী হন। ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির সহিত বিভিন্ন প্রকারের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া বিসমার্ক জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হন। মূলতঃ দুইটি উদ্দেশ্য তাঁহার পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। (১) জার্মানীর জাতীয় সংহতি রক্ষার্থে ইওরোপে শান্তি বজায় রাখা, (২) পরাজিত ফ্রান্সের প্রতিশোধাত্মক মনোভাব ও সম্ভাবিত আক্রমণ হইতে জার্মানীর নিরাপত্তা রক্ষার্থে ফ্রান্সকে অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মিত্রচ্যুত অবস্থায় রাখা। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড ; ফ্রান্স ও ইটালী ; ফ্রান্স ও রাশিয়া—ইহাদের মধ্যে যাহাতে কোনরূপ সদ্ভাব স্থাপিত না হয় সেইদিকে বিসমার্ক সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখেন। অপরদিকে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যেও যাহাতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে না পারে সেদিকেও তিনি লক্ষ্য রাখেন। বিসমার্কের সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে যে তিনি "যাদুকরের ন্যায় একসঙ্গে পাঁচটি বল লইয়া এমনভাবে খেলিতে পারিতেন যে সর্বদাই অন্ততঃ দুইটি বল শূন্যে থাকিত"—এই পাঁচটি বল-এর অর্থ হইল অস্ট্রিয়া, ইটালী, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স।

দুইটি উদ্দেশ্য

ফ্রান্সের আলসাস্-লোরেন প্রদেশ দুইটি জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ফরাসী জাতির মর্যাদা যে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বিসমার্ক তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং ফ্রান্স যে ইহার প্রতিশোধ লইবে তাহাও বিসমার্ক জানিতেন। সুতরাং কূটনৈতিকভাবে ফ্রান্সকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত মিত্রতা হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে তিনি সচেষ্ট হন। বিসমার্ক প্রথমে অস্ট্রিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপনে অগ্রসর হন। স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয় হওয়ার পর হইতে বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার প্রতি বদান্যতা প্রদর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। বলকান অঞ্চলে রাশিয়াকে প্রতিরোধ করার জন্য অস্ট্রিয়ার পক্ষেও এক শক্তিশালী মিত্রের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং বিসমার্কের চেষ্টায় জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়। অতঃপর তিনি রাশিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপনে সচেষ্ট হন। সে সময় জার্মানীর সহিত রাশিয়ার স্বার্থ-সংঘাতের কোন সম্ভাবনা না থাকায় বিসমার্ককে এই বিষয়ে বেগ পাইতে হয় নাই। উপরন্তু পোলিশ বিদ্রোহের সময় প্রাশিয়ার সাহায্য রাশিয়া বিস্মৃত হয় নাই এবং জার্মানীর সমর্থনে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের সময় রাশিয়া প্যারিস সন্ধি লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণসাগরে স্বীয় প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

অস্ট্রিয়ার সহিত সন্ধি স্থাপন ও রাশিয়ার সহিত সদ্ভাব

সুতরাং পূর্ব হইতেই এই দুই দেশ মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধই ছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার বার্লিনে সফর করিতে আসিলে বিসমার্ক সেই সুযোগে অস্ট্রিয়া, জার্মানী ও রাশিয়া এই তিনটি রাষ্ট্রের নরপতিগণের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। ইহা 'Dreikaiserbund' বা 'ত্রি-সম্রাট সংঘ' নামে খ্যাত। এই চুক্তি কোন লিখিত চুক্তি নহে, তিন সম্রাটের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া মাত্র। বল্কান অঞ্চলে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে স্বার্থের প্রকাশ্য সংঘাত উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি জার্মান কূটনীতির প্রধান ভিত্তি ছিল। সম্রাটত্রয় পরস্পরের সাম্রাজ্যের অক্ষুণ্ণতা রক্ষা করিতে, পরস্পরের স্বার্থ বজায় রাখিয়া নিকট-প্রাচ্যের সমস্যা সমাধান করিতে এবং স্ব স্ব রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রবাদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করিতে স্বীকৃত হন।

ত্রি-সম্রাট সঙ্ঘ ও উহার উদ্দেশ্য (১৮৭২)

ত্রি-সম্রাট সঙ্ঘের গুরুত্ব হইল এই যে (১) ইহার দ্বারা ফ্রান্সকে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়, (২) অস্ট্রিয়া স্যাডোয়া যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি বিস্মৃত হয় এবং প্রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ হয় এবং (৩) বিসমার্ক বিগতকালের প্রাশোরাশিয় মৈত্রী পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন।

ত্রি-সম্রাট সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইলেও, বিসমার্ক ফ্রান্সের সহিত সদ্ভাব পুনঃস্থাপনে যত্নবান হন। কূটনৈতিক ভাবে ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া, বিসমার্ক পরোক্ষভাবে ফ্রান্সকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। তিনি জানিতেন যে যতদিন প্রজাতন্ত্রী সরকার ফ্রান্সে ক্ষমতাসীন থাকিবে, ততদিন উগ্র রাজতন্ত্র-শাসিত রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সহিত ফ্রান্সের মৈত্রীবন্ধনের সম্ভাবনা কখনইআসিবে না। এই কারণেতিনিফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রী সরকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নবান হন। ইহা ভিন্ন তিনি আলসাস্-লোরেনের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ফ্রান্সকে অন্যত্র উপনিবেশ স্থাপন করিতে সাহায্য করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-জার্মান সম্পর্কে সংকট দেখা দেয়। ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট থিয়ার্স-এর পতন ঘটে এবং উগ্র রাজতন্ত্রী ম্যাকমোহন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। বিসমার্ক রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সহিত ফ্রান্সের মৈত্রীস্থাপনের সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন এবং ইহার ফলে ফ্রান্সের কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতার অবসানের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফ্রান্সের নূতন প্রেসিডেন্ট ম্যাকমোহন নূতন সামরিক আইন প্রবর্তন করিয়া সামরিক সংস্কারে উদ্যোগী হইলে বিসমার্ক আশঙ্কিত হন। এই অবস্থায় বিসমার্ক ফ্রান্সের সামরিক প্রস্তুতির বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ করেন। তিনি ফ্রান্সকে এই বলিয়া সতর্ক করেন যে ফ্রান্স সামরিক সংস্কারের কর্মসূচী পরিত্যাগ না করিলে জার্মানী যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইবে। প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সের সামরিক প্রস্তুতির সংবাদ প্রচারিত হইলে জার্মানীতে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেই সময় রাশিয়াসহ ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলি ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের

ফ্রান্সের প্রতি বিসমার্কের মনোভাব

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের সম্ভাবনা

সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। রুশ-জার বিসমার্ককে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধ ঘটিলে রাশিয়া নিরপেক্ষ রহিবে না। জারের এই সতর্কবাণী ফলপ্রসূ হয় এবং বিসমার্ক নিরস্ত হন। এইভাবে ইওরোপীয় যুদ্ধের এক সম্ভাবনা দূরে হয়।

নিঃসন্দেহে ত্রি-সম্রাট সংঘ বিসমার্কের এক বিরাট কূটনৈতিক সাফল্য বলিয়া গণ্য করা যায়। কিন্তু এই মৈত্রীচুক্তিকে শান্তিপূর্ণ ভাবে বজায় রাখা ছিল অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের সম্ভাবনা এই মৈত্রী-চুক্তির উপর আঘাত হানে এবং রুশ-জার ফ্রান্সের অনুকূলে হস্তক্ষেপ করেন। রাশিয়ার মিত্রতার প্রতি সন্দিহান হইয়া বিসমার্ক অতঃপর অস্ট্রিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে প্রয়াসী হন। বিসমার্কের সুযোগও উপস্থিত হয়। কারণ এই সময় বল্কানের প্রশ্ন লইয়া রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। বল্কান অঞ্চলে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার স্বার্থ ছিল এমনই পরস্পর-বিরোধী যে উহার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা ছিল প্রায় অসম্ভব। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত বার্লিন কংগ্রেসে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে যে কোনও একটিকে বাছিয়া লইতে বিসমার্ক বাধ্য হন। নিকট-প্রাচ্য সমস্যার ব্যাপারে বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার অভিমত গ্রহণ করিয়া ও অস্ট্রিয়ার পক্ষ সমর্থন করিয়া সানস্টিফেনো সন্ধি পুনর্বিবেচনার দাবি করেন। বিসমার্কের অস্ট্রিয়ার পক্ষ সমর্থনে রুশ-জার অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং ত্রি-সম্রাট সংঘ পরিত্যাগ করেন। বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনে অগ্রসর হন এবং ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে দ্বৈত-মৈত্রী বা Dual Alliance সম্পাদন করেন। এই সন্ধির দ্বারা স্থির হয় যে দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে যে কোনও একটি তৃতীয় রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হইলে অপর রাষ্ট্র তাহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবে। অর্থাৎ রাশিয়া ও ফ্রান্সের আক্রমণ প্রতিহত করাই এই সন্ধির মূল উদ্দেশ্য ছিল। এই সন্ধি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বহাল ছিল।

বার্লিন কংগ্রেসের পর ত্রি-সম্রাট সংঘের অবসান ও অস্ট্রিয়ার সহিত দ্বৈত-সন্ধি (১৮৭৯)

এই সন্ধির দ্বারা জার্মানীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া বিসমার্ক পুনরায় রাশিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপনে সচেষ্ট হন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে নূতন এক সন্ধিপত্র দ্বারা ত্রি-সম্রাট সংঘকে (Dreikaiserbund) পুনরুজ্জীবিত করা হইল। এই সন্ধির দ্বারা রাশিয়া বল্কান অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার 'বিশেষ-স্বার্থ' স্বীকার করিল; ইহার বিনিময়ে রাশিয়ার প্রস্তাবক্রমে সংঘের অপর দুই সদস্য বুলগেরিয়ার সহিত পূর্ব রুমানিয়ার সংযুক্তি স্বীকার করিল এবং সংঘের তিনটি রাষ্ট্রই যুদ্ধের সময় কনস্টান্টিনোপল-এর প্রণালী রুদ্ধ রাখার জন্য তুরস্ককে বাধ্য করিতে স্বীকৃত হইল। বিসমার্কের উদ্দেশ্য সাধনে 'ত্রি-সম্রাট সংঘ' বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। যখনই অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল তখনই বিসমার্ক উহাদের মধ্যে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্ক জার্মানীর নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হন।

পুনরায় ত্রি-সম্রাট সংঘ (১৮৮১)

অতঃপর বিসমার্ক ইটালীকেও তাঁহার দলে টানিতে সচেষ্ট হন। ইটালীর জাতীয় ঐক্য সম্পূর্ণ হইলেও তথায় ফ্রান্সের সাহায্যে পোপের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ছিল। এই সময় উত্তর আফ্রিকার অন্তর্গত টিউনিসে (Tunis) উপনিবেশ স্থাপন লইয়া ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। বিসমার্কের সমর্থনে উৎসাহিত হইয়া ফ্রান্স টিউনিস অধিকার করিল। বিসমার্কের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি করা, এবং তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সফল হইল। ফ্রান্সের ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া ইটালী ও জার্মানী অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর দলে যোগদান করিল। দ্বৈত-সন্ধি (Dual Alliance) অতঃপর ত্রি-শক্তি-মৈত্রীতে (Triple Alliance) পরিণত হইল। ইটালীর নিকট হইতে ফ্রান্সের সাহায্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আর রহিল না।

ইটালীর সহিত সন্ধি (১৮৮২)

অতঃপর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কূটনীতিজ্ঞ বিসমার্কের এইরূপ আশঙ্কা হইল যে রাশিয়াকে দূরে রাখিলে হয়ত বা রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হইতে পারে। ইহা চিন্তা করিয়া ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাশিয়ার সহিত পৃথকভাবে সম্ভাবমূলক সন্ধি স্থাপন করেন। ইহা 'রি-ইনসুরেন্স সন্ধি' (Reinsurance Treaty) নামে খ্যাত। এই সন্ধি দ্বারা স্থির হয় যে (১) চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে কোনও একটি রাষ্ট্র তৃতীয় রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হইলে অপর রাষ্ট্র নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবে, (২) জার্মানী বল্কান অঞ্চলে রাশিরার 'বিশেষ স্বার্থ', স্বীকার করিবে এবং (৩) ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে স্থিরীকৃত কনস্টাণ্টিনোপল প্রণালী সম্পর্কিত ব্যবস্থা উভয় রাষ্ট্র বজায় রাখিবে।

রাশিয়ার সহিত পৃথক সন্ধি (১৮৮৭)

ফ্রান্স যাহাতে ইংল্যাণ্ডের মিত্রতা লাভ করিতে না পারে সেইদিকেও বিসমার্ক মনোযোগী হন। মিশরের সমস্যা লইয়া ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে মতানৈক্য উপস্থিত হইলে বিসমার্ক তাহার সুযোগ গ্রহণ করেন। জার্মানীর নৌ-শক্তি ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রতি বিসমার্ক আগ্রহান্বিত না থাকায় ইংল্যাণ্ডের সহিত জার্মানীর স্বার্থ-সংঘাত ঘটিবার কোনরূপ সম্ভাবনা ছিল না। "I am still no colony man"—বিসমার্ক ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপিত হইল। ইংল্যাণ্ড ইংলিশ চ্যানেলে অবস্থিত হেলিগোল্যান্ড জার্মানীকে সমর্পণ করিল এবং ইহার বিনিময়ে জার্মানী জাঞ্জিবারের (Zanzibar) উপর ইংল্যাণ্ডের কর্তৃত্ব স্বীকার করিল।

ইংল্যান্ডের বন্ধুত্ব অর্জন

নিকট-প্রাচ্যে জার্মানীর কোন প্রত্যক্ষ স্বার্থ ছিল না বটে, কিন্তু জার্মানীর নিরাপত্তা রক্ষার্থেই বিসমার্ক এই অঞ্চলে শক্তি-সাম্য বজায় রাখিতে যত্নবান ছিলেন। বল্কান সম্পর্কে তাঁহার নীতি ছিল (১) জার্মানীর সম্মতি ব্যতীত বল্কানসমস্যার কোনরূপ সমাধান হইতে না দেওয়া, (২) অস্ট্রিয়ার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া রাশিয়ার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইতে না দেওয়া

বল্কান-নীতি

এবং (৩) দার্দানেলিশ প্রণালীতে ইংল্যান্ডের একক আধিপত্য স্থাপিত হইতে না দেওয়া।

বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে তাঁহার আমলে জার্মানী ইওরোপীয় রাজনীতির কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। তিনি জার্মানীর স্বার্থ ও নিরাপত্তা বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইওরোপে জার্মানীর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং ফ্রান্স দীর্ঘকাল মিত্রচ্যুত অবস্থায় পড়িয়া রহে। সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ ফ্রান্স কখনও পায় নাই। ফলে কিছুদিন পর্যন্ত ইওরোপের শান্তিও ভঙ্গ হয় নাই। অপরদিকে ইওরোপের রাষ্ট্রগুলির সহিত জার্মানী মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ রহে। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে তৎকালীন ইওরোপের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিসমার্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। ইহা বিসমার্কের কম কৃতিত্ব নহে, ম্যারিয়টের কথায় "Bismarck had made Prussia supreme in Germany and Germany supreme upon the continent of Europe".

বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য

১.৬. **বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা** (Criticism of Bismarck's Foreign Policy) ঃ আপাতদৃষ্টিতে বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি সাফল্যলাভ করিলেও পরবর্তী কালে ইহার ফল জার্মানীর পক্ষে ভাল হয় নাই। সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে ১৮৯০-১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইওরোপে যে আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্ভব হইয়াছিল এবং যাহার ফলে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ও জার্মানীর পতন ঘটিয়াছিল তাহার জন্য বিসমার্কের একটি পরোক্ষ দায়িত্ব আছে। বিসমার্ক এক সময় মন্তব্য করিয়াছিলেন যে রাজনৈতিক জোটের ধারণায় তিনি অস্বস্তি বোধ করিতেন। ('The idea of coalitions gives me nightmares')। কিন্তু যাহা তিনি পরিহার করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার ভিত্তি তিনি নিজেই রচনা করিয়াছিলেন। ইওরোপে একাধিক রাজনৈতিক জোট বাধাইয়া তিনি প্রতি-জোটের (counter alliances) সৃষ্টি করিয়াছিলেন যাহা ইওরোপকে দুইটি সামরিক শিবিরে ভাগ করিয়া রাখিয়াছিল। আন্তর্জাতিক প্রতিরোধ ও বলসাম্যের ব্যবস্থাদির দ্বারা তিনি ইওরোপে বেশ কিছুদিন শান্তি বজায় রাখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এই শান্তি সামরিক শক্তির ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে তাঁহার সৃষ্ট আন্তর্জাতিক জোটগুলির মধ্যেই ভবিষ্যৎ অশান্তির বীজ নিহিত ছিল। কারণ এইগুলি বিশ্বশান্তি স্থাপনের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। এইগুলিকে প্রতিযোগিতামূলক মিত্রতা বলা যায় মাত্র। ইওরোপে মৈত্রীসংঘ স্থাপন করার পরিবর্তে বলসাম্য (Balance of Power) রক্ষা করাই এই জোটগুলির উদ্দেশ্য ছিল ("For the system was one of competeting alliances, not of a universal league. It was a Balance, not a Concert of Power"—Grant and Temperley)। একাধিক রাষ্ট্রীয় জোট সৃষ্টি করিয়া বিসমার্ক জার্মানীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এই নীতি

এতই অদম্য ও বিপজ্জনক ছিল যে ইহা সাফল্যমণ্ডিত করিতে তাঁহার ন্যায় যাদুকরের প্রয়োজন ছিল। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন এই নীতি সাময়িক ভাবে সার্থক ও জার্মানীর পক্ষে কল্যাণপ্রসূ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। জার্মানীর নিরাপত্তা রক্ষা পাইয়াছিল, বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছিল এবং ফ্রান্স দীর্ঘকাল রাজনৈতিক মৈত্রী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পররাষ্ট্রনীতি মোটেই ত্রুটিশূন্য ছিল না। তাঁহার পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে জার্মান সম্রাট চতুর্দিকে বিপদের জালে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে "প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি কিছু সময়ের জন্য কালোকে অন্যের চক্ষে সাদা দেখাইতে পারেন কিন্তু সকল সময়ে নহে" ("Genius can make black looking white for a time, but not for ever"—Grant and Temperley। বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে এই উক্তি প্রযোজ্য। জার্মানীর মিত্র রাশিয়া শীঘ্রই উপলব্ধি করিল যে জার্মানীর কূটনৈতিক যাদুকর (অর্থাৎ বিসমার্ক) উহাকেও প্রতারণা করিয়াছে। বিসমার্ক অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার সৃষ্ট জটিল পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণ করিবার উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাব ঘটে। ফলে তাঁহার রচিত কূটনৈতিক কাঠামো অনতিকালের মধ্যেই ভাঙিয়া পড়ে।

নীতির অস্বাভাবিকতা

বিসমার্ক জার্মানীর অনুগামী হিসাবে অস্ট্রিয়া ও ইটালীকে মৈত্রী-বন্ধনে আনিয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় সংহতির যথেষ্ট অভাব ছিল এবং বিপদেরও সম্ভাবনা ছিল অনেক। অস্ট্রিয়ার প্রতি জার্মানীর পক্ষপাতিত্ব রাশিয়াকে রুষ্ট করিয়াছিল এবং রাশিয়ার সহানুভূতি হইতে জার্মানী বঞ্চিত হইয়াছিল। অস্ট্রিয়ার স্বার্থরক্ষার্থে রাশিয়ার সহিত জার্মানীর সামরিক সংঘর্ষের সম্ভাবনাও ছিল প্রচুর। বিসমার্ক অস্ট্রিয়া, জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে 'ত্রি-সম্রাট সঙ্ঘ' (Dreikaiserbund) গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু বল্কান অঞ্চলে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার স্বার্থ এতই পরস্পর-বিরোধী ছিল যে উভয়কে একসূত্রে দীর্ঘকাল বাঁধিয়া রাখা সম্ভব ছিল না। উপরন্তু এই অঞ্চলে কোনও সময় অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে জার্মানীও যে সেই সংঘর্ষে জড়িত হইয়া পড়িত তাহাতে সন্দেহ নাই।

(১) অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া

অস্ট্রিয়ার প্রতি জার্মানীর অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্বের ফলে রাশিয়া ফ্রান্সের দিকে ঝুঁকিল এবং ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে (বিসমার্কের পদত্যাগের পর) ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে মিত্রতামূলক সন্ধি সম্পাদিত হইল।

ইটালীর সহিত জার্মানীর মিত্রতাও স্বাভাবিক ছিল না। ইটালী অস্ট্রিয়ার বৈরিতার কথা বিস্মৃত হইতে পারে নাই। উপরন্তু আদ্রিয়াটিক উপকূলে অবস্থিত ইটালীর অঞ্চলসমূহ অস্ট্রিয়ার অধিকারভুক্ত থাকায় ইটালী স্বভাবতঃই অস্ট্রিয়ার প্রতি রুষ্ট হইয়াছিল।

(২) অস্ট্রিয়া ও ইটালী

বিসমার্কের নিয়ন্ত্রণাধীনে অস্ট্রিয়া ও ইটালীর মধ্যে অবশ্য প্রকাশ্যে মনান্তর দেখা দেয় নাই কিন্তু তাঁহার পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই এক দিকে বল্কান সমস্যা লইয়া

অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া এবং অপরদিকে আড্রিয়াটিক অঞ্চলের প্রশ্ন লইয়া ইটালী ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে মনোমালিন্য তীব্র আকারে দেখা দেয়।

ফ্রান্সের প্রতি অবিচার

ফ্রান্সের প্রতি বিসমার্কের আচরণও ত্রুটিপূর্ণ ছিল। তিনি বলপূর্বক আলসাস্-লোরেন প্রদেশদ্বয় জর্মানীর অন্তর্ভুক্ত করায় ফরাসী জাতির মনে প্রতিশোধাত্মক মনোভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা কখনই স্বদেশের এই অঙ্গচ্ছেদের কথা বিস্মৃত হইতে পারে নাই এবং প্রকৃতপক্ষে তাহাদের এই প্রতিশোধাত্মক মনোভাব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ হইয়াছিল।

উপনিবেশ স্থাপনে উদাসীনতা

জার্মানীর অর্থনৈতিক জীবনের ভারসাম্য স্থাপনের জন্য ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তার অপরিহার্য ছিল। কিন্তু বিসমার্ক এই প্রয়োজনীয়তার প্রতি উদাসীন ছিলেন। এক সময় তিনি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন, "A German who can put off his fatherland like an old coat is no longer a German for me." অবশ্য পরিশেষে শিল্প-সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করার পর উপনিবেশ স্থাপনের উপযোগিতা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বিলম্বে হইয়াছিল। ফলে জার্মানীর অদৃষ্টে যে সকল উপনিবেশ জুটিল তাহা লাভজনক না হইয়া বরং ভারস্বরূপই হইয়াছিল। জার্মানীর জাতীয় জীবনে উপনিবেশের অভাবে যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা পরবর্তী কালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ হইয়াছিল।

১.৭. বিসমার্কের শেষ জীবন ও মৃত্যু ঃ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় কাইজার উইলিয়াম জার্মানীর সম্রাট হন। এই সময় হইতে জার্মানীর ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। বিসমার্কের ন্যায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও ক্ষমতাবিশিষ্ট মন্ত্রীর উপস্থিতি অনভিজ্ঞ, অসহিষ্ণু নবীন সম্রাটের নিকট অসহ্য হইয়া উঠে। অভ্যন্তরীণ বৈদেশিক, ঔপনিবেশিক প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাপারে সম্রাটের সহিত বিসমার্কের তীব্র মতভেদ উপস্থিত হয়। কিন্তু আসলে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রশ্ন লইয়া তাঁহাদের মধ্যে বিরোধ এরূপ তীব্র হইয়া দেখা দেয় যে কোনরূপ আপোস মীমাংসার সম্ভাবনা ছিল না। অবশেষে বিসমার্ক ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ শে মার্চ দুঃখিতভাবে তাঁহার পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। জীবনের অবশিষ্টাংশ বিসমার্ক তাঁহার জমিদারিতে অতিবাহিত করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

জার্মান সম্রাটের সহিত মতভেদ ও বিসমার্কের পদত্যাগ

১.৮. বিসমার্কের কৃতিত্ব ও কূটনৈতিক প্রতিভা (Bismarck's Achievements and Statesmanship) ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইওরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে সকল রাষ্ট্রনেতার আবির্ভাব হইয়াছিল তন্মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন জার্মানীর ভাগ্য-নিয়ামক প্রিন্স অটোভন বিসমার্ক (Prince Otto Von Bismarck)। কৃতিত্ব ও সাফল্যের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে বিসমার্ককে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক বলা যাইতে পারে।

নয় বৎসরের মধ্যে বিভক্ত জার্মানীকে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত রাষ্ট্রে পরিণত করাই ছিল তাঁহার প্রধানতম কৃতিত্ব। জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, জার্মানীকে ইওরোপের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে একটি অদ্বিতীয় সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে উন্নীত করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি যখন রাষ্ট্রভার গ্রহণ করেন তখন ইওরোপীয় রাষ্ট্রনৈতীক ক্ষেত্রে প্রাশিয়ার কোন গুরুত্বই ছিল না। অস্ট্রিয়াই ছিল প্রাশিয়া তথা সমগ্র জার্মানীর ভাগ্যনিয়ন্তা। তিনি ক্ষুদ্র প্রাশিয়াকে সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়া জার্মানগণের জাতীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃতিত্বের ফলে ইওরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জার্মানীর শ্রেষ্ঠত্ব বহুদিন পর্যন্ত বজায় ছিল এবং ইওরোপের রাজধানী প্যারিস হইতে বার্লিনে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। "Bismarck made Prussia supreme in Germany and Germany supreme upon the Continent of Europe." ইহা অনস্বীকার্য যে তিনি সমরনীতি (blood and iron) অনুসরণ করিয়াই জার্মানীর জাতীয় ঐক্য সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রয়োজন মিটিয়া গেলে তিনি ইওরোপের বলসাম্য রক্ষা করিয়া শান্তিস্থাপন করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৮৭০ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিসমার্ক ছিলেন ইওরোপের রাজনীতির ভাগ্যনিয়ন্তা স্বরূপ।

জার্মানীর অভ্যন্তরীণ উন্নতির মূলেও তাঁহার কৃতিত্ব কম ছিল না। সাম্রাজ্যের সংহতি আনয়নকল্পে উন্নতধরনের শাসনপদ্ধতির প্রবর্তন, মুদ্রাসংস্কার, রেলপথের সম্প্রসারণ প্রভৃতি উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাদি বিসমার্ক কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া শিল্পসংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করিয়া ও স্টেট সোস্যালিজম্ প্রবর্তন করিয়া তিনি জার্মানীর আর্থিক ও সামাজিক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্টেট সোস্যালিজম্-নীতি অনুসরণ করিয়া পরবর্তী কালে ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি সামাজিক উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাদির প্রবর্তন করিয়াছিল।

বিসমার্কের কতকগুলি নিজস্ব মতবাদ ছিল এবং সেগুলিকে বাস্তবক্ষেত্রে রূপান্তরিত করিতে তিনি কখনই পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। প্রথমতঃ, জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তিনি প্রথম হইতেই সমরনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পার্লামেণ্ট বা বক্তৃতার দ্বারা যে এই মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন রাজতান্ত্রিক। প্রতিনিধিমূলক শাসনপদ্ধতির প্রতি তাঁহার মোটেই আস্থা ছিল না। তিনি এক সময় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে সমগ্র জার্মানী প্রাশিয়ার সামরিক কৃতিত্বের দিকেই চাহিয়া রহিয়াছে, প্রাশিয়ার উদারনৈতিক সংস্কারের দিকে নহে। তৃতীয়তঃ, তিনি প্রাশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু প্রাশিয়াকে জার্মানীর মধ্যে বিলুপ্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। "আমরা প্রাশিয়ান এবং চিরকাল প্রাশিয়ানই থাকিব"—ইহাই ছিল তাহার বিশ্বাস। এই কারণে ফ্রাঙ্কফার্ট পার্লামেণ্ট কর্তৃক জার্মানীর ঐক্যবন্ধনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে

তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ

বিসমার্ক স্বস্তিবোধ করিয়াছিলেন। বিসমার্ক জার্মানীর ঐক্যবন্ধন কামনা করিতেন সত্য, কিন্তু তাহা একমাত্র প্রাশিয়ার সামরিক সাহায্যে ও প্রাশিয়ার নেতৃত্বে সম্পন্ন করার পক্ষপাতী ছিলেন।

কূটনৈতিক প্রতিভায় বিসমার্ক ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন এবং সকল অনুকূল অবস্থাকেই দক্ষতার সহিত নিজের কাজে লাগাইতে পারিতেন। (১) জার্মানীর ঐক্যসাধনে তাঁহার কূটনীতি জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শ্লেসউইগ-হলস্টিন সমস্যাকে প্রাশিয়ার অনুকূলে রূপান্তরিত করিয়া অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। অস্ট্রিয়া পরাজিত হইলে জার্মানীর ঐক্যবন্ধন আংশিক-ভাবে সম্পন্ন হয়। অতঃপর EMS টেলিগ্রামকে উপলক্ষ্য করিয়া যুদ্ধানুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া জার্মানীর ঐক্যপথের অপর এক অন্তরায় ফ্রান্সকে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেও তিনি বাধ্য করিয়াছিলেন। বিসমার্ক মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইহাতে তাঁহার অসাধারণ কূটনীতিজ্ঞানের পরিচয়ই পাওয়া যায়। শ্লেসউইগ-হলস্টিন ও 'এমস' টেলিগ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই তিনি যথাক্রমে অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সকে ইওরোপের চক্ষে পররাজ্যগ্রাসী আক্রমণকারী প্রতিপন্ন করিয়া জার্মানীর অনুকূলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহানুভূতি অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কূটনৈতিক প্রতিভা

(২) সামরিক বল প্রয়োগ করা এবং প্রয়োজনবোধে তাহা সংযত করা উভয়ই তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল। সামরিক ও কূটনৈতিক প্রতিভার বলেই তিনি জার্মানীর ঐক্যবন্ধন সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অতঃপর পরবর্তী কালে সমরনীতি পরিত্যাগ করিয়া তিনি শান্তির-দূতরূপে পররাষ্ট্রক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মৈত্রীলাভ হইতে ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন রাখা; পূর্বশত্রু অস্ট্রিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া রাশিয়া ও ফ্রান্সের আক্রমণের সম্ভবনা হইতে জার্মানীকে রক্ষা করা; ইটালীকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাবাপন্ন করিয়া দলে টানিয়া লওয়া প্রভৃতি সাফল্য তাঁহার অসাধারণ কূটনীতিজ্ঞানের পরিচয় দেয়। তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে যে তিনি যাদুকরের ন্যায় একসঙ্গে পাঁচটি বল হইয়া এমনভাবে খেলিতে পারিতেন যে সর্বদাই অন্ততঃ দুইটি বল শূন্যে থাকিত। ("He was the only man who could juggle with five balls of which two were always in the air.")। এই পাঁচটি বল-এর অর্থ অস্ট্রিয়া, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইটালী।

(৩) ফরাসী জনসাধারণের প্রতিশোধাত্মক মনোভাব যদিও বিসমার্ক সম্পূর্ণ-ভাবে দূর করিতে সমর্থ হন নাই, তথাপি ফ্রান্সের দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ রাখিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। উপনিবেশ স্থাপনের ব্যাপারে বিসমার্ক ফ্রান্সকে উৎসাহিত করিয়া ইংল্যান্ডের সহিত সংঘর্ষে নিক্ষিপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইভাবে তিনি জার্মানীকে ফ্রান্সের সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

(৪) ইংল্যাণ্ডের সদিচ্ছা ও মিত্রতা অর্জনের জন্য বিসমার্ক প্রথম দিকে জার্মানীর নৌশক্তি বিস্তার ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য-স্থাপনের প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। ইহা অনস্বীকার্য যে তিনি ইংল্যাণ্ডের সহানুভূতি ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন।

বস্তুতপক্ষে ১৮৭০ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিসমার্ক জার্মানী তথা ইওরোপের একচ্ছত্র ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়া থাকেন।

কিন্তু বিসমার্ক রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অধিকারী হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞান ত্রুটিশূন্য ছিল না। ঐতিহাসিক ফয়েটার (Fueter) বিসমার্কের কৃতিত্ব প্রসঙ্গে এইরূপ মন্তব্য করেন যে বিসমার্ক সৃজনক্ষম রাজনীতিবিদ্ ছিলেন না ("Bismarck was not a creative statesman")। এই উক্তির কিয়দংশ সত্য।

বিসমার্কের রাজনৈতিক ত্রুটি

প্রথমতঃ, বিসমার্ক সামরিক শক্তির সাহায্যে ফ্রান্সের নিকট হইতে আলসাস্-লোরেন প্রদেশদ্বয় কাড়িয়া লইয়া স্বদেশপ্রেমিক ফরাসীগণকে অযথা জার্মানীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্সের প্রতিশোধাত্মক মনোভাব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মূলে অনেকটা ইন্ধন জোগাইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে সামরিক শক্তির উপর রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব নির্ভরশীল। ফলে ব্যয়বহুল সামরিক সজ্জার খাতে অর্থ যোগাইতে গিয়া স্থায়ী ভাবে দেশহিতকর সংগঠনমূলক কোন কার্যসূচী গ্রহণ করা জার্মানীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বিসমার্কের সামরিক প্রস্তুতি ও একাধিক রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি (political alliance) ইওরোপকে দুইটি সামরিক শিবিরে বিভক্ত করিয়াছিল। ইওরোপে শান্তিস্থাপন করিতে গিয়া বস্তুতপক্ষে বিসমার্ক আন্তর্জাতিক যুদ্ধের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

তৃতীয়তঃ, বিসমার্ক জার্মানীর উদীয়মান সমাজতন্ত্রের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি ইওরোপে সমাজতন্ত্রবাদের (Socialism) অগ্রগতি ও জনপ্রিয়তা যথাযথভাবে অনুধাবন করিতে পারেন নাই। সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া সাময়িকভাবে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন তিনি দমন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পরবর্তী কালে সমাজতন্ত্রবাদই জার্মানীর অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা রূপে দেখা দিয়াছিল। জাতীয়তাবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল মেটারনিকের অন্তিমদশার দৃষ্টান্ত হইতে বিসমার্ক শিক্ষাগ্রহণ করিতে পারেন নাই।

চতুর্থতঃ, উপনিবেশ বিস্তার সম্পর্কে বিসমার্কের ঔদাসীন্য জার্মানীর পক্ষে শুভ হয় নাই। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ঘোষণা—"জার্মানীর আর কোন কামনা নাই" ("Germany is a satiated country")—জার্মানীর পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছিল। জার্মানীর শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারতা ও উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার স্থান সংকুলানের জন্য উপনিবেশ স্থাপন অপরিহার্য ছিল। পরবর্তী কালে বিসমার্ক উপনিবেশ স্থাপনে মনোযোগী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা বিলম্বে হওয়ায়

জার্মানীর ভাগ্যে যে সকল উপনিবেশ জুটিয়াছিল তাহা লাভজনক না হইয়া বরং ভারস্বরূপই হইয়াছিল। জার্মানীর জাতীয় জীবনে উপনিবেশের অভাবে যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা পরবর্তী কালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ইন্ধন যোগাইয়াছিল।

১.৯. **বিসমার্কের জীবনী (Career of Bismarck) ঃ** ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্ক ব্রাণ্ডেনবার্গের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পরবর্তী জীবনের প্রতিভা তাঁহার প্রথম জীবনে মোটেই সূচিত হয় নাই। শিক্ষাজীবনে কোনরূপ প্রতিভার পরিচয় তিনি দিতে পারেন নাই; কিন্তু উগ্রস্বভাব ও অনিয়মানুবর্তিতার জন্য তিনি ছাত্র ও শিক্ষক মহলে সুপরিচিত ছিলেন। গোটিনজেন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বিসমার্ক প্রাশিয়ার সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন, কিন্তু অচিরেই চাকুরির একঘেয়েমিতে তিনি ক্লান্ত হইয়া উঠেন। চাকুরি হইতে ইস্তফা দিয়া কাভুরের ন্যায় তিনিও কয়েক বৎসর পৈতৃক ভূসম্পত্তির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকেন। এইভাবে কাভুরের ন্যায় বিসমার্কও রাজধানী হইতে দূরে থাকিয়া রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন করার সুযোগ পান। কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি প্রতিবেশীদের নিকট একজন বুদ্ধিমান ও সুবক্তা হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। কাভুরের ন্যায় তিনিও ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে বহুবার যাতায়াত করিয়া উভয় দেশের শাসনপদ্ধতি এবং ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় জ্ঞান অর্জন করেন।

প্রথম জীবন

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্ক পোমারানিয়ার প্রাদেশিক 'ডায়েট'-এর সদস্যরূপে নির্বাচিত হন এবং ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার নবগঠিত আইন-পরিষদে নির্বাচিত হইয়া জার্মানীর রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন।

রাজনীতিতে প্রবেশ

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের সময় বিসমার্ক তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশ করেন। প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক চতুর্থ উইলিয়াম্ প্রাশিয়ায় গণতন্ত্রমূলক শাসনপদ্ধতি প্রবর্তন করিলে বিসমার্ক অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন এবং ইহার প্রতিবাদস্বরূপ তিনি কিছুদিনের জন্য ডায়েটের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় তিনি উক্ত পদে নির্বাচিত হন এবং ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র জার্মানীর কেন্দ্রীয় সভা ফ্রাঙ্কফার্ট পার্লামেন্টে প্রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেন।

বিসমার্কের রাজনৈতিক জীবনকে দুইটি পৃথক অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে (১৮৬২-১৮৭১ খ্রীঃ) তিনি প্রাশিয়াকে শক্তিশালী করিয়া প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্যবন্ধন সম্পূর্ণ করিতে তাঁহার সকল শক্তি নিয়োজিত করেন। দ্বিতীয় ভাগে (১৮৭১-১৮৯০ খ্রীঃ) তিনি জার্মানীর সদ্যলব্ধ সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে ও ইওরোপে জার্মানীর প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহার কর্মশক্তি নিয়োজিত করেন।

জীবনের দুইটি পৃথক অধ্যায়

তাঁহার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ঃ ১৮৫১ হইতে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিসমার্ক প্রাশিয়ার প্রতিনিধি রূপে ফ্রাঙ্কফার্ট পার্লামেন্টে অবস্থানকালে কূটনীতি বিষয়ে

সম্যক্ জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ফ্রাংকফার্টে অবস্থানকালীন তিনি অস্ট্রিয়ার প্রাশিয়া-বিরোধী নীতি ও কর্মপন্থা পরীক্ষা করার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে অস্ট্রিয়ার সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য এবং এইরূপ ধারণা তাঁহাকে পরবর্তী কালে কূটনৈতিক ও সামরিক প্রস্তুতি আরম্ভ করিতে সাহায্য করিয়াছিল। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়া ও ফ্রান্সের সাহায্য প্রয়োজন হইবে। বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ হইতে তিনি জার্মানীর রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। ফ্রাংকফার্ট পার্লামেণ্টে প্রাশিয়ার বিশেষ কোন প্রভাব বা প্রতিপত্তি ছিল না এবং অস্ট্রিয়ার প্রতিপত্তি বিসমার্ককে ব্যথিত করিয়াছিল। সুতরাং ফ্রাংকফার্টে থাকাকালীন বিসমার্ক অস্ট্রিয়া-বিরোধী মনোভাবাপন্ন হইয়া পড়েন এবং এই সিদ্ধান্তেই তিনি পৌঁছিয়াছিলেন যে "জার্মানীতে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সহ-অবস্থান সম্ভব নহে" (Germany is too narrow for Austria and Purssia.") ।

ফ্রাংকফার্টের সদস্যরূপে

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভের পূর্বে বিসমার্ক প্রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত-রূপে রাশিয়ায় প্রেরিত হন। তথায় তিনি জারের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি অর্জনে সক্ষম হন, যাহা পরবর্তী কালে প্রাশিয়াকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। পরে তিনি ফ্রান্সে রাষ্ট্রদূত রূপে প্রেরিত হন। তথায় তৃতীয় নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত দুর্বলতা এবং ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ সমস্যা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পান। এইভাবে ফ্রাংকফার্টের অভিজ্ঞতা এবং কূটনৈতিক প্রতিনিধি রূপে ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজধানীতে বাস করিয়া আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ বিসমার্কের জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল। তাঁহার পরবর্তী জীবনের কর্তব্যগুলি তিনি পূর্বাহ্নেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

রাশিয়া ও ফ্রান্সে রাষ্ট্রদূত রূপে

বিসমার্কের রাজনৈতিক মতবাদঃ ১৮৪৮ হইতে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানীতে যে সকল বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল বিসমার্ক তাহার সকল ক্ষেত্রেই বিপ্লব-বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন রক্ষণশীল এবং গণতান্ত্রিক বা প্রতিনিধিমূলক শাসনপদ্ধতির প্রতি তাঁহার ঘৃণা ছিল প্রবল। রাজনৈতিক মতবাদের দিক হইতে তিনি ছিলেন প্রতিক্রিয়াপন্থী। গভীর ধর্মবিশ্বাসকে ভিত্তি করিয়াই তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল। তিনি একসময় এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, "আমি যদি খ্রীষ্টান না হই তবেই আমি সাধারণতন্ত্রী" ("If I were not a Christian I should be a Republican.") গণতন্ত্রের প্রভাব হইতে প্রাশিয়াকে মুক্ত রাখাই ছিল তাঁহার প্রধান নীতি। তিনি ছিলেন গোঁড়া রাজতন্ত্রবাদী। রাজতন্ত্রের সহিত গণতন্ত্রের কোনরূপ আপোসে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। এই কারণেই

বিপ্লবের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন

রাজতন্ত্রবাদী ও গণতন্ত্রের বিরোধী

প্রাশিয়া-রাজ ফ্রেডারিক চতুর্থ উইলিয়ম ফ্রাংকফার্ট পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত রাজমুকুট গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে বিসমার্ক তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছিলেন। উগ্র রাজতন্ত্রপন্থী বলিয়াই তিনি ফ্রাংকফার্ট পার্লামেণ্টে প্রাশিয়ার প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন (১৮৫১ খ্রীঃ)। তিনি সামরিক শক্তি ও যুদ্ধবিগ্রহে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সামরিক শক্তির দ্বারাই প্রাশিয়ার উন্নতি সম্ভব।

সামরিক শক্তিতে বিশ্বাস

বিসমার্কের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা ঃ প্রাশিয়া-রাজ প্রথম উইলিয়াম সামরিক শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং প্রাশিয়া তথা জার্মানীর ভবিষ্যৎ যে সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। এই কারণে প্রাশিয়ার সামরিক শক্তির সম্প্রসারণ করিতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু প্রাশিয়ার সাধারণ প্রতিনিধিমণ্ডলী এই নীতির বিরোধী ছিল। ফলে উইলিয়ম ও প্রতিনিধিসভার মধ্যে বিরোধ এতই প্রবল হইয়া উঠে যে উইলিয়াম সিংহাসন ত্যাগ করাই স্থির করেন। প্রাশিয়ার ইতিহাসে যখন এইরূপ এক সংকট-মুহূর্ত দেখা দেয়, তখন উইলিয়ম বিসমার্ককে তাঁহার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন জার্মানীর একচ্ছত্র অধিনায়ক।

মন্ত্রিসভার সভাপতি হিসাবে

বিসমার্কের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের নেতৃত্বে সমগ্র জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করা। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে প্রাশিয়ার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি না হইলে জার্মানীর ঐক্যবন্ধন সম্ভব নহে। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে পার্লামেণ্টের জয় হইলে জার্মানীর ঐক্যবন্ধন কোনদিন সম্ভব হইবে না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে গণতন্ত্রের মাধ্যমে জার্মানীর ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্ভব নহে। জটিল সমস্যার সমাধান একমাত্র সামরিক শক্তির সাহায্যেই সাধিত হইতে পারে—বক্তৃতা বা ভোটের দ্বারা নহে। "Not by speeches and majority resolutions are the great questions of the day to be decided, but by blood and iron." —এই অভিমত বিসমার্ক স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেন। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্যসাধন করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু ইহার প্রধান অন্তরায় ছিল অস্ট্রিয়া। সুতরাং অস্ট্রিয়াকে জার্মানী হইতে বিতাড়িত করা তাঁহার প্রধান কাজ হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি উহা সম্পন্ন করেন।

প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্যসাধন

জার্মানী হইতে অস্ট্রিয়ার নেতৃত্বের বিলুপ্তি

প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর রাষ্ট্রীয় ঐক্য সম্পন্ন হইলে, বিসমার্ক জার্মান সাম্রাজ্যের সংহতি আনয়নের জন্য বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি নূতন সংবিধান রচনা করিয়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিয়া এবং প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় শাসনের প্রত্যক্ষ অধীনে আনয়ন করিয়া সাম্রাজ্যের সংহতি সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন। ইহা ভিন্ন জার্মানীকরণ-নীতি গ্রহণ করিয়া সাম্রাজ্যের

জার্মান সাম্রাজ্যে সংহতি আনয়নের চেষ্টা

বিভিন্ন অ-জার্মান জাতিগোষ্ঠীর উপর কেন্দ্রের প্রভাব বিস্তার করিতে তিনি প্রয়াসী হন। সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিও তাঁহার সজাগ দৃষ্টি ছিল। রেলপথের সম্প্রসারণ, মুদ্রানীতির সংস্কার, শ্রমিক-উন্নয়নমূলক বিধি-ব্যবস্থা এবং শিল্প-সংরক্ষণ নীতি প্রভৃতি প্রগতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া তিনি জার্মানীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করেন। ইহা ভিন্ন ইম্পিরিয়াল ব্যাংক স্থাপন করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান করেন। সাম্রাজ্যের সংহতির জন্য তিনি চার্চের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্থাপনেও যত্নবান হন যদিও এই ব্যাপারে তিনি আশানুরূপ সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হন। ১৮৭১ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির সহিত একাধিক মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বিসমার্ক জার্মানীর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বজায় রাখিতে সমর্থ হন।

বিসমার্কের প্রবল ব্যক্তিত্ব কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের অসহ্য হইয়া উঠে এবং এই কারণেই প্রথম সুযোগেই তিনি বিসমার্ককে পদচ্যুত করেন এবং রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা হস্তগত করেন।

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম (১৮৮৮-১৯১৮)

১.১০. নূতন সম্রাটের চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ নীতি ঃ কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম সিংহাসনে আরোহণ করিলে জার্মানীর ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। নূতন সম্রাট বহু সংগুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার মানসিক সবলতা, কর্তব্যজ্ঞান, দূরদৃষ্টি ও কষ্টসহিষ্ণুতা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন দৈবস্বত্ব ও সমরবাদে বিশ্বাসী। তিনি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। সেই সঙ্গে তিনি জার্মানীতে ব্যক্তিগত শাসন স্থাপনে ছিলেন অত্যন্ত অভিলাষী।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম—তিনটি ঘোষণা-পত্র প্রচার করিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ব্যক্ত করেন। প্রথম ঘোষণাপত্র সৈন্যদের উদ্দেশ্যে প্রচার করিয়া তিনি সৈন্যবাহিনীকে জার্মান সম্রাটের প্রতি অখণ্ড আনুগত্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। দ্বিতীয় ঘোষণা পত্র নৌ-বাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রচার করিয়া নৌ-বাহিনীকে শক্তিশালী ও সুদক্ষ করিয়া তুলিবার সংকল্পের কথা ব্যক্ত করা হয়। তৃতীয় ঘোষণাপত্র জার্মান জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচার করিয়া জনগণের প্রতি ন্যায়বিচার ও উহাদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এই ঘোষণাপত্রগুলির ভিত্তির উপর কাইজারের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতি আবর্তিত হয়।

বিসমার্কের পতন

জার্মানীর বৃদ্ধ চ্যান্সেলার বিসমার্কের প্রবল ব্যক্তিত্ব কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠে এবং শীঘ্রই উভয়ের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। জার্মান সোস্যালিস্টদের বিরুদ্ধে দমনমূলক বিধিগুলি বিসমার্ক নূতন করিয়া প্রবর্তন করিতে চাহিলে জার্মান-সম্রাট বিরোধিতা করেন। ইহা ভিন্ন জার্মানীর পররাষ্ট্রনীতি ও

ঔপনিবেশিক নীতির ক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম চাহিলেন সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া সাম্রাজ্য শাসন করিতে, শুধু রাজত্ব করিতে নহে। সম্রাট মন্ত্রিদের সহিত সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হইলে বিসমার্ক তাঁহার বিরোধিতা করেন। বিসমার্ক এযাবৎ অনুসৃত বিধির উল্লেখ করিয়া সম্রাটকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে সম্রাট ও মন্ত্রিদের মধ্যে একমাত্র মাধ্যম হইল চ্যান্সেলার বা প্রধানমন্ত্রী। প্রকৃতপক্ষে বিসমার্ক ও কাইজারের মধ্যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির লড়াই শুরু হয়। উভয়েই ছিলেন ক্ষমতা-মত্ত ও প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোন আপোস হওয়া ছিল অসম্ভব। অবশেষে কাইজার বিসমার্ককে পদচ্যুত করেন। কিছুদিন বিসমার্ক জার্মানীর নূতন সরকারের পক্ষে অস্বস্তিকর হইয়া থাকেন এবং তিনি সরকারের কঠোর সমালোচনা করিয়া যাইতে থাকেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের সহিত বিসমার্কের সদ্ভাব স্থাপিত হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্কের মৃত্যু হয়।

অভ্যন্তরীণ নীতি :

বিসমার্ককে পদচ্যুত করিয়া কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার পূর্ব পর্যন্ত পর পর চারজন চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত হন। প্রথমে সমরবাদী ও প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী ক্যাপ্রিভি চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত হন (১৮৯০-৯৪)। ইহার পর নিযুক্ত হন উদারপন্থী ক্যাথলিক ও আলসাস্-লোরেনের শাসনকর্তা প্রিন্স হোহেনলো (১৮৯৪-১৯০০)। ইহার পর চ্যান্সেলার-পদে নিযুক্ত হন যথাক্রমে ভন্-বুলো এবং বেথম্যান-হলওয়েগ (১৯০১-১৭)। কিন্তু বিসমার্কের ন্যায় স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করার মত ক্ষমতা ইঁহাদের কাহারো ছিল না। ইঁহারা সকলেই ছিলেন কাইজারের আজ্ঞাবাহী। কাইজার উইলিয়াম নিজেই ছিলেন নিজের চ্যান্সেল্যার। কাইজার উইলিয়ামের পক্ষে স্বেচ্ছাতন্ত্র চালাইবার কারণ ছিল জার্মানীর সংবিধান। এই সংবিধানে সম্রাটকে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল।

সমাজতন্ত্রীদের বিরোধিতা

সমাজতন্ত্রীগণের সঙ্গে ক্রমেই কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের বিরোধিতা শুরু হয়। জার্মানীর রাজনৈতিক মঞ্চে সামাজিক গণতান্ত্রিক দলের (Social Democratic Party) আবির্ভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই দল শুধু অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাইবার পক্ষপাতী ছিল না। সেই সঙ্গে উহারা স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থারও পরিবর্তনের প্রয়াসী ছিল। শীঘ্রই এই দল জার্মানীর মধ্যবিত্তদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। এক যোগে সামাজিক গণতান্ত্রিক দল এক দিকে সংস্কারকামী ও অপর দিকে বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে। অন্যান্য দেশের সমাজতন্ত্রী দলগুলির তুলনায় জার্মানীর সামাজিক গণতান্ত্রিক দলের আদর্শ ছিল অধিক জাতীয়তাবাদী এবং এই কারণে এই দলটি জনপ্রিয়তালাভে সক্ষম হয়। প্রথম দিকে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম সমাজতন্ত্রীদের প্রতি সন্তুষ্টির মনোভাব গ্রহণ করেন।

বিসমার্কের বিরোধিতা সত্ত্বেও কাইজার সমাজতন্ত্র বিরোধী বিধিনিষেধগুলি প্রত্যাহার করিয়া লন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সমাজতন্ত্রীদের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন না হওয়ায়, তিনি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন এবং দমনমূলক নীতির আশ্রয় লন। কিন্তু ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রাইখস্ট্যাগ কাইজারের দমনমূলক নীতি অগ্রাহ্য করে। সমাজতন্ত্রীগণ কাইজারের স্বৈরাচারী শাসনের প্রতি তীব্র আক্রমণ চালায় এবং সামরিক বাহিনী ও নৌ-বাহিনী খাতে অধিক ব্যয়-বরাদ্দের তীব্র সমালোচনা করে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর কেন্দ্রীয় সরকারকে উৎখাত করার মত শক্তি সমাজতন্ত্রীগণ অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হইলে কেন্দ্রীয় সরকার সাময়িকভাবে রক্ষা পায়।

সামরিক বাহিনীর সম্প্রসারণ

সামরিক শক্তির সাহায্যেই জার্মান সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং সমরবাদই (militarism) ছিল নূতন জার্মান সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। জার্মানীর চ্যান্সেলার ক্যাপ্রিভি দুইবার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের রাজত্বকালের অপর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল জার্মানীর শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ। এযাবৎ জার্মানী ছিল অনুন্নত ও কৃষি-প্রধান দেশ। কিন্তু কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের আমলে জার্মানী শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত হয় এবং জার্মানীর অর্থনৈতিক জীবনে রূপান্তর ঘটে। জার্মানীর শিল্পোন্নতির মূলে ছিল বিসমার্কের শিল্প-সংরক্ষণ নীতি। দ্বিতীয় উইলিয়ামের আমলে জার্মানীতে অভূতপূর্ব শিল্প-সম্প্রসারণ ঘটে। আধুনিক শিল্পোন্নয়নের

শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার

মূল ভিত্তি হইল লৌহ ও কয়লা। এই দুইটি বিশেষ উপাদানে জার্মানী ছিল খুবই সমৃদ্ধ। রূঢ়, সাইলেসিয়া ও সার-অঞ্চলের কয়লাখনিগুলির উন্নয়ন করিয়া জার্মানী বিশ্বের অন্যতম কয়লা উৎপাদনকারী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। লোরেন অঞ্চলটি দখল করার ফলে অফুরন্ত লৌহভাণ্ডার জার্মানীর হস্তগত হয়। লৌহ ও কয়লার অফুরন্ত যোগান ও অন্যদিকে নানা প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন প্রভৃতি কারণে জার্মানীর শিল্পের প্রসার অভূতপূর্ব ভাবে বৃদ্ধি পায়। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীর বৈদেশিক বাণিজ্যের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটে। সেই সঙ্গে জার্মানীর বাণিজ্যপোতের সম্প্রসারণ ঘটে এবং হ্যামবার্গ বিশ্বের অন্যতম বন্দরে পরিণত হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীর জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর জনসংখ্যা ছিল ৪১ মিলিয়ান। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাহা

জনসংখ্যা বৃদ্ধি

বৃদ্ধি পাইয়া ৬৫ মিলিয়ানে পৌঁছায়। জার্মানীর শিল্পোন্নয়নে আকৃষ্ট হইয়া অগণিত বিদেশী শ্রমিক ও কারিগর দলে দলে জার্মানীতে আগমন করে। শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীর কৃষিরও সম্প্রসারণ ঘটে। কৃষির ক্ষেত্রেও জার্মানী স্বয়ম্ভর হইয়া উঠে।

পররাষ্ট্র নীতি ঃ কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের অনুসৃত পররাষ্ট্র-নীতির সহিত বিসমার্কীয় নীতির যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের পর (১৮৭০ খ্রীঃ) বিসমার্ক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখিয়া নব-প্রতিষ্ঠিত জার্মান সাম্রাজ্যকে রক্ষা ও শক্তিশালী করিতে চাহিয়াছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই বিসমার্ক ঘোষণা করিয়াছিলেন যে জার্মানী পরিতৃপ্ত দেশ (Germany—a satiated Country)। কিন্তু কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম স্বীকার করেন নাই যে জার্মানী পরিতৃপ্ত দেশ। তাঁহার মতে টিউটন গোষ্ঠীভুক্ত জার্মান জাতির নিকট অনন্ত বিস্তৃতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীতে জার্মানীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হউক ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার সাফল্য; ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তী কালে জার্মানীর শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি জার্মান অধিবাসগণের মনে নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছিল। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ছিলেন নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। শুধু ইওরোপেই নহে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও জার্মানীর গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেন। বিশ্বশক্তি হিসাবে জার্মানীকে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র ছিল। জার্মানীর হস্তক্ষেপ ব্যতীত বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সমাধান হইতে পারে না—এই মতবাদে কাইজার বিশ্বাসী ছিলেন। জার্মানীকে বিশ্বরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাইজার উইলিয়াম তিনটি নীতি গ্রহণ করেন—বিশ্ব-রাজনীতিতে প্রাধান্য স্থাপন, সাম্রাজ্য বিস্তৃতি ও শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গঠন ("World Politics, expansions and navy were the three dominant notes of the Kaiser's foreign policy.")

জার্মানীকে বিশ্বরাষ্ট্রে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষা

কাইজারের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য ঃ
(১) বিশ্ব-রাজনীতি
(২) সাম্রাজ্যবিস্তার
(৩) সামুদ্রিক প্রাধান্য

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম কর্তৃক জার্মানীর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব স্বহস্তে গৃহীত হওয়ার পর হইতেই বিসমার্কের অনুসৃত নীতি ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে ইওরোপীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া রাশিয়ার সহিত সদ্ভাব রক্ষা করাই বিসমার্কীয় নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু কাইজার রাশিয়ার মিত্রতা বিসর্জন দিয়া অস্ট্রিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। বলকান অঞ্চলে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার স্বার্থসংঘাতের কথা জানিয়াও কাইজার অস্ট্রিয়াকে সমর্থন করিয়া রাশিয়ার বিরাগভাজন হন। অপর দিকে তুরস্ক সাম্রাজ্যে জার্মানীর প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে যাইয়া তিনি রাশিয়ার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করেন। বিসমার্কের বহু চেষ্টায় জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে 'Re-insurance' নামে যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইয়াছিল কাইজার তাহা অপ্রয়োজনীয়

বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি বর্জন

অস্ট্রিয়ার সহিত সদ্ভাব ও রাশিয়ার সহিত অসদ্ভাব

মনে করিয়া বর্জন করেন। ইহার ফলে রাশিয়া ফ্রান্সের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয় যাহা দ্বি-শক্তি বা Dual Alliance নামে খ্যাত। জার্মানীর স্থায়ী শত্রু ফ্রান্স শক্তিশালী হয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জার্মানী রাশিয়ার শত্রুতা অর্জন করে।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রতি বিসমার্ক উদাসীন ছিলেন এবং এই কারণে ইংল্যাণ্ডের সহিত জার্মানীর স্বার্থসংঘাতের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু কাইজার উইলিয়াম ছিলেন ঘোরসাম্রাজ্যবাদী এবং কারণে অকারণে 'জার্মানীর ভবিষ্যৎ সমুদ্রে' ('our future lies on the water') অর্থাৎ নৌ-বাহিনীর প্রস্তুতি জার্মানীর পক্ষে অপরিহার্য ইত্যাদি মন্তব্য করিয়া তিনি ইংল্যান্ডের সহিত শত্রুতা অনিবার্য করিয়া তোলেন। কিন্তু ফ্রান্স ও রাশিয়ার সহিত বিবিধ বিষয়ে সংঘাতের কারণ থাকায় ইংল্যাণ্ড জার্মানীর সহিত সদ্ভাব রাখিতে চেন্টা করে। ইংল্যাণ্ড জাঞ্জিবারের বিনিময়ে জার্মানীকে হেলিগোল্যাণ্ড প্রদান করিবার প্রস্তাব করে এবং জার্মানীকে মধ্য আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনে সাহায্য করিতেও স্বীকৃত হয়। কিন্তু কাইজার ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করেন। কাইজারের ইংল্যাণ্ড-বিরোধী মনোভাব বুয়োর যুদ্ধে (Boer War) প্রকাশ পায়। কাইজার বার্লিন হইতে বাগদাদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ একটি রেলপথ স্থাপনে উদ্যত হইলে ইংল্যাণ্ড পূর্বাঞ্চলিক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশঙ্কিত হইয়া উঠে।

ইংল্যাণ্ডের মৈত্রী-প্রস্তাব অগ্রাহ্য

১.১২. বিশ্বরাষ্ট্র রূপে জার্মানী (Germany as a world power): পররাষ্ট্রক্ষেত্রে বিসমার্কীয় নীতি ও আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদ নীতি গ্রহণ করেন। তিনি জার্মানীকে বিশ্বরাষ্ট্র রূপে পরিণত করিতে অতঃপর অগ্রসর হন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনে কয়েকজন জার্মান ধর্মযাজকের হত্যার অজুহাতে কাইজার চীনকে জার্মানীর হস্তে কিয়াওচাও বন্দর ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে চীনের বক্সার বিদ্রোহ দমন করিতে জার্মান যথেষ্ট সাহায্য করে এবং জার্মানীর অধিনায়কত্বে আন্তর্জাতিক বাহিনী পিকিং-এ প্রবেশ করে। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের নিকট হইতে ক্যারোলাইন দ্বীপপুঞ্জ ক্রয় করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে জার্মানীর আধিপত্য স্থাপিত হয়। তুরস্কের উপর কাইজার তাঁহার প্রভাব বিস্তার করেন এবং আর্মেনিয়ার খ্রীষ্টান প্রজাবর্গের উপর যখন তুর্কীগণ অকথ্য অত্যাচার চালাইতেছিল, কাইজার সেই সময় তুরস্কের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সুলতানের মিত্রতা অর্জন করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কাইজার সিরিয়ায় গমন করিয়া নিজেকে ইসলামধর্মের রক্ষক বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ইহার বিনিময়ে কনস্টান্টিনোপল হইতে বাগদাদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এক রেলপথ স্থাপনের অধিকার লাভ করেন। ইহার ফলে পূর্বাঞ্চলের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সুযোগ জার্মানী লাভ

চীনের নিকট হইতে কিয়াওচাও লাভ

স্পেনের নিকট হইতে ক্যারোলাইন লাভ

তুরস্কের পক্ষাবলম্বন

করে এবং বস্তুতঃ তুরস্কে রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ডের স্বার্থ ক্ষুন্ন করিয়া জার্মানী আপন প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। অস্ট্রিয়া বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা প্রদেশদ্বয় আপন সাম্রাজ্যভুক্ত করিলে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কাইজার রাশিয়াকে তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। মরক্কোতে ফ্রান্সের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনে কাইজার যথেষ্ট বাধা প্রদান করেন। এইভাবে জার্মানী সর্বত্র সামরিক প্রভুত্ব স্থাপনে উদ্যোগী হইলে ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র বিশেষ করিয়া রাশিয়া, ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ড আতঙ্কিত হইয়া উঠে এবং ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে একাধিক মৈত্রী-জোট গড়িয়া উঠে। যেমন ত্রিশক্তি-জোট (Triple Alliance) ও ইঙ্গ-রুশ মৈত্রী (Anglo-Russian Convention)।

১.১৩. ঔপনিবেশিক নীতি ঃ বিসমার্কের সময় জার্মানীর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। বিসমার্কের শাসনের শেষভাগে জার্মানী পূর্ব-আফ্রিকা ও ক্যামেরুনে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। কাইজার উইলিয়াম জার্মানীকে বিশ্ব-রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করাইবার উদ্দেশ্যে জার্মানীর জন্য ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনে অধিকতর উদ্যোগী হন। তিনি সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডের নিকট হইতে জাঞ্জিবারের বিনিময়ে উত্তর সাগরে অবস্থিত হেলিগোল্যাণ্ড লাভ করেন। সুদূর প্রাচ্যে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী চীনের নিকট হইতে কিয়াওচাও বন্দর লাভ করে এবং ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের নিকট হইতে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ক্যারোলাইন দ্বীপপুঞ্জ ক্রয় করে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত এক সন্ধিশর্ত অনুসারে জার্মানী স্যামোয়ান দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত উলপোলু (Ulpolu) ও সেভায় (Sevai) নামে দুইটি বৃহৎ দ্বীপ অধিকার করে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মরক্কোতে ফ্রান্সের 'বিশেষ স্বার্থ' স্বীকার করার বিনিময়ে জার্মানী ফরাসী অধিকৃত কঙ্গোর কিছু অংশ লাভ করে। এইভাবে দশ লক্ষ বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিরাট জার্মান ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত জার্মানীর এই সাম্রাজ্য অক্ষুন্ন ছিল কিন্তু ভার্সাই সন্ধির শর্তানুযায়ী জার্মানী উপনিবেশগুলির উপর সকল দাবি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে জার্মানীর উপনিবেশ স্থাপন

১.১৪. নৌ-শক্তি নীতি ঃ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে যখন জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সময় জার্মানীর কোন নৌ-বাহিনী ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপন ও বহির্বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নৌ-শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য রক্ষা ও বিশ্বরাষ্ট্র রূপে জার্মানীকে পরিণত করিতে হইলে নৌ-বাহিনী যে একান্ত প্রয়োজন তাহা কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 'সমুদ্রপথেই জার্মানীর ভবিষ্যৎ নিহিত' কাইজারের এই উক্তি জার্মানীর ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল। জার্মানীর স্থল-বাহিনী বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ

নৌ-ঘাঁটি স্থাপন

করিয়াছিল, কিন্তু কাইজার অতঃপর ইংল্যাণ্ডের নৌ-বাহিনীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে বদ্ধপরিকর হন। এই উদ্দেশ্যে কাইজার এ্যাডমিরাল টিরপিট্জকে জার্মান নৌ-বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের নিকট হইতে প্রাপ্ত হেলিগোল্যাণ্ডে জার্মানীর প্রথম নৌ-ঘাঁটি স্থাপিত হয় এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কিয়েল খাল সম্পূর্ণ হইলে জার্মান নৌবহরের পক্ষে বাল্টিক সাগর হইতে উত্তর সাগরে যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত হয়। ইতিমধ্যে এ্যাডমিরাল টিরপিট্জের তত্ত্বাবধানে জার্মানীর নৌ-শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ১৮৯৮ ও ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের নৌ-আইনের ফলে জার্মানীর নৌবহরের সংখ্যা ইংল্যাণ্ডের নৌবহরের সমতুল্য হইয়া উঠে। ইংল্যাণ্ড ইহাতে অস্বাস্তিবোধ করে এবং জার্মানীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আপন নৌবহরের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চলে। অকারণ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অপব্যয়ের প্রতি জার্মানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ইংল্যাণ্ড এ সম্বন্ধে এক মীমাংসার প্রস্তাব করে। কিন্তু জার্মানী ইহাতে কর্ণপাত করিল না। অগত্যা ইংল্যাণ্ড তাহার চিরশত্রু ফ্রান্সের সহিত সকল বিরোধের অবসান করিয়া দ্বি-শক্তি জোট স্থাপন করিতে বাধ্য হয় (১৯০৪ খ্রীঃ)। ফ্রান্স মরক্কোর উপর প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যোগী হইলে জার্মানী মরক্কোর পক্ষ অবলম্বন করে। কাইজার উইলিয়াম মরক্কোর অন্তর্গত আগাদি বন্দরে একটি যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করেন। এই অবস্থায় ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করে। আগাদির ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব আরও সুদৃঢ় হয়। এবং উহাদের মধ্যে 'ত্রি-শক্তি আঁতাত' স্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানীর কার্যকলাপের ফলে বিশ্ব দুইটি পরস্পর-বিরোধী শক্তি-শিবিরে (Armed camp) বিভক্ত হয় যাহা শেষ পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য করিয়া তোলে।

নৌবহরের সংখ্যা বৃদ্ধি

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত

১। বিসমার্কের কূটনৈতিক প্রতিভার মূল্যায়ন কর। [উঃ ১.৮.]

২। "বিসমার্ককে সৃজনকুশলী রাষ্ট্রবিদ্ বলা যায় না"—এই মন্তব্য কতদূর সত্য আলোচনা কর। [উঃ ১.৮.]

৩। "১৮৭১ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিসমার্ক ছিলেন ইওরোপের ভাগ্যনিয়ন্তা"—এই মন্তব্যের যথার্থতা আলোচনা কর। [উঃ ১.৫]

৪। বিসমার্কের অভ্যন্তরীণ নীতি আলোচনা কর। [উঃ ১.২.]

৫। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের নৌ-নীতি বিশ্লেষণ কর। [উঃ ১.১৪]

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইটালীর ইতিহাস (১৮৭০-১৯১৪)
(History of Italy (1870-1914)

২.১. অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন (Internal Reconstruction): ইটালীর রাজ্য স্থাপিত হয় ১৮৫৯ এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৬৬ ও ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে ভেনেশিয়া ও রোম ইটালীর রাজ্যভুক্ত হয়।

১৮৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর অবস্থা

নূতন ইটালীর রাজ্যের সম্মুখে বিপত্তি ছিল বিস্তর ও গভীর। রাজনৈতিক দিক দিয়া ইটালী ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু ইটালীর জাতীয় ঐক্য তখনও ছিল অসম্পূর্ণ। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ডি-এ্যাজেগলিও (D' Azeglio) মন্তব্য করিয়াছিলেন, "আমরা ইটালীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছি, এখন ইটালীবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে" ("We have united Italy, now let us unite Italians")। এই মন্তব্যের তাৎপর্য হইল এই যে এযাবৎকাল ইটালীর জনগণের মধ্যে আঞ্চলিক ভাবধারা, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে বিচ্ছিন্নতার ভাব ছিল তাহার অবসান করিয়া ইটালীর জাতীয় জীবন ঐক্যবদ্ধ করা। রোমের পতনের পর ইটালীর জনগণ কখনও ঐক্যবদ্ধ ছিল না এবং ভিনেশিয়ান, সাইলেশিয়ান, তাস্কান, রোমান, পীয়েডমণ্ট প্রভৃতি জনগণের মধ্যে আঞ্চলিক বিভিন্নতা ছিল গভীর। ইহা ভিন্ন, মোটামুটিভাবে উত্তর ও দক্ষিণ ইটালীর মধ্যে বৈষম্য ছিল বিস্তর। এই প্রসঙ্গে কাউণ্ট কাভুর এক সময় মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, অস্ট্রিয়া ও রোমের সহিত যুদ্ধ করা অপেক্ষা উত্তর ও দক্ষিণ ইটালীর মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করা ছিল অধিক দুরূহ।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর ইটালীতে বহু স্বতন্ত্র রাজ্যের উদ্ভব হয় যাহাদের নিজস্ব সরকার, নিজস্ব সৈন্যবাহিনী, নিজস্ব আইন-আদালত ও নিজস্ব মুদ্রা ছিল। ইটালীর ন্যায় একক-রাষ্ট্রে (unitary) এই সকল আঞ্চলিক বৈষম্য বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। একমাত্র পীয়েডমণ্টেই সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। অন্যান্য রাজ্যগুলির কোথাও ছিল উগ্র স্বৈরতন্ত্রী এবং কোথাও জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা। সুতরাং; রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধতার পর ইটালীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হইল ঐক্যবদ্ধতার সুদৃঢ়ীকরণ ও জাতীয় অগ্রগতির সুনিশ্চিতকরণ। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোমের পতনের পর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল ইটালীর তদানীন্তন পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হইয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন "Italy is united and free, it remains for us henceforth to make her great and happy"*।

*Vide Hazen—Europe since 1815.

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই ইটালীর জাতীয় পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত পীয়েড্‌মণ্টের সংবিধানের কিছু রদবদল করিয়া ইটালীর সংবিধান রচিত হয়। এই সংবিধানে দুইকক্ষ-যুক্ত পার্লামেণ্ট বা সংসদের ব্যবস্থা করা হয়—যথা সেনেট (Senate) ও চেম্বার-অফ্-ডেপুটিস (Chamber of Deptuies)। পূর্ণসংসদীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। নিম্নকক্ষের অর্থাৎ চেম্বার-অফ্-ডেপুটিসের নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। ঐক্যবদ্ধ ইটালীর প্রথম রাজধানী হয় টিউরিন (Turin), পরে ফ্লোরেন্স এবং শেষে রোম (১৮৭১)। প্রশাসনের সুবিধার জন্য সমগ্র ইটালীকে ৫৯টি জেলায় বিভক্ত করা হয়, অনেকাংশে ফ্রান্সের 'ডিপার্টমেণ্টের' ন্যায়। ভেনেশিয়া ও রোমের সংযুক্তির পর জেলাগুলির সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৯। ইহার ফলে ইটালীর পূর্বতন প্রদেশগুলির রদ-বদল হয় এবং শহরাঞ্চলে সকল 'প্রিফেক্ট' (Prefects) ও 'মেয়রদের' (Mayor) নিয়োগ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় কেন্দ্রীয়করণ-নীতি প্রযুক্ত হয় যাহা পূর্বে কখনও সম্ভব হয় নাই।

ইটালীর নূতন সংবিধান

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে রোমে ইটালীর পার্লামেণ্টের অধিবেশন শুরু হয়। এই পার্লামেণ্টে দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল ছিল যাহারা দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী নামে পরিচিত। উভয় দলই রাজতন্ত্রের প্রতি অনুগত ছিল। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ইটালীর জাতীয় ঐক্য সম্পাদনে দক্ষিণপন্থী দল যে সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তাহার ফলে স্বৈরতন্ত্রের উগ্র সমর্থক উগ্র-দক্ষিণপন্থী (Extreme Right) ও প্রজাতন্ত্রের উগ্র সমর্থক উগ্র-বামপন্থী দল দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। পীয়েডমণ্ট ও মধ্য-ইটালীর প্রতিনিধিগণ দক্ষিণপন্থীগণকে সমর্থন করিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু ইটালীর রাজধানী টিউরিন হইতে ফ্লোরেন্সে স্থানান্তরিত হওয়ায় দক্ষিণ ইটালীর প্রতিনিধিগণ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া বামপন্থীগণকে সমর্থন করেন। পোপের আদেশানুসারে ক্যাথলিকগণ ভোটদানে অথবা ভোটপ্রার্থী হইতে বিরত থাকে এবং এই কারণে উহারা রাজনীতির সহিত সংস্রব ত্যাগ করে। উত্তর ইটালীতে সমাজতন্ত্রীগণ ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল বটে, কিন্তু ইটালীর নবগঠিত পার্লামেণ্টে উহারা নিতান্তই নগণ্য ছিল।

পার্লামেণ্টের অধিবেশন

পার্লামেণ্টের সম্মুখে সমস্যাগুলি ছিল অত্যন্ত জটিল, যথা, কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা, সুষ্ঠু পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করা, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ত্বরান্বিত করা এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

পার্লামেণ্টের সম্মুখে সমস্যা

১৮৬১ হইতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণপন্থীগণ কর্তৃক গঠিত মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই মন্ত্রিসভা কনুসোরটেরিয়া (Consorteria) বা সংঘ নামে পরিচিত ছিল। এক বিপুল পরিমাণের রাজস্বের ঘাটতি পূরণের জন্য দক্ষিণপন্থী মন্ত্রিসভা নানাপ্রকারের কর ধার্য করেন, প্রচুর শুল্কের বিনিময়ে সিসিলিকে তামাকের

কনুসোরটেরিয়া রাজস্ব

একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার মঞ্জুর করেন এবং রেলপথ রাষ্ট্রায়ত্ত করার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন।

ইটালীর অপর সমস্যা ছিল পোপের সহিত সম্পর্ক স্থির করা। বলপূর্বক ইটালীর সহিত রোমের সংযুক্তিকরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু ইটালীর অন্যান্য শহর হইতে রোমের পার্থক্য ছিল এই যে, রোম ছিল ক্যাথলিক জগতের পীঠস্থান এবং ক্যাথলিকগণ ছিল পোপের প্রতি একান্তভাবে অনুগত। পোপের উপর ইটালীর সরকারের কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করা হইলে ইটালীর ধর্ম-জগতে এক ভয়াবহ বিস্ফোরণের সম্ভাবনা ছিল। এই অবস্থায় রোমে ইটালীর রাজধানী স্থানান্তরিত করার পূর্বেই পোপের সহিত এক আপোস-মীমাংসার প্রয়োজন দেখা দেয়। পোপ ইটালীর সরকারকে স্বীকার করিয়া লইতেও অসম্মত ছিলেন এবং ভিক্টর ইমানুয়েলকে তিনি একমাত্র সার্ডিনিয়ার রাজা বলিয়াই মনে করিতেন। পোপের সহিত আপোস-মীমাংসার জন্য ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'প্রতিশ্রুতির আইন' (Law of Guarantee) নামক এক আইন অনুসারে পোপকে স্বাধীন ও সার্বভৌম হিসাবে স্বীকার করা হয়; ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁহার সর্বাত্মক ক্ষমতা স্বীকার করা হয়; যাজক নিয়োগের ও অনুশাসন (Bulls) জারী করার অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হয়। কিন্তু ফ্রান্সের যাজক সম্প্রদায়ের চাপে পোপ নবম-পায়াস (Pius IX) এই শর্তগুলি মানিয়া লইতে বা ইটালীর সরকারকে স্বীকার করিয়া লইতে অসম্মত হন। তিনি ভ্যাটিকান প্রাসাদে নিজেকে 'বন্দী' বলিয়া ঘোষণা করেন।

ইটালীর পার্লামেন্ট পোপকে যে বাৎসরিক ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছিল, পোপ তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। এই অবস্থায় ভিক্টর ইমানুয়েলের পরিচালনায় ইটালীয় বাহিনী রোমে প্রবেশ করে এবং ভিক্টর ইমানুয়েল ঘোষণা করেন "আমরা রোমে আছি ও তথায় থাকিব" (Yes, We are in Rome, and we shall remain".)। প্রকৃতপক্ষে পোপের তরফ হইতে ইটালী-সরকারের কোন ভীতির কারণ ছিল না, ভীতির কারণ ছিল পোপের অনুকূলে ক্যাথলিক রাষ্ট্রবর্গের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা যাহা শেষ পর্যন্ত ঘটে নাই।

নূতন ইটালী-রাষ্ট্রের অপর সমস্যা ছিল শিক্ষার প্রসার। জাতীয় জীবনের সংহতির ও অগ্রগতির জন্য শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই ব্যাপারে পূর্বতন সরকারগুলি কোন সুষ্ঠু নীতি গ্রহণে ব্যর্থ হইয়াছিলেন।

শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যা

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর জনগণের প্রায় ৭৫ শতাংশ ছিল নিরক্ষর। নেপলস্ ও সিসিলিতে নিরক্ষরতার সংখ্যা ছিল প্রায় ৯০ শতাংশ। ম্যাৎসিনী এক সময় মন্তব্য করিয়াছিলেন যে "জাতীয় শিক্ষা ভিন্ন জাতির নৈতিক অস্তিত্ব থাকে না" (without national education, there exists morally no nation).* ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বাধ্যতামূলক

শিক্ষা-আইন প্রবর্তিত হয় এবং ইটালীর সরকার ক্যাথলিকদের পরিচালিত শিক্ষায়তনগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া লন। প্রাশিয়ার অনুকরণে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। উপরি-উক্ত কার্যাবলীর ফলে কন্‌সোরটেরিয়ার জনপ্রিয়তা ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়ে এবং অবশেষে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।

সামরিক

পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া বামপন্থীগণ মন্ত্রিসভা গঠন করে। রাজনৈতিক মতবাদের দিক দিয়া বামপন্থীগণ উগ্র হইলেও রাজতন্ত্রের প্রতি উহারা অনুগত ছিল। দক্ষিণাঞ্চলের সমর্থনের উপর উহারা নির্ভরশীল ছিল। ফলে নূতন সরকারের উপর দক্ষিণাঞ্চলের আধিপত্য স্থাপিত হয়। বামপন্থী সরকার ছিলেন গণতন্ত্রী, কিন্তু পোপ-বিরোধী।

বামপন্থী সরকার
(১৮৭৬-১৮৮৭)

বামপন্থী সরকার প্রথমেই শস্য-কর বাতিল করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভোটদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের সাধারণ নীতি প্রবর্তিত হইল না। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়।

ইতিমধ্যে ইটালীতে প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী আন্দোলন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহাতে আশঙ্কিত হইয়া সংবিধান ও জাতীয় রাজতন্ত্রের রক্ষাকল্পে বামপন্থী সরকার সংস্কার নীতি বর্জন করেন। বামপন্থী সরকার সমাজতন্ত্রবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের সংঘগুলি ভাঙ্গিয়া দেন।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর প্রধানমন্ত্রী ডেপ্রেটিস (Depretis) আবিসিনীয় অভিযানে ব্যর্থ হইলে তাঁহার মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং ক্রিস্‌পি (Crispi) মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ডেপ্রেটিসের ন্যায় ক্রিস্‌পিও ছিলেন গ্যারিবল্ডির অন্যতম অনুগামী। ক্রিস্‌পি প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রকে সমর্থন করিয়া যাইতে থাকেন। ডেপ্রেটিসের ন্যায় তিনিও পোপ-বিরোধী নীতি গ্রহণ করেন। ১৮৮৭ হইতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্রিস্‌পি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। সরকারের বিরুদ্ধে যাজকদের কোনরূপ সমালোচনা দণ্ডনীয় বলিয়া ঘোষণা করা হয়। আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার চেষ্টা চলে। প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করিবার জন্য পুলিসবাহিনীকে শক্তিশালী করিয়া তোলা হয়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রোমে বেকার নাগরিকদের মিছিল কঠোর হস্তে দমন করা হয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিস্‌পির মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিস্‌পি পুনরায় প্রধানমন্ত্রী-পদে নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একনায়কতন্ত্রী শাসন চালাইয়া যান। তিনি পূর্বতন নীতি অনুসরণ করিয়া বিরোধীদের ধ্বংস

ডেপ্রেটিস মন্ত্রিসভার পতন
(১৮৮৭)

ক্রিস্‌পি

করিতে প্রয়াসী হন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আডোয়া-র যুদ্ধে (Battle of Adowa) আবিসিনীয়দের নিকট ইটালীর পরাজয় ঘটিলে ক্রিস্পির পতন ঘটে।

এই সময় দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দলগুলির ভাঙ্গন ধরে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে দলাদলির ফলে ইটালীর সরকারের সংহতি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা বিনষ্ট হয়। ইহার ফলেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইটালীতে ফ্যাসীবাদের সাফল্য ঘটে।

পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতা

ঐক্যবন্ধ রাষ্ট্র গঠিত হইবার পর প্রায় তিন দশক ধরিয়া ইটালীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে দারুণ বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি চলিতে থাকে। আঞ্চলিক মনোভাব ও শ্রেণীসংঘাতের ফলে ইটালীর রাষ্ট্রীয় জীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। জনগণের মনে জাতীয়তাবাদের কোন আদর্শ ছিল না বলিলেই চলে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত ও দুর্বল। শিক্ষার অভাব ও দারিদ্র্য ছিল ব্যাপক। ক্যাথলিকগণ ছিল সরকারবিরোধী। অর্থনৈতিক দিক দিয়া দক্ষিণাঞ্চল ছিল অনগ্রসর। জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে জনগণের দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করে।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হ্যাম্বার্ট-এর হত্যার পর তাঁহার পুত্র ভিক্টর তৃতীয় ইমানুয়েল (Victor Emmanual III)-এর সিংহাসনে আরোহণ করার পর পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে। ভিক্টর তৃতীয় ইমানুয়েল ছিলেন চরিত্রবান ও উচ্চশিক্ষিত। ইহা ছাড়া তিনি ছিলেন অমায়িক ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ও গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান। তিনি উদারনীতি গ্রহণ করিয়া শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। ফলে পুনরায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং রেশম ও অন্যান্য শিল্পজাত সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। জাতীয় অর্থনীতির নবরূপায়ণ ঘটে এবং সরকারের আয় উদ্বৃত্ত হয়। জলবিদ্যুৎ-শক্তির সম্প্রসারণ ঘটিলে ইটালী ক্রমে শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত হয়।

পরিস্থিতির পরিবর্তন

অর্থনৈতিক অগ্রসরতা সত্ত্বেও ইটালীর সমাজতন্ত্রীগণের কার্যকলাপ অব্যাহত এবং শ্রমিক অসন্তোষ প্রায় লাগিয়াই থাকে। শ্রমিক ধর্মঘট নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয় এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ইটালীতে সাধারণ ধর্মঘট সংঘটিত হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় এক ব্যাপক সাধারণ ধর্মঘট সংঘটিত হয় এবং ইহার নেতা ছিলেন বেনিটো মুসোলিনি (Benito Mussolini)। মুসোলিনি স্ব-সম্পাদিত সমাজতন্ত্রী পত্রিকা আবান্তি (Avanti)-র মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের জোর প্রচার শুরু করেন।

শ্রমিক অসন্তোষ

অর্থনৈতিক সমস্যা: ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর ঐক্যবদ্ধ ইটালীর অন্যতম সমস্যা ছিল অর্থনৈতিক। ইতিমধ্যে ইটালীর জাতীয় ঋণের এক বিশাল বোঝা নূতন ইটালী সরকারের স্কন্ধে আসিয়া পড়িয়াছিল। জাতীয় সংহতি, রেলের সম্প্রসারণ, সামরিক শক্তির সম্প্রসারণ ও অন্যান্য জনহিতকর পরিকল্পনা হেতু সরকারের ব্যয় অভাবনীয়-

ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এককথায় নূতন সরকারের ব্যয়-বরাদ্দ অভূতপূর্ব ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই বিশাল ব্যয়-বরাদ্দ মিটাইবার জন্য কর ও রাজস্বের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি করা হয়। কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নতি না হওয়ায় জনগণের আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠে।' দক্ষিণ ইটালীর জনগণের অবস্থা ছিল অত্যন্ত গুরুতর। শিল্পের অভাব, কৃষির স্বল্পতা, ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব, আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা প্রভৃতি কারণে এই অঞ্চলের জনগণের জীবন ছিল দুর্দশাগ্রস্ত। ইটালীর জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি সরকারকে অধিক মনোযোগী হইতে হয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাও অর্থনৈতিক সমস্যা আরও তীব্র করিয়া তোলে। কিন্তু ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় ইটালীয়গণ দলে দলে গমন করিলে স্বদেশে অর্থনৈতিক চাপ কিছুটা দূর হয়। বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে প্রায় এক মিলিয়ান ইটালীবাসী ভাগ্যান্বেষণে বিদেশে চলিয়া যায়।

সমাজতন্ত্রবাদ

অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা প্রভৃতি কারণে ইটালীর শ্রমিকদের অবস্থা ছিল অসহনীয়। ইহা ভিন্ন সরকারের ব্যয়-বহুল ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের পরিকল্পনা, পণ্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ও অধিক হারে রাষ্ট্রীয় করের বোঝা প্রভৃতি শ্রমিকদের অবস্থা সঙ্গীন করিয়া তোলে। ফলে সর্বত্র রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষের সঞ্চার হয় এবং প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী দলের উদ্ভব হয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে টিউরিন, মিলান ও রোমে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হয় এবং সিসিলিতে প্রবল শ্রমিক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সর্বত্র শ্রমিক আন্দোলন সাধারণভাবে সংঘটিত হইলেও মিলান শহরে তাহা রক্তাক্ত অবস্থায় পরিণত হয়। মধ্য ও দক্ষিণ ইটালীতে রুটি-দাঙ্গা (Bread riots) প্রবল আকার ধারণ করে। সরকার নিষ্ঠুরতার সহিত দাঙ্গা-হাঙ্গামা দমন করেন। দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিতে থাকাকালীন রাজা হাম্বার্ট জনৈক আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

২.২. ইটালীর পররাষ্ট্রনীতি, ১৮৭০-১৯১৫ (Foreign Policy of Italy) : ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ইটালীর কূটনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল জার্মানীর সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।* উত্তর ইটালীর দক্ষিণপন্থীগণ ফ্রান্সের সহিত মৈত্রীবন্ধনের পক্ষপাতী ছিল। কারণ তৃতীয় নেপোলিয়নের সাহায্যেই উত্তর ইটালী অস্ট্রিয়ার কবলমুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্স পোপকে সমর্থন করায় বামপন্থীগণ জার্মানীর সহিত মৈত্রীবন্ধনের পক্ষপাতী ছিল। ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধ ইটালীর জাতীয় ঐক্যবন্ধনের সহায়ক হইয়াছিল।

(১) ফ্রান্স

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে পোপের সমর্থনে ফ্রান্স একদল সৈন্যবাহিনী রোমে প্রেরণ করিয়াছিল। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পোপের অনুকূলে ফ্রান্সের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা দূর হইলে ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে বৈরীভাব কিছু পরিমাণে হ্রাস পায়।

* "The prevailing tendency of Italian diplomacy since 1870 has been towards alliance with Germany."—Camb. Mod Hist. XII P. 239

ইটালী নৌ-বাহিনী গঠনে ব্রতী হইলে ভূমধ্যসাগরে ফ্রান্সের প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এই আশংকায় ফ্রান্স আশঙ্কিত হইয়া উঠে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বার্দোর সন্ধি (Treaty of Bardo) অনুসারে এবং জার্মানী ও ব্রিটেনের সম্মতিক্রমে ফ্রান্স টিউনিস দখল করে। ইটালীর অধিবাসীগণ ইহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করে এবং ইটালীর রাজতন্ত্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হইতে থাকে এবং জার্মানী অপেক্ষা গণতান্ত্রিক ফ্রান্সের প্রতি ইটালীর সহানুভূতি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

ফ্রান্সের যাজকশ্রেণী পোপের রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে এই আশংকার বশবর্তী হইয়া ইটালীর বামপন্থীগণ জার্মানীর সহিত মৈত্রী স্থাপনে বদ্ধপরিকর হয়। টিউনিসে ফ্রান্সের কর্তৃত্ব স্থাপিত হইলে বামপন্থী মন্ত্রী ডেপ্রেটিস ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সহিত ত্রি-শক্তি মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন। ইহার শর্তানুসারে ফ্রান্সের আক্রমণের বিরুদ্ধে ইটালী জার্মানীর সমর্থন লাভ করে; অস্ট্রিয়া ইটালীতে উহার পূর্বতন রাজ্যাংশের উপর সকল দাবি ত্যাগ করে এবং জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিয়া ইটালী উহার বাণিজ্যের উন্নয়ন করিতে এবং সৈন্যবাহিনী ও নৌ-বাহিনী শক্তিশালী করিয়া তুলিতে সমর্থ হয়। ত্রি-শক্তি মৈত্রীর বলে ইটালীর অনেক সুবিধা হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই মৈত্রী-বন্ধন ইটালীবাসীর মনঃপূত হয় নাই। কারণ ইটালীর উত্তরে ও উত্তর-পূর্বে যে সকল অঞ্চল তখন পর্যন্ত ইটালীর বহির্ভূত ছিল, সেগুলি ইটালীর সহিত সংযুক্ত করার পক্ষে অস্ট্রিয়া ছিল প্রধান অন্তরায়। এই অঞ্চলগুলি হইল ট্রেন্ট ট্রিয়েস্ট ও আদ্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব-উপকূল। এই অঞ্চলগুলি তখনও অস্ট্রিয়ার দখলে ছিল। সুতরাং ত্রি-শক্তি মৈত্রী সম্পাদিত হইলে ইটালীর জাতীয়তাবাদীগণ তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া ঐ অঞ্চলগুলি ইটালীর সহিত সংযুক্ত করার জন্য আন্দোলন শুরু করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে ইটালীর এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার সুযোগ আসে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী অস্ট্রিয়ার সহিত উহার মৈত্রী ছিন্ন করে এবং অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পাদিত ত্রি-শক্তি আঁতাতে (Triple Entente) যোগদান করে।

(২) ত্রি-শক্তি মৈত্রী (Triple Alliance)

বৃহত্তর ইটালী গঠনের আন্দোলন

ইটালী ও ব্রিটেনের মধ্যে পুরাতন মৈত্রী-বন্ধন অব্যাহত রহে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত এক সন্ধি অনুসারে ইটালী ও ব্রিটেন ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণসাগর ও আদ্রিয়াটিক উপকূলে স্থিতাবস্থা (Status quo) বজায় রাখিতে সম্মত হয় এবং ভূমধ্যসাগরে তৃতীয় পক্ষের আক্রমণের বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য করিতে সম্মত হয়।

ব্রিটেন

২.৩. **ইটালীর ঔপনিবেশিক নীতি (Italy's Colonial Policy):** ইওরোপে ইটালীর নিরাপত্তার একমাত্র সহায়ক ছিল ত্রি-শক্তি মৈত্রী। মিশরে ফ্রান্স ও মাধি

(Mahdi) ব্রিটেনের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হইলে ব্রিটেনের পক্ষে ইটালীর সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এই কারণে ব্রিটেন লোহিত সাগরের উপকূলস্থ কতক অঞ্চলে ইটালীর ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের প্রতি সম্মতি জানায়।

(১) আবিসিনিয়া

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত মাসোয়া (Massowah) নামক অঞ্চলটি দখল করে। ইহার পর শুরু হয় ইটালীর আবিসিনিয়া অভিযান। মাসোয়া হইতে ইটালীয় বাহিনী অগ্রসর হইলে দোগালি (Dogali) নামক স্থানে এক তুমুল সংগ্রামের পর ইটালীয় বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মেনেলিক (Menelik) ইটালীর সমর্থনে আবিসিনিয়ার সিংহাসন লাভ করেন এবং ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর সহিত এসিয়ালির সন্ধি (Treaty of Accialli) স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধির বলে ইটালী আবিসিনিয়াকে উহার আশ্রিত রাজ্য হিসাবে গণ্য করে এবং আবিসিনিয়ার অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে থাকে। মেনেলিক ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং ফ্রান্সের সমর্থন লাভ করেন। আবিসিনিয়া ইটালীর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে ফ্রান্স অধিকৃত জিবুটি (Djibuti)-র নিরাপত্তা বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফ্রান্স ও মাধির বিরুদ্ধে ইটালীর সাহায্যের আশায় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন ইটালীর সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হয়। ইহার শর্তানুসারে উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় ব্রিটেন ও ইটালীর প্রভাবিত অঞ্চলের সীমারেখা স্থির করা হয়।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আদ্দিস-আবাবার সন্ধি (Treaty of Addis Ababa) স্বাক্ষর করিয়া ইটালী আবিসিনিয়ার উপর উহার সার্বভৌমত্বের অধিকার পরিত্যাগ করে এবং "এরিত্রিয়া সাম্রাজ্য" (Empire of Eritrea) গঠনের পরিকল্পনা ইটালী পরিত্যাগ করে।

মিশরে ব্রিটেনের অনুকূলে ইটালীর সমর্থনের বিনিময়ে ব্রিটেন ইটালীর ত্রিপলি (Tripoli) দখলের পরিকল্পনা সমর্থন করে। ইহা ভিন্ন ইটালী জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সমর্থনও লাভ করে। ত্রিপলি ছিল তুরস্কের অধিকারভুক্ত। সুতরাং তুরস্কের সহিত ইটালীর যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত লুসান-এর সন্ধি অনুসারে ইটালী ত্রিপলি লাভ করে।

(২) ত্রিপলি

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত

১। ১৮৭০ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইটালীর অভ্যন্তরীণ ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উ ২.১]

২। ১৮৭০ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইটালীর পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা কর। [উ. ২.২]

৩। ১৮৭০ হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ইটালীর অর্থনৈতিক সমস্যার বিবরণ দাও। ইটালী এই সমস্যার সমাধানের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল? [উ ২.১]

তৃতীয় অধ্যায়

ফ্রান্সের তৃতীয় সাধারণতন্ত্র (১৮৭১-১৯১৪)
(The Third Republic in France : 1871-1914)

৩.১. **সেডানের যুদ্ধের পর ফ্রান্সের অবস্থা :** সেডানের যুদ্ধের পর ফ্রান্সকে এক শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। দুইটি প্রদেশ (আলসাস ও লোরেন) ফ্রান্সের হস্তচ্যুত হয়, উহার সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিপর্যয় ঘটে এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ এক বিশাল অর্থের পরিমাণ উহার স্কন্ধে আসিয়া পড়ে। ফ্রান্সের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎও এক সংকটের সম্মুখীন হয়। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতনের ফলে পরবর্তী সরকার গঠনের ব্যাপারে দেশব্যাপী এক অন্তর্বিপ্লবের সূচনা হয়। সৌভাগ্যবশতঃ সেই সময় ফ্রান্সে থিয়ার্স-এর ন্যায় এক বিচক্ষণ রাষ্ট্রবিদের আবির্ভাব হয় যিনি বিচক্ষণতার সহিত স্বদেশের এই দুর্দিনে শাসনভার পরিচালনা করেন।

সেডানের যুদ্ধের পরাজয়ের সংবাদ প্রচারিত হওয়ামাত্র ফ্রান্সে এক সাময়িক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয় এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য 'জাতীয় প্রতিরক্ষা' (National Defence) সরকার গঠন করা হয়। কিন্তু ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের পতন ঘটিলে জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের পতন ঘটে এবং জার্মানীর সহিত সদ্য-সম্পাদিত চুক্তি অনুমোদন করার জন্য ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লী (National Assembly) বা জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। থিয়ার্সের (Theirs) নেতৃত্বে জাতীয় পরিষদ জার্মানীর সহিত ফ্রাংকফার্টের সন্ধি (Treaty of Frankfurt) অনুমোদন করিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটায়। এই সন্ধির শর্তানুসারে আলসাস ও লোরেন প্রদেশ দুইটি জার্মানীকে সমর্পণ করা হয় এবং ফ্রান্স যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ প্রদানে স্বীকৃত হয়। ইহাও স্থির হয় যে ফ্রান্স যতদিন এই ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ প্রদান করিতে না পারিবে, ততদিন ফ্রান্সের নিজস্ব ব্যয়ে ফ্রান্সে একদল জার্মান সৈন্য মোতায়েন থাকিবে।

থিয়ার্স কর্তৃক রাষ্ট্রভার গ্রহণ

নূতন সাময়িক সরকার গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকার ও প্যারিসের জনগণের মধ্যে এক গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এই গৃহযুদ্ধ কমিউনের যুদ্ধ (War of the Commune) নামে পরিচিত। ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লী কর্তৃক পরিচালিত ফ্রান্সের সরকার ও প্যারিসের জনগণের মধ্যে নানা বিষয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লীতে রাজতন্ত্রীদের প্রাধান্য থাকায় উহা সাধারণতন্ত্রের বিরোধী ছিল। কিন্তু প্যারিসবাসীদের অধিকাংশই ছিল সাধারণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী।

স্বভাবতঃই তাহাদের মনে এইরূপ আশঙ্কার উদয় হয় যে ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লী ফ্রান্সে পুনরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবে। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস হইতে ভার্সাইতে স্থানান্তরিত করায় প্যারিসবাসীগণ নিজেদেরকে অপমানিত মনে করিল। উপরন্তু সরকার প্যারিসের জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুর্দশা লাঘবের কোন চেষ্টা করিলেন না ও ন্যাশনাল গার্ড ভাঙ্গিয়া দিলেন। আত্মরক্ষার জন্য যে সকল কামান ছিল সেগুলি প্যারিস হইতে স্থানান্তরিত করিবার প্রচেষ্টা হইলে প্যারিসের বিক্ষুব্ধ জনতা সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। সর্বত্র কমিউন প্রতিষ্ঠিত হইল এবং বিদ্রোহীগণ প্যারিসের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও প্রদেশে কমিউন প্রতিষ্ঠার দাবি করিল। থিয়ার্স কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়া প্যারিসের নাগরিকদের দমন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরিয়া এই গৃহযুদ্ধের তাণ্ডবলীলা চলিল। বিদেশী জার্মানদের সম্মুখেই ফরাসী বনাম ফরাসীদের হানাহানি চলিল। অবশেষে সরকারী সৈন্যবাহিনী ভার্সাই হইতে আগমন করিয়া বলপূর্বক প্যারিসে প্রবেশ করিল। প্রতিটি রাজপথে সৈন্যবাহিনীর সহিত প্যারিস-নাগরিকদের খণ্ডযুদ্ধ হইল। শেষ পর্যন্ত প্যারিস সরকারী সৈন্যবাহিনীর কবলে আসিল। এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলে বহু হতাহত হয়, এবং সম্পত্তির বিনাশ ঘটে। সরকার কমিউনদের উপর প্রবল প্রতিহিংসা গ্রহণ করেন। বহু কমিউনকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইল এবং কিছুসংখ্যক কমিউনকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হইল। প্যারিসের পরাজয় ঘটিল এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রবাদ হীনবল অবস্থায় পড়িয়া রহিল। ফ্রান্সে শান্তি ফিরিয়া আসিল।

ফ্রান্সের নূতন গভর্নমেন্টের প্রতি জনসাধারণের বিরোধিতা

৩.২. **অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন :** (Internal Re-construction) : কমিউন-বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে থিয়ার্স অতঃপর জাতীয় পুনর্গঠন ব্যাপারে মনোনিবেশ করেন।

(১) **জার্মানীকে ক্ষতিপূরণের অর্থপ্রদান :** সরকারের প্রথম কর্তব্য হইল জার্মানীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় অর্থ পরিশোধ করা। থিয়ার্স প্রচুর পরিমাণে জাতীয় ঋণ সংগ্রহ করিয়া দুই বৎসরের মধ্যে ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করিলেন। জার্মান সৈন্য ফ্রান্সের দখলীকৃত অঞ্চল পরিত্যাগ করিল।

(২) **সামরিক পুনর্গঠন :** প্রাশিয়ার সামরিক পদ্ধতির অনুকরণে ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনীকে পুনর্গঠিত করা হইল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এক আইন অনুসারে প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে সৈন্যবিভাগে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হইল। অন্ততঃ পাঁচ বৎসর কাল পর্যন্ত সকলকে সৈন্যবিভাগে কাজ করিতে হইবে ইহাও স্থির হইল। সামরিক বিভাগের পুনর্গঠন তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের অন্যতম কৃতিত্ব।

(৩) **নূতন শাসনতন্ত্র রচনা :** ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অবসানের পর ফ্রান্সের যে সামরিক সরকার গঠিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন রাজতন্ত্রের সমর্থক। থিয়ার্স নিজেই ছিলেন

রাজতন্ত্রপন্থী এবং অর্লিয়ান বংশের সমর্থক। কিন্তু রাজতন্ত্রী সমর্থকদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ ছিল। তাহাদের মধ্যে তিনটি দল ছিল—একদল তৃতীয় নেপোলিয়নের পুত্রের পক্ষপাতী, অপর দুই দল যথাক্রমে বুরবোঁ বংশীয় দশম চার্লসের পৌত্র পঞ্চম হেনরী (Comte de Chamford) ও অর্লিয়েন বংশীয় লুই ফিলিপের পৌত্রের (Comte de Paris) পক্ষপাতী ছিল। থিয়ার্সের কথায় "ফ্রান্সে তখন তিনটি মাথা এবং মাত্র একটি রাজমুকুট ছিল।" রাজতন্ত্রীগণের মধ্যে সম্রাট নির্বাচনের প্রশ্ন লইয়া তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হইলে থিয়ার্স নিজ দায়িত্বে ফ্রান্সের তৃতীয় সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করিলেন এবং জাতীয় পরিষদে একটিমাত্র ভোটের সংখ্যাধিক্যে তৃতীয় সাধারণতন্ত্র আইনসিদ্ধ হইল (১৮৭৫ খ্রীঃ)।

থিয়ার্স-এর কৃতিত্ব

ফ্রান্সের ইতিহাসে থিয়ার্স-এর কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। সেডানের বিপর্যয়ের পর ফরাসীদের মধ্যে থিয়ার্স-ই ফ্রান্সকে পুনরুদ্ধার করেন। তিনি কমিউন-বিদ্রোহ দমন করেন, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করেন। সামরিক বাহিনী পুনর্গঠন করেন এবং ফ্রান্সে যখন রাজতন্ত্রী মনোভাব প্রবল, সেই সময় তিনি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। তাঁহার দেশপ্রেম ফরাসীগণকে চমৎকৃত করিয়াছিল।

প্রজাতন্ত্রীদের জয়লাভ ঃ থিয়ার্স-এর উত্তরাধিকারী মার্শাল ম্যাকম্যাহোন ছিলেন উগ্র রাজতন্ত্রবাদী। তাঁহার নেতৃত্বে ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লীতে রাজতন্ত্রবাদীগণ রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপনে বদ্ধপরিকর হয়। বুরবোঁ ও অর্লিয়েন-সমর্থকগণ এক মীমাংসার মাধ্যমে কম্‌ডে দ্য স্যামফোর্ড-কে পঞ্চম হেনরী উপাধিতে ভূষিত করিয়া ফ্রান্সের রাজা বলিয়া ঘোষণা করার পরিকল্পনা করে। ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা যখন একরূপ সুনিশ্চিত, সেই সময় উগ্র বুরবোঁ মনোভাবাপন্ন কম্‌ডে দ্য স্যামবোর্ড ফরাসী বিপ্লবের ত্রি-রঞ্জিত পতাকা রাষ্ট্রীয় প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। তিনি বুরবোঁ রাজাদের শ্বেত পতাকার পুনঃপ্রবর্তনের দাবি করেন। কিন্তু সেই সময় ত্রি-রঞ্জিত পতাকা ছাড়া অন্য কোনও পতাকা রাষ্ট্রীয় প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল ; কারণ ত্রি-রঞ্জিত পতাকার সহিত ফরাসী জনগণের বহু স্মৃতি জড়িত ছিল। কম্‌ডে দ্য স্যামবোর্ড-এর একগুঁয়েমির ফলে রাজতন্ত্রীগণ শুধু যে প্যারিসেই দুর্বল হইয়া পড়িল এমন নহে, প্রদেশে ও গ্রামাঞ্চলেও উহারা দুর্বল হইয়া পড়িল, যেথায় উগ্র প্রজাতন্ত্রবাদী গ্যাম্বেতা (Gambetha) প্রজাতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জোর প্রচারকার্য চালাইতে ছিলেন। গ্যাম্বেতার প্রচেষ্টা সফল হয় এবং একজন রাজতন্ত্রবাদী প্রেসিডেণ্ট রাজতন্ত্রবাদী পরিষদের নেতৃত্বে ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় (১৮৭৫ খ্রীঃ)।

তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের সংবিধান ঃ প্রেসিডেণ্ট

নূতন সংবিধান অনুসারে সাধারণতন্ত্রের সর্বাধিনায়ককে প্রেসিডেণ্ট আখ্যা দেওয়া হইল এবং দুই কক্ষের মিলিত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দ্বারা তাঁহাকে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা হইল। তাঁহার পদের মেয়াদ সাত বৎসর করা হইল।

অর্লিয়েনতন্ত্রীগণ (Orleanists) প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক সেনেট গঠন করার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু বামপন্থীগণ প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সেনেট নির্বাচিত করার পক্ষপাতী ছিল। শেষ পর্যন্ত স্থির হইল যে ডেপুটিগণ, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিভাগের সদস্যগণ ও জেলাপরিষদগুলি নয় বৎসরের জন্য ২২৫ জন সেনেটের সদস্য নির্বাচিত করিবে এবং জাতীয় পরিষদ (National Assembly) ৭৫ জন সেনেটের সদস্য নির্বাচিত করিবে। নব-নির্বাচিত সেনেটকে "The Grand Council of the Communes of France" নামে অভিহিত করা হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে চারি বৎসরের মেয়াদে ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদ চেম্বার-অফ্-ডেপুটিস (Chamber of Deputies) গঠন করিল।

সেনেট

চেম্বার-অফ্-ডেপুটিস

এইভাবে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে যে সরকার গঠিত হইল উহাকে সীমিত নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলা যায়। দায়িত্বশীল মন্ত্রিদের সহযোগিতায় প্রেসিডেণ্ট শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। সাত বৎসরের মেয়াদে তাঁহাকে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা হয়। সেনেট ও চেম্বার-অফ্-ডেপুটিস ভাঙিয়া দেওয়ার অধিকার তাঁহার ছিল না। যদিও ইংল্যাণ্ডের রাজার ন্যায় প্রেসিডেণ্ট মন্ত্রিপরিষদে সভাপতিত্ব করার অধিকারী ছিলেন, তথাপি ইংল্যাণ্ডের রাজার তুলনায় তাঁহার প্রভাব নিতান্তই সামান্য ছিল।

উপসংহার

৩.৩. **ফ্রান্সের শিল্প ও বাণিজ্য (Industry and Commerce) :** ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক জীবনে এক দারুণ বিপর্যয় আসিয়াছিল। কিন্তু তৃতীয় ফরাসী সাধারণতন্ত্রের আমলে শিল্প ও বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক জীবন স্বাভাবিক হইয়া উঠে। এই অগ্রগতির মূলে ছিল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, জনগণের অক্লান্ত পরিশ্রম, রাষ্ট্রের সহযোগিতা, কৃষির উন্নয়ন এবং ফরাসী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের বিস্তার। ১৮৭৮, ১৮৮৯ ও ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত প্যারিসের শিল্প-প্রদর্শনী শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নের সাক্ষ্য বহন করে।

শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নের কারণ

১৮৭১ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফরাসী সরকার কৃষির উন্নয়নের প্রতি মনোযোগী হন। কৃষি-শিল্পের রক্ষার জন্য বিদেশ হইতে আনীত গমের উপর উচ্চহারে শুল্ক ধার্য করা হয় এবং একটি কৃষি-মন্ত্রণালয় স্থাপন করা হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষকদের মধ্যে সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে রেলপথের সম্প্রসারণের ফলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল। ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের সময় ফরাসী রেলপথের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। উত্তর ও

কৃষি ও শিল্পের সম্প্রসারণ

পশ্চিম ফ্রান্সে পোতাশ্রয় ও বন্দরগুলির উন্নয়নের ফলে সামুদ্রিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। শিল্প ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার উন্নতির ফলে ফ্রান্সে বহুবিধ সামাজিক সংস্কার প্রবর্তিত হয় এবং এই সময় হইতে ফ্রান্সে সমাজতন্ত্রবাদের ব্যাপক বিস্তার ঘটে।

উপসংহার

৩.৪. **তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের বিপত্তি (Dangers to the Third Republic) :** এইভাবে ফ্রান্সে তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। কিন্তু শীঘ্রই তৃতীয় সাধারণতন্ত্রকে বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইল। ফ্রান্সে দলগত ভাবাবেগ উগ্র হইয়া দেখা দিল এবং অনেকে সাধারণতন্ত্রকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল। সাধারণতন্ত্র-বিরোধী এই গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন জেনারেল বুল্যাঞ্জার (Boulenger), যিনি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ-মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি সৈন্যদের সুখ-সুবিধা মঞ্জুর করিয়া উহাদের প্রবল সমর্থন লাভ করেন এবং সেই সংগে জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার কথা প্রচার করিয়া ফরাসী জনগণের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেন। রাজতন্ত্রীগণ, বোনাপার্টিয়গণ ও যাজকগণ বুল্যাঞ্জার-এর দলভুক্ত হয়। ইহারা পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া বুল্যাঞ্জার-এর একনায়কতন্ত্র স্থাপনে উদ্যোগী হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহাদের আন্দোলন ব্যর্থ হয় এবং বুল্যাঞ্জার আত্মহত্যা করেন। বুল্যাঞ্জার-ঘটনা সাধারণতন্ত্রের ভিত্তি শক্তিশালী করিল এবং রাজতন্ত্রী ও যাজকগণ হেয় প্রতিপন্ন হইল।

বুল্যাঞ্জার আন্দোলন

কিন্তু ইতিমধ্যে পানামা ক্যানাল কোম্পানীর (Panama Canal Company) ডিরেক্টরদের প্রতারণামূলক লেন-দেনের কথা প্রকাশিত হইলে সাধারণতন্ত্রের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হয়। সাধারণতন্ত্রের কয়েকজন মন্ত্রী এবং বিধান পরিষদের কয়েকজন সদস্য এই কেলেঙ্কারীর সহিত জড়িত থাকায় সাধারণতন্ত্র-বিরোধী দলগুলি সাধারণতন্ত্রের উপর জোর আক্রমণ চালায়।

পানামা খাল কেলেঙ্কারী

এইভাবে একের পর এক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারী তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের অবস্থা সঙ্গীন করিয়া তোলে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অপর এক সামরিক কেলেঙ্কারী সাধারণতন্ত্রের উপর বিরোধীদের আক্রমণের সূত্রপাত করে। এই বৎসর ড্রাইফাস (Dreyfus) নামে এক ইহুদী ও ফরাসী বাহিনীর সমরনায়ক জার্মানীর নিকট কিছু গুপ্ত সামরিক সংবাদ পাচার করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইলে এক দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সামরিক আদালতে ড্রাইফাস-এর বিচার হয় এবং তিনি দোষী সাব্যস্ত হইয়া দক্ষিণ আমেরিকার এক দ্বীপে নির্বাসিত হন। কিন্তু ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ড্রাইফাস-মামলার নথিপত্র পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখা যায় যে সেগুলি ছিল নিতান্তই জাল। এই সংবাদ প্রকাশিত হইলে ফরাসী সরকার অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েন।

ড্রাইফাস ঘটনা

সরকারের ও সামরিক বিভাগের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে সরকার সকল ব্যাপারটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফরাসী সরকারের এই প্রচেষ্টার ফলে সমগ্র ফ্রান্সে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং ফরাসী জনগণ পরস্পর-বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়। কিছু উচ্চপদস্থ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যথা এমিলি জোলা, অ্যানাটলে ফ্রাঁসে ও ক্লিম্যানশো ড্রাইফাস-এর পক্ষ অবলম্বন করেন। অপরদিকে ফরাসী জনগণ, যাজকশ্রেণী, সামরিক বাহিনী ও রাজতন্ত্রীগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। প্রকৃতপক্ষে ড্রাইফাস ঘটনা ফ্রান্সের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকটের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ইহা গোঁড়াপন্থী ও প্রগতিপন্থী এবং সামরিক ও বে-সামরিক ক্ষমতা-দ্বন্দ্বে পর্যবসিত হয়।

ড্রাইফাস-এর সমর্থকগণ তাঁহার পুনর্বিচারের দাবি করে। কিন্তু তাঁহার বিপক্ষবাদীগণ এই দাবির তীব্র বিরোধিতা করে। যাহা হোক, শেষ পর্যন্ত সাধারণতন্ত্রী সরকার ড্রাইফাস-এর বিচার নূতন করিয়া শুরু করেন। ড্রাইফাস পুনরায় দোষী প্রমাণিত হন, কিন্তু তাঁহার দণ্ড লঘু করিয়া মাত্র দশ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ড্রাইফাস-এর বিচার পুনরায় শুরু হয়। তাঁহাকে কারামুক্ত করা হয় এবং সামরিক বিভাগের এক উচ্চপদে নিযুক্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ড্রাইফাসের বিচারকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি পরস্পর-বিরোধী নীতি বা আদর্শের সংঘাত ঘটে। ড্রাইফাস-এর সমর্থকগণ ছিল প্রধানতঃ প্রোটেস্টাণ্ট, ইহুদী ও সমাজতন্ত্রীগণ এবং তাঁহার বিপক্ষে ছিল সামরিক বিভাগ ও যাজকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠী যাহারা ছিল প্রজাতন্ত্রের বিরোধী। এই ঘটনার ফলে সামরিক কর্তৃপক্ষের উপর বে-সামরিক কর্তৃপক্ষের জয়লাভ হয় এবং সমরবাদ ও যাজকবাদের চরম পরাজয় ঘটে।

ড্রাইফাস-ঘটনার গুরুত্ব

৩.৫ ফ্রান্সের সাধারণতন্ত্র ও চার্চ (The Republic and the Church) : ফ্রান্সের তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সমস্যা ছিল রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে সম্পর্কের স্থিরীকরণ করা। এই সমস্যা শুধু যে ধর্মীয় সমস্যা ছিল তাহা নহে। রাজনৈতিক প্রশ্নও ইহার সহিত জড়িত ছিল, কারণ ফরাসী যাজকগণের অধিকাংশই ছিল রাজতন্ত্রবাদী। এই কারণে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে খ্যাতনামা প্রজাতন্ত্রী নেতা গ্যামবেটা (Gambetta) যাজকশ্রেণীকে সাধারণতন্ত্রের ঘোর শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। যাজকশ্রেণী বুল্যাঞ্জিস্ট-আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল এবং ড্রাইফাস-এর বিরুদ্ধে জোর প্রচারকার্যে লিপ্ত হইয়াছিল। শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারেও সাধারণতন্ত্রী ও যাজকশ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষের কারণ ঘটিয়াছিল। সে সময় শিক্ষা ও শিক্ষায়তনগুলি ছিল যাজকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে। শিক্ষার দায়িত্ব রাজতন্ত্রের সমর্থক যাজকদের হস্তে ন্যস্ত রাখা সাধারণতন্ত্র সরকারের মোটেই মনঃপূত ছিল না। উগ্রপন্থী ও নরমপন্থী—সাধারণতন্ত্রীদের উভয় গোষ্ঠীই চার্চ তথা যাজকশ্রেণীর ঘোর বিরোধী ছিল। "যাজকবাদ—আমাদের শত্রু" ("Clericalism—that is our

যাজক-বিরোধী ব্যবস্থা

enemy") গ্যামবেটার এই প্রচার সাধারণতন্ত্রীদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী জুলেস ফেরী (Jules Ferry) প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর চার্চের নিয়ন্ত্রণ বিলোপ করেন, সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্য হইতে শিক্ষক নিয়োগ করার ব্যবস্থা করেন এবং সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে জেসুইটগণকে বিতাড়িত করেন। এক কথায় তিনি শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ধর্মের প্রভাব হইতে মুক্ত করেন। জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও চার্চের প্রভাব খর্ব করা হয়। হাসপাতালগুলিকে ধর্মের প্রভাব হইতে মুক্ত করা হয়, বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনসিদ্ধ করা হয় এবং বিবাহ-বন্ধন রেজিস্ট্রী করার আদেশ প্রচার করা হয়। এককথায় সমাজব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষ করা হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে 'ল-অফ-অ্যাসোসিয়েশন' (Law of Association) নামে একটি আইন প্রবর্তন করিয়া সকল প্রকার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সভা-সমিতির উপর সরকারের কর্তৃত্ব স্থাপন করা হয়। সরকারের স্বীকৃতি না পাইবার কারণে ফ্রান্সের প্রায় তিন হাজার ধর্মীয় সমিতি বাতিল হইয়া যায়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বিচ্ছেদের আইন' (Act of Separation) প্রবর্তন করিয়া রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ করা হয়। ইহার ফলে ভবিষ্যতে রাষ্ট্র কর্তৃক যাজকগণকে বেতন দেওয়ার প্রথা বন্ধ হইয়া যায়।

রাষ্ট্রের সহিত চার্চের সম্পর্কের বিচ্ছেদ

৩.৬. তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের ঔপনিবেশিক নীতি (Colonial Policy of the Third Republic) : ইওরোপের নৌ-শক্তিগুলি বহুকাল যাবৎ ঔপনিবেশিক নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য-বিস্তারে ব্রতী হইয়া পরস্পরের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল ও হল্যান্ড, এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশে নিজেদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, বিশেষ করিয়া ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী কর্তৃক আংগ্রা (Angra) অধিকৃত হইলে ইওরোপীয় শক্তিগুলি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের গুরুত্ব নূতন করিয়া উপলব্ধি করে।

ভূমিকা

তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে ফ্রান্স আলজেরিয়ায় উহার আধিপত্য বজায় রাখিয়াছিল এবং ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে আলজেরিয়াকে ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সাইগনে ফরাসী উপনিবেশ স্থাপিত হয়। মধ্য আমেরিকায় ফরাসী প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে তৃতীয় নেপোলিয়ন মেক্সিকো অভিযানে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অধীনে ফরাসী উপনিবেশ

তৃতীয় নেপোলিয়ন ফরাসী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তারের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না এবং তাঁহার মেক্সিকো অভিযানের ব্যর্থতা ফ্রান্সের

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তারের পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধ ফ্রান্সকে জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রতি অধিক পরিমাণে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। ১৮৭১ হইতে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফরাসী রাষ্ট্রবিদ্‌গণ স্বদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেই অধিক বিব্রত ছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ফরাসী ভাগ্যান্বেষী নাবিক ও সৈনিক সাহারা, ইন্দোচীন প্রভৃতি অঞ্চলে গমনাগমন করিয়া উপনিবেশ বিস্তারে ব্রতী হইয়াছিল। জুলেস ফেরী প্রধান-মন্ত্রী হইবার পর (১৮৮৩-৮৫) ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিস্তার নূতন করিয়া শুরু করেন। তাঁহার আমলে এক বিরাট ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে এবং এই ব্যাপারে ব্রিটেনের পরেই ফ্রান্স অগ্রাধিকার লাভ করে। ইতিপূর্বে আলজেরিয়ায় ফ্রান্সের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার পর উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলির উপর প্রভুত্ব স্থাপনে ফ্রান্স ব্রতী হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স টিউনিসে এক অভিযান পাঠাইয়া উহার অধিপতিকে ফ্রান্সের রক্ষণাধীনে আসিতে বাধ্য করে। বার্দোর সন্ধি অনুসারে টিউনিস ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু টিউনিসের উপর ইটালীর লোলুপ দৃষ্টি থাকায়, ইটালী ফ্রান্সের বিরোধিতা করে। ফ্রান্সের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া ইটালী অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর সহিত ত্রি-মৈত্রী মিত্রতায় (Triple alliance) আবদ্ধ হয়। আলজেরিয়া ও টিউনিস-এ ফরাসী উপনিবেশ বিস্তার ব্রিটেন সমর্থন করে। প্রতিটি উপনিবেশ ফ্রান্সের অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে স্বীকৃত হয় এবং প্রতিটি উপনিবেশকে ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধিত্বের অধিকার দেওয়া হয়।

১৮৭৮ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফরাসী উপনিবেশের বিস্তার

১৮৭৮ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফরাসী উপনিবেশ বিস্তার

তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে ইন্দোচীনে ফ্রান্সের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। ফ্রান্স কাম্বোডিয়া দখল করিয়া ইন্দোচীনকে ফ্রান্সের সহিত সংযুক্ত করিয়াছিল। জুলেস ফেরীর আমলে টোঙ্কিন (Tonkin) জয় করিয়া ফ্রান্স আনামের উপর প্রভুত্ব সুদৃঢ় করে। ফ্রান্স ফরাসী-কঙ্গো নামে এক নূতন উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা করিয়া মাদাগাস্কারের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মাদাগাস্কারকে ফ্রান্সের সহিত সংযুক্ত করা হয় এবং মরক্কোকে ফ্রান্সের প্রভাবিত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হয়। পশ্চিম আফ্রিকায় ব্রিটেনের সম্মতিক্রমে ফ্রান্স, সেনেগাল, নাইজার অঞ্চল ও আইভরি উপকূল ফরাসী সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। জার্মানীর বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মরক্কোকে ফরাসী সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবার পর ইওরোপে ফ্রান্সের শক্তিবৃদ্ধি হয়। এইভাবে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকায় ফ্রান্সের এক বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে।

৩.৭. তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের পররাষ্ট্রনীতি (১৮৭১-১৯১১) (Foreign Policy of France under the Third Republic): ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর ফ্রান্সের

অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। বিসমার্কের কূটনীতির ফলে ফ্রান্স মিত্রচ্যুত অবস্থায় পড়িয়াছিল। আলসাস ও লোরেন প্রদেশ দুইটি জার্মানীকে ছাড়িয়া দেওয়ার ফলে ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্তে জার্মানী প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ পাইয়াছিল যাহা ফ্রান্সের নিরাপত্তার দিক দিয়া বিপজ্জনক ছিল। অপরদিকে মিশর, পশ্চিম আফ্রিকা এবং সুদূর প্রাচ্যে উপনিবেশবিস্তারকে উপলক্ষ করিয়া ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত চলিতেছিল। এই অবস্থায় ইওরোপে ফ্রান্সের একমাত্র সম্ভাব্য মিত্র ছিল রাশিয়া।

ফ্রান্সের বিচ্ছিন্নতা

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের বিপর্যয়ের পর ফ্রান্সের পক্ষে শান্তি একান্ত প্রয়োজন ছিল। ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং রাশিয়ার সহিত ফ্রান্সের মিত্রতা জার্মানীর মনে যথেষ্ট ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। বিসমার্ক এইরূপ আশঙ্কা করিতেছিলেন যে ফ্রান্স ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এক নূতন আইনের বলে ফ্রান্স স্বীয় সৈন্যবাহিনী শক্তিশালী করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হইলে জার্মানী অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠে। কিন্তু বিসমার্ক যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত রুশজার দ্বিতীয় আলেক-জাণ্ডারের হস্তক্ষেপ এবং মহারানী ভিক্টোরিয়া ও জার্মান সম্রাট প্রথম উইলিয়ামের মধ্যে পত্রবিনিময় হইলে পুনরায় ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হয়।

ফ্রান্সের প্রতি জার্মানীর মনোভাব

বিসমার্ক ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক নীতি সমর্থন করেন। কারণ তাঁহার আশা ছিল যে ফ্রান্স উপনিবেশ বিস্তারে ব্রতী হইলে আলসাস-লোরেনের প্রতি ফ্রান্স পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না এবং ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফ্রান্স ব্রিটেনের সহিত লিপ্ত হইলে জার্মানীর সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা থাকিবে না।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন কংগ্রেসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া এবং রুমানিয়া ও গ্রীসকে সমর্থন করিয়া ফ্রান্স ইওরোপের রাজনীতিতে উহার বিনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। ইহা ভিন্ন বার্লিন কংগ্রেসে রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে মতভেদ ফ্রান্সের অনুকূল হইয়াছিল।

(১) রুশ-ফরাসী মৈত্রী (১৮৯৪)ঃ বিসমার্ক রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে Re-insurance Treaty নামে যে বন্ধুত্বমূলক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন, কাইজার উইলিয়াম তাহা পুনঃপ্রবর্তন করিতে অসম্মত হন। বল্কান অঞ্চলে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে যে স্বার্থ-সংঘাত চলিতেছিল কাইজার উহাতে অস্ট্রিয়াকে সমর্থন করায় রাশিয়া জার্মানীর উপর ক্রমশঃ বিরূপ হইয়া উঠিতেছিল। উপরন্তু অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন ব্যাপারে রাশিয়ার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং এই অর্থ একমাত্র ফ্রান্সই রাশিয়াকে দিতে পারিত। সুতরাং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে রাশিয়ার পক্ষে ফ্রান্সের মিত্রতা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

জার তৃতীয় আলেকজান্ডার সাধারণতন্ত্রী ফ্রান্স সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত মিত্রতামূলক এক সন্ধিতে আবদ্ধ হন। এই সন্ধি Dual Alliance বা দ্বি-শক্তিজোট নামে পরিচিত। এই সন্ধির দ্বারা স্থির হয় যে জার্মানী বা জার্মানীর সমর্থনে ইটালী কর্তৃক আক্রান্ত হইলে রাশিয়া ফ্রান্সের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবে। অপরদিকে রাশিয়া জার্মানী বা জার্মানীর সমর্থনে অস্ট্রিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ফ্রান্স রাশিয়ার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবে। এই সন্ধির ফলে ফ্রান্সের মিত্রহীন অবস্থার অবসান হয়।

(২) **ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি ঃ** (১৯০৪)ঃ দ্বি-শক্তিজোট বলে বলীয়ান হইয়া ফ্রান্স অতঃপর ইংল্যান্ডের সহিত সম্পর্ক উন্নত করিতে সচেষ্ট হইল। বহুবিধ কারণে এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের অন্ত ছিল না। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ড কর্তৃক মিশর অধিকৃত হইলে ফ্রান্স উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল। মধ্য আফ্রিকাতে এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে তীব্র মনোমালিন্য ও সংঘাত চলিতেছিল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সেনাপতি মার্চান্ড (Merchand) উত্তর নীল উপত্যকায় ব্রিটিশ অধিকৃত ফ্যাসোডা (Fashoda) নামক স্থানে ফরাসী পতাকা উত্তোলন করিলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে এক মীমাংসার ফলে ফ্রান্স ফ্যাসোডা সম্পর্কিত দাবিদাওয়া পরিত্যাগ করিয়া আফ্রিকায় ব্রিটিশ প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লয়। এই সময় কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির ফলে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স ক্রমশঃ জার্মানীর প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠিতেছিল। এই অবস্থায় উভয় রাষ্ট্রই পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা কামনা করিয়া ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ইহা Entente Cordiale নামে পরিচিত। এই সন্ধির দ্বারা শ্যাম, মাদাগাস্কার, পশ্চিম আফ্রিকা ও মিশর সম্পর্কিত বিরোধ উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে আপোসে নিষ্পত্তি করিয়া লওয়া হইল। ফ্রান্স মিশরে ইংল্যান্ডের সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করিয়া লইল। রাশিয়াকেও এই চুক্তিতে আবদ্ধ করা হইল এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য, আফগানিস্থান ও তিব্বতে রাশিয়ার 'বিশেষ অধিকার' ইংল্যান্ড কর্তৃক স্বীকৃত হইল। ফলে এই তিন শক্তির মধ্যে (রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড) ত্রি-শক্তি আঁতাত বা Triple Entente গড়িয়া উঠিল।

'Entent Cordiale'-এ রাশিয়ার যোগদান ও 'Triple Entente' গঠন

(৩) **মরক্কো সংকট ঃ** (১৯০৫-১৯১১)ঃ ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বি-শক্তি জোট বা Dual Alliance-এর বলে মরক্কোতে ফ্রান্স যে অধিকার লাভ করিয়াছিল জার্মানী তাহার তীব্র বিরোধিতা করিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম মরক্কোর রাজধানী তাঞ্জিয়ারে (Tangier) আগমন করিয়া ঘোষণা করেন যে তিনি মরক্কোতে জার্মানীর বাণিজ্যিক স্বার্থ সর্বতোভাবে রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ফলে এক অশান্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং ইহার অবসানকল্পে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আলজিসেরাসে

মরক্কোর প্রথম সন্ধি (১৯০৫)

(Algeciras) এক আন্তর্জাতিক বৈঠক আহূত হয়। এই বৈঠকে স্থির হয় যে মরক্কোতে কোনও রাষ্ট্রের একাধিপত্য থাকিবে না এবং সকলের জন্য মরক্কো উন্মুক্ত থাকিবে। কিন্তু মরক্কোর শান্তি রক্ষা করার জন্য ফ্রান্স ও স্পেনকে অধিকার প্রদান করা হয়। প্রকৃতপক্ষে মরক্কোতে ফ্রান্সের প্রতিপত্তি স্বীকৃত হয় এবং অতঃপর ফ্রান্স উহার স্বার্থ সংরক্ষিত করিতে সচেষ্ট হয়। ইহার ফলে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কাইজার আগাদির বন্দরে প্যান্থার নামে একটি গানবোট প্রেরণ করিয়া মরক্কোতে ফ্রান্সের একচ্ছত্র আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সকে সমর্থন করায় জার্মানী অগত্যা ফ্রান্সের সহিত বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে বাধ্য হয়। জার্মানী মরক্কোতে ফ্রান্সের আধিপত্য স্বীকার করিল এবং ইহার বিনিময়ে ফ্রান্স ফরাসী-কঙ্গোর কিছু অঞ্চল জার্মানীকে অর্পণ করিল। এইভাবে আলাপ-আলোচনা দ্বারা মরক্কো সমস্যার সমাধান হইল এবং সাময়িক ভাবে ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হইল।

আলজিসেরাসের সন্ধি (১৯০৬)

মরক্কোর দ্বিতীয় সন্ধি (১৯১১)

মরক্কো সংকটের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব: ইওরোপের আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে মরক্কো সংকটের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৪ খ্রীঃ) রাশিয়ার পরাজয়ের সুযোগে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত ইঙ্গ-ফরাসী দ্বি-শক্তি মৈত্রী (Dual Entente) দুর্বল করিতে, উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিতে এবং মরক্কোতে জার্মানীর আধিপত্য স্থাপন করিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একমাত্র জার্মান-বিরোধী ফরাসী মন্ত্রী ডেলকেসি (Delcasse)-র পদত্যাগ ঘটানো ছাড়া তিনি তাঁহার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।

আলজেসিরাস

জার্মানীর বিরোধিতা সত্ত্বেও ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী অক্ষুণ্ণ রহে। ব্রিটেন ও রাশিয়া উভয়েই ফ্রান্সকে সমর্থন করে। বাগদাদ্ রেলপথ সম্প্রসারণে জার্মানীর প্রচেষ্টায় রাশিয়া বাধা দান করিলে ব্রিটেন রাশিয়াকে সমর্থন করে। ফলে ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যেও সম্পর্কের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। মরক্কো সংকটের ফলে রাশিয়া ব্রিটেনের সহিত যোগদান করিলে দ্বি-শক্তি মৈত্রী ত্রি-শক্তি মৈত্রীতে (Triple Entente) পরিণত হয়।

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের আক্রমণাত্মক মনোভাব এবং আগাদির সমস্যা সম্পর্কে ব্রিটেনের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে তাঁহার অসম্মতি প্রভৃতি কারণে ব্রিটেন ও জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনার উদ্ভব হয়। ইহার ফলে ব্রিটেনের সহিত ফ্রান্সের মৈত্রীবন্ধন আরও দৃঢ় হয়।

আগাদির

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত

১। ফ্রান্সের তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের সমস্যাগুলি কি ছিল? এই সমস্যাগুলির সমাধান কিভাবে করা হইয়াছিল? [উঃ ৩.১, ৩.২]

২। ফ্রান্সের তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের আমলে শিল্প ও বাণিজ্যের কিরূপ প্রসার হইয়াছিল? [উঃ ৩.৬]

৩। ফ্রান্সের তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের ঔপনিবেশিক নীতি কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল? [উঃ ৩.৩]

৪। ফ্রান্সের তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের পররাষ্ট্রনীতির মূল্যায়ন কর। [উঃ ৩.৭]

চতুর্থ অধ্যায়

ইওরোপের অর্থনৈতিক অগ্রগতি
(ঊনবিংশ শতাব্দী)
(Economic Progress in Europe)
(19th Century)

৪.১ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইওরোপের জনসংখ্যা ও নগর-সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যেমন কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রশাসনের পরিবর্তন ঘটে, তেমনি অর্থনৈতিক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই গ্রেটব্রিটেন, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে এই পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের পরে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরী ও রাশিয়ায় এই পরিবর্তন দেখা যায়। সমগ্র ইওরোপে এক নূতন অর্থনৈতিক অগ্রগতির যুগের সূচনা হয়।

সম্পদসৃষ্টির ক্ষেত্রে জার্মানীর সমকক্ষ সেই সময় কেহই ছিল না যদিও পশ্চিমী দেশগুলির অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। লৌহশিল্পের ক্ষেত্রে ১৮৭১ হইতে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্সের উন্নয়ন ছয় শতাংশ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে জার্মানীর লৌহশিল্পের উন্নয়ন ঘটে প্রায় দশ শতাংশ। সার, রাঢ়, আলসাস্-লোরেন প্রভৃতি অঞ্চলের খনিজ সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানী ইওরোপের সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে জার্মানীর পরেই স্থান ছিল যথাক্রমে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের। প্রাক্-বিশ্বযুদ্ধের ইওরোপের অর্থনৈতিক জীবনের সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য ছিল জার্মানীর দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন। ফ্রান্স বিশ্বের বাজারের চাহিদা মিটাইবার পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার উপযোগী পণ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিতেই অধিক ব্যস্ত ছিল। কিন্তু জার্মানী বিদেশে রপ্তানি করার উপযোগী শিল্পজাত সামগ্রী প্রস্তুত করার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল। অর্থাৎ বিশ্বের বাজারে ফ্রান্সের রপ্তানি বিশেষ কিছু ছিল না বলিলেই চলে এবং ইহা ভিন্ন জার্মানীর তুলনায় ফ্রান্সের শিল্পজাত পণ্যসামগ্রীর মানও ছিল নিম্ন। অপরদিকে বিশ্বের বাজারে প্রচুর পরিমাণে উন্নতমানের পণ্যসামগ্রী রপ্তানি করার ক্ষমতা অর্জন করার ফলে জার্মানী ব্রিটেনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। ব্যাংকিং, বীমা ও সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও জার্মানী ব্রিটেনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে নৌ-শক্তি ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে জার্মানী ব্রিটেনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে অবতীর্ণ হয়।

জার্মানীর অগ্রগতি

অর্ধশতাব্দী পূর্বে ব্রিটেনের ন্যায়, জার্মানীও উহার প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী বিদেশ হইতে আমদানি করিত, যদিও যন্ত্রের সাহায্যে চাষ-আবাদ করিয়া জার্মানীর কৃষিজাত সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানী নেদারল্যান্ডস্, ডেনমার্ক ও দানিয়ুব উপত্যকা হইতে খাদ্যসামগ্রী আমদানি করিত। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্ক বাণিজ্য-সংক্রান্ত নীতির পরিবর্তন করিয়া 'সংরক্ষণ-নীতি' গ্রহণ করেন। জমিদার ও শিল্পপতিদের চাপে বিসমার্ক আমদানির উপর শুল্কের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। এই সময়ের মধ্যে বাণিজ্যিক সংরক্ষণ নীতির সমর্থক ফ্রান্সও বৈদেশিক পণ্যসামগ্রীর উপর উচ্চহারে শুল্ক ধার্য করিয়া উহার শিল্প-সংস্থাগুলিকে রক্ষা করিতে প্রয়াসী হয়। এমন কি এই সময়ের মধ্যে ব্রিটেনও উন্মুক্ত বাণিজ্য-নীতি (Free-trade) বর্জন করে। সুতরাং ইওরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলি উন্মুক্ত বাণিজ্য-নীতি বর্জন করিলে ইওরোপের সর্বত্র সংরক্ষণ-নীতির প্রয়োগ শুরু হয়। প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্র এই নীতি গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ শিল্পসংস্থাগুলিকে রক্ষা করিতে যত্নবান হয়। সড়ক, রেল ও জলযানের উন্নয়নের ফলে জার্মানীর অর্থনৈতিক ঐক্য সম্পন্ন হয়। ১৮৭৯ হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রাশিয়ার অধিকাংশ সড়ক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলিয়া আসে। জার্মানীর কয়লা ও লোহের উৎপাদন অভাবনীয় ভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে ইওরোপে লোহ ও ইস্পাত শিল্পে জার্মানী শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। ব্রিটেনের কয়লার উৎপাদন জার্মানীর তুলনায় অধিক ছিল, কিন্তু লোহ ও ইস্পাতের উৎপাদন ছিল অনেক কম। রাঢ়, সার, আলসাস-লোরেন ও সাইলেশিয়ার সুবৃহৎ কলকারখানাগুলি ইওরোপে জার্মানীর সমৃদ্ধি ও ক্ষমতার ভিত্তি রচনা করে। ১৮৮৫ হইতে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জার্মানী অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে এবং জার্মানীর শিল্পগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। বিবিধ উন্নয়নের ফলে জার্মানীর ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ইওরোপের বাজারে জার্মানী ব্রিটেনের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে আবির্ভূত হয়। নৌ-শক্তিতেও জার্মানী ব্রিটেনের পরেই স্থান লাভ করে।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানীর বৈদেশিক ও ঔপনিবেশিক রপ্তানির সামগ্রিক মূল্য ২২ বিলিয়ান ডলারে পৌঁছায়। ব্রিটেনের রপ্তানির মূল্য জার্মানীর তুলনায় কিছু বেশী ছিল। এই সময়ের মধ্যে ফরাসী রপ্তানি-বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ব্রিটেনের অর্ধেক এবং রাশিয়ার ছিল ফ্রান্সের সামগ্রিক রপ্তানির অর্ধেক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পনের বৎসর পূর্বের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ইওরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যের অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ।

এই সময়ের মধ্যে রেলপথের সম্প্রসারণ ইওরোপের অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্স, ইটালী, সুইজারল্যান্ড ও জার্মানীর রেলপথের অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটে। বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস্ ও স্পেনেও রেলপথের বিশেষ সম্প্রসারণ ঘটে। ১৮৯১ ও ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাশিয়া

সাইবেরিয়ান রেলপথের নির্মাণকার্য সম্পন্ন করে। ৩,০০০ মাইলের উপর দিয়া সাইবেরিয়ান রেলপথের চলাচল সেযুগে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং এই রেলপথের কল্যাণে এশিয়ার বহু অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে এবং ইহার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উন্নতি ঘটে।

অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ, শিল্পের সম্প্রসারণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের মূলে ছিল ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। ব্যাংকিং ও অর্থ-বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বার্লিন, লণ্ডন, প্যারিস ও আমস্টার্ডাম-এর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। জার্মানীর অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের মূলে ছিল উহার ব্যাংকিং ব্যবস্থার ও অর্থ-বিনিয়োগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। জার্মানীর ব্যাংক ও অর্থ-বিনিয়োগ সংস্থাগুলি শুধু যে অভ্যন্তরীণ শিল্প-সংস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্যেই অর্থলগ্নী করিয়া সাহায্য করিয়াছিল তাহাও নহে, এই সংস্থাগুলি অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, ল্যাটিন, আমেরিকা, আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চলে অকাতরে অর্থ-বিনিয়োগ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। বৈদেশিক শিল্প-সংস্থা ও বণিককুলকে অর্থসাহায্য করার ব্যাপারে জার্মানীর দোয়েজ ব্যাংক (Deutsche Bank)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এই ব্যাংক-এর বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান হইল বার্লিন-বাগদাদ্ রেলপথের নির্মাণে অর্থসাহায্য দান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী যুগে বার্লিন-বাগদাদ্ রেলপথ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুদূর-প্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল।

ইওরোপের প্রতিটি শিল্পোন্নত দেশগুলিতে যে সকল অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল সেগুলির কার্যতঃ বৃহদাকার কলকারখানা ও মূলধনী সংস্থা গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। বহু উৎপাদনকারী সংস্থা ও শিল্পগুলিকে একত্র করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির ক্ষেত্রে নূতন নজির সৃষ্টি করা হয়। স্বভাবতঃই ক্ষুদ্র কলকারখানাগুলিকে একত্র করিয়াই ইহা করা সম্ভব হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন বৃহদাকার ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠে। এই শিল্পগুলি লৌহপিণ্ডের নিষ্কাশণ হইতে শুরু করিয়া রেল ও বাষ্পীয় জাহাজ-নির্মাণ করার কাজ শুরু করে। ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে জার্মানীতেও বহু বৃহদাকার ইস্পাত ও লৌহ, ইলেক্ট্রিকাল ও রাসায়নিক কারখানা গড়িয়া উঠে। ব্রিটেন, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই, যদিও ফ্রান্সে ক্ষুদ্র শিল্পের অস্তিত্ব বজায় ছিল। ব্রিটেনে ক্ষুদ্র কলকারখানার সঙ্গে বৃহদাকার শিল্প-সংস্থা এই যুগেই গড়িয়া উঠে এবং ব্রিটেনের শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী বিশ্বের বাজারে ছড়াইয়া পড়ে। পশ্চিম ইওরোপের অর্থনীতির ক্ষেত্রে বহু লিমিটেড কোম্পানির পত্তন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পর রাশিয়ায় বৃহদাকার লিমিটেড কোম্পানির পত্তন হয়, বিশেষ করিয়া ধাতুশিল্পের ক্ষেত্রে।

৪.২. ইওরোপের রাজনীতির ক্ষেত্রে শিল্পের প্রভাব : ইওরোপে বৃহদাকার শিল্পের প্রসারের ফলে রাজনীতিতেও উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। ১৮৭১

হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হয়। শিল্প-সংস্থাগুলিকে কেন্দ্রীয়করণের ফলে নূতন কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার উন্মেষ ঘটে। ইওরোপে নূতন অর্থনৈতিক ক্ষমতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস ঘটে। নূতন নূতন শিল্প-সংস্থার আবির্ভাবের ফলে রাজনীতির ক্ষেত্রে শিল্পপতিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে শিল্পপতিদের ভূমিকা গুরুত্ব অর্জন করে। সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদনকারীগণ বিশ্বে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করিয়া সামরিক প্রতিযোগিতার পথ প্রশস্ত করে এবং সমরবাদী মনোভাবে ইন্ধন যোগায়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে গঠিত 'অর্থনৈতিক ঐক্য সংস্থা' (Union of Economic Interests) বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ফরাসী সরকারের উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। রাষ্ট্রীয় কর, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ফ্রান্সের এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে গঠিত 'জার্মান-নৌ-সমবায়' (German Navy League) রাষ্ট্রীয় নীতি গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং ব্রিটেনের নৌ-শক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য এই সংস্থা জার্মানীর নৌ-শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রবল প্রচারকার্য চালাইয়াছিল।

৪.৩. **সমবায় আন্দোলন**ঃ ১৮৭১ হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে ইওরোপের অর্থনৈতিক অগ্রগতির অপর বৈশিষ্ট্য হইল সমবায় সমিতি ও ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রসার। বহু দেশে উৎপাদনকারী ও ক্রেতাগণের সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠে। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে উৎপাদনকারীদের সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্সে সমবায় আন্দোলন বিশেষ প্রসার লাভ করে। ১৮৮০ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্সে সমবায় সংস্থাগুলির সংখ্যা ১০০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫০-এ পেঁছায়। অপরদিকে ব্রিটেনে ক্রেতা-সমবায় আন্দোলন এই সময় জোরদার হইয়া উঠিয়াছিল। এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল দালাল বা ফড়িয়াদের প্রভাব হইতে পাইকারী বাজার মুক্ত রাখা। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর ব্রিটেনে পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয় ক্রেতা-সমবায় সংস্থাগুলির আওতায় আসিয়া পড়ে। এমনকি জীবনবীমা ও ব্যাংকিং-ও ক্রেতা-সমবায় কর্তৃক পরিচালিত:হইতে থাকে। জার্মানীতে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামবার্গ সোসাইটি স্থাপিত হইলে তথায় ক্রেতা-সমবায় আন্দোলন উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ফ্রান্স, ব্রিটেন ও জার্মানীতে সমবায় সমিতিগুলি অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং সেই সঙ্গে কলকারখানায় শ্রমিকদের অংশীদার করার রীতিও ক্রমে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের পর-সমবায় আন্দোলনের গতি স্তিমিত হইয়া যায়।

ইওরোপের অন্যান্য দেশেও নিজেদের অর্থনৈতিক জীবনের চাহিদা অনুসারে সমবায় সংস্থা গড়িয়া উঠে। ডেনমার্ক, ইটালী, ফিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড প্রভৃতি

দেশে কৃষি ও গোশালার ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। একমাত্র ডেনমার্কেই ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল হাজারের ঊর্ধ্বে। ইটালীতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল প্রায় চারিশত। এই সকল দেশের সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে ভোগ্য-সামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয় করার রীতি জনপ্রিয়তা অর্জন করিলে উঁহাদের অর্থনৈতিক সমস্যার কিছুটা সমাধান হইয়া যায়। ইহা ভিন্ন এই সকল দেশে অদক্ষ শ্রমিক ও কারিগরদের সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ঘেণ্ট-এর (Ghent)-এর শ্রমিক-কারিগরগণ সমবায় সমিতি গঠন করিয়া রুটির মূল্য হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

৪.৪. **ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন :** বড় বড় শিল্পপতি ও বণিকদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এই যুগেই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রসার লাভ করে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই পশ্চিম ইওরোপে শ্রমিক আন্দোলনের ঐতিহ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের পর অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের ফলে শ্রমিক আন্দোলন তথা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের আরও সুযোগ আসে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ইওরোপের সর্বত্র ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যথেষ্ট প্রসারলাভ করিয়াছিল। বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক সংগঠন গড়িয়া তোলা খুবই সহজ হইয়াছিল। এই সকল সংগঠনের মাধ্যমে শ্রমিকগণ শিল্পপতিদের নিকট হইতে সংঘবদ্ধভাবে নানা সুযোগ-সুবিধা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই যুগেই গণতন্ত্রের আদর্শের প্রসারের ফলে শ্রমিক-উন্নয়নমূলক আইন রচিত হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া ও জার্মানীতে ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক-সংঘগুলি আইনের স্বীকৃতি লাভ করে।

৪.৫. **ধনতন্ত্রবাদের প্রসার :** ১৮৭১ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইওরোপে ধনতন্ত্রবাদের ব্যাপক প্রসার ঘটে। বড় বড় শিল্প-সংস্থার প্রতিষ্ঠা, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং মূলধনের অভূতপূর্ব যোগান প্রভৃতি কারণে ধনতন্ত্রবাদের প্রসার ঘটে। কিন্তু সেই সঙ্গে সুগঠিত শ্রমিকসংঘেরও প্রসার ঘটে। ফলে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের সহিত শ্রমিক-সংঘগুলির সংঘর্ষেরও সূত্রপাত হয়। এই সংঘর্ষের ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে অশান্তি ও অনিশ্চয়তা নামিয়া আসে এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মন্দার সৃষ্টি হয়। এই সময়ের মধ্যে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, নেদারল্যাণ্ডস্, সুইডেন—শ্রমিক-বিক্ষোভের ফলে কলকারখানা বন্ধ হইয়া যায় এবং অর্থনৈতিক মন্দা তীব্র আকার ধারণ করে। তথাপি এই যুগে বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, বিশ্বব্যাপী বাজারের প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বব্যাপী মূলধনের বিনিয়োগের ফলে ইওরোপের সমাজব্যবস্থা নূতন ভাবে গড়িয়া উঠে।

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত

১। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইওরোপের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ ৪.১.]

২। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জার্মানীর অর্থনৈতিক অগ্রগতি কিরূপ হইয়াছিল ? উদাহরণ দিয়া দেখাও। [উঃ ৪. ১.]

৩। ইওরোপের রাজনীতির ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের প্রভাব কিরূপ হইয়াছিল ? [উঃ ৪. ২.]

৪। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইওরোপে ধনতন্ত্রবাদের প্রসারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ ৪.৫.]

পঞ্চম অধ্যায়

বিশ্বে ইওরোপের বিস্তৃতি

(Europeanisation of the World)

৫.১. **বিশ্ব-রাজনীতির যুগ ঃ** এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর অপরাপর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হইল ইওরোপের বাহিরে ইওরোপের বিস্তৃতি। ("One of the principal features of the 19th century has been the Europeanisation of the world on a large scale")। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে কলম্বাস, ভাস্কো-ডা-গামা প্রমুখ নাবিক ও আবিষ্কারকের প্রচেষ্টায় বিশ্বের ভৌগোলিক আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছিল। তাহার ফলে পঞ্চদশ শতক হইতে ইওরোপের বহির্ভূত দেশগুলির ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে ইওরোপের প্রতিপত্তি ও প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পর্তুগাল, স্পেন, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড—ইওরোপের বহির্ভূত অঞ্চলের উপর ক্রমশঃ আধিপত্য বিস্তারে যত্নবান হয়। ভৌগোলিক আবিষ্কার ও সামুদ্রিক পথের উন্নতির ফলে জগতের কোন অংশই আর ইওরোপ হইতে দূরে রহিল না, বরং লণ্ডন, প্যারিস ও বার্লিন বিশ্বের নাভিকেন্দ্র স্বরূপ হইয়া উঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্বেতজাতিসমূহ বিশ্বের অনুন্নত ও দুর্বল দেশগুলিকে সামরিক শক্তির সাহায্যে একের পর এক গ্রাস করিতে থাকে। এমন কি প্রাচীন সভ্যতার দেশগুলিও ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সাম্রাজ্যিক লিপ্সা হইতে রক্ষা পায় নাই। আফ্রিকা ও চীন বণ্টনের ব্যাপার লইয়া ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের তীব্র কামনা পরিস্ফুট হইয়াছিল। ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি সাম্রাজ্যবিস্তারের পক্ষে ইওরোপ পর্যাপ্ত নহে এবং সপ্তদশ শতাব্দী হইতে 'ইওরোপীয় ইতিহাস' ও 'ইওরোপীয় রাজনীতি' প্রভৃতি শব্দের অর্থ বৃহত্তর হয়। ইওরোপের ইতিহাস ইওরোপ মহাদেশের মধ্যেই আর সীমাবদ্ধ রহিল না। বিশ্বের যে সকল অঞ্চল ইওরোপীয় শক্তিবর্গের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল তাহা ইওরোপীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠাভুক্ত হইল। ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও শুধু ইওরোপে সীমাবদ্ধ রহিল না ; ইহা বিশ্বে সুদূর অঞ্চলে বিশেষ করিয়া আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে স্থানান্তরিত হয়। ইওরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের বৈদেশিক নীতি বিশ্ব-রাজনীতিতে রূপান্তরিত হয় এবং সমগ্র বিশ্বই কূটনীতির মঞ্চে পরিণত হয়। এককথায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বিশ্ব-রাজনীতির যুগ সূচিত হয় এবং পরবর্তী কালে ক্রমশঃ সমগ্র বিশ্বই ইওরোপীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হয়।

ভৌগোলিক আবিষ্কার ও সামুদ্রিক পথের উন্নতির ফল

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'সাম্রাজ্যবাদ' শব্দের প্রচলন শুরু হয়, এবং

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী যুগকে 'সাম্রাজ্যবাদী যুগ' বলা হয়। সাম্রাজ্যবাদ-নীতির প্রবল সমালোচক হবসন্ (J. A. Hobson) সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক কারণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবর্তে অর্থবিনিয়োগই হইল সাম্রাজ্যবাদের মূল কারণ। তাঁহার মতে উপনিবেশ গঠনের অর্থই হইল মূলধনের ব্যাপক বিনিয়োগ এবং এই বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে লাভ করা যাহা স্বদেশে সম্ভব ছিল না। প্রকৃতপক্ষে পুঁজিপতিদের বিশেষ স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতেই সাম্রাজ্যবাদী-নীতির ব্যাখ্যা করা চলে। ইহা অনস্বীকার্য যে উপনিবেশ স্থাপনের মূলে ইওরোপীয় দেশগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মূলধনের অধিকতর লাভজনক বিনিয়োগ। লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে ধনতন্ত্রবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় (Imperialism, the highest stage of Capitalism) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইওরোপীয় দেশগুলির উপনিবেশ স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল নূতন নূতন বাজারের আবিষ্কারের পরিবর্তে মূলধনের ব্যাপক বিনিয়োগ করা। লেনিন ধনতন্ত্রবাদকেই সাম্রাজ্যবাদের পরিণতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

'সাম্রাজ্যবাদ' শব্দের উৎপত্তি

৫. ২. ইওরোপের বাহিরে ইওরোপীয় দেশগুলির উপনিবেশ বিস্তার ঃ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগাল, স্পেন, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি বাণিজ্য ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তারকল্পে পৃথিবীর নানা স্থানে গমন করিয়াছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের উৎসাহ কতকটা হ্রাস পায়। ইহার কারণ এই সকল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলি বহুক্ষেত্রে ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়া উঠিয়াছিল। এই শতাব্দীতে ইংল্যান্ড তাহার আমেরিকা মহাদেশস্থ উপনিবেশগুলি হারায় (১৭৮৩ খ্রীঃ)। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রেজিল পর্তুগালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করে। এই সকল ঘটনা সাময়িকভাবে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনাকে কতক পরিমাণে দমন করে। ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির উপনিবেশ স্থাপনে অমনোযোগ প্রসঙ্গে ডিজরেলী মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, "এই সকল ভগ্নপ্রায় উপনিবেশগুলি আমাদের স্কন্ধে বোঝাস্বরূপ এবং কিছুদিনের মধ্যেই ইহারা স্বাধীনতা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে।" অধিকন্তু এ্যাডাম স্মিথের 'লেইসেজ-ফেয়ার' (Laissez faire) নীতি ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে উপনিবেশ স্থাপনে নিরুৎসাহ করে।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পোন্নতির ফলে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে সাম্রাজ্যবিস্তারকল্পে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। নেপোলিয়নের পতনের পর হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী কালের মধ্যে আমেরিকার পশ্চিমার্ধে, আফ্রিকার উপকূলভাগে এবং অস্ট্রেলিয়ার সর্বত্র দ্রুতগতিতে ইওরোপের অধিকার বিস্তার লাভ করে। এই সকল

অঞ্চলে শুধু ইওরোপীয় শক্তিবর্গের রাজনৈতিক অধিকার স্থাপিত হয় এমন নহে, ইওরোপীয় সভ্যতা এবং ভাবধারাও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহির্জগতে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের বিস্তারের একাধিক কারণ ছিল :

(১) **অর্থনৈতিক কারণ :** শিল্প-বিপ্লবের ফলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির যথেষ্ট পরিবর্তন আসে। কলকারখানা স্থাপিত হইলে কৃষি ও কুটিরশিল্প বিনষ্ট হয়, সর্বত্র বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি পায়। সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাভাবও যেভাবে দেখা দেয় তাহাতে ইওরোপের একাধিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিপন্ন হইয়া উঠে। অপরদিকে শিল্প-বিপ্লব যানবাহনের উন্নতিসাধন করিলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে দ্রুতগতির সৃষ্টি হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে চালিত হয়। কলকারখানা স্থাপিত হইলে কাঁচামালের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশ ইহার উৎপন্নক্ষেত্র হয়। উপরন্তু কলকারখানায় যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হইতে লাগিল সেগুলির বিক্রয়ের জন্য বৃহত্তর বাজারের প্রয়োজন হয়। সুতরাং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যসমস্যার সমাধানকল্পে, কাঁচামাল সংগ্রহ ও বৃহত্তর বাজারের প্রয়োজনকল্পে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি উপনিবেশ বিস্তারের নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ১৮৭০ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এই মনোভাব প্রকটভাবে দেখা দেয়। বৃহত্তর বাজার ও মূলধন বিনিয়োগের উজ্জ্বল সম্ভাবনায় উহাদের দৃষ্টি আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে নিবদ্ধ হয়। এই ধরনের অর্থনৈতিক বিস্তার পরবর্তী কালে রাজনৈতিক অধিকার বিস্তারের সহায়ক হয়।

(২) **রাজনৈতিক কারণ :** ইওরোপের যে সকল রাষ্ট্রের বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্য ছিল তাহাদের পক্ষে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক দুরবস্থা, রাজনৈতিক আন্দোলন ও বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি হেতু ইওরোপের বহুসংখ্যক অধিবাসী গৃহ, খাদ্য ও কর্মসংস্থান উপলক্ষে অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় গমন করে। ইহা যে জাতির সামরিক ক্ষতি তাহাও ইওরোপীয় দেশগুলি উপলব্ধি করে। সুতরাং দেশের সামরিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রাষ্ট্রগুলি উপলব্ধি করে। জার্মানী ও ইটালী সাম্রাজ্যবাদের সপক্ষে এই যুক্তিই উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, অনুন্নত দেশের অধিবাসীগণকে উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির কাজে নিযুক্ত করার সম্ভাবনাও যথেষ্ট ছিল। সাম্রাজ্যবিস্তারের সপক্ষে ফ্রান্স এই শেষোক্ত যুক্তি গ্রহণ করিয়াছিল। কারণ একদিকে ক্রমক্ষীয়মান জনসংখ্যা ও অপরদিকে জার্মানীর জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি ফ্রান্সকে আতঙ্কিত করিয়াছিল।

(৩) **উপনিবেশ জাতীয় গৌরবের মানদণ্ড :** রাষ্ট্রীয় মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যও উপনিবেশ বিস্তারের প্রয়োজন ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি উপলব্ধি করে। জার্মানী ও ইটালীতেই প্রধানতঃ এইরূপ মনোবৃত্তি প্রবল হইয়া দেখা দেয়। জাতীয় ঐক্য

অর্জনের পর এই দুই দেশ বিশ্বরাষ্ট্রের মর্যাদালাভের জন্য অত্যধিক আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে। ইহা অনস্বীকার্য যে এই দুইটি রাষ্ট্রের এইরূপ মনোভাবের জন্যই উপনিবেশবিস্তার লইয়া ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। সর্বত্রই জাতীয়তাবাদ উগ্র হইয়া উঠিল এবং স্বদেশ-প্রীতি 'সাম্রাজ্যগঠন'-প্রীতিতে পরিণত হয়।

(৪) **ধর্মনৈতিক কারণ :** খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের আগ্রহ চার্চের এক প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল। ধর্মপ্রচারের মধ্য দিয়া অনেক দেশের সহিত ইওরোপের বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বাণিজ্য-সম্পর্ক কালক্রমে রাজনৈতিক সম্পর্কে পরিণত হয়। চীন ও আফ্রিকায় এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। পৃথিবীর অনুন্নত জাতিসমূহের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিলে জনকল্যাণ সাধিত হইবে এইরূপ মনোভাব লইয়াও ইওরোপের একাধিক রাষ্ট্র উপনিবেশ স্থাপনে মনোযোগী হয়। সকল যুগেই খ্রীষ্টান চার্চের লক্ষ্য ছিল বিশ্বে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচার করা। বিদেশী ধর্মপ্রচারক বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলিতে আগমন করিলে উহাদের নিরাপত্তার জন্য ধর্মপ্রচারকদের নিজনিজ দেশের সরকারের হস্তক্ষেপ অনিবার্য হইয়া দেখা দেয়। আফ্রিকাও দক্ষিণ-সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জগুলিতে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের পথ অনুসরণ করিয়া প্রথমে খ্রীষ্টান বণিক ও পরে খ্রীষ্টান সৈন্যবাহিনীর আগমন ঘটে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে অনুন্নত জাতিগুলিকে সুসভ্য করিয়া তুলিবার আগ্রহ ছিল বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শেষ পর্যন্ত ইওরোপীয় শাসনাধীন অনুন্নত জাতিগুলির উপর ইওরোপীয় প্রশাসকদের অকথ্য অত্যাচার খ্রীষ্টান মিশনারীদের মহৎ উদ্দেশ্য কলঙ্কিত করে। যাহা হউক ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকগণ সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক হয়।

৫.৩. ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির উপনিবেশ বিস্তার : উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে উপনিবেশ স্থাপনের তেমন আগ্রহ দেখা যায় নাই। বরং স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি প্রাচীন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। ফ্রান্স সেন্ট লরেন্স ও মিসিসিপি রাজ্য হারাইল এবং ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ভারতবর্ষের কয়েকটি স্থান ছাড়া ফ্রান্সের উপনিবেশ বলিতে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। একমাত্র ইংল্যান্ডই তাহার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বজায় রাখিয়া উত্তরোত্তর আয়তন বৃদ্ধি করিতেছিল। ১৭৮৩ হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই যুগকে উপনিবেশ বিস্তারে ইংল্যান্ডের একাধিপত্যের যুগ বলা যায়।

বিশ্বের দুইটি অঞ্চলে ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নগ্নতা বিশেষভাবে প্রকটিত হয়, যথা—এশিয়া ও আফ্রিকা। দাসত্ব হইতে মুক্ত নিগ্রো দাসদের পুনর্বাসনের জন্য সৃষ্ট লাইবেরীয়ার ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র ভিন্ন আফ্রিকা মহাদেশ ইওরোপীয় শক্তিগুলির নিকট বণ্টিত হইয়া যায়। প্রাচীন আবিসিনীয় বা

ইথিওপিয়া সাম্রাজ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত কোনও মতে স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিবাদী সাম্রাজ্যবাদের শোষণের কবলিত হয়। এশিয়া ভূখণ্ডে ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রচণ্ডভাবে দেখা দেয়। উত্তরে রাশিয়া উরাল পর্বতমালা হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত এক বিরাট ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলে এবং দক্ষিণে ব্রিটেন ভারতে ও ব্রহ্মদেশে উহার সাম্রাজ্যবিস্তার করে এবং ফ্রান্স ইন্দোচীনের এক বৃহদংশ কুক্ষিগত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ইওরোপীয় শক্তিবর্গ চীন সাম্রাজ্যের বহু অঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করে। কিন্তু জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া (১৯০৪-৫) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের অগ্রসর রোধ করিতে সমর্থ হয় এবং জাপান এশিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা করে। পারস্য ও মধ্য-এশিয়া ইওরোপীয়দের প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত হয়।

আফ্রিকা ও এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের নগ্নতা

ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশঃ আমেরিকার উপনিবেশগুলি হারাইলেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের আয়তন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৭৮৩ হইতে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে হল্যাণ্ড, স্পেন ও পর্তুগালের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য যখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, সেই সময় ইংল্যাণ্ড তাহার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে যত্নবান হয়। সপ্তদশ শতকে ডাচ আবিষ্কারকগণ সর্বপ্রথম অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের প্রতি সভ্যজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও ইওরোপের কোন রাষ্ট্রই তথায় উপনিবেশ স্থাপনে বিশেষ সাফল্য লাভ করে নাই। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ইংরাজ নাবিক ও আবিষ্কারক ক্যাপ্টেন কুক (Capt. Cook) একাধিকবার সমুদ্রযাত্রা করিয়া অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড আবিষ্কার করেন। অধিকন্তু তিনি অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল আবিষ্কার করিয়া 'বোটানী হ্রদে' (Botany Bay) সর্বপ্রথম ব্রিটিশ পতাকা উত্তোলন করেন। এইস্থলে ইহাও স্মরণযোগ্য যে বিদ্রোহের পূর্বে আমেরিকা ইংরাজ অপরাধীগণের নির্বাসন-ক্ষেত্র রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু আমেরিকার উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে অপরাধীগণকে অন্যত্র চালান করার এক সমস্যা দেখা দেয়। ঠিক এই সময় ক্যাপ্টেন কুক অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নয়টি জাহাজপূর্ণ ইংরাজ অপরাধীগণকে সর্বপ্রথম এই নূতন আবিষ্কৃত অঞ্চলে পাঠান হয়। প্রথম অবস্থায় অস্ট্রেলিয়া বাসস্থানের উপযুক্ত ছিল না, কিন্তু গভর্নর ম্যাকয়ার-এর প্রচেষ্টায় রাস্তাঘাট, চার্চ ও সেতু নির্মাণ এবং কৃষি ও মেষপালনের প্রভূত উন্নতিসাধন হইলে অস্ট্রেলিয়া বাসস্থানের উপযোগী হইয়া উঠে। পরে ছয়টি উপনিবেশ স্থাপিত হইলে সমগ্র অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

অস্ট্রেলিয়া

নিউজিল্যাণ্ডেও ইংরাজ উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এই কার্যের প্রধান উদ্যোক্তা

ছিলেন ওয়েকফিল্ড (Wakefield)। তাঁহার নেতৃত্বে বহু ইংরাজ এই স্থানে বসবাস আরম্ভ করে এবং ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কানাডার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কুইবেক সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং ইহার অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল ফরাসী; সুতরাং স্বভাবতঃই ইহারা ছিল ব্রিটিশ-বিদ্বেষী। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে কুইবেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কানাডা সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সন্নিকটে অবস্থিত থাকায় ইহা আমেরিকার প্রভাবাধীন হইতে পারে এই আশংকায় ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড নর্থ কুইবেক এ্যাক্ট পাস করিয়া কুইবেকের জনসাধারণকে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। কিন্তু কানাডার ইংরাজ ও ফরাসী অধিবাসীগণের মধ্যে সর্বদাই বিরোধ লাগিয়া থাকিত। এই বিরোধের সুযোগ লইয়া আমেরিকা তথায় আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে এই আশংকায় ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে কানাডা এ্যাক্ট পাস করাইয়া ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কানাডাকে দুইভাগে বিভক্ত করে। ফরাসী অধিবাসী অধিকৃত অঞ্চলকে বলা হইল নিম্ন-কানাডা (Lower Canada) ও ইংরাজ অধিবাসী অধিকৃত অঞ্চলকে বলা হইল উচ্চ-কানাডা (Upper Canada)। অধিকন্তু এই দুই অংশে পার্লামেণ্টারী শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তিত হইল। কিন্তু এই ব্যবস্থা কানাডাবাসীগণের মনঃপূত হয় নাই এবং মহারানী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন লাভের অব্যবহিত পরে তাহারা বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ দমনের পর লর্ড ডারহামের রিপোর্ট অনুসারে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কানাডার উভয় অংশকে একত্র করিয়া একটি অখণ্ড রাষ্ট্র গঠন করা হয় এবং উহাকে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রদান করা হয়। অবশেষে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কানাডা ডোমিনিয়নের মর্যাদা লাভ করিয়া পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার পায়।

নিউজিল্যাণ্ড

কানাডা

কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া হইতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে এই সময় ভারতবর্ষও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্তির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিল। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার ন্যায় ভারতবর্ষে ইংরাজ অপরাধীগণের নির্বাসনের কোন সমস্যা বা শাসনতান্ত্রিক সমস্যার উদ্ভব হয় নাই। দুইশত বৎসর ধরিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু বণিকদের হস্তে ভারতের শাসনভার ছাড়িয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া ১৭৭৩ ও ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে নর্থের রেগুলেটিং এ্যাক্ট ও পিটের ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট রচনা করিয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কোম্পানীর রাজ্যে গভর্নর ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত করার ও রাজনৈতিক ব্যাপার পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। প্রথম অবস্থায় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতে সাম্রাজ্যবিস্তারের নীতির বিপক্ষে ছিল এবং যেটুকু সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা কোম্পানীর ভারতস্থ কর্মচারীগণের দায়িত্ব ও প্রচেষ্টার ফলে হইয়াছিল।

ভারত

পলাশী (১৭৫৭ খ্রীঃ) ও বক্সারের যুদ্ধের (১৭৬৪ খ্রীঃ) ফলে ভারতবর্ষে ইংরাজদের অধিকার ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে থাকে। পরবর্তী একশত বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্যের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃত্বের অবসান ঘটে ও ভারতের শাসনভার ইংল্যাণ্ডের রানী ও পার্লামেণ্টের হস্তে অর্পিত হয়। ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়া তাহা ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে।

দক্ষিণ-আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের পর কেপ-অফ-গুড-হোপ-এ ইংরাজ আধিপত্য স্থাপিত হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইহাই সর্বাধিক প্রাচীন ইংরাজ অধিকৃত অঞ্চল। অতঃপর ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে নাটাল ও ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অরেঞ্জ-রিভার (Orange river) কলোনী ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে পশ্চিমে অরেঞ্জ-রিভার হইতে পূর্বে নাটাল পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সিংহল, ব্রহ্মদেশের উপকূল অঞ্চল, সিঙ্গাপুর, মালাক্কা প্রভৃতি স্থান দখল করায় ইংল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তারের পথ প্রশস্ত হয়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ফিজী দ্বীপপুঞ্জ দখল করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে।

হল্যাণ্ডের উপনিবেশ

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাভা দ্বীপপুঞ্জ দখল করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। উহাদের শাসনাধীনে জাভার জনসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। ওলন্দাজগণ প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করিয়া জাভার অর্থনৈতিক জীবনে রূপান্তর ঘটায়।

আমেরিকার উপনিবেশ

ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতায় আমেরিকাও যোগ দেয়। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের সহিত আমেরিকার স্বার্থ জড়িত ছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে সামোয়া দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার দখলে চলিয়া যায়। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সামোয়া দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকা ও জার্মানীর মধ্যে ভাগ হইয়া যায়। ইহার পর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার দখলে চলিয়া যায়। কিছুদিনের মধ্যে গুয়াম ও ক্যারোলাইন দ্বীপপুঞ্জ দখল করে। প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপ আমেরিকার এক বিশাল নৌ-ঘাঁটিতে পরিণত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জগুলি একে একে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলিও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দখলে চলিয়া যায়। ইহার পর দক্ষিণ-আমেরিকায় ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি উপনিবেশ বিস্তারে উদ্যোগী হয়। অনেক পূর্বেই ইওরোপের মূলধন দক্ষিণ-আমেরিকায় নিয়োজিত করা হইয়াছিল এবং ইওরোপের বহু লোক তথায় স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করিয়াছিল। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মনরো-নীতি (Monroe

Doctrine) প্রয়োগ করিয়া দক্ষিণ-আমেরিকায় ইওরোপীয়দের উপনিবেশ স্থাপন নিষিদ্ধ করিয়া দেয়। তথাপি দক্ষিণ-আমেরিকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের অবদান ছিল সর্বাধিক।

ফ্রান্সের উপনিবেশ : অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। সেণ্ট-লরেন্স ও মিসিসিপি ফ্রান্সের হস্তচ্যুত হয়। ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা বিনষ্ট হয়। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে আরও কিছু রাজ্য ফ্রান্সকে হারাইতে হয়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কয়েকটি দ্বীপ, দক্ষিণ-আফ্রিকার কতকগুলি অঞ্চল এবং ভারতবর্ষের কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বলিতে আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজত্বকালে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ নূতন উদ্যম লাভ করে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার অন্তর্গত আলজিয়ার্স অঞ্চল ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হয়। অতঃপর আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল এবং সেনেগল অঞ্চল ফরাসী সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের পর আনাম, কম্বোজ, টনকিন প্রভৃতি অঞ্চলের উপর ফ্রান্সের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। ইহা ছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত নিউ-কেলিডোনিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জ ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হয়। সুতরাং ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে ফ্রান্সও অনগ্রসর ছিল না।

রুশ উপনিবেশ : ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে এশিয়া ভূখণ্ডে রাশিয়ার বিস্তৃতি ছিল সর্বাধিক। ইওরোপ মহাদেশের ন্যায় এশিয়া ভূখণ্ডে রাশিয়ার লক্ষ্য ছিল সমুদ্রের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলে ইওরোপে রাশিয়ার সম্প্রসারণের পথ রুদ্ধ হইলে রাশিয়া এশিয়ার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে রাশিয়া দক্ষিণে পারস্য ও আফগানিস্থান এবং পূর্বে চীনের দিকে সম্প্রসারণে প্রয়াসী হয়। দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া রাশিয়া কাস্পিয়ান সাগরীয় অঞ্চল দখল করিয়া ভারত-সীমান্তে আসিয়া পৌঁছায়। রুশ-সাম্রাজ্যের অগ্রগতির ফলে ব্রিটেনের ভারতীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিপন্ন করিয়া তোলে এবং ফলে ইঙ্গ-রুশ সম্পর্কে সংকটের উদ্ভব হয়। সাইবেরিয়াকে কেন্দ্র করিয়া রাশিয়া ককেসাস অঞ্চল, মধ্য-এশিয়া এবং তুর্কীস্থানে নিজ প্রতিপত্তি বিস্তার করে। রাশিয়ার প্রতি আফগানিস্থানের মৈত্রীভাব ব্রিটেনের অস্বস্তির কারণ হইয়া উঠে এবং পরিশেষে ইঙ্গ-আফগান-যুদ্ধ সংঘটিত হয় (১৮৭১-৭৯)। আফগান সিংহাসনে ব্রিটেনের সমর্থনপুষ্ট এক আমীরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্রিটেন ভারতের দিকে রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-রুশ কনভেনশন বা চুক্তি সম্পন্ন হইলে ভারতীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা সম্বন্ধে ব্রিটেন নিশ্চিন্ত হয়।

কিন্তু পূর্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে রাশিয়ার সম্প্রসারণ অত্যন্ত সহজেই হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীন সাম্রাজ্যে তাই-পিং বিদ্রোহ এবং

চীনের সহিত ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সংঘর্ষের সুযোগে রাশিয়া চীনের সহিত আইগুণ-সন্ধি (Treaty of Aigun, 1858) সম্পাদিত করে। ইহার শর্তানুসারে আমুর নদী পর্যন্ত চীনের এক ভূখণ্ড রাশিয়া লাভ করে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে ভ্লাডিভস্টক নামে একটি নৌ-বন্দরের প্রতিষ্ঠা করিয়া কোরিয়ার সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার ফলে জাপানের সহিত রাশিয়ার সংঘর্ষের সূচনা হয় এবং রাশিয়া সুদূর-প্রাচ্য সমস্যার এক অন্যতম কারণ হইয়া উঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া ইওরোপের অন্যতম ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে।

রুশ-সাম্রাজ্যের অগ্রগতির ফলে ইংল্যাণ্ডের ভারতীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয় এবং ইহার ফলে নানাপ্রকার জটিলতার সৃষ্টি হয়। অবশেষে ইংল্যাণ্ড আফগানিস্থানের উপর আপন প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবর্ষের অভিমুখে রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিহত করে। কিন্তু উত্তর দিকে রাশিয়ার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য উরাল পর্বতমালা হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

৫.৪. **ঔপনিবেশিক বিস্তারের ফলাফল** (Consequences of Colonial Expansion) ঃ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইওরোপীয় শক্তিগুলি উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ইওরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রবর্তন করে।

দক্ষিণ-আফ্রিকা, আমেরিকা, সাইবেরিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় ইওরোপীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইলে এই সকল অঞ্চলে ইওরোপের সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ-আফ্রিকার নিবাসীর অধিকাংশই ছিল ইওরোপীয়ান ও যাহাদের মাতৃভাষা ছিল ইংরাজী। কিন্তু এই সকল অঞ্চলে স্থানীয় অধিবাসীরাও ছিল যেমন নিগ্রো, ভারতীয়, মাওরি ইত্যাদি যাহারা কালক্রমে ইওরোপীয়দের ভাষা, সংস্কৃতি ও আচার-আচরণ শিখিয়া ইওরোপীয়ান ভাবাপন্ন হইয়া উঠে। উহারা খ্রীষ্টধর্মও গ্রহণ করে।

ইওরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার

অপরদিকে এশিয়া ও উত্তর-আফ্রিকায় ইওরোপীয় সভ্যতা জোর করিয়া চালাইয়া দেওয়া হয়। কারণ ভারত, চীন ও মিশরের সভ্যতা অতি প্রাচীন এবং পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিবার বহুকাল পূর্বেই এই সকল অঞ্চল ছিল উন্নতমানের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। এই সকল অঞ্চলে ইওরোপীয় সভ্যতা প্রবর্তন করা হইলেও উহাদের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ এই সকল অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিয়া কিছু লোককে ধর্মান্তরিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিবার ফলে এই সকল অঞ্চলের জনগণের সামাজিক আচার-আচরণ ও রাজনৈতিক আদর্শের বিবর্তন ঘটে। ভারতে 'সতী-দাহ'-প্রথার মূলে ছিল পাশ্চাত্যের প্রভাব।

ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির উপনিবেশ বিস্তারের মূলে ছিল শিল্প-বিপ্লব। মাতৃভূমির

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই উপনিবেশগুলিকে শোষণ করা হইয়াছিল। অবশ্য কোন কোন উপনিবেশে বড় বড় শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থানীয় জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত করা হইয়াছিল। ইওরোপের উদ্বৃত্ত মূলধন উপনিবেশগুলিতে নিয়োজিত করা হইয়াছিল।

অর্থনৈতিক শোষণ

ইওরোপের বাহিরে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তারের ফলে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত দেখা দেয়। মিশর ও সুদানের ব্যাপারে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ প্রায় অনিবার্য হইয়া দেখা দেয়। ফরাসীরা টিউনিস দখল করিলে ইটালীর সহিত ফ্রান্সের বিবাদ শুরু হয়। মধ্য-এশিয়ায় ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র আকার ধারণ করে। সুদূর-প্রাচ্যে রাশিয়ার অগ্রগতি জাপানের পক্ষে অসহ্য হইয়া ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয় (১৯০৪-৫ খ্রীঃ)। মরক্কোর ব্যাপার লইয়া জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে তীব্র বিবাদের সূত্রপাত হয়।

ঔপনিবেশিক সংঘাত

৫.৫. আফ্রিকায় ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির উপনিবেশ বিস্তার : সমুদ্র-পরিবেষ্টিত ও অরণ্যানীমণ্ডিত এক বিচিত্র মহাদেশ এই আফ্রিকা। অভ্যন্তরস্থিত বিশাল মালভূমি, নিবিড় অরণ্য, ঊষর মরুভূমি, দুর্গম পর্বতরাজি এবং দুরন্ত নদী ও জলপ্রপাত এই মহাদেশটিতে এক মনোরম প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য দিয়াছে। আফ্রিকা মহাদেশে সাম্রাজ্য প্রসারের ইতিহাস অতি চমকপ্রদ। আফ্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অনুসৃত সাম্রাজ্যবাদ নীতি প্রকট হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে আফ্রিকা ইওরোপের অগোচরেই ছিল। অবশ্য আফ্রিকার উত্তর সীমান্তের মিশরীয় এবং কার্থেজীয় সভ্যতা প্রাচীন কাল হইতেই অনেকের নিকট সুবিদিত ছিল। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক হইতে অন্যান্য মহাদেশ অপেক্ষা আফ্রিকা ইওরোপের সর্বাধিক নিকটবর্তী। কিন্তু আফ্রিকা বহুদিন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত মহাদেশ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যে সকল জাতি আফ্রিকার সংস্পর্শে আসিয়াছিল তাহাদের অধিকার উপকূলভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরভাগ অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত ছিল অজ্ঞাত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাই আফ্রিকা মহাদেশকে বলা হয় 'অন্ধ মহাদেশ' (Dark Continent)। উত্তরে ফ্রান্সের দখলে ছিল আলজেরিয়া ও দক্ষিণে ইংল্যাণ্ডের দখলে ছিল বুয়র (Boer) রাষ্ট্র ও কেপ্-কলোনী। টিউনিস ও ট্রিপোলী তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত আফ্রিকা সমগ্রভাবে অনাবিষ্কৃত ছিল।

আফ্রিকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নানা কারণে আফ্রিকা সম্বন্ধে ইওরোপের আগ্রহ দেখা দেয়। নেপোলিয়ন কর্তৃক মিশর অধিকার এবং পরবর্তী কালে ইংল্যাণ্ড কর্তৃক মিশর হইতে ফরাসী সৈন্য বিতাড়ন প্রভৃতি ব্যাপারে আফ্রিকার গুরুত্ব ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি উপলব্ধি করে। ইংল্যাণ্ডে দাস-ব্যবসা বন্ধ হইলে খ্রীষ্টান মিশনারীগণ আফ্রিকায় আসিয়া দাস-প্রথার বিরুদ্ধে এবং

আফ্রিকার গুরুত্ব

খ্রীষ্টধর্মের সপক্ষে প্রচারকার্য আরম্ভ করেন। আফ্রিকা সম্বন্ধে ইওরোপের ঔৎসুক্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু মনরো-নীতি অনুযায়ী দক্ষিণ-আমেরিকায় ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবিস্তারের পথ রুদ্ধ হওয়ায় সকলের দৃষ্টি অতঃপর আফ্রিকার উপর নিবদ্ধ হয়।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে স্পেক, লিভিংস্টোন, স্ট্যানলী প্রমুখ অভিযাত্রী ও ধর্মপ্রচারকদের অনুসন্ধিৎসার ফলে এবং তাঁহাদের দ্বারা প্রচারিত আফ্রিকা অভিযানের বিচিত্র কাহিনী ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে এক উদ্দীপনার সঞ্চার করে এবং ইহারই ফলস্বরূপ অবিলম্বে আফ্রিকায় বাণিজ্যকেন্দ্র ও উপনিবেশ স্থাপনের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। প্রথমদিকে আফ্রিকার ভাগাভাগি লইয়া ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোনও যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয় নাই, সকল ক্ষেত্রেই বিবাদ-বিসম্বাদ আপোসের দ্বারা মীমাংসিত হয়।

আফ্রিকা বিভাগ (Partition of Africa) ঃ আফ্রিকার বণ্টন ব্যাপারে দুইটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, এই উপলক্ষে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোনও যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। সকল ক্ষেত্রেই বিবাদ আপোসের মাধ্যমেই মীমাংসিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এই বণ্টনকার্য ধীরে ও ক্রমাগ্রগতিতে সম্পাদিত হয় নাই, বরং অতি দ্রুততার সহিত ইহা সম্পন্ন হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে বণ্টনকার্য আরম্ভ হইয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তাহা সম্পন্ন হয়। নবস্বাধীনতাপ্রাপ্ত ইটালী ও জার্মানীর ইওরোপীয় রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে আবির্ভাবই এই দ্রুততার কারণ। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য জাতীয় গৌরবের মানদণ্ডস্বরূপ এইরূপ মনোভাবের বশবর্তী হইয়া ইটালী ও জার্মানী আফ্রিকায় সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ইহাদের আগমনে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স (যাহারা পূর্বেই আফ্রিকায় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল) বিব্রত হইয়া পড়ে, ফলে আফ্রিকার আধিপত্য বিস্তারকল্পে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে এক বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়।

বণ্টন ব্যাপারে দুইটি বৈশিষ্ট্য

বিশ্বের ইতিহাসে আফ্রিকার অভ্যুদয় নিতান্তই আধুনিক কালের ঘটনা। ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই আফ্রিকা মহাদেশ ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া যায়। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকায় মাত্র দুইটি ঔপনিবেশিক শক্তি ছিল—যথা ওলন্দাজ ও পর্তুগীজ। ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ কেপ্ কলোনী দখল করিয়া নিজেদের দখলে রাখে। তবে উহারা কেপ্-কলোনীকে ভারতের পথে যাইবার বন্দর হিসাবেই ব্যবহার করিত। উহারা কেপ্-কলোনীতে ইওরোপীয়দের বসবাসের উপযোগী করিয়া তুলিতে মোটেই উৎসাহী ছিল না। বরং উহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য স্থানীয় দাস-শ্রমিকদের উপরই অধিক নির্ভর করিত। কিন্তু এই নীতি ওলন্দাজদের পক্ষে অনেক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল।

আফ্রিকা মহাদেশে ইওরোপীয়দের আগমন

ফরাসী-রাজ চতুর্দশ লুই-এর ধর্মীয় উৎপীড়নের ফলে বহু ফরাসী স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আফ্রিকায় আগমন করে ও অরেঞ্জ নদীর তীরে বসবাস স্থাপন করে। কিন্তু

তথায় একটি পূর্ণাঙ্গ উপনিবেশ স্থাপন করার ব্যাপারে বহুদিন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ কেপ্-কলোনী ইংরাজদের নিকট সমর্পণ করে।

আফ্রিকা মহাদেশে পর্তুগীজদের আধিপত্য সুদৃঢ় ছিল। উহারা প্রথমে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করে। পরে দিয়াজ, গামা প্রভৃতি দুঃসাহসিক পর্তুগীজ নাবিকরা দক্ষিণ-আফ্রিকায় আগমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। কিন্তু পর্তুগীজরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করার পরিবর্তে লুঠতরাজেই অধিক নিমগ্ন থাকে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আফ্রিকায় উহাদের তিনটি উপনিবেশ গড়িয়া উঠে—যথা গিয়ানা উপকূল, শোফালা ও পশ্চিম আফ্রিকা বা এ্যাঙ্গোলা। কিন্তু এই উপনিবেশগুলি ছিল প্রধানতঃ দাস-ব্যবসার কেন্দ্র।

প্রকৃত উপনিবেশ স্থাপনের প্রচেষ্টা

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আফ্রিকা মহাদেশে ইওরোপীয়দের প্রকৃত উপনিবেশ গড়িয়া উঠে নাই। কিন্তু দুইটি ঘটনার ফলে তথায় নূতন করিয়া ইওরোপীয়দের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ফ্রান্স উত্তর-আফ্রিকার অন্তর্গত আলজেরিয়ায় এক অভিযান চালাইয়া তাহা দখল করে। যদিও ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থানীয় অধিবাসীদের বিরোধিতার ফলে আলজেরিয়ার উপনিবেশ সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে আলজেরিয়াকে কেন্দ্র করিয়াই পরবর্তী কালে ফ্রান্স আফ্রিকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল ফরাসী ঔপনিবেশিকদের হাতে চলিয়া যায়। ফরাসীদের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া ওলন্দাজরাও লিম্পোপো-নদী পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উপনিবেশ গড়িয়া তোলে। ওলন্দাজদের নূতন উপনিবেশগুলি হইল নাটাল, অরেঞ্জ নদী উপনিবেশ ও ট্রান্সভাল। তখন পর্যন্ত নীল-উপত্যকা ও কঙ্গো-উপত্যকা ইওরোপীয়দের নিকট অজ্ঞাত ছিল।

ব্রাসেল্স্ সম্মেলন ১৮৭৮

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের দুঃসাহসিক অভিযাত্রী স্ট্যানলী কঙ্গো-উপত্যকা আবিষ্কার করিলে আফ্রিকা সম্বন্ধে ইওরোপীয়দের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায় এবং সকলের দৃষ্টি আফ্রিকার প্রতি নিবদ্ধ হয়। বিশ্বের রাজনীতিতে আফ্রিকার দ্বার এইভাবে উন্মুক্ত হয়। বেলজিয়াম কঙ্গো-উপত্যকা দখল করিলে আফ্রিকার বণ্টন ত্বরান্বিত হয়। বেলজিয়াম-রাজ দ্বিতীয় লিওপোল্ড স্ট্যানলীর অভিযানের অল্পকালের মধ্যেই ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাসেল্স্-এ ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে আফ্রিকার অন্তর্দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা হয়। বেলজিয়াম-রাজের সভাপতিত্বে এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে একটি আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক সংস্থা গঠন করা হয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এই সংস্থা অকার্যকর হইয়া পড়ে। আফ্রিকা সম্পর্কে যাহা কিছু আগ্রহ দেখা গিয়াছিল, তাহা প্রতিটি ইওরোপীয় রাষ্ট্রের স্ব-স্ব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল এবং প্রতি রাষ্ট্রই তথায় নিজস্ব ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হইল।

আফ্রিকা মহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত লইবার জন্য ১৮৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপের প্রতিনিধিগণ বার্লিন সম্মেলনে মিলিত হন। এই সম্মেলনে স্থির হয় যে, কোন রাষ্ট্র আফ্রিকার কোন অংশ দখল করিতে চাহিলে পূর্বেই তাহা অন্যান্য রাষ্ট্রকে জানাইতে হইবে; কঙ্গো-নদী আন্তর্জাতিক নদী হিসাবে স্বীকৃত হইবে; সকল রাষ্ট্রের ধর্মপ্রচারক ও অভিযাত্রীদের কঙ্গোর অন্তর্দেশে প্রবেশ করার অধিকার থাকিবে এবং আফ্রিকায় দাস-ব্যবসা বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করিতে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোনও রাষ্ট্রেরই আগ্রহ ছিল না। ইতিমধ্যে বেলজিয়াম-রাজ কঙ্গো তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া ফ্রান্স, পর্তুগাল, জার্মানী, ইংল্যান্ড, ইটালী প্রভৃতি রাষ্ট্র আফ্রিকায় আপন আপন অধিকার বিস্তারে উদ্যোগী হয়।

বার্লিন সম্মেলন, ১৮৮৪-৮৫

পূর্ব হইতেই আলজেরিয়া ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত ছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স টিউনিস দখল করে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কঙ্গো-নদীর দক্ষিণ উপকূল অধিকার করিয়া ফ্রান্স চাঁদ হ্রদ (Lake Chad) পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার মাদাগাস্কার দ্বীপটি ফ্রান্স কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মরক্কো ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হয়। এইভাবে উত্তর-আফ্রিকায় ফ্রান্স এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলে।

ফ্রান্স

পর্তুগালও এই ভাগাভাগিতে যোগদান করে। পর্তুগাল কঙ্গোর দক্ষিণ উপকূলে এ্যাঙ্গোলা ও পশ্চিম উপকূলে মোজাম্বিক দখল করে।

পর্তুগাল

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী লোহিত সাগরে অবস্থিত এরিত্রিয়া এবং আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে অবস্থিত সোমালিল্যান্ড দখল করে। এই দুইটি অঞ্চলের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য ইটালী আবিসিনিয়া দখল করিতে অগ্রসর হইলে এ্যাডোয়ার যুদ্ধে (১৮৯৬ খ্রীঃ) পরাস্ত হয়। এইদিকে বাধাপ্রাপ্ত হইলে ইটালী ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের নিকট হইতে ট্রিপলী অধিকার করিয়া লয়।

ইটালী

ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জার্মানীও অবতীর্ণ হইল। বিসমার্ক উপনিবেশ স্থাপনের প্রতি উদাসীন থাকিলেও অবশেষে জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদী দলের চাপে পড়িয়া তাঁহাকে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইতে হয়। ১৮৪৮ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আফ্রিকার চারিটি অঞ্চল—যেমন, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা, টগোল্যান্ড এবং কেমেরুনস্ জার্মানীর দখলে আসিল।

জার্মানী

আফ্রিকার বৃহৎ অংশ ইংল্যান্ডের ভাগ্যেই জুটিল। ওলন্দাজদের নিকট হইতে কেপ্-কলোনী দখল, উত্তরদিকে অগ্রসর হইয়া নাটাল ও অরেঞ্জ-রিভার কলোনী দখল এবং বুয়রদিগকে পরাজিত করিয়া ট্রান্সভাল ইংল্যান্ডের দখলে আসিল। দক্ষিণের

এই অঞ্চলগুলিকে একত্রিত করিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার ইউনিয়ন গঠিত হয়। উত্তরে মিশর অধিকার করিয়া ইংল্যাণ্ডের আধিপত্য সুদান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ব্রিটিশ পূর্ব-আফ্রিকা ও উগাণ্ডা (Uganda) অধিকারভুক্ত হইলে ব্রিটেন ভারত মহাসাগর হইতে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করার সুযোগ পায়। কেবলমাত্র আবিসিনিয়া ও লাইবিরিয়া ইওরোপীয় দেশগুলির কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। এইভাবে আফ্রিকার নানা স্থানে ইওরোপীয় সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে।

ইংল্যাণ্ড

৫.৬. **আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদের ফলাফল** (Consequences of the Partition of Africa)ঃ আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অংশে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ইওরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রবর্তন করে। ইওরোপীয়রা আফ্রিকাকে 'অন্ধ মহাদেশ' বলিয়া মনে করিত। প্রকৃতপক্ষে উহাদের আগমনের পূর্বে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের সঙ্গে আফ্রিকার কোনও যোগাযোগ ছিল না। ইওরোপীয়দের দৃষ্টিতে আফ্রিকার জনগণ ছিল অনুন্নত।

ইওরোপীয় সভ্যতার বিস্তার

উপনিবেশ স্থাপন করার পর শুরু হয় ইওরোপীয়দের শোষণ। বহু নিগ্রো ক্রীতদাসে পরিণত হয়। আফ্রিকার বহু ক্রীতদাসকে আমেরিকায় চালান করা হয় সস্তায় শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত করার জন্য। প্রথমদিকে দাস-ব্যবসা করিয়া ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকদের প্রচুর অর্থাগম হয়। অবশ্য ধীরে ধীরে আফ্রিকায় দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধ হয় ও ঔপনিবেশিকরা খ্রীষ্টধর্ম ও ইওরোপীয় শিক্ষার প্রচলন করিয়া আফ্রিকার জনগণের মধ্যে সভ্যতার বিস্তারে সাহায্য করে।

প্রথমে শান্তিপূর্ণভাবে আফ্রিকার বণ্টনকার্য সম্পাদিত হইলেও পরে ইহার ফলে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। প্রথমে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যেই আফ্রিকার বণ্টন সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর জার্মানী ও ইটালী ইহাদের সহিত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তারকল্পে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। মিশরের আধিপত্য লইয়া ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয় এবং খেদিভের আর্থিক দুরবস্থার সুযোগ লইয়া তথায় ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের দ্বৈতশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু শীঘ্রই আরাবীপাশা ও মাধি বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া ইংল্যাণ্ড মিশর ও সুদান হইতে ফরাসী আধিপত্যের অবসান ঘটাইয়া স্বীয় আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সুদান অঞ্চলে ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করিলেও অবশেষে তাহা আপোসে নিষ্পত্তি হইয়া যায়। ইতিমধ্যে ফ্রান্স আলজেরিয়া ও মরক্কোতে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু জার্মানী এই অঞ্চলে ফ্রান্সের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইলে ফ্রান্স ইংল্যাণ্ডের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে। এইভাবে আফ্রিকায় উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হয়।

ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত

বিসমার্কের প্ররোচনায় ফ্রান্স আফ্রিকায় টিউনিস প্রদেশটি দখল করিলে ইটালীর সহিত ফ্রান্সের মনোমালিন্য ঘটে, এবং ইটালী জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সহিত যোগদান করে। এইভাবে মধ্য-ইওরোপে ত্রি-শক্তি মৈত্রী গড়িয়া উঠে।

আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন লইয়া জার্মানীর সহিত ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বিরোধ উপস্থিত হয়। মরক্কোয় ফ্রান্সের একক আধিপত্য জার্মানী অস্বীকার করে। ইহার ফলে আলজেসিরাস বৈঠকে (১৯০৬ খ্রীঃ) স্থির হয় যে মরক্কোয় সকল দেশের বাণিজ্যিক সুবিধা অব্যাহত থাকিবে এবং ফ্রান্স ও স্পেন তথায় যুগ্মভাবে শাসনের অধিকারী হইবে। কিন্তু জার্মানী এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মরক্কো বিদ্রোহ দমনার্থে ফ্রান্স তথায় সৈন্য পাঠাইলে জার্মানীও বিদ্রোহীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া আগাদীর বন্দরে একটি যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করে। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিলে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করিয়া জার্মানীকে সতর্ক করিয়া দেয়। ইংল্যাণ্ডের এইরূপ মনোভাবে আশঙ্কিত হইয়া জার্মানী সংযত হয় এবং কঙ্গোর কিয়দংশের বিনিময়ে মরক্কোর উপর ফ্রান্সের অধিকার স্বীকার করিয়া লয়।

আফ্রিকা বিভাগের ফলে ইংল্যাণ্ডই সর্বাপেক্ষা বেশী লাভবান হইয়াছিল। জিব্রাল্টার, এডেন, সকোট্রা, জাঞ্জিবার এবং কেপ-টাউন প্রভৃতি অঞ্চলে ইংল্যাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ নৌ-ঘাঁটি স্থাপিত হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকা অধিকার করিয়া ইংল্যাণ্ড তথায় শ্বেতকায় অধিবাসীদের উপনিবেশ স্থাপনের সূত্রপাত করে।

আফ্রিকার বিভাগ ইওরোপীয় রাজনীতিকে বহুদিন পর্যন্ত প্রভাবিত করিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পশ্চাতে যে আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়াছিল তাহার উদ্ভব হয় আফ্রিকা হইতে।

৫.৭. ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নীতি (British Imperialism in the 19th Century) ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রসারিত হইয়াছিল। জগতের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এবং বিভিন্ন জলবায়ু সমন্বয়ে এই সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। কোন সুপরিকল্পিত নীতি অনুসরণে এইসাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে নাই। এই কারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের শাসনতন্ত্র রচিত হয়। সাম্রাজ্যের কোন কোন অঞ্চল স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী, কোন অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে ইংল্যাণ্ডের শাসনাধীন, (যেমন Crown Colonies), কতক অঞ্চল চার্টারপ্রাপ্ত কোম্পানির শাসনাধীন, আবার কতকগুলি অঞ্চল ব্রিটেনের রক্ষণাধীন (protectorate)। কিন্তু ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে এইরূপ রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আবার নব-সাম্রাজ্যবাদের (New Imperialism) উদ্ভব হয়। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠন সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডের চিরাচরিত নীতিও পরিবর্তিত হয়। ইহার কারণ—

নতুন সাম্রাজ্যবাদ ও চিরাচরিত নীতির পরিবর্তনের কারণ

(ক) অবাধ-বাণিজ্য : অবাধ-বাণিজ্য-নীতি জনপ্রিয় হইয়া উঠিলে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তন ঘটে। পূর্বে অনুসৃত ঔপনিবেশিক নীতির একমাত্র লক্ষ্য ছিল মাতৃভূমির অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধন করা এবং উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে না দেওয়া। কিন্তু আমেরিকার উপনিবেশগুলি বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিলে পূর্বতন ঔপনিবেশিক নীতির অসারতা প্রমাণিত হয়। অপরদিকে এ্যাডাম স্মিথের অবাধ-বাণিজ্য-নীতির প্রচারও এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী।

(খ) উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার স্থান সংকুলান : ইহা ক্রমশঃ স্বীকৃতি লাভ করে যে উপনিবেশগুলি কেবলমাত্র মাতৃভূমির ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নকল্পেই সৃষ্ট হয় নাই, ইহার উদ্দেশ্য হইল মাতৃভূমির ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার স্থান সংকুলান করা। এইরূপ মতবাদের প্রথম প্রচারক ছিলেন গিবন ওয়েকফিল্ড (Gibbon Wakefield) যাঁহার নাম অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড উপনিবেশ স্থাপনের সহিত জড়িত রহিয়াছে।

(গ) সভ্যতা ও শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস : অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত ইংল্যান্ড উপনিবেশগুলিকে শোষণের ক্ষেত্র বলিয়া মনে করিত। উপনিবেশবাসীগণের সুখ-সুবিধার প্রতি ইংল্যান্ড সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতকের প্রথমভাগ হইতে এই নীতির পরিবর্তন হয়। অনুন্নত জাতির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জ্ঞান-বিস্তার এবং শ্বেতকায় বাসিন্দাদের অত্যাচার হইতে উপনিবেশবাসীগণকে রক্ষা করা প্রভৃতি উদার মনোভাব ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির পরিবর্তনের আর একটি কারণ।

(ঘ) ঔপনিবেশিকগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দান : 'মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্যই উপনিবেশের প্রয়োজন'—এই নীতি বর্জন করিয়া ইংল্যান্ড উপনিবেশসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে শাসনপদ্ধতি সংস্কারের প্রয়োজন উপলব্ধি করিল। ওয়েকফিল্ড ও লর্ড ডারহাম এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে কালক্রমে উপনিবেশগুলি মাতৃভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। সুতরাং সাম্রাজ্যের অক্ষুণ্ণতা বজায় রাখার জন্য উপনিবেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিল।

ডারহাম রিপোর্ট (১৮৪০)

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডারহাম কানাডার শাসন সম্পর্কিত যে রিপোর্ট প্রণয়ন করেন তাহাতেই সর্বপ্রথম ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের নীতি গৃহীত হয়। এই নীতি অনুসারে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কানাডায় পার্লামেন্টারী শাসনপদ্ধতি প্রবর্তিত হয় এবং ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কানাডার অধিবাসীগণকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করা হয়। এই নীতি অনুসারে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট অন্যান্য উপনিবেশগুলিতেও স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়াকে শাসনতন্ত্র রচনা করার ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং তথায় ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারী শাসনপদ্ধতির অনুকরণে শাসনতন্ত্র রচিত হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে নিউজিল্যান্ডকেও অনুরূপ অধিকার দেওয়া হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-

ব্রিটিশ কমনওয়েলথের উৎপত্তি

আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত কেপ্‌-কলোনী স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করে। এইরূপে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে ইংল্যান্ডের নেতৃত্বে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ নামে পরিচিত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রসংঘ গড়িয়া উঠে।

মিশরে ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তার ঃ মিশরের উপর ফ্রান্সের লোলুপ দৃষ্টি বহুদিন হইতেই ছিল। কিন্তু কালক্রমে ব্রিটেনের কূটনীতির ফলে ফ্রান্সকে মিশর কবলিত করার আশা পরিত্যাগ করিতে হয়। প্রথম নেপোলিয়ন কর্তৃক মিশর অধিকৃত হওয়ার পর হইতে ফ্রান্সের যে স্বার্থ তথায় গড়িয়া উঠে তাহা নেপোলিয়নের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয় নাই। তুরস্কের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইয়া মিশরের শাসনকর্তা মেহমেৎ আলি স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে ফ্রান্স তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া কিছু রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতে যত্নবান হয়। বাণিজ্য প্রসারকল্পে অতঃপর ফ্রান্স সুয়েজ খাল খনন করিয়া ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিতে অগ্রসর হয়। অবশ্য এইরূপ প্রচেষ্টা নূতন নহে, পিরামিড-এর যুগেও এইরূপ প্রচেষ্টা হইয়াছিল। ফ্রান্সের ইঞ্জিনীয়ার লেইবনিজ (Leibnitz) সর্বপ্রথম সুয়েজের গুরুত্ব ফরাসী-রাজ চতুর্দশ লুইকে জ্ঞাপন করেন এবং প্রধানমন্ত্রী কোলবার্ট (Colbert) ইহা সম্পন্ন করিতে তৎপর হন। প্রথম নেপোলিয়নও সুয়েজের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সুয়েজ অঞ্চলে জরিপ করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিন্তু ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার ফার্ডিনান্ড-ডি-লেসেপ্‌স্‌ (Ferdinand-de-Lessepes) সর্বপ্রথম খালের খননকার্য আরম্ভ করেন।

মিশরে ফ্রান্সের স্বার্থ

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের খেদিভের অনুমতিক্রমে ফার্ডিনান্ড একটি কোম্পানী গঠন করেন এবং ইংল্যান্ডের সহযোগিতা লাভ করিতে সচেষ্ট হন। কিন্তু সুয়েজের অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব তখনও পর্যন্ত উপলব্ধি করিতে না পারায় ইংল্যান্ড ফার্ডিনান্ডের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হয়। লর্ড ক্ল্যারেন্ডন মন্তব্য করেন যে এই পরিকল্পনার পশ্চাতে উদ্দেশ্য ছিল মিশরকে তুরস্কের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করা। এই পরিকল্পনায় একমাত্র ফ্রান্সের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে মনে করিয়া লর্ড পামারস্টোন ইহার বিরোধিতা করেন। কিন্তু ফার্ডিনান্ড সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবশেষে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজের খননকার্য সম্পন্ন করেন। সমগ্র বিশ্ব তাঁহার কৃতিত্বে চমৎকৃত হয়।

সুয়েজ খালে ফ্রান্সের আধিপত্য স্থাপন

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ডিসরেলী প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইলে ইংল্যান্ডের নীতির পরিবর্তন হয়। তিনি ছিলেন গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী। সুয়েজ খালে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতের সহিত ইংল্যান্ডের যোগাযোগ সহজ হইবে ইহা তিনি উপলব্ধি করেন। এই সময় অর্থনৈতিক বিপর্যয় হেতু মিশরের খেদিভ ইসমাইল পাশা সুয়েজ খালে মিশরের যে সকল 'শেয়ার' ছিল তাহা নগদ অর্থের

বিনিময়ে বিক্রয় করার সংকল্প করেন। এই সংবাদে উৎসাহিত হইয়া ডিসরেলী তাহা ক্রয় করিতে মনস্থ করেন। তাঁহার ক্যাবিনেটের অধিকাংশ সদস্য ইহার বিরোধিতা করিলেও মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইহা সমর্থন করেন। ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যে ডিসরেলী খেদিভের সমুদয় শেয়ার ক্রয় করিয়া ভিক্টোরিয়াকে জানাইলেন, "It is settled ; you have it Madam." বেলজিয়াম-রাজ লিওপোল্ড ইংল্যাণ্ড কর্তৃক মিশরের শেয়ার ক্রয় করার প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে "আধুনিক রাজনীতিতে ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা" ("It is the greatest event in modern politics")। ইহা স্বীকার্য যে ইংল্যাণ্ডের তথা বিশ্বের রাজনীতিক্ষেত্রে এই শেয়ার ক্রয় এক নূতন যুগের সূচনা করিয়াছিল।

ইংল্যাণ্ড কর্তৃক সুয়েজ খালের শেয়ার ক্রয়

সুয়েজ খাল অঞ্চলে ইতিপূর্বে ফ্রান্স স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। শেয়ার ক্রয় করার পর হইতে ফ্রান্সের ন্যায় ইংল্যাণ্ডেরও স্বার্থ মিশরের সহিত জড়িত হইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট কৃত ঋণের দেয় টাকা ইসমাইল পাশা পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইলে তিনি মিশরের আর্থিক পুনর্গঠনের সকল দায়িত্ব ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের উপর অর্পণ করেন। মিশরে দ্বি-শক্তি (Dual Control) আধিপত্য স্থাপিত হয় এবং ছয় বৎসর কাল ধরিয়া তাহা অব্যাহত রহে।

মিশরের উপর ইঙ্গ-ফরাসী দ্বৈত অধিকার

দ্বি-শক্তি আধিপত্যের কালে মিশরের শাসনকার্যে বহুসংখ্যক ইওরোপীয় কর্মচারী নিযুক্ত হওয়ায় স্বদেশ-প্রেমিক মিশরীয়গণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে আরাবী পাশার নেতৃত্বে 'মিশর মিশরবাসীর' এই দাবির ভিত্তিতে এক বিরাট আন্দোলন সংঘটিত হয়। মুখ্যতঃ ইহা সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ হইলেও পরে ইহাকে মিশরের উপর তুরস্কের সার্বভৌমত্বের ও বিদেশী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে পরিচালিত করা হইয়াছিল। ইংল্যাণ্ড সামরিক হস্তক্ষেপের দ্বারা এই বিদ্রোহ দমন করিতে অগ্রসর হইল। ফ্রান্স প্রথমে ইংল্যাণ্ডের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াও শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সংকটের সম্ভাবনায় ইংল্যাণ্ডের সহিত যোগদান করিল না। ইতিমধ্যে মিশরীয়গণ আলেকজান্দ্রিয়াতে বহুসংখ্যক ইওরোপীয় নাগরিককে নির্মমভাবে হত্যা করিল। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ামাত্র ব্রিটিশ নৌ-সেনাপতি শেমোর (Seymour) ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের নির্দেশক্রমে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর কামান দ্বারা বিধ্বস্ত করিয়া উহা দখল করেন (১৮৮২ খ্রীঃ)।

মিশরে বিদ্রোহ

অপরদিকে স্যার গারনেট উলসির (Sir Gernet Wolsey) অধিনায়কত্বে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী টেল-এল-কবিরের যুদ্ধে (১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৮২) আরাবী পাশাকে পরাস্ত করিয়া রাজধানী কায়রো অধিকার করিলেন। খেদিভকে পুনঃস্থাপিত করা হইল এবং এইভাবে মিশরে ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক আধিপত্যের সূত্রপাত হইল।

মিশরে ইংল্যাণ্ডের আধিপত্য স্থাপন

মাধি বিদ্রোহ ঃ মিশরকে অধিকারভুক্ত করিয়া রাখার ইচ্ছা প্রথমদিকে ইংল্যাণ্ডের ছিল না। মিশরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং খেদিভের কর্তৃত্ব পুনঃস্থাপিত করিয়া মিশর পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই ইংল্যাণ্ডের ইচ্ছা ছিল এবং এইরূপ ইচ্ছা গ্রেনভিল স্বয়ং ঘোষণাও করিয়াছিলেন (১৮৮৩ খ্রীঃ)। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষভাগে মিশরের অধিকারভুক্ত সুদানে গোলযোগ উপস্থিত হইলে ইংল্যাণ্ড মিশরের ঘরোয়া ব্যাপারে ক্রমশঃ জড়িত হইয়া পড়িল এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য তথায় অবস্থান করিতে বাধ্য হইল। বহুদিন হইতেই সুদানের অধিবাসীগণ মিশরের অত্যাচারিত শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। বিশেষ করিয়া ইসমাইল পাশা কর্তৃক নিযুক্ত সুদানের শাসনকর্তা চার্লস গর্ডন (Charles Gordon) ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সুদান ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তথাকার অধিবাসীগণের দুর্দশা চরমে উঠিয়াছিল। অবশেষে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মাধি (Madhi) নামক এক ধর্মোন্মাদ সর্দারের নেতৃত্বে সুদান বিদ্রোহী হইয়া তথা হইতে মিশরীয় সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করিল। এই অবস্থায় ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ সুদান হইতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ফিরাইয়া আনিবার জন্য জেনারেল গর্ডনকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু মাধির সহিত যুদ্ধে গর্ডন নিহত হইলেন। দীর্ঘকাল পরে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কিচেনারের নেতৃত্বে ইংরাজ সৈন্যবাহিনী মাধিকে পরাজিত করিয়া সুদানে পুনরায় ইঙ্গ-মিশরীয় কর্তৃত্ব স্থাপন করিল। এই সময় হইতে খেদিভকে নামমাত্র মিশর ও সুদানের শাসনকর্তারূপে রাখা হইল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুদানের উপর ইংল্যাণ্ডের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ইংল্যাণ্ডকে বাধ্য হইয়া মিশরের উপর স্বীয় অধিকার দৃঢ় করিতে হয়।

ইংল্যাণ্ডের রক্ষণাধীনে মিশর ও সুদান

মিশর ইংল্যাণ্ডের রক্ষণাধীনে আসিলে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইল। মিশরের ব্যাপার লইয়া নাইজার, শ্যাম, মাদাগাস্কার প্রভৃতি অঞ্চলেও এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ফ্রান্স নীল নদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে সচেষ্ট হইলে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল। ফরাসী সুদান ও লোহিত সাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকল্পে ফরাসী সরকার ক্যাপ্টেন মার্চাণ্ডকে মিশরের প্রেরণ করিলেন। মার্চাণ্ড ফ্যাসোডা (Fashoda) নামক স্থানে ফরাসী পতাকা উত্তোলন করিলে ব্রিটেন উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া ফরাসী সরকারের নিকট মার্চাণ্ডের অপসারণের দাবি করিল। ইহার ফলে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল বটে কিন্তু অবশেষে উভয়ের মধ্যে আপোস মীমাংসা হইয়া যায় এবং ফ্রান্স ফ্যাসোডার উপর স্বীয় কর্তৃত্ব প্রত্যাহার করে।

মিশরের কর্তৃত্ব লইয়া ইঙ্গ--ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর সংকেত

১। ঊনবিংশ শতকে ইওরোপের বাহিরে ইওরোপীয় উপনিবেশ বিস্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ ৫. ৩.]

২। ঔপনিবেশিক বিস্তারের ফলাফল কিরূপ হইয়াছিল ? [উঃ ৫. ৪.]

৩। আফ্রিকায় ইওরোপীয় বিস্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ ৫. ৫.]

৪। আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদের ফলাফল আলোচনা কর। [উঃ ৫. ৬.]

৫। "১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইওরোপের ইতিহাস আফ্রিকা ও এশিয়ায় শুরু হয়"—ইহা কতদূর যথার্থ ? [উঃ ৫.৩., ৫. ৫.]

৬। মিশরে ইংল্যান্ডের প্রতিপত্তি স্থাপনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ ৫.৭.]

ষষ্ঠ অধ্যায় — সুদূর-প্রাচ্য—চীন ও জাপান—১৯১৯ পর্যন্ত

(Far-East—China and Japan to 1919)

৬.১. সুদূর-প্রাচ্যের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য (Nature of the Far-Eastern History) : আফ্রিকার পর এশিয়া মহাদেশ ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের লীলাকেন্দ্রে পরিণত হয়। ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া ইংল্যান্ড দক্ষিণ-এশিয়ায় স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করে। ইন্দোচীন সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া ফ্রান্স ও এই অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করে। অপরদিকে রাশিয়া উরাল পর্বতমালা হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করে। এই তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে রাশিয়াই সর্বপ্রথম সুদূর-প্রাচ্য অভিমুখে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হয় এবং ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সাইবেরিয়া জয় করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে উপনীত হয়।

সুদূর অতীতকাল হইতে চীন ও জাপান পাশ্চাত্য দেশের নিকট পরিচিত ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত চীনদেশ বহির্জগত হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। চারিদিকে সমুদ্র, মরুভূমি ও পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া চীন উহার অতীত গৌরব ও সভ্যতা সম্পর্কে অতিশয় গর্ববোধ করিত এবং বহির্জগতের অন্যান্য দেশ বা জাতির সহিত সকল সম্পর্ক সর্বোতভাবে বর্জন করিয়া চলিত। চীন হইতে বৈদেশিক কোন রাষ্ট্রে কখনও রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করা হইত না বা কোন রাষ্ট্র হইতে তাহা গ্রহণও করা হইত না। কিন্তু চীনের বিপুল ঐশ্বর্য ও বাণিজ্যের সম্ভাবনা ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির নিকট অবিদিত ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু পূর্ব হইতেই চীনের সহিত বিদেশী রাষ্ট্রের কিছু কিছু সংযোগ যে ছিল না একথা বলা যায় না। রোমের বিলাস-সামগ্রী চীনে বিক্রয় হইত, রোমের ক্যাথলিক চার্চ চীনে ধর্মপ্রচারক পাঠাইত এবং বিদেশী পর্যটকগণ চীনের বিপুল ঐশ্বর্যের সংবাদ চতুর্দিকে প্রচার করিত। ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি চীনদেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিল কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। একমাত্র ক্যান্টন বন্দরেই বিদেশী বণিকগণকে ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার অনুমতি দেওয়া হইত বটে কিন্তু তাহাও অত্যন্ত অপমানজনক শর্তে।

চীনের বিচ্ছিন্নতা

চীন সরকারের অনিচ্ছার বিরুদ্ধেই ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজগণ দক্ষিণ-চীনের ম্যাকাও বন্দরে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে এবং পরবর্তী কালে ক্রমান্বয়ে স্পেনীয়, ওলন্দাজ ও ইংরাজ ব্যবসায়ীগণ ম্যাকাও ও ক্যান্টন বন্দরে বাণিজ্যাধিকার লাভ করে। বিদেশী বণিকগণকে বিতাড়িত করিতে অসমর্থ হইলে চীনা সরকার নানাপ্রকার বাধানিষেধ আরোপ করিয়া উহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন।

চীন ও জাপানে ইওরোপীয় জাতি

উনবিংশ শতাব্দীতে ইওরোপীয় দেশগুলি এবং আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরীয় দুইটি দেশ চীন ও জাপানের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হয়। চীন ও জাপানের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করাই ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। চীন ও জাপান বিদেশীদের আগমনে অসন্তুষ্ট হইলেও পরিশেষে ইহারা চীনদেশে বলপূর্বক প্রবেশ অধিকার লাভ করে। ইওরোপীয়দের বলপূর্বক প্রবেশলাভের প্রচেষ্টা হইতেই সুদূর-প্রাচ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রথমদিকে অবশ্য এই সমস্যা মোটেই জটিল ছিল না কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ হইতে এই সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিতে থাকে। বাণিজ্যাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যিক অধিকারের প্রশ্ন উঠে। প্রথমে বাণিজ্যাধিকার, পরে রাষ্ট্রাধিকার এবং সর্বশেষে চীন-সাম্রাজ্যের বণ্টন প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে জাপানের প্রবেশ ইত্যাদি প্রশ্ন সুদূর-প্রাচ্য সমস্যাকে অত্যধিক জটিল করিয়া তোলে।

চীন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইওরোপীয় দেশগুলির সামরিক শক্তি প্রতিহত করার মত শক্তি না থাকায় চীন নিজেকে রক্ষা করিতে পারিল না। স্বাধীনতা ও জাতীয় সম্মান ক্ষুণ্ণ করিয়া বিদেশীগণকে ভৌমিক এবং বাণিজ্যাধিকার প্রদান করিতে চীন বাধ্য হয়। একসময় আফ্রিকার ন্যায় চীনদেশও ইওরোপীয়গণ কর্তৃক বণ্টিত হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল। শোষিত ও লুণ্ঠিত চীন বহুদিন পর্যন্ত অসহায় অবস্থায় পড়িয়া রহিল। অপরদিকে জাপানে ইওরোপীয় শক্তিগুলির প্রবেশের প্রতিক্রিয়া ভিন্নরূপ হইয়াছিল। প্রথমদিকে চীনের ন্যায় জাপানও অনিচ্ছাসত্ত্বেই বিদেশীগণকে ভৌমিক এবং বাণিজ্যাধিকার প্রদান করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়পাদ হইতে জাপান পাশ্চাত্য ভাবধারা, পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক শিক্ষা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়। পাশ্চাত্য দেশগুলির অনুকরণে বহুবিধ সংস্কার প্রবর্তন করিয়া জাপান ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং সাম্রাজ্যবাদের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই জাপান সাম্রাজ্যস্থাপনকল্পে ইওরোপীয় শক্তিগুলির সহিত প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। উদীয়মান জাপান সুদূর-প্রাচ্য সমস্যাকে অধিকতর জটিল করিয়া তোলে এবং ইহা সুদূর-প্রাচ্য ইতিহাসের অপর একটি বৈশিষ্ট্য।

চীন লুণ্ঠিত ও জাপান আত্মরক্ষায় সমর্থ

৬.২. চীনে বিদেশীগণের আগমন ও উহার দ্বার উদ্ঘাটন ঃ "The history of the Far-East from 1800 is the history of one movement in many aspects. It is the history of the intrusion—forcible intrusion of the West upon the East," (*Ketelbey*)। উনবিংশ শতকের পূর্বে ইওরোপের সহিত চীনের সম্পর্ক সামান্যই ছিল। চীনেরা নিজেদের দেশকে প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান মনে করিত। নিজেদের অতীত যুগের সভ্যতা সম্পর্কে অতিশয় গর্ববোধ

রোম, আরব ও পারস্যের সহিত যোগাযোগ

করিত এবং বহির্জগতের সংস্পর্শে আসিবার প্রয়োজনীয়তা মোটেই স্বীকার করিত না। মাঝে মাঝে অবশ্য চীন-সাম্রাজ্যের সহিত আরব ও পারস্যদেশের কূটনৈতিক বিনিময় চলিত; রোমের ক্যাথলিক চার্চ ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করিত।

পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিক্‌দের আগমন

কিন্তু পঞ্চদশ শতক হইতে জলপথের সন্ধান ও ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইওরোপীয় জাতিগুলির সুদূর-প্রাচ্যে আবির্ভাব ঘটিতে থাকে। (ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজগণ চীনের দক্ষিণ উপকূলে ম্যাকাও বন্দরে এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজগণ ফরমোসা দ্বীপে এবং ইংরাজগণ ক্যাণ্টন বন্দরে প্রতিষ্ঠিত হয়।) চীনা সরকার ইহাদিগকে ঘৃণা করিলেও বহিষ্কৃত করিতে পারেন নাই। তথাপি নানাপ্রকার

বিদেশীগণের প্রতি চীনের ঘৃণা

অপমানজনক বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া চীনা সরকার ইহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে ও ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ করিতেন। বিদেশীগণকে চীনা ভাষা শিক্ষা করার সুযোগ দেওয়া হইত না, ইহাদের যে কোন আবেদন ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করা হইত। কিন্তু ইওরোপের বণিক্‌কুল নির্বিকার চিত্তে সকল অপমান সহ্য করিয়া ব্যবসা চালাইয়া যাইতে থাকে।

ইতিমধ্যে রাশিয়া স্থলপথ দিয়া চীনের উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। রাশিয়াও চীনের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে চাহিল। রাশিয়ার

রাশিয়ার আগমন ও চীনের সহিত সন্ধি

এশিয়া মহাদেশস্থ সাম্রাজ্য চীন-সাম্রাজ্যের নিকটস্থ হওয়ায় এই দুই দেশের মধ্যে প্রায়ই সীমান্ত-সংঘর্ষ লাগিয়া থাকিত। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনা সরকার ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম রাশিয়ার সহিত বাণিজ্যিক-চুক্তিতে আবন্ধ হইয়াছিল (Treaty of Narsching)। রাশিয়াকে বাণিজ্যিক সুবিধা-মঞ্জুর করা হইল বটে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত সামান্য। সন্ধির শর্তানুসারে, রাশিয়া জলপথ দিয়া চীনের সহিত ব্যবসা করিতে পারিবে না এবং চীনা সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিবে এইরূপ স্থির হয়। অষ্টাদশ শতকে এই দুই দেশের মধ্যে আরও কয়েকটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রাশিয়ার বাণিজ্যিক অধিকার সীমাবন্ধ রাখা হইয়াছিল। এইরূপ বিধিনিষেধের ফলে রাশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য মোটেই লাভজনক হয় নাই এবং ক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

প্রথম চীন যুদ্ধ (১৮৪০-৪২): ঊনবিংশ শতকের আরম্ভ হইতে চীনে এক গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিল। ইওরোপীয় বণিক্‌গণের ব্যবসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহারা কোনমতেই আর পিকিং সরকারের শুভেচ্ছা বা দুর্নীতিপরায়ণ চীনা-রাজকর্মচারীদের খেয়াল-খুশির উপর নিজেদের লাভজনক ব্যবসা ছাড়িয়া দিতে পারিল না। অতঃপর তাহারা নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য সংরক্ষণের জন্য সংঘবন্ধ হইল। এই কার্যের প্রধান উদ্যোক্তা ছিল ইংল্যাণ্ড। ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা চীনে অধিকতর বিস্তারলাভ করায় কোম্পানী বাণিজ্যিক বিধিনিষেধ

তুলিয়া লওয়ার ও সমতার ভিত্তিতে চীনের সহিত সন্ধিপত্র রচনা করার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। কোম্পানীর আনুকূল্যে ব্রিটিশ সরকার এই বিষয়ে অগ্রসর হইলেও চীনা সরকার সমতার ভিত্তিতে বিদেশীগণের সহিত বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন রাজা তৃতীয় জর্জের পত্রের উত্তরে চীনা সম্রাট এইরূপ লিখিয়াছিলেন, "As your ambassador can see for himself, we possess all things. I set no value on objects strange or ingenious, and I have no use for your country's manufactures." চীনা সরকার এইরূপ ঘোষণা করিলেন যে ইওরোপের দেশগুলি চীনা-সাম্রাজ্যে ব্যবসা করিতে চাহিলে চীনা সরকারের শর্তানুসারেই তাহা করিতে হইবে।

ইওরোপীয় বণিক্‌গণ কর্তৃক বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা

চীনে ইংল্যাণ্ড-রাজ কর্তৃক দূত প্রেরণ

ইংরাজ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে লর্ড আমহার্স্ট-এর চীনে আগমনের পর হইতে (১৮১৬ খ্রীঃ) চীন ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে মনোমালিন্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অপরদিকে এইসময় হইতে চীনে ইংল্যাণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক একাধিপত্য লোপ পাইলে চীনে একদল নূতন ইংরাজ বণিকের আবির্ভাব হইল। এই ইংরাজ বণিক্‌গণ বাণিজ্যিক স্বাধীনতা দাবি করিতে থাকে, অপরদিকে চীনা সরকার ইহাদের নিয়ন্ত্রিত করিতে বদ্ধপরিকর হন।

ইংরাজ বণিক্‌গণের বাণিজ্যিক স্বাধীনতা দাবি

এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে অহিফেন প্রশ্ন লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পাইল। পর্তুগীজগণের আগমনের পূর্বেই চীনারা অহিফেনের ব্যবহার জানিত। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের পর হইতে চীনে অহিফেনের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। চীনদেশে অহিফেন চালান দিয়া উক্ত কোম্পানী প্রভূত অর্থোপার্জন করিত। চীনা সরকার অহিফেন সেবনের কুফল হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করার নিমিত্ত আইন-প্রণয়ন করিয়া অহিফেন আমদানী নিষিদ্ধ করিলেও ইংরাজ বণিক্‌গণ গোপনে এই লাভজনক ব্যবসা চালু রাখিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে অহিফেন-ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইলেও দুর্নীতিপরায়ণ চীনা-রাজকর্মচারীগণের সাহায্যে এই ব্যবসা চলিতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও অহিফেনের আমদানী বন্ধ না হওয়ায় অবশেষে চীনা সম্রাট ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে লিন (Leen) নামে এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকে উহা বন্ধ করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। লিন ইংরাজ বণিক্‌দের দুইটি জাহাজ তল্লাসী চালাইয়া প্রায় ২০,০০০ অহিফেন বোঝাই বাক্স উদ্ধার করিয়া সেগুলি পোড়াইয়া ধ্বংস করিলেন। অতঃপর ইংরাজ বণিক্‌গণ এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবে না লিন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দাবি করিলেন।

চীনে অহিফেন ব্যবসার প্রসার এবং চীনা সরকার কর্তৃক অহিফেন-বর্জন নীতি গ্রহণ

দীর্ঘকাল ধরিয়া উভয়পক্ষে বাদানুবাদ চলিল কিন্তু বস্তুতঃ কোন পক্ষই শান্তি স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল না। এক কথায় বলিতে গেলে উভয় পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এইরূপ পরিস্থিতিতে ক্যান্টন নদীতে দুইটি ইংরাজ জাহাজ হইতে একটি চীনা জাহাজের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। এই গুলিবর্ষণ উপলক্ষ্য করিয়া চীন ও ইংল্যান্ডের মধ্যে যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয় তাহা প্রথম চীন যুদ্ধ (First Chinese War) বা প্রথম অহিফেন যুদ্ধ (First Opium War) নামে খ্যাত। প্রায় দুই বৎসরকাল যুদ্ধ চলার পর চীন পরাস্ত হয় এবং ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে নানকিং-এর সন্ধি (Treaty of Nanking) দ্বারা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

চীনা জাহাজের উপর গুলিবর্ষণ ও প্রথম চীন যুদ্ধ (অহিফেন যুদ্ধ)

নানকিং-এর সন্ধি ঃ এই সন্ধি অনুযায়ী চীনা সরকার হংকং বন্দর ইংল্যান্ডকে ছাড়িয়া দিতে এবং ক্যান্টন, ফুচৌ, নিংগপো, অ্যাময় ও সাংহাই এই পাঁচটি বন্দরে ইওরোপীয় বণিকগণের অবাধ বাণিজ্যাধিকার প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই সকল বন্দরে ইওরোপীয়গণ তাহাদের নিজ নিজ কনসাল (Consul) নিযুক্ত করিবার অধিকার পাইল। এতদ্ভিন্ন চীনা সরকার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ প্রদান করিতে এবং ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে চীনের সমতুল্য মর্যাদা দান করিতেও বাধ্য হইলেন।

ইংল্যান্ডের এই সাফল্যকে ভিত্তি করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইওরোপের সুদূর-প্রাচ্য নীতি রচিত হইল। ইওরোপের নিকট চীনের দ্বার উন্মুক্ত হইল, জাপান বিশ্বরাষ্ট্রনীতিতে প্রবেশ করিল এবং ইহার ফলস্বরূপ প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমস্যার উদ্ভব হইল। ইংল্যান্ডের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া একে একে ফ্রান্স, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, পর্তুগাল প্রভৃতি রাষ্ট্র চীনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তার করিতে অগ্রসর হইল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রও এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত রহিল না।

সন্ধির গুরুত্ব

দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ (১৮৫৬-৫৮) ঃ নানকিং-এর সন্ধি এবং পরবর্তী ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের সহিত চীনের সন্ধি স্থাপনের ফলে ইওরোপীয় বণিকগণ চীনে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু চীনের সহিত সমমর্যাদা লাভ বা চীনা সরকারের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা তখনও সম্ভব হয় নাই। অপরদিকে নানকিং সন্ধির শর্তাদি পালন করিতে চীনা সরকার মোটেই যত্নবান ছিলেন না বরং তাহা অমান্য করিতেই চীন সরকার আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। এই অবস্থায় ইংরাজ বণিকগণ নানকিং সন্ধির পুনর্বিবেচনা দাবি করিল।

নানকিং সন্ধি লঙ্ঘন করিতে চীনা সরকারের আগ্রহ

একথা অনস্বীকার্য যে প্রথম চীন যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে চীনের সামরিক শক্তি

সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া চীনে অধিকতর বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে উৎসাহিত হয়। একদিকে বাণিজ্যিক লোভ ও অপরদিকে উৎকৃষ্ট সামরিক শক্তির অধিকারী হওয়ায় ইওরোপীয়গণের মনে আক্রমণাত্মক মনোভাব জাগিয়া উঠে। এইরূপ মনোভাবই দ্বিতীয় চীন যুদ্ধের কারণ হইল এবং এই যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের সহিত ফ্রান্সও যোগদান করিল।

ইওরোপীয়গণের আক্রমণাত্মক মনোভাব

প্রথম চীন যুদ্ধের ন্যায় দ্বিতীয় চীন যুদ্ধও অতি তুচ্ছ কারণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ প্রচারের অপরাধে চীনা রাজকর্মচারী একজন ফরাসী ধর্মযাজককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলে চীনে অবস্থিত ফরাসী রাষ্ট্রদূত এই দণ্ডের প্রতিবাদ করিয়া দাবি করেন যে ফরাসী নাগরিকগণকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার একমাত্র ফরাসী বিচারালয়েরই আছে, অন্য কাহারও নাই। সেই বৎসরই অহিফেনের চোরাই ব্যবসায়ে লিপ্ত একটি ব্রিটিশ জাহাজ (Arrow) ব্রিটিশ পতাকা উত্তোলন করিয়া যাইবার অপরাধে চীনা সরকার উক্ত জাহাজের কর্মচারীগণকে দণ্ডিত করেন। ইহার ফলে ব্রিটিশ পতাকাকে অপমান করা হইয়াছে বলিয়া ব্রিটিশ সরকার ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স উভয়েই চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার উপযোগী অজুহাত পাইল। ফরাসীরাজ তৃতীয় নেপোলিয়ন ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় স্থাপিত ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী পুনঃস্থাপন করিয়া চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার প্রস্তাব করেন। ফলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুগ্মভাবে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া চীনের রাজধানী পিকিং পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া চীনা সম্রাটের রাজপ্রাসাদ ধ্বংস করে। এই অবস্থায় চীন সরকার সন্ধির প্রস্তাব করেন।

দ্বিতীয় চীন যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ

তিয়েনসিনের সন্ধি (Treaty of Tientsin) দ্বারা (১) চীনা সরকার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে প্রভূত অর্থ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন, (২) ইংরাজ ও ফরাসী বণিক্‌গণকে তাহাদের দাবি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে হইল, (৩) চীন সরকার পিকিং-এ বিদেশী রাষ্ট্রদূত রাখিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, (৪) পাস-পোর্টের সাহায্যে বিদেশীগণকে চীন-সাম্রাজ্যে অবাধে ভ্রমণ করার এবং খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণকে সাম্রাজ্যের মধ্যে অবস্থান করার অধিকার দেওয়া হইল, (৫) এগারোটি নূতন বন্দর অর্থাৎ নানকিং-এর সন্ধি অনুযায়ী পাঁচটি বন্দর লইয়া মোট ষোলটি বন্দর বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করা হইল, (৬) বিদেশীগণকে অতি রাষ্ট্রীক ক্ষমতাও (Extra territorial rights) দেওয়া হইল।

তিয়েনসিনের সন্ধি (১৮৬১)

৬.৩. তিয়েনসিন-এর সন্ধি হইতে সিমোনসেকির সন্ধি পর্যন্ত চীনের ইতিহাস ঃ উপর্যুপরি দুইটি পরাজয়ের ফলে চীনের দ্বার বিদেশীদের নিকট উন্মুক্ত হয় এবং

চীনের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাও প্রকট হইয়া পড়ে। অতঃপর বিদেশীগণ কর্তৃক অর্থনৈতিক শোষণ ও চীনের রাজ্যগ্রাস শুরু হয়। (১৮৬০ হইতে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে চীনের ইতিহাসের তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, চীনে ইওরোপীদের অর্থনৈতিক শোষণ; দ্বিতীয়তঃ, চীনের রাজ্যগ্রাস এবং তৃতীয়তঃ, জাপান কর্তৃক এই রাজ্যগ্রাস ব্যাপারে সক্রিয় অংশগ্রহণ।)

চীনা-ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য (১৮৬০-১৮৯৫) চীনের অর্থনৈতিক শোষণ, চীনের সাম্রাজ্যাংশ অধিকার এবং জাপানের উত্থান

তিয়েনসিন সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরবর্তী তিন বৎসরের মধ্যে ইওরোপের প্রায় সকল রাষ্ট্রই চীনের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করিল। ব্রিটেনের ব্যবসা প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি পাইল। দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সাতটি বিদেশী রাষ্ট্র ব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, রাশিয়া, নরওয়ে এবং সুইডেন চীনের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করিল। পুনরায় পরবর্তী ত্রিশ বৎসরের মধ্যে প্রাশিয়া, ডেনমার্ক, স্পেন, বেলজিয়াম, ব্রেজিল, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলিও চীনের সহিত অনুরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইল।

মার্গারী নামক একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি চীনে নিহত হইলে ব্রিটেন তাহার সুযোগ লইয়া চীনের নিকট হইতে আরও কিছু সুবিধা আদায় করিল।

চেফু-বন্দোবস্তের (Chefoo Agreement, 1876) দ্বারা (১) আরও চারিটি বন্দর উন্মুক্ত করা হইল এবং ইয়াং-উপত্যকায় ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক স্বার্থ কায়েম হইল, (২) উপরি-উক্ত হত্যাকাণ্ডের জন্য চীনা সরকারকে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য করা হইল এবং ইংরাজ পর্যটকগণের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আদায় করা হইল।

চীনের অঙ্গচ্ছেদন : অর্থনৈতিক শোষণের সঙ্গে সঙ্গে চীন-সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদন আরম্ভ হইল। চীনের রাষ্ট্রীয় সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহার বাহিরের সকল অঞ্চল একে একে বিদেশীগণের অধিকারভুক্ত হইল।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনে সংঘটিত তাইপিং (Taiping Rebellion) বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া রাশিয়া আমুর নদী পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ড দখল করিল। দুই বৎসর পর, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে চীনের মিত্র হিসাবে রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ার সামুদ্রিক অঞ্চল নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিল।

রাশিয়ার লাভ

সেডানের যুদ্ধে (১৮৭০ খ্রীঃ) পরাজিত হওয়ার পর হইতে ফ্রান্স সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল। চীনদেশে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করার পর চীন সাম্রাজ্যভুক্ত আনাম ও টংকিন (Annam & Tonkin) ফ্রান্স নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিল।

ফ্রান্সের লাভ

গ্রেটব্রিটেন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তারের বিশেষ পক্ষপাতি ছিল না এবং

সর্বদাই সুদূর-প্রাচ্যে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করা অপেক্ষা বাণিজ্য সম্প্রসারণেরই বেশী পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু ফ্রান্স কর্তৃক এই অঞ্চলে ভূখণ্ড লাভ হেতু ইওরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে ভার-সাম্য (balance of power) এবং ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখা দিলে ব্রিটেন ব্রহ্মদেশ ও তিব্বত অধিকার করিল (১৮৯০ খ্রীঃ)। ফ্রান্সও ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। অতঃপর ইটালী, জার্মানী ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রও পূর্ণশক্তিতে চীনের আসরে অবতীর্ণ হইল।

ব্রিটেনের লাভ

ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে জাপানও চীনের দুর্গতির সুযোগ লইয়া স্বীয় প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে উদ্যোগী হইল। বস্তুতঃ জাপানের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে চীন তথা সুদূর-প্রাচ্যের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনের নিকট হইতে লু-চু দ্বীপপুঞ্জ (Loochoo Islands) বলপূর্বক আদায় করিল। অতঃপর জাপান কোরিয়া (Korea) বলপূর্বক দখল করিতে অগ্রসর হইলে ১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন-জাপান যুদ্ধ (Sino-Japanes War) সংঘটিত হইল এবং চীন কোরিয়ার উপর নিজের অধিকার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। জাপান লিয়াওতাং উপদ্বীপ দখল করিতে অগ্রসর হইল কিন্তু ইওরোপীয় শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপের ফলে জাপান নিরস্ত হইল।

জাপানের লাভ

চীন-জাপান যুদ্ধের সময় রাশিয়া ও ফ্রান্স চীনকে প্রচুর ঋণ দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। উহার পুরস্কার স্বরূপ রাশিয়া উত্তরে মাঞ্চুরিয়া ও দক্ষিণে ইউনান ও কোয়াংটুং প্রদেশে রেলপথ নির্মাণ ও খনি সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা লাভ করিল। অপরদিকে ফ্রান্স আনাম ও টংকিন অঞ্চলে নিজের আধিপত্য সুদৃঢ় করার অধিকার পাইল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সাণ্টুং প্রদেশে দুইজন জার্মান ধর্মযাজক নিহত হইলে জার্মানী এই অজুহাতে ৯৯ বৎসরের জন্য কিয়াওচাও বন্দরের অধিকার চীনের নিকট হইতে আদায় করিল। জার্মানীর সাফল্যে অন্যান্য ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ আতঙ্কিত হইল এবং ভার-সাম্য বজায় রাখিবার দোহাই দিয়া তাহারা চীনের অংগচ্ছেদ করিতে নূতনভাবে উদ্যোগী হইল। ফ্রান্স কোয়াংচোয়াং বন্দর ও টংকিন হইতে ইউনান পর্যন্ত একটি রেলপথ নির্মাণের অধিকার আদায় করিল। রাশিয়া পোর্ট-আর্থার ও তালিয়েন-ওয়ান বন্দর দুইটি পঁচিশ বৎসরের জন্য ইজারা আদায় করিল এবং মাঞ্চুরিয়া হইতে ভ্লাডিভস্টক (Vladivostok) পর্যন্ত একটি রেলপথ নির্মাণের অধিকারও পাইল। এই বণ্টন প্রতিযোগিতায় ইংল্যাণ্ডও যোগদান করিল। "পোর্ট-আর্থার" যতদিন পর্যন্ত রাশিয়ার অধিকারভুক্ত থাকিবে ততদিনের জন্য ইংল্যাণ্ড ওয়ে-হাই-ওয়ে (Wei-hai-Wei) অঞ্চলের উপর অধিকার আদায় করিল।

নূতন করিয়া চীনের বণ্টন

এইভাবে চীন বিদেশী শক্তিবর্গের দ্বারা বণ্টিত হইল। উহার বাহিরের ভূখণ্ড পররহস্তগত হইল, উহার বাণিজ্য, শুল্ক এবং ডাকবিভাগও বিদেশীগণের নিয়ন্ত্রণাধীন

হইল। এমন কি চীনের অন্তর্দেশীয় রেলপথ বিদেশী মূলধনে নির্মিত হইল এবং উহার পরিচালনার ভারও বিদেশীগণের উপর ন্যস্ত হইল।

৬.৪. নিশ্চিত ধ্বংস হইতে চীনের পরিত্রাণ ঃ একদিকে ইওরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ এবং অপরদিকে জাপান কর্তৃক অনুসৃত পররাজ্যগ্রাস নীতির ফলে চীন-সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু কয়েকটি নূতন পরিস্থিতির উদ্ভবের ফলে চীনের রাষ্ট্রীয়-সত্তা রক্ষা পাইল।

(১) সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা ও বিরোধ এতই প্রবল ছিল যে তাহারা সম্মিলিতভাবে কোন কর্মপন্থা অনুসরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। সুদূর-প্রাচ্যে ভার-সাম্য বজায় রাখিতে যাইয়া পাশ্চাত্য শক্তিগুলি পরস্পর দ্বন্দ্বকলহে লিপ্ত হয়। প্রধানতঃ তাহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলেই চীনের ভৌমিক অক্ষুন্নতা রক্ষা পায়।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব

(২) আমেরিকা কর্তৃক 'উন্মুক্ত-দ্বার-নীতি' (Open door Policy) ইহার আর একটি কারণ। যদিও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র চীনের বাণিজ্যিক দ্বার উদ্ঘাটনের ব্যাপারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছিল তথাপি চীনে বিদেশীগণ কর্তৃক ভৌমিক সত্তা ও অতি-রাষ্ট্রিক ক্ষমতা স্থাপন আমেরিকার অভিপ্রেত ছিল না। আমেরিকার নীতি ছিল চীনের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করা, সাম্রাজ্য-স্থাপন নহে। চীনারা আমেরিকাকে তাহাদের মিত্ররূপেই জ্ঞান করিত। কোন যুদ্ধ না করিয়া আমেরিকাই সর্বপ্রথম পিকিং সরকারের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং দ্বিতীয় চীন যুদ্ধের পর কিছু অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়া লয়। কিন্তু চীনের বণ্টন ও চীন-সাম্রাজ্যের ভিতর অতি-রাষ্ট্রিক ক্ষমতা (extra territorial rights) স্থাপনের প্রচেষ্টা আরম্ভ হইলে আমেরিকা এইরূপ আশংকা করে যে চীন-সাম্রাজ্য পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে বণ্টন হইয়া গেলে আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি হইবে। ফ্রান্স কোয়াংসিতে, জাপান ফুকিয়েনে, ইংল্যাণ্ড ইয়াংসিতে এবং রাশিয়া মাঞ্চুরিয়াতে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিপন্থী শুল্ক-প্রাচীর গড়িয়া তুলিলে চীনের বাজার আমেরিকার হস্তচ্যুত হইবে এই আশংকায় আমেরিকা চীন-সাম্রাজ্যে 'উন্মুক্ত-দ্বার-নীতি' প্রয়োগের প্রস্তাব করিল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এইরূপ প্রস্তাব সম্বলিত পত্র বা নোট লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, সেন্ট-পিটার্স-বার্গ, রোম ও টোকিওতে প্রেরণ করিয়া আমেরিকা প্রস্তাব করিল যে (১) চীনে সকল রাষ্ট্রই বাণিজ্যিক সম-অধিকার ভোগ করিবে, (২) সকল রাষ্ট্রের প্রতি একই রকমের পোত এবং বাণিজ্যিক শুল্ক ধার্য করা হইবে এবং (৩) শুল্ক আদায়ের অধিকার চীনা সরকারের হাতে ন্যস্ত রহিবে। এক কথায়, এই উন্মুক্ত-দ্বার-নীতির উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার পরিবর্তে চীনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রবর্তন করা। রাশিয়া ভিন্ন প্রায় সকল রাষ্ট্রই আমেরিকার প্রস্তাবিত উন্মুক্ত-দ্বার-নীতি গ্রহণ করিল। গ্রেটব্রিটেন ও আমেরিকার স্বার্থ প্রায় একই রকমের হওয়ায় গ্রেটব্রিটেনও এই নীতি গ্রহণে সম্মত হইল।

'উন্মুক্ত-দ্বার-নীতি'

কেন এই নীতি

(৩) **বক্সার-বিদ্রোহ ঃ** (Boxer Rebellion, 1900) চীনে পাশ্চাত্য দেশগুলি কর্তৃক অনুসৃত রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার বিস্তারের বিরুদ্ধে শুধু যে আমেরিকাই প্রতিবাদ করিয়াছিল এমন নহে চীনও ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করিল। চীনা অধিবাসীগণের মধ্যে ক্রমশ এক অভূতপূর্ব জাতীয় চেতনার উদ্ভব হইল। চীনের বক্সার-বিদ্রোহই পাশ্চাত্য দেশগুলির বিরুদ্ধে চীনের আক্রমণাত্মক মনোভাবের প্রথম পরিচয়। এই বিদ্রোহ মুষ্ঠি-যোদ্ধার (boxer) ভ্রাতৃসঙ্ঘের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা ইতিহাসে 'বক্সার-বিদ্রোহ' নামে খ্যাত।

চীনবাসী কর্তৃক ইওরোপীয়দের বিরোধিতা

চীনের শিক্ষিত সম্প্রদায়, জাপান এবং ইওরোপীয় দেশগুলির আক্রমণাত্মক নীতির কবল হইতে চীনের স্বাতন্ত্র্য রক্ষাহেতু চীনের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে সংস্কার প্রবর্তন করিতে ক্রমশঃ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু চীনের প্রতিক্রিয়াশীল সম্প্রদায় স্বদেশের এই দুরবস্থার জন্য পাশ্চাত্য জাতিগুলিকেই সর্বতোভাবে দায়ি করিল, এমন কি তাহারা বিদেশী শিক্ষাকেও ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল। তাহাদের এই পাশ্চাত্য-বিরোধী ঘৃণা আত্মপ্রকাশ করিল বক্সার-বিদ্রোহে। তিনটি কারণে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল ঃ

বিদ্রোহের কারণ

(ক) জাপান কর্তৃক চীনের পরাজয় (১৮৯৬ খ্রীঃ), (খ) চীনে পাশ্চাত্য দেশগুলির ক্রমবিস্তার, এবং (গ) চীনা-সম্রাট কোয়াং-সু (Kwang-Su) কর্তৃক পাশ্চাত্য দেশগুলির অনুকরণে স্বদেশে সংস্কার প্রবর্তনের প্রচেষ্টা।

চীনের একাধিক অঞ্চলে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। চীনের সংস্কার-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল বিধবা সম্রাজ্ঞী বিদ্রোহের মূলে ইন্ধন যোগাইলেন। বিদ্রোহীদের হস্তে বহু বিদেশী স্ত্রী-পুরুষ ও খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ নিহত হইল। "বিদেশীগণকে ধ্বংস করিয়া সাম্রাজ্য রক্ষা কর" ("Exterminate the Foreigners and save the dynasty") ইহাই ছিল বিদ্রোহীদের একমাত্র ধ্বনি। বিদ্রোহীগণ পিকিং ও তিয়েনসিন অধিকার করিল এবং রাজধানীতে চীনা সৈনিকগণ এই বিদ্রোহে যোগদান করিল। প্রায় ছয় সপ্তাহ বিদ্রোহীদের ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ড চলিবার পর অবশেষে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের এক সম্মিলিত আন্তর্জাতিক বাহিনী আসিয়া বিদ্রোহ দমন করিল। বিধবা সম্রাজ্ঞী ও চীনের উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ পিকিং হইতে পলায়ন করিলেন। এই বিদ্রোহের ফলে—(১) চীনা সরকারকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য করা হইল, (২) উত্তর-চীনে বিদেশী সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হইল এবং (৩) বিদেশী বণিক্‌গণকে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে চীনা সরকারকে বাধ্য করা হইল।

বিদ্রোহ আরম্ভ

বিদ্রোহের ব্যর্থতা

বিদ্রোহের ফলাফল

যদিও এই বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল, তথাপি ইহা পাশ্চাত্য দেশগুলির প্রতি এক বিপজ্জনক সংকেত জ্ঞাপন করিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সচিব জন হে (John Hay) 'উন্মুক্ত-দ্বার-নীতি' পুনঃ সমর্থন করিয়া ঘোষণা করিলেন যে চীনের রাষ্ট্রীয় অক্ষুণ্ণতা রক্ষা করাই যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমেরিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ইংল্যাণ্ড ও জার্মানী একটি অঙ্গীকারপত্র রচনা করিয়া ঘোষণা করিল যে চীনের বর্তমান তথা জটিল পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া তাহারা তথায় কোন প্রকার ভৌমিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিবে না এবং কোন রাষ্ট্র তাহা করিতে চেষ্টা করিলে তাহারা সম্মিলিত ভাবে উহাতে বাধা প্রদান করিবে। সুতরাং বক্সার-বিদ্রোহের ফলে চীনে রাষ্ট্রীয় অক্ষুণ্ণতা রক্ষা পাইল।

বক্সার-বিদ্রোহের গুরুত্ব

(৪) ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী: (Anglo-Japanese Alliance, 1902): ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত ইঙ্গ-জাপান সন্ধি চীন-সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন প্রতিরোধ করে। সুদূর-প্রাচ্যে রাশিয়ার রাজ্যলিপ্সা ইংল্যাণ্ড ও জাপানের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। বক্সার-বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ায় স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিলে ইংল্যাণ্ড ও জাপানের এই ভীতি অধিকতর তীব্র হইয়া উঠে এবং উভয় রাষ্ট্র একটি পরস্পর সাহায্যমূলক সন্ধি সম্পাদন করে। রাশিয়া ইহাতে ভীত হইয়া সুদূর-প্রাচ্যে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না।

মৈত্রীর কারণ

জাপানের ইতিহাস

৬.৫. ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত জাপানের ইতিহাস: জাপানীরা উহাদের দেশকে বলিত 'নিপ্পন' অথবা 'উদীয়মান সূর্যের দেশ'। জাপানের অভ্যুদয়ের ইতিহাস বিচিত্র। চীনের ন্যায় জাপানও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বহির্জগত হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। বিদেশীগণকে স্বদেশে প্রবেশাধিকার দিতে উহারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। জাপানীদের দেশাত্মবোধ ছিল গভীর এবং যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করা ছিল উহাদের মহান গুণ। জাপানীদের ধর্ম সিন্তোবাদ (Shintoism) উহাদিগকে দেবতার প্রতি ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রেমের শিক্ষাও দিয়াছিল। দেশ-প্রেম উহাদের ধর্মের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য।

জাপানের আত্মগোপন

জাপানী কর্তৃপক্ষ কোন বিদেশীকে জাপানে প্রবেশাধিকার প্রদান না করিলেও ষোড়শ শতাব্দীর অবসানের পূর্বে পর্তুগাল, স্পেন ও নেদারল্যাণ্ডের বণিকগণ বাণিজ্য অন্বেষণে জাপানে প্রবেশ করে এবং ইহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ক্যাথলিক মিশনারীগণও তথায় দলে দলে আসিতে আরম্ভ করে। কিন্তু মিশনারীগণ কর্তৃক বহু জাপানী খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হইলে জাপানে ইহাদের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। উপরন্তু বিদেশীগণ জাপানী আইনও অমান্য করিতে থাকে। আমেরিকার খ্রীষ্টান মিশনারীগণের কার্যকলাপ জাপানীদের নিকট

বিদেশীগণের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ

অবিদিত ছিল না। উহারা এইরূপ আশঙ্কা করিল যে ধর্মপ্রচারের সুযোগ লইয়া একদিন মিশনারীগণ উহাদের স্বদেশভূমি সামরিক শক্তির সাহায্যে দখল করিয়া লইবে। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই জাপানে খ্রীষ্টান মিশনারীগণের আগমন নিষিদ্ধ হয় এবং ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে দুইটি রাজকীয় অনুশাসন জারী করিয়া বিদেশীগণের নিকট জাপানের দ্বার রুদ্ধ করা হয়। অপরদিকে জাপানীগণের পক্ষে বিদেশযাত্রাও নিষিদ্ধ হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জাপানে সামন্ত-প্রথা প্রচলিত ছিল। মিকাডো বা সম্রাটই ছিলেন জাতির জনক। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তিনি নামেমাত্র সম্রাট ছিলেন। রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা সোগুণ (Shogun) নামে এক অভিজাত পরিবারের হস্তে চলিয়া গিয়াছিল। সোগুণই ছিলেন সকল ক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁহার রাজপ্রাসাদ ইয়েডো (Yedo) ছিল রাষ্ট্রের প্রধান কেন্দ্র।

সোগুণ পরিবারের কর্তৃত্ব

৬৬. আমেরিকা কর্তৃক জাপানের দ্বার উদ্ঘাটনঃ জাপানকে উহার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আত্মগোপনতা হইতে বিশ্বের দৃষ্টির সম্মুখে আনয়ন করিতে যিনি মুখ্যতঃ সাহায্য করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন আমেরিকার নৌ-বিভাগের সেনাপতি কমোডোর পেরী (Commodore Perry)। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে আমেরিকা পশ্চিমাভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া জাপানের উপকূলে আসিয়া উপনীত হয়। আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্বার্থ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নৌ-ঘাঁটি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত দেশগুলির সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনেও আগ্রহী হইয়া উঠে।

কমোডোর পেরীর দুইবার জাপানে আগমন

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কমোডোর পেরী কয়েকটি রণপোতসহ টোকিওতে উপস্থিত হন। জাপানের নিকটবর্তী সমুদ্রে বিপদগ্রস্ত আমেরিকার নাবিকগণের নিরাপত্তার জন্য তিনি জাপানী কর্তৃপক্ষের নিকট তথাকার কয়েকটি বন্দর ব্যবহার করার অধিকার দাবি করেন। অধিকন্তু জাপানী বন্দর হইতে আমেরিকার জাহাজগুলির প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় এবং তথায় আমেরিকার জাহাজবাহী দ্রব্যাদি বিক্রয় করার অধিকারও দাবি করেন। উপরি-উক্ত দাবিসমূহ জানাইয়া কমোডোর পেরী প্রস্থান করেন। পর বৎসর (১৮৫৪ খ্রীঃ) পেরী আটখানি রণতরী লইয়া পুনরায় জাপানের উপকূলে উপনীত হইয়া জাপানী সরকারের উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও জাপানের কর্তৃপক্ষ আমেরিকার দাবির কিয়দংশ স্বীকার করিয়া লন। একটি সন্ধিপত্র রচনা করিয়া জাপানের দুইটি বন্দর আমেরিকার নিকট উন্মুক্ত করা হয়। এই সন্ধির ফলে জাপানের সহিত বহির্জগতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অতঃপর জাপানের উপকূলে নৌ-ঘাঁটি স্থাপনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ইংল্যাণ্ড জাপানের সহিত মৈত্রীসূত্রে

ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সহিত জাপানের বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন

আবদ্ধ হয়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইওরোপের প্রায় পনেরোটি রাষ্ট্রের সহিত জাপানের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

জাপানে গণ-বিপ্লব ও পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণে রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন : বহির্জগতের সহিত যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ার পর হইতে দ্রুতগতিতে জাপানের রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে এক আমূল পরিবর্তন আসে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যযুগের ইওরোপের ন্যায় জাপানে সামন্ত-প্রথা প্রচলিত ছিল। 'মিকাডো' বা সম্রাট নামেমাত্র জাপানের সর্বময় অধিকর্তা ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সোগুণ (Shogun) উপাধিধারী এক অভিজাত পরিবারের উপরই রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা অর্পিত ছিল। আভিজাত্যের দিক হইতে জাপানের সমাজ ছিল, তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—সোগুণ (Shogun), ডাইমিও (Daimio) এবং সামুরাই (Samurai)। রাষ্ট্র ও সমাজের সকল কর্তৃত্ব এই তিনটি শ্রেণীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। সাধারণ শ্রেণীর নাগরিকেরা সকল প্রকার অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত ছিল।

সমাজে অভিজাতশ্রেণীর প্রাধান্য

পাশ্চাত্য দেশগুলির সহিত অসম-চুক্তি (Uneqal Treaties) সম্পাদিত হইলে জাপানে তীব্র বিদেশী-বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হইল। বিদেশী-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সোগুণ-বিরোধী আন্দোলনেরও সূত্রপাত হইল। জাপানের জনগণ সোগুণতন্ত্র বিলোপ করার জন্য সোচ্চার হইয়া উঠিল। সোগুনের অবস্থা সঙ্গীণ হইয়া উঠিল। ইহা অনস্বীকার্য যে বিদেশীদের শক্তির প্রবল চাপেই তিনি জাপানের দ্বার উহাদের নিকট উম্মুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চিম-জাপানের ডাইমিওগণ সোগুণের এই কাজকে চিরাচরিত নীতির অবমাননা ও ধর্ম-বিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিল। ডাইমিওগণ সোগুণের অপসারণের দাবি ও সেই সঙ্গে সম্রাট বা মিকাডো-র স্বগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি করিল। জাপানের অভিজাতগণের অনেকেই বিদেশীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছিল এবং বিদেশীদের 'বর্বর' বলিয়া জাপানী জনগণের মধ্যে ঘৃণার সঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু দুইটি ঘটনা সংঘটিত হইলে এই আন্দোলনের রূপ পরিবর্তিত হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে জনৈক ইংরাজ নিহত হইলে ইংরাজ সৈন্যবাহিনী জাপানের কাগোসিমা শহরটি বোমা দ্বারা বিধ্বস্ত করিল। পরবৎসর জাপানে একজন সামন্ত বিদেশী নৌবহরের উপর গুলিবর্ষণ করিলে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড ও আমেরিকার রণতরী সম্মিলিতভাবে সিমোনসেকি শহরে বোমা নিক্ষেপ করিয়া প্রভূত ক্ষতিসাধন করিল। এই দুইবার পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি উহাদের সামরিক শক্তি প্রদর্শন করিলে জাপান উপলব্ধি করিল যে বিদেশীদের হস্তে অনিবার্য ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইতে হইলে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে স্বীকার করিয়া উহাদের আদর্শ অনুকরণে দেশকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। এইরূপ মনোভাবের ফলে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের রাজনীতিক্ষেত্রে এক বিপ্লবের সৃষ্টি হইল।

জাপানের অভ্যন্তরীণ বিপ্লব

সোগুণ পরিবারের আধিপত্য হইতে জাপানের সম্রাটকে মুক্ত করা হইল। সোগুণ, ডাইমিও ও সামুরাই—এই তিনটি শ্রেণীর সকল প্রকার অধিকার বিলুপ্ত করা হইল। সম্রাট মুৎসুহিটো (Mutsuhito)-কে তাঁহার বিচ্ছিন্ন অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া ইয়েডো-নগরে স্বগৌরবে সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করা হইল। তাঁহার রাজত্বকালকে 'মেজি' (Meji) নামকরণ করা হইল। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে জানুয়ারী জাপানে মেজি-যুগের সূচনা হইল এবং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই সম্রাট মুৎসুহিটো-র মৃত্যু হইলে এই যুগের অবসান হইল। বিনা রক্তপাতে জাপানে যে বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল তাহা জাপানের ইতিহাসে 'Restoration' নামে পরিচিত।

৬.৭. **অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন** (Internal Reconstruction): সোগুণতন্ত্রের অবসান ও সম্রাটের পূর্ব গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা জাপানের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা করে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই জাপানের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আসে। জাপানে কেন্দ্রীয়করণের পথ প্রশস্থ হয় যাহা সেই সময় নিতান্তই প্রয়োজন ছিল। কেন্দ্রীয়করণের পথে প্রধান অন্তরায় ছিল সামন্ত-প্রথা। সুতরাং প্রথমেই সামন্ততন্ত্রের বিলোপসাধন করা হয়। পশ্চিম-জাপানের চারিজন ক্ষমতাশালী অভিজাতগণ (ডাইমিওগণ) যাঁহারা সম্রাটকে পূর্ব গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বেচ্ছায় নিজেদের পদ, গৌরব ও জমিদারি সমর্পণ করেন। ইঁহাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া অপরাপর সামন্তগণ তাঁহাদের জমিদারি সমর্পণ করিয়া সাধারণ পর্যায়ভুক্ত হন। পূর্বতন সামরিক শ্রেণী বা সামুরাইগণও তাঁহাদের শ্রেণীগত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বর্জন করেন। এইভাবে জাপানে বহুকাল যাবৎ প্রচলিত সামন্ত-প্রথার বিলুপ্তি ঘটে এবং জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে জাপানের অভ্যুত্থানের পথ সুগম হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এক রাজকীয় অনুশাসনবলে সামন্ত-প্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। সামন্ত-প্রথার বিলুপ্তি ঘটিলে মিকাডো-র অধীনে কেন্দ্রীয় শাসন শক্তিশালী হইয়া উঠে। সুবিধাভোগী সকল শ্রেণী স্বেচ্ছায় সকল সুবিধা সমর্পণ করার এই দৃষ্টান্ত বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

সামন্ত-প্রথার বিলোপ

সামন্ত-প্রথা বিলুপ্ত হইলে সামুরাই শ্রেণীর যুদ্ধ করার বংশগত অধিকারও বিলুপ্ত হয়। যুদ্ধ করার অধিকার ও দায়িত্ব সকল শ্রেণীর উপর সমভাবে বর্তায়। পূর্বতন সামন্ত-সৈন্যবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন জাতীয় বাহিনী গঠন করা হয় এবং সকল শ্রেণী হইতে সৈন্য সংগ্রহ করার রীতি প্রবর্তিত হয়।

জাতীয় সৈন্যবাহিনী

ইহার পর শুরু হয় পাশ্চাত্যকরণ (Wasternisation) নীতি। সোগুণতন্ত্রের বিলুপ্তির পর যাঁহারা পাশ্চাত্যকরণ নীতির প্রবল সমর্থক ছিলেন, তাঁহারা রাষ্ট্রে অত্যন্ত প্রভাবশালী হইয়া উঠেন। তাঁহাদের সরকারী নীতি ছিল পাশ্চাত্যের অনুকরণে জাপানের শিক্ষা ও সংস্কৃতি গড়িয়া তোলা। জাপান পাশ্চাত্যের আদর্শে আধুনিক হইবার জন্য

পাশ্চাত্যকরণ

যত্নশীল হয় এবং এই পাশ্চাত্যকরণ এমন নিপুণভাবে সম্পন্ন করা হয় যে শীঘ্রই জাপান সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। মধ্যযুগের সংস্কৃতি ও সভ্যতার এত দ্রুত রূপান্তর বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিয়া জাপান পাশ্চাত্য দেশগুলিকেও হার মানাইয়া দেয়।

সম্রাটকে পূর্ব গৌরবে ফিরিয়া আনার পর শুরু হয় সাংবিধানিক সরকার গঠনের আন্দোলন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট এক নূতন সংবিধানের কথা ঘোষণা করেন।

নূতন সংবিধান

এই নূতন সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করেন যুবরাজ ইটো (Ito) এবং প্রাশিয়ার অনুকরণেই জাপানের নূতন সংবিধান রচিত হয়। নূতন সংবিধান অনুসারে সম্রাট রাষ্ট্রের প্রধান ও সকল ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হন। অভিজাতদের ও জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে 'ডায়েট' (Diet) সম্রাটকে প্রশাসনে সাহায্য করিবে স্থির হয়। রাষ্ট্রের মন্ত্রিগণ সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহারা সম্রাটের নিকট দায়ী রহিবেন স্থির হয়। সংবিধানে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

নূতন আইন-বিধি

ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার অনুকরণে নূতন আইন-বিধি রচিত হয়। পূর্বতন আমলের কতকগুলি নির্যাতনমূলক আইন বাতিল করা হয়।

জাতীয় শিক্ষা-নীতি গৃহীত হয় এবং নারী, পুরুষ সকলের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী বিদ্যালয়গুলিকে রাষ্ট্রের

শিক্ষা-নীতি

নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। সকল স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষাকে আবশ্যিক করা হয় এবং বিদেশী শিক্ষকদের আমন্ত্রণ জানান হয়। ইওরোপীয় বর্ষপঞ্জী জাপানে গৃহীত হয়। সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় এবং প্রাশিয়ার অনুকরণে স্থলবাহিনী এবং ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে নৌ-বাহিনী সংগঠন করা হয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বহু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রবর্তন করা হয়। জাপানের সর্বত্র রেলপথ, ডাক ও টেলিগ্রাফ, বাষ্পীয় জাহাজ কারখানা ও বন্দর স্থাপন করা

অর্থনৈতিক পরিবর্তন

হয়। দেশের শিল্প ও বাণিজ্য-সম্পদ সম্প্রসারণ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানা স্থাপন করা হয়।

পাশ্চাত্য আদর্শ অনুকরণ করিয়া আধুনিকতার পথে অগ্রসর হইলেও; একথা অনস্বীকার্য যে জাপান কখনও স্বজাত্যবোধ বিসর্জন দেয় নাই। নিজের জাতীয় সত্তাকে বজায় রাখিয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রবর্তন করাই জাপানী সংস্কারকামীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল।

জাপানের এই দ্রুত রূপান্তর পূর্বতন যুগের প্রতিক্রিয়াশীলদের মনঃপূত হয়

নাই। এই সকল প্রগতিমূলক সংস্কার উহাদের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। জাপানের বহু স্থানে সংস্কার-বিরোধী হাঙ্গামা এক এক সময় ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই প্রসঙ্গে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের হাঙ্গামা উল্লেখ্য। এই বিক্ষোভের নেতা ছিলেন সাতসুমার সামুরাই সাইগো (Saigo)।

সংস্কার-বিরোধী বিক্ষোভ

'নব্য জাপানের' স্রষ্টাদের মধ্যে ইয়ামাগাতা (Yamagata), ইটো (Ito), ইতাগাকি (Itagaki) ও ওকুমা (Okuma)এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইয়ামাগাতা একজন সমরবিদ্ ও রাজনীতিবিদ্ ছিলেন। জাপানের নতুন সৈন্যবাহিনী গঠন তাঁহার কৃতিত্ব। তিনি ছিলেন সমরনীতিতে বিশ্বাসী। কাউন্ট ইটোকে জাপানের নূতন শাসনতন্ত্রের জনক বলা হইয়া থাকে। তিনি জার্মানীর শাসনতন্ত্রের অনুকরণে জাপানের শাসনতন্ত্র রচনা করেন। ইতাগাকিকে জাপানের রুশো (Rousseau) বলা হইয়া থাকে। সোগুণ পরিবারের ক্ষমতা বিলুপ্ত করিয়া সম্রাটের বিনষ্ট ক্ষমতা ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। তিনি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার স্থাপনের সমর্থক ছিলেন। ওকুমা ছিলেন শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রধান সমর্থক এবং জাপানের 'প্রগ্রেসিভ'পার্টি'র' নেতা। তিনি সাম্রাজ্যবাদ-নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন।

নব্য-জাপানের স্রষ্টা

৬.৮. জাপানের পররাষ্ট্রনীতি (Foreign Policy 1867-1905) : ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপানের ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল জাপানের সাম্রাজ্যবাদ। বিংশ শতাব্দীতে জাপানকে কেন্দ্র করিয়াই প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমস্যাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্রনীতির মূলে রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক কারণও ছিল।

সাম্রাজ্যবাদের পথে জাপান

জাপানের প্রথম লক্ষ্য হইল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্য দেশসমূহের সহিত যে সকল অসম-সন্ধিপত্র সম্পাদিত হইয়াছিল সেগুলি বর্জন করা। উক্ত সন্ধিগুলির দ্বারা বিদেশীগণের উপর জাপানের কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছিল এবং এমন কি বাণিজ্যিক শুল্কও উহাদের তত্ত্বাবধানের রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রথমেই জাপান ঐ সন্ধিপত্র প্রত্যাহারের দাবি জানাইল। এই উদ্দেশ্যে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবর্গের নিকট রাষ্ট্রদূত পাঠাইয়াছিল কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এই অবস্থায় জাপান বুঝিতে পারিল যে সামরিক শক্তির প্রয়োগ ভিন্ন উহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং আত্মরক্ষা ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে জাপান এক তেজস্বী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করিল এবং পাশ্চাত্য দেশগুলির অনুকরণে রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হইল।

রাজনৈতিক কারণ

অর্থনৈতিক কারণেও জাপান সাম্রাজ্যবাদ-নীতি গ্রহণে বাধ্য হয়। চারিটি দ্বীপ-পুঞ্জ লইয়া জাপানের মূল ভূখণ্ড গঠিত যথা হনসু, হোক্কাইডো, শিককু ও

কিউশিউ। ইহা ভিন্ন শতাধিক ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জও জাপানের অন্তর্ভুক্ত। জাপানের অধিকাংশ অঞ্চল পর্বতসংকুল এবং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উহার ভূখণ্ডেরঅর্ধাংশ ছিল বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। উহার পঞ্চ-ষষ্ঠাংশ জমি ছিল কৃষির অনুপযোগী। অথচ জাপানের অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান ভিত্তি হইল কৃষি। খনিজ সম্পদের দিক দিয়াও জাপান ছিল অনুন্নত। কয়লা, ইস্পাত ও কাঁচামালের জন্য জাপানকে বিদেশী রাজ্যের উপর নির্ভর করিতে হইত। ইহা ভিন্ন জাপানে যে পরিমাণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল তাহাতে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার জন্য স্থান সংকুলান করাও জাপানের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল। অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় উদ্বৃত্ত জাপানীদের বসবাসের কোন সুযোগ ছিল না। সর্বত্রই আইন করিয়া জাপানীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। ইওরোপ ও আমেরিকার ন্যায় জাপানেও শিল্প-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। কাঁচামাল আমদানি ও শিল্পজাত পণ্যের বিক্রয়ের জন্য, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রীর জন্য এবং উদ্বৃত্ত জাপানীদের বসবাসের জন্য জাপানের পক্ষে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

অর্থনৈতিক কারণ

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনের নিকট এই মর্মে দাবি করিল যে চীনা সরকার ইওরোপীয় রাষ্ট্রসমূহকে যে সকল বাণিজ্যিক ও ভৌমিক অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন জাপানকেও অনুরূপ অধিকার প্রদান করিতে হইবে। দুই বৎসর পর চীনের সহিত বিবাদ সৃষ্টি করিয়া জাপান লু-চু দ্বীপপুঞ্জ দখল করিয়া লইল। রাশিয়ার সহিত এক চুক্তি সম্পাদন করিয়া জাপান কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের উপর নিজের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করিল। ইহার বিনিময়ে জাপান রাশিয়াকে দক্ষিণ-শাখালিন (Sakhalin) প্রত্যর্পণ করিল। ইহার পর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কোরিয়ার (Korea) প্রশ্ন লইয়া চীনকে অবশেষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করিল।

জাপান কর্তৃক প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকার

(১) চীন-জাপান যুদ্ধ (Sino-Japanese War, 1894-95): কারণঃ কোরিয়ার অধিকার লইয়া চীন ও জাপানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই এই যুদ্ধের প্রধান কারণ। আইনতঃ কোরিয়া চীন-সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু চীনাশাসনের দুর্বলতা ও অক্ষমতাহেতু কোরিয়ায় অভ্যন্তরীণ গোলযোগ উপস্থিত হইলে তথায় পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির প্রতিপত্তি স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ইহাতে জাপান আশঙ্কিত হইয়া উঠে। কারণ কোরিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান এইরূপ যে জাপানের নিরাপত্তার দিক হইতে উহাকে জাপানের শাসনাধীনে আনিবার একান্ত প্রয়োজন ছিল। ইহা ছাড়াও মাঞ্চুরিয়া অভিমুখে রাশিয়ার অগ্রগতি জাপানের নিরাপত্তা ক্রমশঃ বিপজ্জনক করিয়া তুলিতেছিল। সুতরাং উপরি-উক্ত কারণেও জাপানের পক্ষে কোরিয়া দখল করা নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। কোরিয়া সম্পর্কে জাপানের

জাপানের নিকট কোরিয়ার গুরুত্ব

কোরিয়া সম্পর্কে জাপানের উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য ছিল দুইটি প্রথমতঃ, কোরিয়ায় চীনের আধিপত্য ও প্রভাব বিলুপ্ত করা ; দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজনীয় সংস্কারাদি প্রবর্তনের দ্বারা কোরিয়াকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার মত উপযোগী করিয়া তোলা। এই উদ্দেশ্য লইয়া ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কোরিয়ার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিল।

কোরিয়া ও চীনের সহিত জাপানের সন্ধি

ইহার পর জাপান চীনের সহিত এইরূপ শর্তে সন্ধি করিল যে উভয় রাষ্ট্রই একে অপরকে পূর্বাহ্নে জ্ঞাত না করিয়া কোরিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করিবে না। অধিকন্তু কোরিয়ার সংস্কারাদি প্রবর্তনের নিমিত্ত জাপান চীনের সহযোগিতা কামনা করিল। কিন্তু চীন উহাতে সম্মত না হওয়ায় অগত্যা জাপান নিজ দায়িত্বে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়া সরকারের নিকট এক চরমপত্র প্রেরণ করিয়া জাপান কর্তৃক নির্ধারিত সংস্কারাদি কোরিয়ায় প্রবর্তন করিবার দাবি জানাইল।

কোরিয়ার নিকট জাপানের চরমপত্র

কিন্তু কোরিয়ার রাজার অনমনীয় মনোভাব লক্ষ্য করিয়া জাপান অবশেষে কোরিয়া আক্রমণ করিল। কোরিয়ার রাজা বন্দী হইলেন। এই অবস্থায় চীন উহার প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে কোরিয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিল। কোরিয়ার রাজাকে সংস্কার প্রবর্তন করিতে বাধ্য করার জন্য জাপান চীনের নিকট প্রস্তাব করিল। কিন্তু চীন ইহাতে অসম্মত হইল এবং অধিকন্তু কোরিয়ার উপর উহার সার্বভৌমত্বের অধিকার দাবি করিল। কিন্তু জাপান কোনমতেই কোরিয়ার উপর নিজের অধিকার পরিত্যাগ করিতে রাজী হইল না। জাপান চীনকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করার জন্য চীনের এক সৈন্যবাহী জাহাজের উপর গুলিবর্ষণ করিল। ফলে উভয় পক্ষে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

যুদ্ধারম্ভ (১৮৯৪)

ইওরোপীয় পদ্ধতিতে সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত জাপবাহিনীর নিকট চীনাবাহিনী পরাস্ত হইল এবং কোরিয়া হইতে বিতাড়িত হইল। ইয়ালু নদীতে চীনের নৌ-বাহিনী বিধ্বস্ত হইল! বিজয়ী জাপবাহিনী অতঃপর মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিয়া পোর্ট-আর্থার দখল করিল এবং পিকিং অভিমুখে অগ্রসর হইল। রাজধানী অধিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে চীন ভীত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিল এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সিমোনসেকির সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটিল।

চীনের পরাজয়

সিমোনসেকির সন্ধি (Treaty of Shimonosheki) : এই সন্ধি অনুযায়ী (১) চীন পোর্ট-আর্থার, লিয়াওতাং উপদ্বীপ, ফরমোসা দ্বীপ এবং পেস্কাডোর প্রভৃতি স্থান জাপানকে সমর্পণ করিল, (২) জাপান যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এবং বাণিজ্যিক সুবিধালাভ করিল, (৩) কোরিয়ার স্বাতন্ত্র্য এবং তথায় জাপানের অবাধ অধিকার চীন কর্তৃক স্বীকৃত হইল, (৪) স্বীয় সামরিক শক্তি প্রদর্শন করিয়া জাপান ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গকে চমকিত করিতে চাহিয়াছিল, এই যুদ্ধে জাপানের সেই

উদ্দেশ্য সফল হইল, (৫) চীনের আরও চারিটি বন্দর বিদেশীদের নিকট উন্মুক্ত করা হইল।

যুদ্ধের ফলাফল (Results of the Sino-Japanese War) ঃ চীন-জাপান যুদ্ধ সুদূর-প্রাচ্যের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। "The Sino-Japanese War was the critical and decisive event in the modern history of the Far-East."

প্রথমতঃ, এই যুদ্ধের ফলে জাপানের সম্মান ও প্রতিপত্তি অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইল এবং ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের সহিত সম্পাদিত অসম-চুক্তিগুলি বাতিল করিতে জাপান সমর্থ হইল। অনতিবিলম্বে জাপান হইতে বিদেশীগণের অতিরাষ্ট্রীক অধিকার বিলুপ্ত হইল এবং জাপান ইচ্ছামত আমদানী-রপ্তানী শুল্ক নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার পাইল।

দ্বিতীয়তঃ, এই যুদ্ধের ফলে জাপানে এক নব-জাগরণের সৃষ্টি হইল। জাপান আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতন হইল এবং তাহা সাম্রাজ্যবাদের সূচনা করিল। অপরদিকে জাপানের এই আত্মসচেতনতা সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতিক্ষেত্রে এক নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি করিল। পরবর্তী পনেরো বৎসরের মধ্যে জাপান কোরিয়া স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিল এবং কুড়ি বৎসরের মধ্যে জাপান সাম্রাজ্যবিস্তারের পথে বহুদূর অগ্রসর হইল।

তৃতীয়তঃ, অতি সহজেই চীনকে পরাজিত করিয়া জাপান চীনের মৌলিক দুর্বলতা বিশ্বের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিল। ফলে চীনের উপর ইওরোপীয় রাষ্ট্রের শোষণ অধিকতর তীব্র হইল। চীনের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল।

চতুর্থতঃ, পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া চীনেও দেখা দিল। একদিকে জাপান ও ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে চীনের অধিবাসীগণের তীব্র অসন্তোষ এবং অপর-দিকে ইওরোপীয় আদর্শে চীনকে আধুনিক করিয়া তোলার আন্দোলন আরম্ভ হইল।

চীনে ইওরোপীয়গণের শোষণ

পঞ্চমতঃ, চীনের দুর্বলতার প্রমাণ পাইয়া ইওরোপীয় শক্তিবর্গ চীন-সাম্রাজ্য বণ্টন করিতে অগ্রসর হইল। চীনের ভৌমিক অখণ্ডতার প্রশ্ন তুলিয়া রাশিয়া জার্মানী ও ফ্রান্সের সমর্থনপুষ্ট হইয়া জাপানকে লিয়াওতাং উপদ্বীপ ও পোর্ট-আর্থার প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করিল। কিন্তু এই অখণ্ডতার প্রশ্ন একটি অজুহাত ভিন্ন আর কিছুই নহে। জাপানের অগ্রগতি প্রতিহত করাই ইওরোপীয় শক্তিবর্গের উদ্দেশ্য ছিল। জাপান উপলব্ধি করিল যে উহার প্রধান শত্রু হইল রাশিয়া। চীন-জাপান যুদ্ধের মধ্যে পরোক্ষভাবে রুশ-জাপান যুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল একথা বলা চলে। চীনকে সাহায্য করার পুরস্কার স্বরূপ রাশিয়া পঁচিশ বৎসরের মেয়াদে পোর্ট-আর্থার অধিকার করিল। দুইজন জার্মান মিশনারী নিহত হইলে উহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ জার্মানী চীনের নিকট হইতে ৯৯ বৎসরের মেয়াদে কিয়াওচাও নামক স্থানটি আদায় করিয়া লইল।

ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী ও ব্রিটেনের বিচ্ছিন্নতার-নীতির অবসান : ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ইওরোপের রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্রিটেন 'বিচ্ছিন্নতার-নীতি' (Policy of Isolation) অনুকরণ করিয়া আসিতেছিল এবং ইওরোপের ঘটনাবলীর প্রতি নির্লিপ্ত রহে। কিন্তু ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সহিত মৈত্রী (Anglo-Japanese Alliance-1902) স্থাপিত হইতে ব্রিটেনের বিচ্ছিন্নতার-নীতির অবসান হয়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জাপান সামুদ্রিক সম্প্রসারণ-নীতি গ্রহণ করে। জাপানের সম্প্রসারণের লক্ষ্য ছিল চীন। চীন-জাপান যুদ্ধে (১৮৯৪-৯৫) জাপান জয়লাভ করে এবং সিমোনসেকি-সন্ধি দ্বারা জাপান চীনের নিকট হইতে ফরমোসা ও লিয়াওতাং উপদ্বীপ আদায় করে। কিন্তু চীনের রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড দখল করার ব্যাপারে জাপান ছাড়াও ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানী প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলিও সমভাবে আগ্রহী ছিল। জার্মানী, রাশিয়া ও ফ্রান্সের চাপে জাপান শেষ পর্যন্ত লিয়াওতাং চীনকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ব্রিটেন সুদূর-প্রাচ্যে ইওরোপীয় দেশগুলির কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখে। সুদূর-প্রাচ্য, তথা চীনে ব্রিটেনের বাণিজ্য ও সামরিক স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। জাপান উপলব্ধি করিয়াছিল যে রাশিয়ার প্ররোচনায় লিয়াওতাং চীনকে প্রত্যর্পণ করিতে জাপান বাধ্য হইয়াছিল। সেই সঙ্গে ব্রিটেন উপলব্ধি করে যে রাশিয়া চীনের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া ব্রিটেনের স্বার্থ বিপজ্জনক করিয়া তুলিতেছিল। সুতরাং ব্রিটেন ও জাপান উভয়ের নিকট রাশিয়া ভীতির কারণ হইয়া উঠে। ইতিমধ্যে জার্মানীর সহিত এক সন্তোষজনক মীমাংসায় আসিবার চেষ্টা ব্রিটেনের ব্যর্থ হয় এবং ফ্রান্সের সহিতও কোন বোঝাপড়ায় আসা ব্রিটেনের পক্ষে সেই সময় সম্ভব ছিল না, কারণ ফ্রান্স ছিল ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বী। এই অবস্থায় ব্রিটেন উহার 'বিচ্ছিন্নতার-নীতি' বর্জন করিতে বাধ্য হয় এবং ইহাও উপলব্ধি করে যে সুদূর-প্রাচ্যে রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিরোধ করিতে হইলে জাপানের সাহায্য একান্তই প্রয়োজন। এই প্রয়োজনবোধেই ব্রিটেন ক্রমেই জাপানের দিকে ঝুঁকিতে থাকে। অপরদিকে রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ অনিবার্য মনে করিয়া জাপানও ক্রমে ব্রিটেনের দিকে ঝুঁকিতে থাকে। চীন-জাপান যুদ্ধের পর উভয় দেশের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। এমন কি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের অনুকূলে ব্রিটেন জাপানের সহিত অসম-চুক্তি (Unequal Treaty) সংশোধন করিয়া জাপানকে সন্তুষ্ট করে। চীন-জাপান যুদ্ধের সময় ব্রিটেন নিরপেক্ষ থাকে। ফলে ব্রিটেন ও জাপান পরস্পরের নিকট আসিয়া পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-জাপানী মৈত্রী সম্পাদিত হয়। এই মৈত্রী-চুক্তির শর্তানুসারে স্থির হয় যে তৃতীয় কোনও শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হইলে ব্রিটেন ও জাপান পরস্পরকে সাহায্য করিবে। ফলে রাশিয়ার সহিত ভবিষ্যৎ যুদ্ধে ব্রিটেনের সাহায্য লাভের ব্যাপারে জাপান নিশ্চিন্ত হয় এবং জাপানের অনুকূলে ব্রিটেনের হস্তক্ষেপ ঘটিলে সেই ক্ষেত্রে ফ্রান্সের পক্ষে উহার মিত্র রাশিয়াকে সাহায্য করার সম্ভাবনা দূর হয়। প্রকৃতপক্ষে ইঙ্গ-জাপান মৈত্রীকে

রাশিয়ার প্রতি এক চ্যালেঞ্জ বলা যায়। এই চুক্তি সম্পাদিত হইলে ইওরোপের রাজনীতিতে ব্রিটেনের বিচ্ছিন্নতার-নীতির অবসান হয়।

রুশ-জাপান যুদ্ধ (Russo-Japanese War, 1904-1905)

চীন-জাপানের যুদ্ধের পর (১৮৯৪-'৯৫ খ্রীঃ) জাপান সুদূর-প্রাচ্যে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু তখনও সুদূর-প্রাচ্যে জাপানের অগ্রগতির পথে রাশিয়া ছিল প্রধান অন্তরায়। সুতরাং জাপানের সাম্রাজ্যবাদের দ্বিতীয় অধ্যায় হইল রুশ-জাপান যুদ্ধ।

কারণ (Causes) ঃ

(ক) সুদূর-প্রাচ্যে রাশিয়ার অগ্রগতি ঃ কখনও যুদ্ধের দ্বারা, আবার কখনও চীনের প্রতি মিত্রতা প্রদর্শন করিয়া রাশিয়া চীন সাম্রাজ্যভুক্ত মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কোরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল এবং মাঞ্চুরিয়া সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করার জন্য প্রয়োজনীয় পথও প্রস্তুত হইয়াছিল। সুদূর-প্রাচ্যে সাম্রাজ্য বিস্তৃতির পথে জাপানকে প্রধান অন্তরায় মনে করিয়া সিমোনসেকি সন্ধির রদবদল করার ব্যাপারে রাশিয়া অগ্রণী হয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া জাপানকে লিয়াওতাং উপদ্বীপ ও পোর্ট-আর্থারের উপর সর্ববিধ দাবিদাওয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য করে। জাপান রাশিয়ার এইরূপ আচরণে কখনও বিস্মৃত হয় নাই।

(খ) মাঞ্চুরিয়ার ভবিষ্যৎ লইয়া রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে স্বার্থসংঘাত ঃ চীনের বক্সার-বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া রাশিয়া চীনের বিনা অনুমতিতে মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া তথায় সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করিতেছিল। এই ব্যাপারে জাপান রাশিয়ার অভিসন্ধি সম্পর্কে আতঙ্কিত হইয়া উঠে। অপরদিকে রাশিয়ার ক্রমবিস্তার পূর্বাঞ্চলের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার দিক দিয়া ইংল্যাণ্ডের নিকট কোনরূপেই কাম্য ছিল না। সুতরাং রুশ-ভীতি ইংল্যাণ্ড ও জাপান উভয়ের মধ্যে এক মিত্রতামূলক সন্ধির পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত ইঙ্গ-জাপান মৈত্রীর (Anglo-Japanese, 1902) মধ্যেই রুশ-জাপান সংগ্রামের পূর্বাভাষ সূচিত হইয়াছিল।

(গ) রাশিয়া কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া ত্যাগের দাবি প্রত্যাখ্যান ঃ ইঙ্গ-জাপান মৈত্রীর ফলে রাশিয়া নিজের বিপদ উপলব্ধি করিয়া মাঞ্চুরিয়া হইতে ছয়মাসের ব্যবধানে তিন কিস্তিতে সমস্ত রুশ-সৈন্য অপসারণ করিতে সম্মত হয়। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল যে রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ার উপর স্বীয় কর্তৃত্ব ছাড়িতে কোনমতেই প্রস্তুত নহে। সৈন্য অপসারণের প্রথম কিস্তিতে রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ার এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে সৈন্য-বাহিনী স্থানান্তরিত করিল মাত্র। সৈন্য অপসারণের দ্বিতীয় কিস্তির সময় উত্তীর্ণ

হইলেও রাশিয়া তাহা করিল না। উপরন্তু চীনের নিকট এই মর্মে দাবি করিল যে অন্য রাষ্ট্রকে মাঞ্চুরিয়া সমর্পন করা চলিবে না এবং তথায় একমাত্র রাশিয়া ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্রকে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া চলিবে না। কিন্তু চীন ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সমর্থন পুষ্ট হইয়া রাশিয়ার দাবি অগ্রাহ্য করিল। রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ার সামরিক ঘাঁটি সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্ট-আর্থারের সহিত রেলপথে মস্কোর সংযোগ স্থাপন করিল এবং মাঞ্চুরিয়াকে রুশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ বলিয়া ঘোষণা করিল। উপরন্তু কোরিয়ায় জাপানের প্রতিপত্তি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে রাশিয়া কোরিয়ায় একদল রুশ-সৈন্য প্রেরণ করিতে উদ্যোগী হইল। জাপান রাশিয়ার এই কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া রাশিয়ার নিকট প্রস্তাব করিল যে উভয় রাষ্ট্র চীন ও কোরিয়ার অখণ্ডতা রক্ষা করিবে এবং রাশিয়া কোরিয়ায় জাপানের অধিকার ও জাপান মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ার অধিকার স্বীকার করিবে। মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ার প্রাধান্য স্বীকৃত হইল কিন্তু ইহার বিনিময়ে রাশিয়া কোরিয়ায় জাপানের অধিকার স্বীকার করিল না। প্রকৃতপক্ষে মাঞ্চুরিয়া হইতে সরিয়া যাইবার কোন ইচ্ছাই রাশিয়ার ছিল না এবং মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারে জাপানের হস্তক্ষেপের কোন অধিকার রাশিয়া অস্বীকার করে। রাশিয়া ঘোষণা করিল যে মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারে মীমাংসা করার অধিকার একমাত্র রাশিয়া ও চীনের এবং রাশিয়া চীনের সহিত আপোষে মীমাংসা করার কথাও ঘোষণা করিল। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ব্রিটেনের প্রবল প্রতিবাদের ফলে রাশিয়া উহার মাঞ্চুরিয়া পরিকল্পনা বাস্তব রূপায়নে ব্যর্থ হইল।

রাশিয়া কর্তৃক জাপানের দাবি অস্বীকৃত

জাপানের যুদ্ধ প্রস্তুতি: জাপানের নিকট ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে মাঞ্চুরিয়া হইতে রাশিয়াকে বিতাড়িত করিতে হইলে রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ অনিবার্য। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া জাপান উহার সামরিক নৌ-বাহিনী শক্তিশালী করিয়া তুলিল এবং ব্রিটেনের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে প্রয়াসী হইল। রাশিয়ার দক্ষিণাভিমুখ অগ্রসর চীনে রাশিয়ার প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সম্ভবনায় ব্রিটেন ইতিমধ্যেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা ভিন্ন রাশিয়া ও জাপানের ব্যাপারে ফ্রান্সের মনোভাব সম্পর্কেও ব্রিটেনের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। ইতিমধ্যেই রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে দ্বি-মৈত্রী চুক্তি (Dual Alliance) সম্পন্ন হইয়াছিল। ফ্রান্স রাশিয়ার যুগ্ম সহযোগিতায় পিকিং ও হ্যাংকক-এর মধ্যে একটি রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা চীনে ব্রিটেনের স্বার্থ বিপন্ন করিয়া তোলার সম্ভাবনাও ব্রিটেনকে যারপর নাই উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং চীনের অভিমুখে রাশিয়ার ক্রমাগ্রতি ব্রিটেনকে জাপানের সহিত মৈত্রী স্থাপনে বাধ্য করিল এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী (**Anglo-Japanese Alliance**) সম্পাদিত হইল।

জাপানের যুদ্ধ

ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী শুধুমাত্র সুদূর-প্রাচ্যের ব্যাপারেই সীমিত রাখা হয়। চীন

ও কোরিয়ার স্বাধীনতা ও ভৌমিক অখণ্ডতা রক্ষা করিয়া সুদূর-প্রাচ্যে স্থিতাবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখাই এই মৈত্রী-চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইহার দ্বারা চীনে ও কোরিয়ায় যথাক্রমে ব্রিটেন ও জাপানের বিশেষ স্বার্থ স্বীকৃত হয়। ইহাও স্থির হয় যে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিতে যাইয়া চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রের কোন একটি যদি অন্য রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়, সেই ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ অপর রাষ্ট্র নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবে; একাধিক রাষ্ট্র কর্তৃক চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রের যে কোনটি আক্রান্ত হইলে অপর মৈত্ররাষ্ট্র সর্বোতভাবে আক্রান্ত মিত্র-রাষ্ট্রকে সামরিক সাহায্য করিবে। ইহাও স্থির হয় যে এই মৈত্রী-চুক্তি পাঁচ বৎসর কাল স্থায়ী রহিবে এই মৈত্রী-চুক্তি জাপানকে রাশিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে আশ্বস্ত করে এবং জাপানের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে, কারণ এই প্রথম ব্রিটেনের ন্যায় এক বিরাট নৌ-শক্তির সহিত সমতার ভিত্তিতে জাপান মর্যাদা লাভ করে।

ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী ১৯০২

মাঞ্চুরিয়া হইতে রাশিয়ার অপসারণ-সংক্রান্ত জাপানের সকল প্রস্তাব রাশিয়া কার্যকর করিতে অসম্মত হইলে, জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-৫) শুরু হয়।

যুদ্ধের ঘটনাবলী (Incidents of the War): যুদ্ধের প্রারম্ভেই জাপ-নৌ-বাহিনীর এডমিরাল টোগো (Togo) পোর্ট-আর্থারে অবস্থিত রুশ-নৌ-বহরকে অবরুদ্ধ রাখিয়া সমুদ্রের উপর জাপানের কর্তৃত্ব স্থাপন করিলেন। ইহার ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইবার পক্ষে জাপানের যথেষ্ট সুবিধা হইল। পোর্ট-আর্থার হইতে রুশ-নৌবহর নির্গত হইতে থাকিলে জাপানী নৌবহর গোলাবর্ষণ করিয়া তাহা ধ্বংস করিতে থাকে। ইতিমধ্যে একদল জাপানী সৈন্য পোর্ট-আর্থার অভিমুখে অগ্রসর হইয়া ইয়ালু নদীর তীরে রুশ-বাহিনীকে পরাস্ত করিল। অন্যদিকে পোর্ট-আর্থারের উপর প্রচণ্ডভাবে বোমাবর্ষণ করিয়া জাপ-বাহিনী উহা দখল করিল। অতঃপর জাপ-বাহিনী মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী মুকডেন (Mukden) অবরোধ করিল। প্রায় দুই সপ্তাহ প্রচণ্ড সংগ্রামের পর রুশ-বাহিনী পরাস্ত হইয়া মুকডেন পরিত্যাগ করিল। ইতিমধ্যে রাশিয়ার বাল্টিক বাহিনী সুদূর-প্রাচ্য অভিমুখে অগ্রসর হইলে সুশিমোয় (Tshusimo) নৌ-যুদ্ধে জাপানের এডমিরাল টোগো কর্তৃক বিধ্বস্ত হইল। ট্রাফালগারের নৌ-যুদ্ধের পর এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ নৌ-যুদ্ধ আর কখনও সংঘটিত হয় নাই। অবশেষে উভয়পক্ষ পরিশ্রান্ত হইয়া শান্তির জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মধ্যস্থতায় পোর্টসমাউথের সন্ধি দ্বারা যুদ্ধের অবসান ঘটিল।

পোর্টসমাউথের সন্ধি (Treaty of Protsmouth, 1905): এই সন্ধির শর্তানুসারে (১) কোরিয়ায় জাপানের প্রাধান্য রাশিয়া কর্তৃক স্বীকৃত হইল, (২) রাশিয়া লিয়াওতাং উপদ্বীপ ও শাখালিন দ্বীপের কিয়দংশ জাপানকে সমর্পণ

করিল, (৫) রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া হইতে রুশ-সৈন্য অপসারণ করিতে সম্মত হইল ও মাঞ্চুরিয়া চীনকে প্রত্যাপিত হইল।

যুদ্ধের ফলাফল (Results of the War) : রাশিয়া, চীন, জাপান এবং ইওরোপের উপর এই যুদ্ধের ফল পরিলক্ষিত হয়। সাময়িকভাবে সুদূর-প্রাচ্যে রাশিয়ার অগ্রগতি স্থগিত রহিল এবং রাশিয়া বল্কান ও নিকট-প্রাচ্যের প্রতি দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিল। এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ রাশিয়ায় গণ-বিপ্লব আসন্ন হইল। রাশিয়ার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া অস্ট্রিয়া, বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা প্রদেশদ্বয় অধিকার করিয়া লইল।

রাশিয়া

জাপানের সামরিক শক্তি ও জাতীয় মর্যাদা বহুল পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল। ইহার পর হইতে জাপান চীনে ইওরোপীয় শক্তিগুলির সহিত প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইল এবং সাম্রাজ্যবাদ-নীতি অনুসরণ করিয়া ১৯১০ সালে কোরিয়া নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিল।

জাপান

চীনের জনসাধারণ উপলব্ধি করিলে যে ইওরোপীয় শক্তিগুলির আক্রমণ প্রতিহত করিতে হইলে দেশকে আধুনিক ভাবে পুনর্গঠন করিতে হইবে। জাপানের জয়লাভ চীনকে সচেতন করিল এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্যের শাসনপদ্ধতির প্রতি চীনা জনসাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল এবং এই প্রেরণাই ১৯১১ সালে সংঘটিত চীন-বিপ্লবের পরোক্ষ ফল।

চীন

উপরি-উক্ত দেশগুলি ছাড়াও ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে রুশ-জাপান যুদ্ধ ফলদায়ক হইয়াছিল। রাশিয়া দুর্বল হইয়া পড়ায় ইংল্যাণ্ডে রুশভীতি বহুলাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল ও উভয়ের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের পথ প্রশস্ত হইল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে Anglo-Russian Convention নামে একটি সন্ধি সম্পাদিত হইল এবং ইহার ফলে উভয়ের মধ্যে এশিয়া মহাদেশ সংক্রান্ত স্বার্থসংঘাতের অবসান হইল। অপরদিকে জাপানের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আশঙ্কিত হইয়া আমেরিকা এই যুদ্ধে মধ্যস্থতা করিয়াছিল। ফলে আমেরিকার 'মনরো-নীতি' সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হইল এবং সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতিতে আমেরিকা সক্রিয় অংশগ্রহণ করিল।

ইওরোপীয় রাজনীতি

৬.৯. **জাপানের পররাষ্ট্রনীতি** (Foreign Policy, 1905-1919) : পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণে রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবন পুনর্গঠন করার পর হইতে জাপান ক্রমশঃ সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতিতে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। প্রথমে চীন-জাপান যুদ্ধে (১৮৯৪-৯৫) এবং পরে রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৪-১৯০৫) জয়লাভ করিয়া জাপান নিজ শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং সাম্রাজ্যবাদের পথে বহুদূর অগ্রসর হয়। চীন-জাপান যুদ্ধের ফলে জাপান আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হয় এবং চীনের কিয়দংশে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে। রুশ-জাপান

জাপানের সাম্রাজ্যবাদের দ্বিতীয় পর্যায়

যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ বিশ্বরাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। জাপানকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বরাষ্ট্রনীতির ভারকেন্দ্র আতলান্তিক হইতে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। রাশিয়াকে মাঞ্চুরিয়া হইতে অপসারণ করার পর জাপান কোরিয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে শুরু করে এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়াকে জাপানের সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে কোরিয়া দখলের ব্যাপারে জাপানের সাম্রাজ্যবাদের নগ্নমূর্তি দেখা যায়।

১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে জাপান উহার সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার অপূর্ব সুযোগ পাইল। এই যুদ্ধে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ ইওরোপে ব্যস্ত থাকায় জাপান এশিয়ায় এবং বিশেষ করিয়া চীনে স্বীয় প্রতিপত্তি সুদৃঢ় করিতে প্রয়াস পাইল। ইংল্যান্ডের মিত্র হিসাবে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপান জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া চীনে জার্মান অধিকৃত কিয়াওচাও এবং জার্মানীর বিশেষ অধিকারসমূহ আত্মসাৎ করিল এবং সাণ্টুং প্রদেশ দখল করিল।

চীনের নিকট একুশ দফা দাবি এবং উহাতে চীনের আংশিক স্বীকৃতি

১৯১৫ সালে জাপান কুখ্যাত একুশ-দফা দাবি (Twenty one Demands) পূরণের জন্য চীনের নিকট এক চরম পত্র প্রেরণ করিল। যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন করিয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে চীনে-সাধারণতন্ত্রের তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট ইউয়ান-সি-কাইকে পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া জাপান উহার অধিকাংশ দাবিই আদায় করিয়া লইল। জাপান মাঞ্চুরিয়ার কর্তৃত্ব লাভ করিল। অন্যান্য দাবির মধ্যে ছিল চীন উহার সাম্রাজ্যের কোনও অংশ, পোতাশ্রয় বা উপকূল অন্য কোন রাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তরিত করিবে না। এককথায় জাপান ইওরোপের নিকট চীনের দ্বার রুদ্ধ করিল। অতঃপর জাপান সুদূর-প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের যাবতীয় প্রভাব ও প্রতিপত্তি নিশ্চিহ্ন করিয়া 'এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য'—এই দাবির ভিত্তিতে আপন প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যোগী হইল। এস্থলে স্মরণ রাখা দরকার যে ইউয়ান-সি-কাই নিজ দায়িত্বেই জাপানের একুশ-দফা দাবির কিয়দংশ পূরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেও চীনের জনসাধারণ তাহা গ্রহণ করিতে পারে নাই। ডঃ সান-ইয়াৎ-সেনের একজন সহকর্মী এই প্রসঙ্গে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন, "ইউয়ান-সি-কাই ও জাপানের মধ্যে ইহা ছিল নিছক ব্যক্তিগত রফা। চীনের পার্লামেণ্ট ইহা কখনও পাস করে নাই, সুতরাং জাপানের দাবিগুলি স্বীকার করিয়া লইবার বাধ্যবাধকতা চীনা জনগণের ছিল না"।

সাণ্টুং প্রদেশে চীন জাপানকে জার্মানীর উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলেও মিত্রশক্তি এইরূপ মত প্রকাশ করিল যে যুদ্ধাবসানে এই সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে বিবেচনা করা হইবে। এই অবস্থায় জাপান সাণ্টুং প্রদেশের অধিকার সম্পর্কে পৃথকভাবে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি আদায় করিতে সচেষ্ট হইল এবং শীঘ্রই সুযোগও আসিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মিত্রশক্তি জার্মানীর সাবমেরিণ আক্রমণ হইতে তাহাদের বাণিজ্য জাহাজগুলি রক্ষা করার জন্য জাপানের সহযোগিতা

প্রার্থনা করিল। জাপান এই শর্তে মিত্রশক্তিকে জাহাজ দিয়া সাহায্য করিতে সম্মত হইল যে, যুদ্ধাবসানে ইংল্যাণ্ডে ফ্রান্স ও ইটালী সাণ্টুং প্রদেশের উপর জাপানের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইবে। ভার্সাই সন্ধি দ্বারা জাপানের এই দাবি স্বীকৃত হইল। জাপানের সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

৬.১০. চীনের নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন (Reawakening of China and Reform Movement): জাপানের নিকট পরাজয়ের পর (১৮৯৫) চীনের অধিবাসীগণ ইওরোপীয় আদর্শের অনুকরণে সংস্কার প্রবর্তনের প্রয়োজন উপলব্ধি করে। বক্সার-বিদ্রোহের পূর্বেই 'তরুণ-চীন' (young China) আন্দোলন শুরু হইয়াছিল। ইহার লক্ষ্য ছিল পাশ্চাত্যের অনুকরণে চীনের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে সংস্কার প্রবর্তন করিয়া চীনকে সময়োপযোগী শক্তিশালী করিয়া তোলা।

সংস্কার আন্দোলন

এই 'তরুণ-চীন' আন্দোলনের নেতা ছিলেন কাং-ইউ-ওয়ে (Kang-yu-wei) যাঁহাকে চীনের 'আধুনিক ঋষি' ('Modern Sage') বলা হয়। তিনি চীনের তরুণ সম্রাট কোয়াং-সু-কে সংস্কার প্রবর্তনের প্রয়োজন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট এক রাজকীয় আদেশ জারী করিয়া চীনের সর্বত্র পাশ্চাত্যের অনুকরণে স্কুল ও কলেজ স্থাপনের আদেশ দেন। বিদেশী গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করার কাজ শুরু হয়; বিদেশীগণকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান হয়, বহু অপ্রয়োজনীয় সরকারী সংস্থা বাতিল করা হয় এবং পাশ্চাত্যের অনুকরণে সামরিক ও বে-সামরিক সরকারী সংস্থাগুলি পুনর্গঠন করা হয়; প্রায় একশত দিন ধরিয়া এই সংস্কার কার্য চলে বলিয়া এই সময়কে 'একশত দিনের সংস্কার' ('Hundred day's Reform') বলা হয়। তরুণ-চীনের আন্দোলনের ফলে চীনে পাশ্চাত্য পুস্তক-পুস্তিকার চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানেরা পিকিং-এ স্থাপিত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শুরু করে এবং দেশের বহু স্থানে বিদেশী স্কুল ও সংঘ গড়িয়া উঠে। এমন কি চীনের সম্রাট তরুণ-চীন আন্দোলনের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া চীনের প্রাচীনপন্থী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা তুলিয়া দেন, প্রাচীন চীনা সাহিত্যের পরীক্ষা বাতিল করেন এবং বিদেশে শিক্ষামূলক পর্যটনে উৎসাহ দেন।

'একশত দিনের সংস্কার'

কিন্তু এই সকল প্রগতিমূলক সংস্কার প্রবর্তনের ফলে চীনে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই সকল সংস্কারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত রক্ষণশীল দল এইরূপ প্রচার করিতে থাকে যে পাশ্চাত্যের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্কচ্ছেদ করিতে না পারিলে চীনের মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। চীনের বিধবা সম্রাজ্ঞী (Dowager Empress), যিনি সম্রাট কোয়াং-সুর উপর নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার প্রতীক্ষায় ছিলেন, রক্ষণশীল দলের বিদেশী-বিরোধী মনোভাবের সুযোগ লইয়া নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও মাঞ্চু রাজবংশকে জনপ্রিয়

সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হন। বিধবা সম্রাজ্ঞী (জু-শি) বলাধিকারের (Conpd'etat) সাহায্যে সম্রাট কোয়াং-সুকে নিজের কর্তৃত্বাধীনে আনিয়া রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা দখল করেন। তিনি এক অনুশাসন জারী করিয়া সকল সংস্কার বাতিল করেন এবং সম্রাটের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টাকে হত্যা করেন। সম্রাজ্ঞী রক্ষণশীল দল কর্তৃক পরিচালিত সংস্কার-বিরোধী আন্দোলনের পুরো ভাগে আসিয়া দাঁড়ান। ফলে প্রতিক্রিয়াশীলগণ শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং বিদেশীদের উপর আক্রমণ চরম আকার ধারণ করে। এই বিদেশী-বিরোধী ঘৃণার চরম পরিণতি বক্সার-বিদ্রোহে প্রকাশ পায়।

কিন্তু বক্সার-বিদ্রোহের বিফলতায় সংস্কার-বিরোধী ও বিদেশী-বিরোধী দলের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিল। পিকিং-এ বিদেশী সৈন্যবাহিনী প্রবেশ করিলে প্রতিক্রিয়াপন্থীগণও উপলব্ধি করিল যে সংস্কার প্রবর্তন ভিন্ন পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিবার আর কোন উপায় নাই। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিধবা সম্রাজ্ঞী পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে উৎসাহ প্রদান করিলেন এবং বহু উপসনা-গৃহ বিদ্যালয়ে পরিণত করিলেন। ইওরোপীয় শাসন-পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার নিমিত্ত একটি কমিশন বিদেশে প্রেরিত হইল। চীনে অহিফেন-ব্যবসা নিষিদ্ধ হইল এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনে পার্লামেন্টারী শাসনতন্ত্র রচনা করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইল।

সংস্কারের দাবি জয়যুক্ত হইল

৬.১১. **চীনের গণ-বিপ্লব, ১৯১১ (The Chinese Revolution, 1911) ঃ** উপরি-উক্ত সংস্কার প্রবর্তিত হইলেও চীনের 'তরুণ-দল' ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৪-১৯০৫) জাপানের জয়লাভের ফলে চীনে এক অভূতপূর্ব সচেতনতার উদ্ভব হইল এবং তরুণ-চীন দল দ্রুত পরিবর্তন আনয়নের জন্য তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করিল। তাহাদের মনে এইরূপ ধারণা জন্মিল যে চীনের দুরবস্থার জন্য মাঞ্চু রাজবংশের অকর্মণ্যতা ও সংস্কার-বিমুখতাই একমাত্র দায়ী। এই কারণে 'তরুণ-চীন' দল মাঞ্চুবংশের উচ্ছেদ করিয়া পার্লামেন্টারী শাসনপদ্ধতি প্রবর্তনের দাবি জানাইল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিক্রিয়াশীল বিধবা সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু হইলে মাঞ্চুসিংহাসনে এক নাবালক সম্রাট অধিষ্ঠিত হইলেন। অভিভাবক পরিষদের গঠন লইয়া দেশের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি হইল। ইতিমধ্যে ক্যান্টনকে কেন্দ্র করিয়া চীনে ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের (Dr. Sun-yat Sen) নেতৃত্বে মাঞ্চু-বিরোধী সাধারণতান্ত্রিক আন্দোলন আরম্ভ হইল। এই আন্দোলনে আতঙ্কিত হইয়া ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে চীন সরকার একটি জাতীয় পরিষদ আহবান করিয়া উহাকে পার্লামেন্টারী শাসনপদ্ধতি রচনা করিবার অধিকার প্রদান করিলেন। কিন্তু সাধারণতন্ত্রীদল মাঞ্চু রাজবংশের সহিত কোনরূপ আপোষমূলক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করিতে অসম্মত হইল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা মাঞ্চু রাজবংশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া নানকিং শহর দখল করিল এবং

তরুণ-চীন দলের দাবি

দক্ষিণ-চীনে আন্দোলন

অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা (১৯১১)

তথায় এক অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে নাবালক সম্রাট স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিলে সাধারণতান্ত্রিক আন্দোলন জয়যুক্ত হইল। সমগ্র চীনে সাধারণতন্ত্র (Republic) ঘোষিত হইল এবং ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন প্রথম সভাপতি বা প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দলের নাম হইল কুয়ো-মিং-টাং (Kuo-Ming-Tang) বা সাধারণতান্ত্রিক দল।

মাঞ্চুবংশের অবসান ও সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (১৯১২)

ইউয়ান-সি-কাই-এর সভাপতিত্ব লাভ ঃ শীঘ্রই সান-ইয়াৎ-সেন ইউয়ান-সি-কাই নামক এক সুদক্ষ সেনাপতির অনুকূলে সভাপতির পদে ইস্তফা দেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে একজন শক্তিশালী রাজনীতিজ্ঞের হস্তে সদ্য প্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্র শক্তিশালী হইবে ও সংহতি লাভ করিবে। কিন্তু ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন শীঘ্রই লক্ষ্য করিলেন যে ইউয়ান পার্লামেণ্টারী সরকার স্থাপন করার পরিবর্তে স্বীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতেই অধিকতর সচেষ্ট। ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের সহিত সম্পাদিত অসম সন্ধিসমূহ (Unequal Treaties) রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া কার্যতঃ উহাদের সহযোগিতায় স্বীয় ক্ষমতা দৃঢ় করাই ইউয়ানের লক্ষ্য ছিল। ইউয়ান বিদেশী পশ্চশক্তির নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করিয়া চীনের অর্থনীতি-সংক্রান্ত সকল ব্যাপার উহাদের হস্তেই ছাড়িয়া দিলেন। ইউয়ানের জাতীয়-স্বার্থ-বিরোধী ব্যবস্থায় চীনের স্বদেশ প্রেমিকগণ আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। দক্ষিণ-চীনের সর্বত্র ইউয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত হইল। কিন্তু ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউয়ানের মৃত্যু হইলে চীন এক বিরাট সংকট হইতে রক্ষা পাইল।

৬.১২. **প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও চীন** (China and the First World War) ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চীন জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়াছিল এবং চীন আশা করিয়াছিল যে এই যুদ্ধে মিত্রশক্তি জয়লাভ করিলে চীন তাহাদের সাহায্যে অসম সন্ধিসমূহ বাতিল করিয়া বিদেশীগণের নিকট হইতে উহার অঞ্চলসমূহ ফেরৎ পাইবে। ইতিমধ্যে যুদ্ধের প্রথমদিকে মিত্রশক্তি বিব্রত থাকায় জাপান চীনের নিকট 'একুশটি দাবি' (Twenty one demands) উপস্থাপিত করিল। চীনকে এই দাবি পূরণ করার জন্য মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দেওয়া হইল। এই একুশ-দফা দাবিতে পাঁচটি বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তাব ছিল। প্রথম সাণ্টুং প্রদেশ সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়া সম্পর্কে, তৃতীয়টি কয়লা ও লৌহ সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে, চতুর্থটি চীনের নদী, বন্দর ও উপকূল অঞ্চল সম্পর্কে এবং পঞ্চমটি চীনের দরবারে জাপানী পরামর্শদাতা নিয়োগ ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে।

জাপানের একুশ দফা দাবি

এই সকল দাবি পূরণ করিলে চীনের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সাধারণতন্ত্রের তদানীন্তন সভাপতি ইউয়ান-সি-কাই দুইটি কারণে নিজ দায়িত্বে ইহা পূরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। প্রথমতঃ, তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী

পরিকল্পনা সার্থক করার উদ্দেশ্যে জাপানের সাহায্য লাভের আশায় তিনি উৎসাহিত হন এবং দ্বিতীয়তঃ, উপরি-উক্ত দাবিসমূহপূরণ না করিলে জাপানের সহিত যুদ্ধ যে অনিবার্য তাহাও তিনি উপলব্ধি করেন। সুতরাং ইউয়ান জার্মান অধিকারভুক্ত সান্টুং প্রদেশের উপর জাপানের কর্তৃত্ব স্বীকার করেন, মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের সামরিক অধিকার স্থাপনে সম্মত হন, জাপানকে কয়লা ও লৌহ সম্পর্কে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন এবং চীনের বন্দরে ও উপকূলভাগে একমাত্র জাপান ভিন্ন অন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রকে অধিকার স্থাপন করিতে দেওয়া হইবে না ইউয়ান এই প্রতিশ্রুতিও প্রদান করেন। কিন্তু চীনজাতি সমগ্র জাপানের এই দাবি মানিয়া লইতে অসম্মত হইল, কারণ ইউয়ান সমর্থন করিলেও চীনের পার্লামেন্ট উহা সমর্থন করে নাই।

চীনের বিরোধিতা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপান মিত্রশক্তিকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। সাহায্যের পুরস্কার স্বরূপ জাপান গোপনে মিত্রশক্তির নিকট হইতে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি আদায় করিলে যে যুদ্ধাবসানে জার্মান অধিকৃত সান্টুং প্রদেশ জাপানকে সমর্পণ করা হইবে। চীন সরকার এই চুক্তিসম্পর্কে কিছুই জানিতেন না। উপরন্তু 'লানসিং-ইসি চুক্তি' (Lansing-Ishii Agreement) নামক চুক্তি দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও চীনে জাপানের 'বিশেষ স্বার্থ'' (special interests) স্বীকার করিয়া লয়। এইভাবে প্রয়োজনবোধে মিত্রশক্তি চীনের স্বার্থ ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার উপেক্ষা করিয়া জাপানকে খুশী করিতে দ্বিধা করিল না।

মিত্রশক্তি কর্তৃক জাপানের দাবি স্বীকৃত

যুদ্ধে যোগদান করিয়া চীনের কিছু সুবিধাও হইয়াছিল। (১) চীনের অনুকূলে বাণিজ্যিক শুল্ক পুনর্বিবেচিত হইল। (২) জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার অধিকৃত অঞ্চলগুলি চীন ফেরৎ পাইল, (৩) বক্সার-বিদ্রোহের ক্ষতিপূরণ বাবদ জার্মানী ও অস্ট্রিয়াকে দেয় অর্থ চীন বাতিল করিয়া দিতে সমর্থ হইল। (৪) পাঁচ বৎসরের জন্য মিত্রশক্তিবর্গকেও এই ক্ষতিপূরণের অর্থ দেওয়ার হাত হইতে চীন রক্ষা পাইল এবং (৫) যুদ্ধাবসানে শান্তি-সম্মেলনে চীনের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার হইল।

যুদ্ধে যোগদান করিয়া চীনের লাভ

কিছু লাভ হইলেও যুদ্ধে যোগদান করিয়া চীনের অসুবিধাও হইয়াছিল যথেষ্ট। উত্তরোত্তর জাপান চীনে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পাইতেছিল। চীনের আর্থিক দুরবস্থা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং আমেরিকার নিকট হইতে অর্থপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা না থাকায় চীন জাপানের দ্বারস্থ হইল। চীনের প্রাদেশিক রাজস্ব, খনিজ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে জাপান চীনকে প্রচুর পরিমাণে ঋণ দান করিল। ইহার ফলে চীনের উপর জাপানের অধিকার ও আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

চীনের অসুবিধা

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে চীনা-প্রতিনিধিগণ সান্টুং প্রত্যর্পণের দাবি ও চীনের সহিত সম্পাদিত অসম সন্ধিসমূহ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার দাবি উত্থাপন করিলেন। কিন্তু বিজয়ী শক্তিবর্গ চীনের এই সকল ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি উদাসীন রহিলেন। সান্টুং জাপানকে অর্পণ করা হইল এবং চীনের সকল দাবি 'আলোচনার বহির্ভূত' বলিয়া ঘোষণা করা হইল। চীনা প্রতিনিধিগণ শূন্যহস্তে ও গভীর হতাশা লইয়া শান্তি-সম্মেলন হইতে প্রত্যাবর্তন করেন।

শান্তি-সম্মেলনে চীন

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর সংকেত

১। ঊনবিংশ শতাব্দীতে চীনে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির আক্রমণের বিবরণ দাও। [উঃ ৬.২. ৬.৩.]

২। অহিফেন যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। [উঃ ৬.২.]

৩। তিয়েনসিন-এর সন্ধি হইতে সিমোনসেকির সন্ধি পর্যন্ত চীনের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখ। [৬.৩.]

৪। ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক চীনের অঙ্গচ্ছেদ কিভাবে ঘটিয়াছিল? নিশ্চিত ধ্বংস হইতে চীন কিভাবে রক্ষা পাইয়াছিল? [উঃ ৬.৩., ৬.৪.]

৫। বক্সার-বিদ্রোহ বলিতে কি বোঝায়? এই বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল কিরূপ হইয়াছিল? [উঃ ৬.৪]

৬। ১৮৬৭ পর্যন্ত জাপানের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [উঃ ৬.৫.]

৭। "সুদূর-প্রাচ্যের আধুনিক ইতিহাসে চীন-জাপান যুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও চূড়ান্ত ঘটনা" —আলোচনা কর। এই যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। [উঃ ৬.৮.]

৮। জাপানের ইতিহাসে মেজির পুনঃপ্রতিষ্ঠা (১৮৬৮) বলিতে কি বোঝায়? মেজি-যুগে জাপানের অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ ৬.৬., ৬.৭.]

৯। জাপানের সাম্রাজ্যবাদের মূলে কি কারণ ছিল? ১৮৯৫ হইতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত জাপানের সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্রনীতির বিবরণ দাও। [উঃ ৬ ৮.]

১০। রুশ-জাপান যুদ্ধের (১৯০৪-৫) কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করা। [উঃ ৬.৮.]

১১। 'রাশিয়া, জাপান, চীন ও ইওরোপে রুশ-জাপান যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল"—এই মন্তব্যের আলোচনা কর। [উঃ ৬.৮.]

১২। চীনের সংস্কার আন্দোলনের প্রকৃতি কিরূপ ছিল? এই আন্দোলনের ও প্রতি আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ ৬.১০., ৬.১১.]

সপ্তম অধ্যায় | # নিকট-প্রাচ্য সমস্যা
(Near-Eastern Question)

৭.১. নিকট-প্রাচ্য সমস্যা—১৮৫৬-১৮৭৮

বল্কানের বিদ্রোহ ও রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ ঃ প্যারিসের সন্ধির শর্তানুসারে তুরস্কের সুলতান তাঁহার সাম্রাজ্যে সংস্কার প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া যুগ্মভাবে তুরস্ক-সাম্রাজ্যের অখণ্ডতার ও স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। কিন্তু বল্কান রাষ্ট্রগুলির উপর তুরস্কের প্রতিপত্তি ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়ে এবং ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রুমানিয়া, সার্বিয়া ও মণ্টিনিগ্রো কতক পরিমাণে স্বাধীনতা অর্জন করে এবং মিশর ও টিউনিস-এ তুর্কী-সুলতানের মনোনীত শাসনকর্তাগণ একরূপ স্বাধীন হইয়া উঠেন।

তুরস্ক-সাম্রাজ্য

প্যারিসের সন্ধির শর্তানুসারে তুরস্কের সুলতান সংস্কার প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত করার যথেষ্ট অসুবিধা ছিল। তুরস্ক ছিল ধর্মশ্রয়ী (theocracy) রাষ্ট্র এবং ইসলামীয় নীতি ও আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সংস্কার প্রবর্তন করার জন্য সর্বপ্রথম তুরস্ককে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়োজন ছিল। এবং ইহার জন্য প্রয়োজন ছিল জ্ঞানদীপ্ত ও বলিষ্ঠ শাসক। কিন্তু তুরস্কের তিনজন সুলতান যথাক্রমে আবদুল মাজিদ (১৮৩৯-৬১ খ্রীঃ), আবদুল আজিজ (১৮৬১-৭৬ খ্রীঃ) ও আবদুল দ্বিতীয় হামিদ (১৮৭৬-১৯০৯ খ্রীঃ) ছিলেন দুর্বল, ব্যাভিচারী, অত্যাচারী ও সংস্কারবিমুখ। আবদুল দ্বিতীয় হামিদ ব্রিটেন ও রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে পারস্পরিক মতভেদ ও বিবাদের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তুরস্কে সংস্কার প্রবর্তনে অবহেলা করেন। কিন্তু ইওরোপীয় শক্তিবর্গ তুরস্কে সংস্কার প্রবর্তনের প্রবল পক্ষপাতী ছিল।

সংস্কার প্রবর্তনে অসুবিধা

ইওরোপীয় শক্তিবর্গের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও তুর্কী-সুলতান প্রতিশ্রুতি পালনে মোটেই যত্নবান হইলেন না। বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা প্রভৃতি কয়েকটি আংশিক-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলিতে কিছু পরিমাণে সংস্কার প্রবর্তিত হইল বটে, কিন্তু এই সকল দেশে খ্রীষ্টানধর্মী শ্লাভদের উপর তুর্কী কর্মচারী ও ইসলামধর্মী শ্লাভদের অকথ্য অত্যাচার অবাধে চলিতে থাকে। ফলে তুরস্ক-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টানধর্মী শ্লাভদের অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিতে থাকে।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ

তরুণ-তুর্কী (Young Turks)-দল তুরস্কে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের

পক্ষপাতী ছিল। এই দলের নেতা ছিলেন বুলগেরিয়ার শাসনকর্তা মিধাত্ পাশা (Midhat Pasha)। তরুণ-তুর্কীগণ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আব্দুল আজিজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তরুণ-তুর্কীগণ শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করিয়া উদারনীতি পরিত্যাগ করে।

তরুণ-তুর্কী

বল্কান রাজ্যসমূহ ঃ তুর্কী ও উহার খ্রীষ্টান প্রজাবর্গের এবং তুর্কী ও উহার প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার সমস্যাই ছিল নিকট-প্রাচ্য সমস্যার মূলকথা। খ্রীষ্টান প্রজাবর্গের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করিয়া নিজের স্বীয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বজাই রাখাই ছিল তুর্কী-সুলতানের প্রধান লক্ষ্য।

বল্কানের অধিবাসীগণ শ্লাভ গোষ্ঠীভুক্ত হইলেও আঞ্চলিক ও সামাজিক বৈষম্য উহাদের ঐক্য-বন্ধনের পথে অন্তরায় ছিল। নিম্ন-দানিউবের অধিবাসীগণ ছিল রোমান ক্যাথলিক, বুলগারগণ ছিল উহার গোষ্ঠীভুক্ত; সার্বিয়ানগণ ছিল বিশুদ্ধ শ্লাভ-গোষ্ঠীভুক্ত এবং উহারা সার্বিয়া-রাজ্য পুনঃস্থাপনের পক্ষপাতী ছিল; আলবানিয়ানগণ ছিল দুর্ধর্ষ পর্বতবাসী; মণ্টিনিগ্রোর অধিবাসীগণ ছিল বিশুদ্ধ শ্লাভ-গোষ্ঠীভুক্ত এবং উহারা সর্বদাই তুর্কী শাসনের বিরোধী এবং তুর্কী শাসকভুক্ত গ্রীকগণ প্রাচীন বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য পুনর্গঠনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সুতরাং জাতিগত বৈষম্য নিকট-প্রাচ্য সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছিল।

জাতিগত বৈষম্য

বল্কান জাতিগুলির মধ্যে ধর্মীয় বৈষম্যও ছিল। আলবানিয়ানগণ ছিল ধর্মান্ধ মুসলমান; বোসনিয়া ও বুলগেরিয়ার অভিজাতগণ ছিল ইসলামধর্মী। কিন্তু বোসনিয়ার কৃষকগণ ছিল রোমান ক্যাথলিক। বল্কান দেশগুলির অধিকাংশ জনগণ ছিল গ্রীক, খ্রীষ্টান এবং কনস্টাণ্টিনোপল-এর চার্চের প্রতি অনুগত।

ধর্মীয় বৈষম্য

সর্ব-শ্লাভবাদ নিকট-প্রাচ্য সমস্যাকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। অস্ট্রিয়ায় এই আন্দোলনের প্রথম সূচনা হয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রাগে সর্বপ্রথম সর্ব-শ্লাভবাদ আন্দোলনের জন্য শ্লাভ নেতৃবর্গের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরে রাশিয়া এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার বিনষ্ট প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধারের আশায় রুশ-জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার (১৮৫৫-৮১) সর্ব-শ্লাভবাদ আন্দোলন সমর্থন করেন। রাশিয়া পোল্যাণ্ডের শ্লাভদের আন্দোলন নির্মম হস্তে দমন করে বটে, কিন্তু তুরস্কের বিরুদ্ধে বল্কানের শ্লাভগণকে সমর্থন করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মণ্টিনিগ্রো, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রুমানিয়া এবং ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সার্বিয়ার আন্দোলন রাশিয়া সমর্থন করে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের মস্কো নগরীতে শ্লাভনেতাদের এক বৈঠকের উদ্বোধন করেন। জার নিজেকে বল্কানের

সর্ব-শ্লাভবাদ (Pan Slavanism)

রাশিয়া ও সর্ব-শ্লাভবাদ

খ্রীষ্টান অধিবাসীদের রক্ষক হিসাবে দাবি করিতেন এবং ইহার ফলে তুরস্কের সহিত রাশিয়ার সংঘর্ষ শেষ পর্যন্ত অনিবার্য হইয়া উঠে।

সর্ব-শ্লাভবাদ আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতা ছিল বল্কান দেশগুলির মধ্যে ধর্মীয় ও জাতিগত বৈষম্য, উহাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ এবং বল্কান অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপনে সার্বিয়ার উদ্যোগ। প্রকৃতপক্ষে সার্বিয়ার পরিচালনাধীনে সর্ব-সার্ববাদ (Pan Serb) সর্ব-শ্লাভবাদ আন্দোলনের বিরোধী হইয়া উঠে।

শ্লাভবাদ আন্দোলনের দুর্বলতা

বল্কান ও ইওরোপীয় শক্তিবর্গ (উনবিংশ শতাব্দী): বল্কানের সহিত ইওরোপের প্রধান শক্তিবর্গের স্বার্থ জড়িত ছিল এবং এই কারণে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ বল্কানের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং বল্কান ও তুরস্কের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারে নাই। রাশিয়ার লক্ষ্য ছিল বল্কানে স্বীয় আধিপত্য সুদৃঢ় করা, ইওরোপ হইতে তুর্কীগণকে বিতাড়িত করা এবং কনস্ট্যান্টিনোপল দখল করা।

রাশিয়া

অস্ট্রিয়া ইওরোপে তুর্কীগণকে থাকিতে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল বটে কিন্তু সেই সঙ্গে পূর্বদিকে সম্প্রসারণের নীতি (Drang nach Osten : Drive to the East) গ্রহণ করিয়া বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা দখল করিতেও উদগ্রীব ছিল। অস্ট্রিয়া সর্ব-শ্লাভবাদ আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিল। দানিউব অঞ্চলে রাশিয়ার ক্রম-সম্প্রসারণ অস্ট্রিয়ার পক্ষে উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিকট-প্রাচ্য সমস্যার এক অন্যতম কারণ। ব্রিটেন ও ফ্রান্স তুরস্ক-সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা বজায় রাখিবার পক্ষপাতী ছিল।

অস্ট্রিয়া ও ব্রিটেন

মলডেভিয়া ও ওয়ালাকিয়ার জাতীয় আন্দোলন: প্যারিস সন্ধির শর্তানুযায়ী তুরস্কের সুলতান তাঁহার সাম্রাজ্যের সংস্কার প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি তাহা পালন করেন নাই। ফলে বল্কান জাতিগুলির মধ্যে তুর্কী-বিরোধী মনোভাব তীব্র হইতে থাকে।

দানিউব নদীর উত্তর উপকূলে অবস্থিত মলডেভিয়া ও ওয়ালাকিয়া প্রদেশ দুইটিতে গণ-আন্দোলন আরম্ভ হইলে নিকট-প্রাচ্য সমস্যার পুনরাবৃত্তি ঘটিল। উভয় প্রদেশের জনসাধারণ পূর্ণ-স্বাধীনতা দাবি করিল। ফ্রান্স ও রাশিয়া এই দাবি সমর্থন করিল। অপরদিকে অস্ট্রিয়া স্বীয় সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ও ইংল্যান্ড তুরস্ক-সাম্রাজ্যের অক্ষুণ্ণতা বজায় রাখার জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরোধিতা করিল।

ইতিমধ্যে মলডেভিয়া ও ওয়ালাকিয়ার জনসাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে উভয় প্রদেশকে একত্রীভূত করিয়া একটি অখণ্ড রাষ্ট্র গঠনের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। কিন্তু ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিলে উক্ত প্রদেশ দুইটির অধিবাসীবৃন্দ কর্ণেল আলেকজাণ্ডার কুজা (Col. Alexander Couza)

নামক এক সেনানায়ককে সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাজা বলিয়া মনোনীত করিল (১৮৫৯ খ্রীঃ)। অনেক দ্বিধা ও সন্দেহের পর ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ উভয় প্রদেশের মিলনকে সরকারীভাবে স্বীকার করিয়া লইল। এই নূতন রাষ্ট্রের নামকরণ হইল রুমানিয়া এবং উহার রাজধানী হইল বুখারেস্ট। প্রিন্স কুজা ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে গণ-আন্দোলনের ফলে পদচ্যুত হন। অতঃপর জার্মানীর হোহেনজোলার্ণ বংশীয় প্রিন্স ক্যারল রুমানিয়ার রাজারূপে মনোনীত হইয়া ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

বল্কানে শ্লাভজাতির আন্দোলন: তুরস্ক সাম্রাজ্যাধীন বল্কান জাতিসমূহের স্বাধীনতা-আন্দোলন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্রমশঃ সার্বিয়া (১৮১৯ খ্রীঃ) ও গ্রীসের (১৮৩২ খ্রীঃ) আংশিক বা পূর্ণ-স্বাধীনতা অর্জন এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মলডেভিয়া ও ওয়ালাকিয়ার সাফল্য প্রতিবেশী অন্যান্য অঞ্চলসমূহের অধিবাসীগণকে তুরস্কের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য চঞ্চল করিয়া তুলিল। রাশিয়ার নেতৃত্বে প্যান-শ্লাভ আন্দোলন এই জাতীয় জাগরণে অনুপ্রেরণা জোগাইল। সার্বিয়া, গ্রীস, মলডেভিয়া ও ওয়ালাকিয়ার পর তুর্কী-বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হইল বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া ইহাদের উপর তুর্কী-সুলতানের উৎপীড়ন চলিতেছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই দুই অঞ্চলের জনসাধারণ বিদ্রোহী হইল। বিদ্রোহের অগ্নি মণ্টিনিগ্রো, ডালমেশিয়া ও বুলগেরিয়ায় ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িল। ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি পারস্পরিক বিবাদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হেতু তুরস্কের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অসমর্থ হওয়ায় রাশিয়া তুরস্কের খ্রীষ্টান প্রজাদের সাহায্যে অগ্রসর হইল। ইহার ফলে রুশ-তুর্কী যুদ্ধ আরম্ভ হইল (১৮৭৭ খ্রীঃ)।

রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ (১৮৭৭-৭৮): রাশিয়ার বিপ্লবী-আন্দোলনের প্রসারের আশঙ্কায় জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার তুরস্কের সহিত যুদ্ধ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। এতদ্ভিন্ন তুরস্কের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলে ব্রিটেনের সহিতও রাশিয়ার যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু রুশজনগণের চাপে সার্বিয়া রক্ষার্থে তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে রুশ-জার ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ সকল শক্তি নিয়োগ না করিলে তিনি একক হস্তেই তুরস্কের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন যদিও কনস্টাণ্টিনোপল দখল করার অভিপ্রায় তাঁহার নাই।

ডিসরেলী ও দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার

রাশিয়ার চরমপত্র ইংল্যাণ্ডে এক দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করিল এবং ডিসরেলীর মনে এই ধারণাই বলবতী হইল যে রুশ-জার বল্কান সংকটের সুযোগে বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে বদ্ধ পরিকর। রাশিয়ার সাফল্য ব্রিটেনের ভারতীয় সাম্রাজ্যের পক্ষে যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ ছিল। ইতিমধ্যে রুশ-জার ঘোষণা

করিলেন যে তুরস্ক ইওরোপীয় শক্তিবর্গের দাবি মানিয়া লইতে অসম্মত হইলে রাশিয়া অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হইবে।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া রাইখস্টাগ-এর সন্ধি (Treaty of Reichstadt) স্বাক্ষর করিল। ইহার শর্তানুসারে স্থির হইল যে (১) রুশ-তুরস্ক যুদ্ধে অস্ট্রিয়া নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবে, (২) রাশিয়া দানিউবের দক্ষিণাঞ্চলের কোন অংশ দখল করিবে না এবং (৩) অস্ট্রিয়া বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা দখল করিবে।

রাইখস্টাগের সন্ধি, কনস্টান্টিনোপল-এর সম্মেলন

লর্ড ডার্বি-র প্রস্তাবক্রমে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের প্রতিনিধিগণ কনস্টান্টিনোপল-এর সম্মেলনে মিলিত হইলেন। এই সম্মেলনে বোসনিয়া ও হারজেগোভিনার স্বায়ত্তশাসনের এবং সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোকে কিছু রাজ্যাংশ প্রদান করার দাবি করিল। কিন্তু তুরস্কের সুলতান এই দাবিগুলি মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইলেন। ফলে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সম্মেলন বন্ধ হইয়া গেল। জনৈক ঐতিহাসিকের ভাষায় "It had served its purpose. It had fooled Europe." রুশ-জার অতঃপর ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ডিসরেলীর সহিত লণ্ডন প্রটোকল্ নামক চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। তুরস্কের সুলতান রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটেনের সাহায্যের আশায় লণ্ডন প্রটোকল্ গ্রহণে অসম্মত হইলেন এবং পররাষ্ট্র ব্যাপারে তুরস্কের স্বাধীন অধিকারের কথা ঘোষণা করিলেন।

লণ্ডন প্রটোকল্ (১৮৭৭)

ফলে রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। রুশ-জনগণের চাপ ও তুরস্কের আক্রমণাত্মক মনোভাব সত্ত্বেও দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার যুদ্ধ পরিহার করার চেষ্টা করিয়া শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইলেন। রুশ-তুরস্ক সংঘর্ষ সম্পর্কে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্‌দের মধ্যে অনৈক্য ও মতভেদ তুরস্ককে উৎসাহিত করিল। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রুশ-বাহিনী তুরস্কের সীমানা অতিক্রম করিলে রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটিল। এই যুদ্ধে তুরস্কের অনুকূলে ব্রিটেনের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু রাশিয়া ব্রিটেনকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিল যে কনস্টান্টিনোপল বা সুয়েজখাল দখলের অভিপ্রায় রাশিয়ার নাই।

যুদ্ধ

কৃষ্ণসাগরের উপর তুর্কী রণতরীর আধিপত্য থাকায় একমাত্র রুমানিয়ার ভিতর দিয়া রাশিয়ার পক্ষে তুরস্ক আক্রমণের পথ উন্মুক্ত ছিল। সুতরাং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রাশিয়া রুমানিয়ার সহিত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। ইহার শর্তানুসারে রাশিয়া রুমানিয়ার ভিতর দিয়া সৈন্য চলাচলের অনুমতি লাভ করিল এবং ইহার বিনিময়ে রাশিয়া রুমানিয়ার রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল। তুরস্কের সুলতান এই চুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিলেন এবং রুমানিয়ার কালাফাৎ নামক

রুশ-রুমানিয়া চুক্তি

শহরটি বোমারুদ্বারা বিধ্বস্ত করিলেন। ইহার প্রতিবাদে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে রুমানিয়া তুরস্কের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। রুমানিয়ার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া মণ্টিনিগ্রো তুরস্কের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করিল। রাশিয়া বল্কানে ও ককেসাসে একযোগে যুদ্ধ শুরু করিল। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে রুশ-বাহিনী বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করিল। ইহার পর রুশ-বাহিনী দানিউব অতিক্রম করিয়া দব্রুজা (Dobrudja) দখল করিল। সর্বত্র তুর্কী-বাহিনী পরাজিত হইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিল। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রুশ-বাহিনী প্লিভ্না (Plevna) দখল করিলে সার্বিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। প্লিভ্না দখলের পর রুশ-বাহিনী আদ্রিয়ানোপল-এর দিকে অগ্রসর হইল এবং ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রুশ-বাহিনী আদ্রিয়ানোপল দখল করিল। তুরস্ক বাধ্য হইয়া রাশিয়ার সহিত আদ্রিয়ানোপল-এর যুদ্ধবিরতি চুক্তি (Armistice of Adrianople) স্বাক্ষর করিল। ইহার শর্তানুসারে তুরস্ক রুমানিয়া, সার্বিয়া ও মণ্টিনিগ্রোর সম্প্রসারণে ও বুলগেরিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে সম্মত হইল।

রুশ-বাহিনীর ক্রমাগত জয়লাভ

সান-স্টিফানোর সন্ধি: আদ্রিয়ানোপল-এর যুদ্ধবিরতি-চুক্তি ইওরোপীয় শক্তিগুলির মনে উদ্বেগের সঞ্চার করিল। ব্রিটেন আশঙ্কা করিল যে পূর্বসম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করিয়া রাশিয়া কনস্টাণ্টিনোপল দখল করিবে। তুরস্ক এই সংগ্রামে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যস্থতার যে প্রস্তাব ইতিমধ্যে করিয়াছিল জার্মানী তাহাতে সম্মত হইল না। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রিটিশ নৌবহর সানস্টিফানোর সন্নিকটে আসিয়া পেঁছিলে রাশিয়া কনস্টাণ্টিনোপল দখল করিবার হুমকি দেখাইল। অবশেষে তুরস্কের সুলতানের অনুরোধে ব্রিটিশ নৌবহর বেসিক হ্রদে ফিরিয়া যায়। অস্ট্রিয়া আদ্রিয়ানোপল-এর যুদ্ধবিরতি-চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া ভিয়েনায় ইওরোপীয় শক্তিবর্গের একটি সম্মেলনের প্রস্তাব করিল। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। বিসমার্ক তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে মধ্যস্থতা ('honest broker') করার প্রস্তাব করিলেন।

ইওরোপীয় শক্তিবর্গের উদ্বেগ

অস্ট্রিয়ার প্রস্তাব

যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে সানস্টিফানোর সন্ধি (Treaty of San Stefano) স্বাক্ষরিত হইল। ইহার শর্তানুসারে (১) রাশিয়া তুরস্কের নিকট হইতে দব্রুজা সমেত প্রচুর ক্ষতিপূরণ আদায় করিল, (২) দানিউব অঞ্চলে তুরস্ক উহার দুর্গাদি ভাঙ্গিয়া দিতে স্বীকৃত হইল, (৩) এশিয়ায় রাশিয়া বাটুম, কার্স, আরদাহান ও বায়াজিদ প্রভৃতি অঞ্চলগুলি লাভ করিল, (৪) বুলগেরিয়াকে স্বায়ত্ত-শাসিত ও করদরাজ্যের মর্যাদা প্রদান করা হইল এবং আলবানিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত বুলগেরিয়ার সীমানা সম্প্রসারিত করা হইল, (৫) সার্বিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করা হইল এবং মণ্টিনিগ্রোর সীমান্ত পর্যন্ত সার্বিয়ার

সানস্টিফানো-সন্ধির শর্তাদি

সীমানা সম্প্রসারিত করা হইল, (৬) রুমানিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করা হইল, (৭) বোসনিয়া ও হারজেগোভিনাকে খ্রীষ্টান গভর্নর জেনারেলের শাসনাধীনে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হইল এবং (৮) তুরস্ক আর্মেনিয়ায় প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রবর্তনে সম্মত হইল।

সমালোচনা

সানস্টিফানোর সন্ধি শ্লাভ রাষ্ট্রগুলিকে শক্তিশালী করিল এবং বল্কানে রাশিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল। 'বৃহত্তর বুলগেরিয়া' (Greater Bulgaria) গঠিত হইবার ফলে তথায় রাশিয়ার প্রতিপত্তি একপ্রকার কায়েম হইল এবং বুলগেরিয়া রাশিয়ার একটি প্রদেশে পরিণত হইল। তুরস্কের শাসনাধীন ইওরোপের রাজ্যাংশগুলির উপর রাশিয়ার প্রত্যক্ষ শাসন স্থাপিত হইল। ইওরোপে তুরস্ক-সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটিল। বল্কানে তুরস্কের অধীনে রহিল মাত্র রুমানিয়া, সালোনিকা, থেসালী, এপিরাস, আলবানিয়া, বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা। সানস্টিফানোর সন্ধি বল্কানে এক গভীর অসন্তোষের সঞ্চার করিল। বোসনিয়া লাভ না করায় সার্বিয়া ক্ষুণ্ণ রহিল, রাশিয়াকে সাহায্য করার বিনিময়ে রুমানিয়া আশানুরূপ রাজ্যাংশ লাভ না করায় বিক্ষুব্ধ হইল এবং ম্যাসিডনিয়া লাভ না করায় গ্রীস মর্মাহত হইল।

৭.২. **বার্লিন সন্ধি (Treaty of Berlin) ঃ** সানস্টিফানোর সন্ধি দ্বারা নিকট-প্রাচ্যে রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের অবসান হইয়াছিল বটে কিন্তু ইওরোপীয় শক্তিবর্গ এই সন্ধি সমর্থন করিতে পারে নাই।

ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক সানস্টিফানো সন্ধির সংশোধন দাবি

এই সন্ধিতে ইংল্যাণ্ডই সর্বাপেক্ষা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল কারণ নিকট-প্রাচ্যে তুরস্কের ব্যয়ে রাশিয়ার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংল্যাণ্ডের প্রাচ্য-সাম্রাজ্য মিশর ও ভারতবর্ষের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবার উপক্রম হইল। তুরস্কের উপর রাশিয়ার প্রতিপত্তি বিস্তার লাভের ফলে বল্কান অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার সম্প্রসারণের পথ রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইল এবং ইহা ছাড়া রাশিয়ার তাঁবেদারীতে বল্কান অঞ্চলে বৃহৎ বুলগেরিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের অখণ্ডতার পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। বল্কান অঞ্চলে জার্মানীর কোন প্রত্যক্ষ স্বার্থ না থাকিলেও বিসমার্ক রাশিয়ার বিপক্ষে অস্ট্রিয়াকে সমর্থন করিতে লাগিলেন। সুতরাং সম্মিলিতভাবে ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রিয়া দাবি করিল যে, যেহেতু নিকট-প্রাচ্য সমস্যা ইওরোপের আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যা সুতরাং একমাত্র রাশিয়া এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা করিতে পারে না, এবং সানস্টিফানোর সন্ধি ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক পুনর্বিবেচনা করিতে হইবে। ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রিয়া কর্তৃক ভীতি প্রদর্শন এবং রাশিয়ার প্রতি জার্মানীর বিরুদ্ধ মনোভাব প্রভৃতি কারণে অবশেষে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাশিয়াকে সানস্টিফানোর সন্ধি পুনর্বিবেচনা করার প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন জার্মানীর চ্যান্সেলার বিসমার্কের সভাপতিত্বে

বার্লিনে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের এক বৈঠক আহূত হইল। ইংল্যাণ্ডের প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলী বৈঠকের কার্যাবলী পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন। এই বৈঠকে ডিজরেলীর গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া বিসমার্ক বলিয়াছিলেন, "The old Jew, that is the man"। বহু আলোচনার পর বার্লিন বৈঠকে সানস্টিফানোর সন্ধি সংশোধিত হইয়া একটি নূতন সন্ধি রচিত হইল। ইহা বার্লিন সন্ধি (Treaty of Berlin, 1878) নামে অভিহিত।

বার্লিন সন্ধির শর্তাবলী : বার্লিন সন্ধির শর্তানুযায়ী (১) মন্টিনিগ্রো, সার্বিয়া এবং রুমানিয়া তুরস্কের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হইল।

(২) সানস্টিফানো সন্ধি দ্বারা স্বীকৃত 'বৃহত্তর বুলগেরিয়াকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হইল। ম্যাসিডনিয়া তুর্কী-সুলতানের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে রহিল; বুলগেরিয়ার দক্ষিণাংশ পূর্ব রুমানিয়া নামে একটি স্বয়ং-শাসিত রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিল। কিন্তু একজন খ্রীষ্টান গভর্নর সুলতানের অধীনে এই নূতন রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন স্থির হইল। অবশিষ্ট অংশ বুলগেরিয়া নামে পরিচিত হইল।

(৩) তুর্কী-সুলতান কর্তৃক রুমানিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল।

(৪) রাশিয়া বেসারাবিয়া, বার্টুম, কার্স ও আর্মেনিয়ার কিয়দংশ প্রাপ্ত হইল এবং বেসারাবিয়ার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রুমানিয়াকে দব্রুজা (Dobrudja) ছাড়িয়া দিল।

(৫) ইওরোপের শান্তি অব্যাহত রাখার জন্য বোসনিয়া ও হারজেগোভিনাকে অস্ট্রিয়ার শাসনাধীনে রাখা হইল।

(৬) রাশিয়া যতদিন বার্টুম ও কার্স উহার শাসনাধীনে রাখিবে ততদিন পর্যন্ত সাইপ্রাস দ্বীপের শাসনভার ইংল্যাণ্ডের হস্তে অর্পিত হইল। তুরস্ক-সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধনের জন্য তুরস্ক সাইপ্রাস দ্বীপের উদ্বৃত্ত রাজস্ব পাইবে স্থির হইল।

(৭) ভবিষ্যতে টিউনিস (Tunis) অধিকার করার অনুমতি ফ্রান্সকে দেওয়া হইল।

(৮) আলবানিয়াও ট্রিপোলী অধিকার করার দাবি জানাইল। নব্য-ইটালী ইওরোপীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে উহার গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভের দাবি সকলকে জানাইবার সুযোগ পাইল।

৭.৩. **বার্লিন সন্ধির সমালোচনা :** নিকট-প্রাচ্যের ইতিহাসে বার্লিন সন্ধি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। তৎকালীন নিকট-প্রাচ্যের রাজনৈতিক সমস্যা সাময়িকভাবে সমাধান করা ছাড়াও এই সন্ধিতে পরবর্তী কালের বহু সমস্যার বীজ নিহিত ছিল। তুরস্ক-সাম্রাজ্য সাময়িকভাবে রক্ষা পাইল বটে কিন্তু উহার অনিবার্য ধ্বংস ও সেই ধ্বংসের উপর নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব বার্লিন সন্ধিতে সূচিত হইয়াছিল।

সন্ধির গুরুত্ব

প্যারিসের সন্ধি দ্বারা (১৮৫৬ খ্রীঃ) ইওরোপীয় শক্তিবর্গ তুরস্ক-সাম্রাজ্যের অখণ্ডতার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল কিন্তু বার্লিন সন্ধি উহার বিচ্ছিন্নতা আইনতঃ স্বীকার করিয়া লয়। ইহা সত্য যে তুর্কী-সুলতান সানস্টিফানোর সন্ধি দ্বারা খণ্ডিত প্রায় ৫ লক্ষ অধিবাসীসহ ৬০ হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ড ফিরিয়া পান কিন্তু অন্যদিকে সাম্রাজ্যের প্রায় অর্ধাংশ সুলতানের অধিকারচ্যুত হয়। সাম্রাজ্যের কতকাংশ ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার হস্তগত হয়। তুরস্ক-সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার নামে এই শক্তিগুলি স্ব স্ব স্বার্থ চরিতার্থ করে। বল্কান অঞ্চলে ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার পারস্পরিক স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া শক্তিসমতা রক্ষা করাই এই সন্ধির মূল উদ্দেশ্য ছিল।

তুরস্কের প্রতি অবিচার

এই সন্ধির অন্যতম ত্রুটি হইল বল্কান অধিবাসীগণের জাতীয়তাবাদের দাবি অপূর্ণ রাখা। এমন কি তুরস্কের নির্যাতনমূলক শাসনাধীনে কোন কোন অঞ্চলকে রাখিতে সন্ধির রচয়িতাগণ কুণ্ঠিত হন নাই। বুলগেরিয়ার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া সার্বিয়াকে পুরস্কৃত করা হইল বটে কিন্তু অস্ট্রিয়ার ভূখণ্ড লাভ সার্বিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক হইল। সার্বিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলের শ্লাভগণকে তাহাদের জ্ঞাতি মন্টিনিগ্রোর শ্লাভগণ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। উপরন্তু বোসনিয়া ও হারজেগোভিনার কর্তৃত্বলাভ করিয়া অস্ট্রিয়া বল্কান অঞ্চলের অন্তর্দেশে আসিয়া পেঁছিল। ইহার ফলে অস্ট্রিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল নীতির সহিত বল্কান জনসাধারণের জাতীয়তাবাদী নীতির প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

বল্কান রাষ্ট্রগুলির প্রতি অবিচার

রুমানিয়া অসন্তুষ্ট রহিল। রাশিয়ার হস্তে সানস্টিফানোর সন্ধি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ রুমানিয়া বার্লিন সন্ধি দ্বারা সুবিচার পাইল না। রুমানিয়া হইতে বেসারাবিয়াকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাশিয়াকে প্রদান করায় রুমানিয়া ক্ষুব্ধ রহে। বুলগেরিয়াকে ত্রি-খণ্ডিত করায় বুলগেরিয়ার জনসাধারণের মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বোসনিয়া ও হারজেগোভিনার শাসনভার অস্ট্রিয়ার হস্তে অর্পণ করায় নিকট-প্রাচ্য সমস্যা অধিকতর জটিল হইয়া উঠে। এই প্রদেশদ্বয়ের অধিবাসীগণ শ্লাভ জাতিগোষ্ঠীভুক্ত ছিল। স্বভাবতঃই ইহারা প্রতিবেশী শ্লাভরাষ্ট্র অস্ট্রিয়ার সহিত সংযুক্ত হওয়ার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু বার্লিন সন্ধি অনুযায়ী উহাদিগকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়ার সহিত জুড়িয়া দেওয়ায় ভবিষ্যৎ অশান্তির বীজ রোপিত হয়।

বার্লিন বৈঠকের কূটনীতিবিদ্গণের দূরদৃষ্টির অভাব বশতঃ বার্লিন সন্ধিতে ভবিষ্যৎ অশান্তির কারণ রহিয়া যায়। বল্কান অঞ্চল হইতে একটি রাষ্ট্রকে (রাশিয়াকে) অপসারণ করিতে গিয়া তাঁহারা তথায় একাধিক রাষ্ট্রকে প্রবেশাধিকার প্রদান করিয়া বল্কান সমস্যা অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছিলেন। রাশিয়ার স্থলে অস্ট্রিয়া এই

ভবিষ্যৎ অশান্তির বীজ

অঞ্চলের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠে। শ্লাভজাতিগুলির জাতীয়তাবাদের পথে অস্ট্রিয়া প্রতিবন্ধক হইয়া উঠে। ফলে সন্ধির সাত বৎসরের মধ্যেই গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং বিশ বৎসর পর্যন্ত একা বুলগেরিয়াই নিকট-প্রাচ্য সমস্যাকে জীবন্ত করিয়া রাখে।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধিতে রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে যে সংঘর্ষের বীজ নিহিত ছিল তাহা ইওরোপকে দুইটি সামরিক শিবিরে বিভক্ত করিয়াছিল—একদিকে রুশ-ফরাসী মৈত্রী ও অপরদিকে অস্ট্রিয়া-ইটালী-জার্মান মৈত্রী।

রাশিয়া বুলগেরিয়াকে নিজের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনিতে চেষ্টা করিলে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বুলগারগণ বিক্ষুব্ধ হইয়া পূর্ব-রুমানিয়া হইতে তুর্কী-শাসনকর্তাকে বিতাড়িত করিল। অতঃপর উভয় রাষ্ট্রকে সংযুক্ত করিয়া 'বৃহত্তর বুলগেরিয়া' পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল। তুরস্কের নির্যাতন হইতে ম্যাসিডনিয়ার পুনরুদ্ধারের জন্য ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বল্কান যুদ্ধ এবং উহাকে বুলগেরিয়ার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বল্কান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বল্কানে একদিকে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অপরদিকে অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইন্ধন যোগাইতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। সর্বোপরি বিসমার্ক নিকট-প্রাচ্যের ব্যাপারে রাশিয়ার মিত্র হইয়াও প্রকৃতপক্ষে অস্ট্রিয়াকে সমর্থন করিয়া মোটেই 'সাধু দালাল' (honest broker)-এর পরিচয় দিতে পারেন নাই। জার্মানীর এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে রাশিয়া জার্মানীর প্রতি রুষ্ট হইয়া রহে। বল্কান ও তুরস্কের পরবর্তী ইতিহাস বার্লিন-সন্ধির রচয়িতাগণের গৌরব মোটেই বৃদ্ধি করে নাই। ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলী বার্লিন বৈঠক হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই বলিয়াছিলেন, "I have brought peace with honour" ("আমি সসম্মানে শান্তি স্থাপন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি")। ইহা স্বীকার্য যে নিকট-প্রাচ্যের সেই সংকটময় পরিস্থিতিতে ডিজরেলী সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য ইওরোপ তথা নিকট-প্রাচ্যে শান্তি অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ডিজরেলী কর্তৃক ঘোষিত 'সম্মানের সহিত শান্তি' যথার্থই স্থাপিত হইয়াছিল কিনা এই বিষয়ে মতভেদ আছে। বল্কানে রাশিয়ার একক হস্তক্ষেপ করার দাবির বিরোধিতা করিয়া তথায় ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের সম্মিলিত হস্তক্ষেপ করার নীতি গ্রহণ করিতে ডিজরেলী রাশিয়াকে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রিয়ার স্বার্থের খাতিরে রাশিয়াকে প্রতিরোধ করা হয় এবং সানস্টিফানোর সন্ধিদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত তুরস্ককে কিছু ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করিতে দেওয়া হয়। রাশিয়ার অগ্রগতি রুদ্ধ হওয়ায় ইংল্যাণ্ডের প্রাচ্য-সাম্রাজ্যের দ্বারপথ সুরক্ষিত হয়। এই দিক দিয়া বিচার করতে গেলে ইহা স্বীকার্য যে বার্লিন-সন্ধির ফলে ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ আশাতীতভাবে সুরক্ষিত হয়।

ডিজরেলীর নীতির সমালোচনা

দাবির স্বপক্ষে যুক্তি

ডিজরেলীর নীতির সমর্থন করিয়া ম্যারিয়ট (Marriott) বলেন যে যদি ডিজরেলী সান-স্টিফানোর সন্ধি পুনর্বিবেচনা করার চেষ্টা না করিতেন তাহা হইলে গ্রীস ও সার্বিয়াকে ম্যাসিডনিয়া লাভের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে হইত এবং উক্ত সন্ধি দ্বারা প্রাপ্ত বিশাল ভূখণ্ড বুলগেরিয়ার পক্ষে সুবিধাজনক না হইয়া অসুবিধারই কারণ হইত। তিনি বলেন যে অনিবার্য ধ্বংসের মুখ হইতে আংশিকভাবে তুরস্ক-সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিয়া ডিজরেলী বল্কান অঞ্চলে কয়েকটি নূতন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন।

ম্যারিয়টের সমর্থন

কিন্তু ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিত ঘটনা পরম্পরা বিচার করিলে দেখা যায় যে ডিজরেলীর দাবি 'Peace with honour' সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হইবে যে বল্কানে রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিহত হইল, কিন্তু বেসারাবিয়া উহার অধীনে থাকায় ও কৃষ্ণসাগরের পথ উন্মুক্ত থাকায়, ইওরোপের পরিবর্তে এশিয়াতে রাশিয়ার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ার পথে কোনরূপ বাধা রহিল না। কালক্রমে পূর্বাঞ্চলে রাশিয়া ইংল্যাণ্ডের স্বার্থের ঘোর পরিপন্থী হইয়া উঠে। বল্কান অঞ্চলে নব-জাগরিত জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ডিজরেলীর আস্থা ছিল না বলিয়া মনে হয়, এবং একমাত্র সামরিক শক্তির প্রয়োগ ছাড়া রাশিয়াকে প্রতিহত করার কোন দ্বিতীয় উপায় তাঁহার জানা ছিল না। ইওরোপ কিংবা এশিয়ার খ্রীষ্টান প্রজাবর্গের উন্নতিসাধনও প্রতিরক্ষার ব্যাপারে তিনি তুর্কী-সুলতানের সততার উপর নির্ভর করিয়া ভুল করিয়াছিলেন। তাঁহার এশিয়-নীতির ব্যর্থতা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হইয়াছিল। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া বার্লিন সন্ধির ৬৯নং ধারা অগ্রাহ্য করিয়া বাটুম সুরক্ষিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। সুতরাং রাশিয়া কিংবা তুরস্ক কেহই ডিজরেলীর এশিয়-নীতি (Asiatic Policy) স্বীকার করিয়া লয় নাই। সাইপ্রাস-দ্বীপে ব্রিটিশ নৌ-ঘাঁটি স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই এবং ইহা 'পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় জিব্রালটারেই, রহিয়া যায়।

ডিজরেলীর দাবির অযৌক্তিকতা

ইঙ্গ-রুশ সংঘর্ষের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

বার্লিন সন্ধির মূল উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়াকে প্রতিহত করিয়া তুরস্ককে শক্তিশালী করা। কিন্তু তাহা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। ডিজরেলী তুরস্ক-সাম্রাজ্যের ভৌমিক অখণ্ডতা রক্ষা করিবার নীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু সাইপ্রাস, বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা তুরস্ক-সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তুরস্ক সম্পর্কে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং ডিজরেলীর "Peace with honour"-কে ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টিকোণ হইতে কেটেলবী যথার্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ডিজরেলীর দাবি-কে এইভাবে সমর্থন করা যায় যে "তিনি শান্তির সহিত সাইপ্রাস-দ্বীপকেও সঙ্গে আনিয়াছিলেন এবং ব্রিটেনের স্বার্থে রাশিয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রতিহত করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন।"

ইংল্যাণ্ডের স্বার্থপরতা

নিকট-প্রাচ্য সমস্যার পুনরভ্যুদয়

৭.৪. **বার্লিন সন্ধি হইতে বুখারেস্ট-সন্ধি পর্যন্ত:** পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বার্লিন সন্ধি আশার পরিবর্তে হতাশার সৃষ্টি করে এবং ইহার শর্তগুলি পালন করার পরিবর্তে লঙ্ঘন করা হইতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বল্কান অঞ্চলের পরবর্তী ইতিহাস হইল বার্লিন সন্ধির উল্লঙ্ঘন এবং তজ্জনিত আন্তর্জাতিক জটিলতার সৃষ্টি। বল্কানের জাতিগুলি ও ইওরোপের শক্তিবর্গ বার্লিন সন্ধির শর্তাদি পালনে মোটেই উৎসাহী ছিল না। অস্ট্রিয়া প্রকাশ্যেই এই সন্ধি উপেক্ষা করিয়া চলিতে থাকে। বল্কানের সহিত ইওরোপের শক্তিবর্গের স্বার্থ বিভিন্নভাবে জড়িত ছিল এবং এই কারণে উহারা নিকট-প্রাচ্য সম্পর্কে কোন সুচিন্তিত নীতি গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়। ফলে বল্কান ইওরোপের ঝটিকা-কেন্দ্রে পরিণত হয়।

বার্লিন সন্ধির পর নিকট-প্রাচ্যের ইতিহাসে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

(ক) **পূর্ব-রুমানিয়ার সহিত বুলগেরিয়ার মিলন (১৮৮৬):** বুলগেরিয়াই সর্বপ্রথম বার্লিন সন্ধির বিরোধিতা করে। বার্লিন সন্ধি অনুযায়ী বুলগেরিয়া ও রুমানিয়াকে স্বতন্ত্র দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করা হইয়াছিল। জাতিগত বৈষম্য হিসাবে এই নীতি গৃহীত হয় নাই সুতরাং এই ব্যবচ্ছেদ অকৃত্রিম ও বলপূর্বকভাবে করা হইয়াছিল। বার্লিন বৈঠকের রাষ্ট্রবিদ্‌গণ এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে রাশিয়া কর্তৃক প্রস্তাবিত বৃহৎ বুলগেরিয়া (Greater Bulgaria) সৃষ্ট হইলে তাহা রাশিয়ার হস্তেই ক্রীড়নক স্বরূপ হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, এই অকৃত্রিম ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে উভয় রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ প্রিন্স আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া একটি অখণ্ড রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে। বুলগেরিয়ার তদানীন্তন নরপতি আলেকজাণ্ডার উভয় রাষ্ট্রের নরপতি বলিয়া ঘোষিত হন। তুরস্কের সুলতান এই মিলনের বিরোধিতা করেন ও জার বুলগেরিয়ার সৈন্যবাহিনী হইতে রুশ কর্মচারীগণকে ফিরাইয়া আনেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ড এই মিলন স্বীকার করিয়া লয়। বুলগেরিয়ার আয়তন বৃদ্ধিতে ক্ষুব্ধ ও ঈর্ষান্বিত হইয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্র সার্বিয়া বল্কানের শক্তি-সাম্য বিপন্ন হইতেছে এই অজুহাতে বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষে শান্তি স্থাপিত হয় এবং তুর্কী-সুলতানের অনুমোদনক্রমে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এই মিলন সরকারীভাবে স্বীকৃত হয়।

(খ) **আর্মেনিয়ার সমস্যা (১৮৯৪-৯৬):** কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত আর্মেনিয়া তুরস্কের অধিকারভুক্ত ছিল ও উহার অধিকাংশ অধিবাসী ছিল খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী। বার্লিন সন্ধি অনুযায়ী আর্মেনিয়া তুরস্কের অধীন থাকিবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল এবং তুরস্কের সুলতান তথায় শাসন সংস্কার প্রবর্তন করিবার প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সুলতান এই প্রতিশ্রুতি পালন না

করায় বুলগারদের দৃষ্টান্ত অনুকরণে আর্মেনিয়াগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সুলতান নিষ্ঠুরভাবে এই বিদ্রোহ দমন করেন এবং রাজধানী কনস্টান্টিনোপল এ প্রায় ছয় হাজার আর্মেনিয়াকে হত্যা করেন। আর্মেনিয়ানদের উপর এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইওরোপের সর্বত্র তীব্র প্রতিবাদ হইলেও ইওরোপের কোন রাষ্ট্রই তাহাদের স্বার্থ রক্ষার্থে অগ্রসর হইল না। রাশিয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া দ্বিতীয় 'অকৃতজ্ঞ বুলগেরিয়া' সৃষ্টি করিতে চাহিল না। ইংল্যান্ড শুধু প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত রহিল। জার্মানীর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ইতিপূর্বেই তুর্কী-সুলতানের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি নীরব রহিলেন। অস্ট্রিয়া জার্মানীর দৃষ্টান্তই অনুসরণ করিল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তার ফলে আর্মেনিয়া তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া নানাপ্রকার অত্যাচারে দগ্ধ হইতে থাকে।

(গ) **গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ (১৮৯৭) ঃ** ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীস স্বাধীনতা লাভ করিলেও গ্রীক ভাষাভাষী আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, ক্রীট, থেসালী, এপিরাস ও ম্যাসিডনিয়া প্রভৃতি অঞ্চল গ্রীকরাষ্ট্রের বহিভূর্ত রহিয়া গিয়াছিল। গ্রীস আশা করিয়াছিল যে বার্লিনের বৈঠকে গ্রীসের ভৌগোলিক সীমা পুনর্বিবেচনা করা হইবে এবং উপরি-উক্ত অঞ্চলগুলি গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু বার্লিন সন্ধি দ্বারা গ্রীসের সেই আশা পূর্ণ না হওয়ায় গ্রীস তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের মধ্যস্থায় তুরস্কের সুলতান থেসালী ও এপিরাস-এর কতকাংশ গ্রীসকে ছাড়িয়া দেন। কিন্তু গ্রীকগণ ইহাতেও সন্তুষ্ট হইল না।

ইতিমধ্যে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ভূমধ্যসাগরস্থ ক্রীট দ্বীপের অধিবাসীগণ স্বেচ্ছায় গ্রীসের সহিত তাহাদের অন্তর্ভুক্তি ঘোষণা করিলে তথাকার শাসনভার গ্রহণ করিবার জন্য গ্রীস তথায় সৈন্য প্রেরণ করে। তুরস্ক এ ব্যাপারে উদাসীন থাকিতে না পারিয়া ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঘোষণা করে। গ্রীস পরাজিত হইয়া ক্রীট অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা পরিত্যাগ করে এবং থেসালির কতকাংশ তুরস্ককে অর্পণ করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর ইওরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যস্থতায় ক্রীটকে আন্তর্জাতিক (ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইটালীর) রক্ষণাবেক্ষণে স্বয়ংশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত করা হয় এবং গ্রীসের যুবরাজ প্রিন্স জর্জকে তুর্কী-সুলতানের অধীনে উহার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ক্রীট এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারিল না এবং গ্রীসের সহিত সংযুক্ত হওয়ার জন্য আন্দোলন চালাইয়া যাইতে থাকে। অবশেষে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক যখন বল্কান যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত তখন গ্রীস সুযোগ বুঝিয়া ক্রীট অধিকার করিয়া লয়।

(ঘ) **তরুণ-তুর্কী আন্দোলন (১৯০৮-১৯০৯) ঃ** ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে নিকট-প্রাচ্য সমস্যা এক নূতন পর্যায়ে এবং নূতনভাবে দেখা দেয়। ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রভাবিত তুর্কী যুবকদের পরিচালনায় তুরস্কে একটি সংস্কারপন্থী দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সংস্কারপন্থী তরুণ-তুর্কী আন্দোলনের (Young

Turk Movement) লক্ষ্য ছিল—(১) আধুনিকভাবে তুরস্ককে গড়িয়া তোলা, (২) বিদেশীশক্তির প্রভাবাধীন হইতে তুরস্ককে মুক্ত করা এবং (৩) পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রীতি অনুসারে তুরস্কের শাসনতন্ত্র রচনা করা মূলতঃ অটোম্যান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন করাই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। এই তরুণ-তুর্কী দল বিনা রক্তপাতে সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদকে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন হেতু এক পার্লামেণ্ট আহবান করিতে বাধ্য করে। নূতন পার্লামেণ্ট আহূত হয় এবং শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ঘোষিত হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আব্দুল হামিদ তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়া স্বেচ্ছাতন্ত্র পুনর্বহাল করিতে সচেষ্ট হন। ফলে তরুণ-তুর্কীদল তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা পঞ্চম মহম্মদকে সুলতান-পদে অভিষিক্ত করে (১৯০৯ খ্রীঃ)।

তুরস্ক-সাম্রাজ্যে নবযুগের সূচনা দেখিয়া ইওরোপীয় শক্তিগুলি অস্বস্তিবোধ করে, অপরদিকে বার্লিন সন্ধির শর্তাবলীও লঙ্ঘিত হইতে থাকে। বুলগেরিয়া তুরস্কের অধিকার হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ-স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তুর্কীর-সুলতান বুলগেরিয়ার এইরূপ ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইলেও অধিক ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে বুলগেরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লন। অস্ট্রিয়া বার্লিন সন্ধি অমান্য করিয়া বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা প্রদেশ দুইটি অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের অংগীভূত করিয়া লয়। এই দখলের ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়া অস্ট্রিয়া যথেষ্ট লাভবান হয়। জাপানের সহিত যুদ্ধে পরাজয়ের পর দুর্বল হইয়া পড়ায় বল্কান অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার প্রধান প্রতিদ্বন্দী রাশিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াই ক্ষান্ত রহে। নূতন করিয়া যুদ্ধ করার মত ক্ষমতা আপাততঃ রাশিয়ার ছিল না। প্রকাশ্যভাবে বার্লিন-চুক্তি উল্লঙ্ঘিত হইলেও শুধু আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার জন্য ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া অস্ট্রিয়ার আচরণ নির্বিবাদে সহ্য করে। কিন্তু এই ব্যাপারে সর্বাধিক রুষ্ট হইল সার্বিয়া। ভাষা, ঐতিহ্য ও জাতিগোষ্ঠীর দিক হইতে বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা প্রদেশ দুইটির উপর অস্ট্রিয়া অপেক্ষা সার্বিয়ার দাবি অধিক ছিল। বহুদিন হইতেই সার্বিয়া এই প্রদেশ দুইটিকে স্বীয় রাজ্যভুক্ত করার স্বপ্ন দেখিতেছিল। অস্ট্রিয়া এই প্রদেশ দুইটি দখল করিলে শুধু যে সার্বিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল তাহা নহে। উপরি-উক্ত সমুদ্রাভিমুখে সার্বিয়ার বিস্তারলাভের পথও রুদ্ধ হয়। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া কোন ফল হইল না বটে, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে অস্ট্রিয়া-সার্বিয়ার সংঘর্ষ হইতেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম স্ফুলিঙ্গ উদ্ভূত হইয়াছিল।

ইহার প্রতিক্রিয়া

অস্ট্রিয়া কর্তৃক বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা দখল

অস্ট্রিয়ার প্রতি সার্বিয়ার বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব

বল্কান অঞ্চলের এই বিশৃংখলার সুযোগ লইয়া ইটালীও তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত ট্রিপোলী দখল করিয়া লয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের লোসেন-এর সন্ধি দ্বারা সুলতান ইটালীর এই অধিকার স্বীকার করিয়া লন।

তুরস্ক-ইটালী যুদ্ধ ও ইটালীর লাভ

প্রথম বল্কান যুদ্ধ (First Balkan War, 1911) **:** তরুণ-তুর্কী আন্দোলনের নেতৃবর্গ গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের নীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু মুখ্যতঃ তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কীকরণ নীতি অনুসরণ করিয়া তুরস্ক-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর উপর একাধিপত্য স্থাপন করা। তুরস্কীকরণ নীতির নামে প্রথমেই ম্যাসিডনিয়া ও আলবেনিয়ার খ্রীষ্টান প্রজাবর্গের উপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ হয়। এইরূপ অত্যাচারের ফলে তুরস্ক-সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়া উঠে।

তুরস্কীকরণ নীতি

তুরস্কের অত্যাচার নিবারণ করার অভিপ্রায়ে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে সার্বিয়া, মণ্টিনিগো, গ্রীস ও বুলগেরিয়া বল্কানের এই রাষ্ট্রচতুষ্টয় 'বল্কান লীগ' (Balkan League) নামে এক সংঘ প্রতিষ্ঠা করে। এই লীগ ম্যাসিডনিয়ার খ্রীষ্টান প্রজাগণের উপর অত্যাচারের অবসান করিয়াও তথায় শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করিবার দাবি সুলতানকে জানাইল। কিন্তু সুলতান ইহাতে সম্মত না হওয়ায় বল্কান লীগ সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইহা প্রথম বল্কান যুদ্ধ নামে পরিচিত। তুর্কীবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং একমাত্র কনস্ট্যাণ্টিনোপল ব্যতীত তুরস্ক-সাম্রাজ্যের আর সকল অংশই বল্কান লীগের অধিকারভুক্ত হয়। এই অবস্থায় তুরস্কইওরোপীয় শক্তিবর্গের নিকট আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাব পাঠায়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনেআলোচনা আরম্ভ হয় কিন্তু সুলতান তুরস্কের কতকাংশের উপর অধিকার পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হওয়ায় আলোচনা পরিশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং এই যুদ্ধেও তুরস্কের পরাজয় ঘটে। সার্ব ও বুলগারগণ আদ্রিয়ানোপল এবং মণ্টিনিগ্রোগণ স্কুটারী দখল করে। স্কুটারীর পতন হইলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ আতঙ্কিত হইয়া উঠে। অস্ট্রিয়া ও ইটালী মণ্টিনিগ্রো কর্তৃক স্কুটারী দখলের বিরোধিতা করিয়া উহা আলবানিয়ার সহিত সংযুক্ত করিবার দাবি করে। উহারা সার্বিয়াকেও আদ্রিয়ানোপল হইতে সরিয়া যাইবার জন্য চাপ দেয়। সার্বিয়ার শক্তিবৃদ্ধি অস্ট্রিয়া কোনো মতেই সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া সার্বিয়াকে সমর্থন করে। অপরদিকে জার্মানী অস্ট্রিয়ার পশ্চাতে রহে। রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিলে প্রথমোক্ত ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ শান্তিরক্ষার জন্য অস্ট্রিয়ার দাবিকেই প্রাধান্য দেয়।

বল্কান লীগ ও উহার দাবি

লীগের সহিত সুলতানের যুদ্ধ

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন সন্ধি অনুযায়ী প্রথম বল্কান যুদ্ধের অবসান হইল। এই সন্ধি দ্বারা (১) তুরস্ককে একমাত্র কনস্ট্যাণ্টিনোপল ছাড়া আর সবই হারাইতে হইল। তুরস্ক গ্রীস কর্তৃক ক্রীট অধিকার স্বীকার করিয়া লইল। (২) অস্ট্রিয়ার বিশেষ আগ্রহে সার্বিয়ার ক্ষমতা খর্ব করার জন্য আলবেনিয়াকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা হইল। (৩) অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে ঘোরতর বিদ্বেষের সৃষ্টি হইল।

লণ্ডনের সন্ধি (১৯১৩)

দ্বিতীয় বল্কান যুদ্ধ (Second Balkan War, 1913) **:** তুরস্কের পরাজয়ের পর বল্কান অঞ্চলের ভাগ-বাঁটোয়ারা লইয়া বল্কান লীগের সদস্যদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয় এবং এই বিবাদের পরিণতি হইল দ্বিতীয় বল্কান যুদ্ধ। ম্যাসিডনিয়ার অঞ্চল লইয়া সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। আলবেনিয়া হস্তচ্যুত হওয়ায় ক্ষতিপূরণ হিসাবে সার্বিয়া ম্যাসিডনিয়া দাবি করিল। বুলগেরিয়া এই দাবির বিরোধিতা করিয়া ম্যাসিডনিয়ার উপর নিজের দাবি উপস্থাপিত করিল। কিন্তু সার্বিয়া ম্যাসিডনিয়ার দাবি পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হওয়ায় বুলগেরিয়া সার্বিয়া আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বল্কান যুদ্ধ আরম্ভ হইল। গ্রীস ও রুমানিয়া সার্বিয়ার পক্ষ সমর্থন করিয়া বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। বল্কানের এই অন্তর্বিবাদের সুযোগ লইয়া হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তুরস্ক বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান করিল। চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া বুলগেরিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল। অবশেষে অস্ট্রিয়ার মধ্যস্থতায় বুখারেস্ট সন্ধি দ্বারা (১৯১৩ খ্রীঃ) বুলগেরিয়া সার্বিয়া ও গ্রীসকে ম্যাসিডনিয়ার বৃহৎ অংশ ছাড়িয়া দিল, রুমানিয়াও বুলগেরিয়ার কিছু অংশ লাভ করিল এবং তুরস্ক আদ্রিয়ানোপল ও এথেন্সের কিছু অংশ পুনরুদ্ধারের সুযোগ পাইল।

বল্কান রাষ্ট্রগুলির বিবাদ

বুখারেস্টের সন্ধি (১৯১৩)

বুলগেরিয়ার পরাজয়
রুমানিয়া ও তুরস্কের লাভ

৭.৫. **বল্কান যুদ্ধের ফলাফল** (Results of the Balkan Wars) **:** দুই বল্কান যুদ্ধের ফলে ইওরোপে তুরস্ক-সাম্রাজ্যের বিলোপ ঘটিল এবং অপরদিকে বল্কান অঞ্চলে খ্রীষ্টান রাজ্যগুলির আয়তন পূর্বাপেক্ষা বৃহত্তর হইল।

(১) সার্বিয়া ও গ্রীস সর্বাপেক্ষা লাভবান হইল। (২) তুরস্ক উহার সাম্রাজ্যের চার-পঞ্চমাংশ হারাইল এবং বল্কান অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তেই এই সাম্রাজ্য অতঃপর সীমাবদ্ধ রহিল। (৩) দুইটি বল্কান যুদ্ধ দ্বারাও বল্কান সমস্যার সমাধান হইল না। উপরন্তু দ্বিতীয় বল্কান যুদ্ধ এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিবাদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিল। বল্কান রাষ্ট্রগুলির দ্বারা অত্যাচারিত হইয়াছিল বলিয়া বুলগেরিয়ার মনে ইহাদের বিরুদ্ধে আক্রোশ রহিল এবং প্রতিশোধ লইবার জন্যই বুলগেরিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বল্কান রাষ্ট্রগুলির বিপক্ষদলে যোগদান করিয়াছিল। (৪) তুরস্কের স্থলে রাশিয়া বল্কানের রক্ষক হিসাবে আবির্ভূত হইল। (৫) সার্বিয়ার রাজ্যলাভ অস্ট্রিয়াকে বিরূপ করিল। অস্ট্রিয়ার শ্লাভ প্রজাগণ অস্ট্রিয়ার শাসন হইতে মুক্ত হইবার জন্য সার্বিয়ার দিকে তাকাইয়া রহিল। ফলে অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে ধ্বংস করার প্রতীক্ষায় রহিল। অপরদিকে সার্বিয়া অস্ট্রিয়ার শ্লাভ প্রজাগণের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল।

বল্কান যুদ্ধের ফলস্বরূপ আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি পাইল। তুরস্ক ও

বুলগেরিয়া দুর্বল হইয়া পড়ায় উভয়েই যথাক্রমে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হইল। অপরদিকে রাশিয়ার তাঁবেদার রাষ্ট্র সার্বিয়া বল্কান অঞ্চলে সর্বাধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইল। সুতরাং একদিকে সার্বিয়া ও অস্ট্রিয়া এবং অপরদিকে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া এই পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইন্ধন যোগাইতে সাহায্য করিয়াছিল।

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তরসংকেত

১। ১৮৫৬ হইতে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নিকট-প্রাচ্য সমস্যার বিবর্তন সংক্ষেপে লিখ। [উঃ ৭.১.]

২। ১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-তুর্কী যুদ্ধের কারণ কি? কোন্ সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে? এই সন্ধির শর্ত কি কি ছিল? [উঃ ৭ ১.]

৩। সানস্টিফানো সন্ধির সমালোচনা কর। [উঃ ৭.১.]

৪। বার্লিন সন্ধির (১৮৭৮) শর্তগুলি কি ছিল? বল্কান জাতিগুলির আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে এই সন্ধি কতদূর সফল হইয়াছিল? [উঃ ৭ ২., ৭.৩.]

৫। বার্লিন সন্ধির সমালোচনা কর। "আমি সম্মানের সহিত শান্তি স্থাপন করিয়াছি"—ডিজরেলীর এই মন্তব্য কতদূর যথার্থ বলিয়া মনে হয়? [উঃ ৭.৩.]

৬। বার্লিন সন্ধির পরবর্তী নিকট-প্রাচ্য সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ ৭ ৪.]

৭। দুইটি বল্কান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। [উঃ ৭.৪., ৭.৫.]

অষ্টম অধ্যায় | প্রথম বিশ্বযুদ্ধ—ভার্সাই সন্ধি—১৯১৪-১৯১৮ (First World War-Treaty of Versailles—1914-18)

৮.১. ১৮৭১-১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যুগের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Age—1871-1914)

সশস্ত্র শান্তির যুগ (Armed Peace—1871-1914) : ১৮৭১ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইওরোপ তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘটনা ও সংকটের চরম পরিণতি হইল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ইওরোপের ইতিহাসে এই যুগকে 'সশস্ত্র শান্তির যুগ' (Era of Armed Peace) বলা হইয়া থাকে। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের পর প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল ইওরোপে আন্তর্জাতিক শান্তি বিরাজিত ছিল। পশ্চিমে ফ্রাঙ্কফার্টের সন্ধি (১৮৭১ খ্রীঃ) হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং পূর্বাঞ্চলে বার্লিন সন্ধি (১৮৭৮ খ্রীঃ) হইতে বল্কান যুদ্ধ (১৯১৩ খ্রীঃ) পর্যন্ত শান্তি বজায় রহে। কিন্তু শান্তি অব্যাহত রহিলেও ইওরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইওরোপের রাজনৈতিক আবহাওয়া এমন ভাবে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল যে, যে কোনও মুহূর্তে এই শান্তি ব্যাহত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। ভবিষ্যৎ যুদ্ধের সম্ভাবনায় প্রতিটি রাষ্ট্রই নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী সামরিক প্রস্তুতি লইয়া ব্যস্ত ছিল। এইরূপ পরিস্থিতির ফলে সমগ্র ইওরোপ একটি সামরিক শিবিরে পরিণত হয়। এই কারণেই এই যুগকে সশস্ত্র শান্তির যুগ বলা হইয়া থাকে।

১৮৭১ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ এই পর্যন্ত যুগের ইওরোপীয় ইতিহাসের প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক কেটেলবী (Ketelbey) বলেন যে এই যুগের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল (১) শিল্পোন্নতি, (২) শ্রমিক আন্দোলন এবং (৩) উগ্র-জাতীয়তাবাদ। ("The age preceding the war of 1914 was distinguished on the whole by three chief tendencies—industrialism, working class movement and militant nationalism.")

শিল্পোন্নতি (Industrial Development) : অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংল্যাণ্ডে যে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীকালের মধ্যে তাহা সমগ্র পশ্চিম-ইওরোপে বিস্তার লাভ করিয়া পোল্যাণ্ড ও রাশিয়াকেও প্রভাবিত করিয়াছিল। যন্ত্রপাতি, বাষ্পশক্তি প্রভৃতির আবিষ্কার উৎপাদন প্রণালীর আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল। হস্ত দ্বারা উৎপাদনের পরিবর্তে যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ক্রমশঃ বাষ্পশক্তির পরিবর্তে বৈদ্যুতিক শক্তি এবং কয়লার পরিবর্তে তেলের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। এই সকল আবিষ্কারের ফলে ইওরোপের

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দেয়। যানবাহনের উন্নতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের দূরত্ব সংকুচিত হয়। অন্তর্দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমশঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিণত হয়। অর্থনৈতিক দিক দিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানার সৃষ্টি হয় এবং ইহার ফলে সমাজে বিভিন্ন নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হয় যাহারা ক্রমশঃ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠে।

নারী আন্দোলন

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালের মধ্যে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যেমন ল্যাবাদিস্ট (Labadist), এ্যান ভন শুরম্যান (Anna von Schurmau), জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill), স্ত্রীলোকদের জন্য কর্মসংস্থান ও তাহাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার দাবি উপস্থাপিত করিয়া আসিতেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শিল্পোন্নতির ফলে তাহাদের সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মের সংস্থান, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও শিক্ষা-গ্রহণের সুযোগ প্রভৃতি দাবি অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং নারী আন্দোলন ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। ইহা অনস্বীকার্য যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই তাহাদের এই দাবি কথঞ্চিৎ পূরণ করা হইয়াছিল এবং যুদ্ধের পরবর্তী কালে ইওরোপের প্রায় সকল রাষ্ট্রেই পুরুষদের সহিত তাহাদের সমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা স্বীকৃত হয়।

শ্রমিক আন্দোলন (Working Class Movement): শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইওরোপের প্রায় সকল রাষ্ট্রেই প্রভূত অর্থাগম হয়, নূতন নূতন সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতার পথ উন্মুক্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যের পথও প্রশস্ত হয়। সর্বত্র ধনী ও দরিদ্র, মালিক ও মজুর শ্রেণীর মধ্যে অচিরেই স্বার্থসংঘাত দেখা দেয় এবং এই সংঘাত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। একদিকে ধনিক সম্প্রদায়ের সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া চলে, অপরদিকে অল্প পারিশ্রমিকে কারখানার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করিয়া শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নৈতিকচরিত্র নষ্ট হইতে থাকে। উপরন্তু অত্যধিক পরিশ্রম এবং সর্বদা বেকারত্বের ভয়ে ভীত থাকিয়া ক্রমেই শ্রমিকদের মধ্যে এক বিরাট আন্দোলনের সূচনা হয়। এইরূপ পরিস্থিতিতে শিল্পজগতের সর্বত্র শ্রমিকশ্রেণীর উন্নতিসাধনের দাবি উত্থিত হয়। শ্রমিক-আন্দোলন তিনটি বিভিন্নপথে রূপ পায় যথা, ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন, শ্রমিক-হিতৈষী আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন।

ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন: শ্রমিকশ্রেণী উপলব্ধি করে যে তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারকল্পে এককভাবে চেষ্টা করা অপেক্ষা সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা অধিকতর কার্যকর হইবে। এইরূপ ধারণা হইতেই ট্রেড-ইউনিয়নের জন্ম হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেই ট্রেড-ইউনিয়ন গড়িয়া উঠে কিন্তু ইহাদের অনিষ্টকর কার্যকলাপের জন্য ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে ট্রেড-ইউনিয়ন স্বীকৃত হয় নাই। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে গ্ল্যাডষ্টোন মন্ত্রিসভা ইংল্যাণ্ডে ট্রেড-ইউনিয়ন স্বীকার করিয়া লন। ফ্রান্সে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রমিকদের আন্দোলন কঠোরভাবে দমন করা হইয়াছিল কিন্তু ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তথায় ট্রেড-ইউনিয়ন স্বীকৃত হয়। জার্মানীতে বিসমার্কের আমলে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের আইন দ্বারা ট্রেড-ইউনিয়ন গঠন নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এই আইন লঙ্ঘন করিয়া তথায় ট্রেড-ইউনিয়ন গড়িয়া উঠে এবং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে সেগুলি আইনতঃ স্বীকৃত হয়। এইভাবে সমগ্র ইওরোপে পরবর্তী কালে ট্রেড-ইউনিয়নগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শ্রমিক-সঙ্ঘের ন্যায় কৃষি-সঙ্ঘও গড়িয়া উঠে কিন্তু ইহাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব বিশেষ ছিল না বলিলেই চলে। ট্রেড-ইউনিয়নগুলির উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকগণের আর্থিক উন্নতি সাধন করা।

শ্রমিক-হিতৈষী আন্দোলন : শিল্পপতি, রাষ্ট্র বা মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান যাহারা শ্রমিকগণকে নিয়োজিত করে তাহারা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে নানাপ্রকার আইন লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়। শ্রমিকগণের ক্ষতিপূরণমূলক আইন, ইনসিওরেন্স ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি উন্নয়নমূলক আইন লিপিবদ্ধ হয়। একমাত্র ইংল্যাণ্ডেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে চল্লিশটি ফ্যাক্টরী আইন লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। প্রতিক্রিয়াপন্থী বিসমার্ক ও শ্রমিকদের উন্নয়নমূলক আইন-প্রণয়ন করিয়া সেগুলিকে রাষ্ট্রানুগত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন : শিল্প-বিপ্লব-প্রসূত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের পন্থা হিসাবে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব হয়। কোন একটিমাত্র সংজ্ঞা দ্বারা সমাজতন্ত্রবাদকে (Socialism) যথাযথরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। ইহার প্রায় ২৬০টি ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। "There are as many varieties of Socialism as there are Socialists।" অর্থাৎ যত জন তত মত।

সমাজতন্ত্রবাদের মূল নীতি তিনটি। কর্মপন্থা ও আদর্শ লইয়া সমাজতন্ত্র-বাদের সমর্থকগণের মধ্যে মতবিরোধ থাকিলেও সামগ্রিকভাবে দেখিতে গেলে সমাজতন্ত্রবাদী দর্শনের মধ্যে একটি মূলগত ঐক্য বিদ্যমান। প্রধানতঃ তিনটি মৌলিক নীতির উপর এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। (১) মূলধন (capitalism) ও উহার বিলোপসাধন, (২) মূলধন ও মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকগণকে রক্ষা করা এবং (৩) উৎপাদনের সকল কিছুই রাষ্ট্রীয়করণ করা (nationalisation)। অবশ্য সমাজতন্ত্রবাদ সকলপ্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তিরই বিলোপসাধন বা রাষ্ট্রীয়করণের পক্ষপাতী নহে।

সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতি

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে Utopians নামে একশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিকদের

আবির্ভাব হয়। ইংল্যাণ্ডের আওয়েন (Robert Owen), ফ্রান্সের চার্লস ফোরিয়ার (Charles Fourier) এবং সেণ্ট সাইমন (St. Simon) ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শকে কার্যে রূপায়িত করার কোন নির্দিষ্ট পন্থা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কার্ল মার্ক্স (Karl Marx) সমাজতন্ত্রবাদকে এক নূতন পথে পরিচালিত করিয়া ইহাকে এক নূতন রূপ দান করেন। তাঁহার প্রচারিত মতবাদকে বলা হয় কমিউনিজম (Communism)। এই মতবাদের সমর্থকগণ (কমিউনিস্ট) ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন করিয়া উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সকল কিছুরই রাষ্ট্রীয়করণ করার পক্ষপাতী। মার্ক্সের মতে ধনিক, পুঁজিবাদী ও শোষিত শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সংঘাত অনিবার্য এবং এই সংঘাতের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইবে শ্রেণীহীন সমাজের অভ্যুদয়ে।

কার্ল মার্ক্স ও কমিউনিজম

সংগ্রামশীল-জাতীয়তাবাদ (Militant Nationalism) **:** ১৮৭১ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যুগের ইওরোপীয় ইতিহাসের অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল উগ্র-জাতীয়তাবাদের উন্মেষ। এই উগ্র-জাতীয়তাবাদের রূপ দুইটি (ক) ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদ জয়যুক্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহারা অন্যান্য রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হইল। জার্মানীতে এইরূপ মনোভাব উগ্রভাবে দেখা দিয়াছিল। উগ্র-জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ইওরোপীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

ইওরোপের কতক অঞ্চল যেমন পোল্যাণ্ড ও বল্কানের অধিবাসীদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় নাই। তদুপরি ফ্রান্সের জনসাধারণের মধ্যে আলসাস্-লোরেনের ব্যাপার লইয়া জাতীয় বিক্ষোভের অন্ত ছিল না। শ্লেসউইগ জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তথাকার ডেনস্ অধিবাসীগণ অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীতেও জাতিগত বিরোধ লাগিয়াই ছিল। ইটালী অস্ট্রিয়ার অধিকার হইতে ট্রিয়েস্ট ফিরিয়া পাইতে দৃঢ়সংকল্প ছিল এবং ট্রিয়েস্টের ব্যাপার লইয়া উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের অন্ত ছিল না। আইরিশগণের জাতীয় আন্দোলন ইংল্যাণ্ডের এক বিরাট রাজনৈতিক সমস্যা ছিল। অপরদিকে রাশিয়াকেও ফিনল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ডের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিব্রত রাখিয়াছিল। একদিকে অতৃপ্ত জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং অপরদিকে সামরিক শক্তিতে আস্থাশীল উগ্র-জাতীয়তাবোধ ইওরোপে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব করিয়াছিল। এই পরিস্থিতিরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

বিভিন্ন দেশে উগ্র-জাতীয়তাবোধ ও অতৃপ্ত জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা

সামরিকবাদ (Militarism) **:** আধুনিক সামরিকবাদের উৎপত্তিস্থল হইল দুইটি, প্রথমটি ফরাসী বিপ্লব এবং প্রথম নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য লিপ্সা। বাধ্যতামূলকভাবে

সৈন্যদলভুক্তকরণ নীতি (Conscription) সর্বপ্রথম ফ্রান্সেই গৃহীত হয় এবং ইহার ফলস্বরূপ পরবর্তী কালে আত্মরক্ষার্থে জার্মানী এই নীতি গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় উৎপত্তিস্থল হইল প্রাশিয়া। ইহা অনস্বীকার্য যে জার্মানীর জাতীয় ঐক্য প্রাশিয়ার সামরিক শক্তির দ্বারাই অর্জিত হইয়াছিল। সামরিক শক্তি হিসাবে প্রাশিয়ার আকস্মিক ও অভূতপূর্ব অভ্যুত্থান ও অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার সামরিক সাফল্য সমগ্র ইওরোপকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে সেডানের যুদ্ধের পর (১৮৭১ খ্রীঃ) ইওরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি আত্মরক্ষার্থে সামরিক প্রস্তুতির প্রতি সচেষ্ট হইয়াছিল।

৮.২. বিপর্যয়ের দিকে ইওরোপ
(Europe heading towards a Cataclysm)

বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইওরোপ ঃ বিগত কয়েক দশকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চরম পরিণতি হইল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধে (Franco-Prussian war) জার্মানীর জয়লাভ জার্মানীকে ইওরোপের অন্যতম রাষ্ট্রের মর্যাদা দান করে। ফ্রান্সের পরাজয় ও বিচ্ছিন্নতা, ইওরোপের ব্যাপারে ব্রিটেনের নির্লিপ্ততা প্রভৃতি কারণে জার্মানী ও উহার চ্যান্সেলার বিসমার্ক ইওরোপের ভাগ্য নিয়ন্তারূপে আবির্ভূত হন। ইওরোপে শক্তি-সাম্যের (Balance of Power) বিপর্যয় ঘটিলে জার্মানী ইওরোপের প্রাণ-কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের পর জার্মানী যুদ্ধবিগ্রহ নীতি ('Blood and Iron') বর্জন করিয়া আত্মরক্ষার নীতি গ্রহণ করে। বিসমার্ক এইরূপ আশঙ্কা করিতেছিলেন যে ফ্রান্স প্রতিশোধাত্মক মনোভাব লইয়া জার্মানীর সহিত পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে। সুতরাং বিসমার্ক জার্মানীর স্বার্থে ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ফ্রান্সের সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে ও ফ্রান্সকে ইওরোপে মিত্রচ্যুত রাখিতে যত্নবান হন। তাঁহার কূটনীতির চরম সাফল্য হইল ত্রি-শক্তি মৈত্রী (Triple Alliance)। এই ত্রি-শক্তি মৈত্রী জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইটালীর মধ্যে সম্পাদিত হয়।

ত্রি-শক্তি মৈত্রী

অপরদিকে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়া যুদ্ধ (১৮৭১) অবসানে শক্তিহীন ফ্রান্স ত্রি-শক্তি মৈত্রী স্থাপনে আতঙ্কিত হইয়া মিত্র অন্বেষণে যত্নবান হয় এবং শীঘ্রই সেই সুযোগও উপস্থিত হয়। নিকট-প্রাচ্য সমস্যার সমাধান কল্পে বার্লিন কংগ্রেসে রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে মনোমালিন্যের উদ্ভব হইয়াছিল। ফ্রান্স সেই সুযোগে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে সমর্থ হইল। এইভাবে ইওরোপে দ্বি-শক্তি চুক্তি (Dual Alliance) নামে অপর একটি রাষ্ট্রজোট গঠিত হইল। ইহার দ্বারা শুধু যে ফ্রান্সের

দ্বি-শক্তি মৈত্রী

রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতারই অবসান হইল এমন নহে, ইহা ত্রি-শক্তি মৈত্রীর সমতার স্বরূপ হইল। (বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই এই দ্বি-শক্তি চুক্তি ইংল্যাণ্ডের সহযোগিতায় রূপান্তরিত হইয়া ত্রি-শক্তি মৈত্রী বা ট্রিপল আঁতাতে (Triple Entente) পরিণত হয়।) এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী আত্মরক্ষামূলক মৈত্রীসংঘ গঠন করার উদ্দেশ্য ছিল ইওরোপের বলসাম্য বজায় রাখা। এইভাবে দুইটি পরস্পর-বিরোধী সামরিক শিবিরে বিভক্ত হইয়া ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও ঈর্ষার মনোভাব হইয়া কালযাপন করিতে লাগিল। প্রত্যেকেই ভাবী বিপর্যয়ের আশংকা করিয়া নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সামরিক প্রস্তুতি চালাইতে লাগিল। মোটের উপর ফ্রান্সের সেডানের গ্লানি মুছিয়া ফেলিবার অদম্য স্পৃহা, জার্মানীর বিশ্বের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা লাভের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, অস্ট্রিয়ার জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা লাভের প্রবল আগ্রহ এবং অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড ও ইটালীর সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ প্রভৃতি কারণে ইওরোপের রাজনীতিতে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল যাহা আন্তর্জাতিক যুদ্ধের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল।

জার্মানীর উচ্চাভিলাষ : যতদিন বিসমার্ক জার্মানীর চ্যান্সেলার-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ততদিন তিনি ইওরোপে শান্তি রাখিবার চেষ্টা করেন। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্যবন্ধন এবং ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সেডানের যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় হইলে বিসমার্ক মন্তব্য করিয়াছিলেন যে "জার্মানী পরিতৃপ্ত দেশ" (Germany a satiated country), সুতরাং সাম্রাজ্যবিস্তারে জার্মানীর আকাঙ্ক্ষা বলিয়া কিছুই নাই। অতঃপর জার্মানীর নিরাপত্তার বিধান করাই বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং বিশেষ করিয়া ফ্রান্সের প্রতিশোধাত্মক আক্রমণ হইতে জার্মানীকে রক্ষা করার জন্য তিনি বহু প্রতিরক্ষামূলক মৈত্রীজোটের সৃষ্টি করেন।

কিন্তু বিসমার্কের পতনের পর তাঁহার অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি বর্জন করা হয়। জার্মানীর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ঘোষণা করেন যে "জার্মানী পরিতৃপ্ত দেশ নহে"—অনন্ত বিস্তৃতির সম্ভাবনা জার্মানীর সম্মুখে রহিয়াছে। তাঁহার মতে কেবলমাত্র ইওরোপই নহে, জার্মানী সমগ্র বিশ্বের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে আগ্রহী এবং জার্মানীর সম্মতি-ব্যতিরেকে আন্তর্জাতিক কোন সমস্যার সমাধান করা চলিবে না। কাইজারের ভাষায় "We stand under the sign of world policy and world traffic",। সেই যুগে বিশ্বরাজনীতিতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে হইলে জার্মানীর পক্ষে ঔপনিবেশিক ও সামুদ্রিক সাম্রাজ্যের একান্ত প্রয়োজন ছিল। যদি ঔপনিবেশিক সামাজ্য বিস্তৃতির মাপকাঠিতে কোন দেশের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করিতে হয় তাহা হইলে সেইদিক দিয়া জার্মানী তাহার ইওরোপীয় প্রতিদ্বন্দিদের তুলনায় নেহাৎ একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া ইওরোপের বাহিরে বহু পূর্ব হইতেই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া

বিশ্ব রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠনে জার্মানীর আগ্রহ

তুলিয়াছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় সমগ্র বিশ্বই বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে বণ্টন হইয়া গিয়াছিল এবং অতি সামান্য অংশই জার্মানীর ভাগে পড়িয়াছিল। সুতরাং কাইজার দাবি করিলেন যে জার্মানীকে বিশ্ব-সাম্রাজ্য গঠনের অধিকার প্রদান করিয়া বিশ্বশক্তি হিসাবে তাহাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগঠনে নৌ-শক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া কাইজার এক বিরাট নৌ-শক্তি গঠনে যত্নবান হন।

সুতরাং দেখা যায় যে কাইজারের পররাষ্ট্রনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব-রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদিতার ও নৌ-শক্তি গঠন। অতঃপর ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে জার্মানী 'পরিতৃপ্ত দেশ নহে' এবং ভারসাম্য (balance of power) বজায় রাখাও জার্মানীর উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু জার্মানী সকল দিকেই উহার অগ্রগতির দ্বার রুদ্ধ দেখিতে পাইয়া বিশ্ব-শান্তি ভঙ্গ করিতে দ্বিধাবোধ করিল না। উহার বিশ্ব-সাম্রাজ্য গঠন করার উচ্চাকাঙ্ক্ষাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ।

জার্মানীকে এই যুদ্ধের জন্য সর্বতোভাবে দায়ী করা অনুচিত ঃ কারণে অকারণে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম জার্মানীর সামরিক শক্তির আস্ফালন করিয়া অন্যান্য রাষ্ট্রকে সন্ত্রস্ত রাখিতে চাহিয়াছিলেন। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে তাঁহার তরবারি আস্ফালন এবং বিবিধ কার্যকলাপ ইওরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রকেই জার্মানী সম্পর্কে সন্দিহান করিয়া তুলিয়াছিল। তথাপি জার্মান সম্রাট কিংবা জার্মান রাষ্ট্রই যে এই যুদ্ধের জন্য সর্বতোভাবে দায়ী একথাও বলা সংগত নহে। এই যুদ্ধের পশ্চাতে জার্মানী ছাড়া আরও বহু রাষ্ট্রের স্বার্থের সংঘাত চলিতেছিল। কাইজারের সিংহাসনলাভের পূর্ব হইতেই ইওরোপ দুইটি সামরিক শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে ত্রি-শক্তি রাষ্ট্রজোট (জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইটালী) ও অপরদিকে দ্বি-শক্তি রাষ্ট্রজোট (রাশিয়া ও ফ্রান্স) এবং পরে ট্রিপল আঁতাত (ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া)। দ্বি-শক্তি মৈত্রী ও ট্রিপল আঁতাত বা ত্রি-শক্তি মৈত্রী জার্মানীর পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিতেছিল। আলসাস্-লোরেনের অধিকার লইয়া ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে মনোমালিন্য এবং ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর মধ্যে নৌ-বহরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হেতু যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার জন্য জার্মানীকেই এককভাবে দায়ী করা চলে না।

জার্মান সমালোচকগণ জার্মানী বা ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্সকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী না করিয়া সমস্ত দায়িত্ব অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়ার স্কন্ধে চাপাইয়াছেন। জার্মানীর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠনের আকাঙ্ক্ষা যুদ্ধের কারণ নহে। উপরন্তু এই ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের সমর্থন ছিল। ইংল্যাণ্ড যখন মিশরের ব্যাপারে বিব্রত, সেই সময় বিসমার্ক জার্মানীর জন্য আফ্রিকার কতক অঞ্চল দাবি করিলে ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন এই দাবি সমর্থন করিয়াছিলেন। ("If Germany is to become a colonising power, all I can say God speed her. She

জার্মানীর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠনে ইংল্যাণ্ডের সমর্থন

becomes our ally and partner in the execution of the great purposes of Providence for the advantage of mankind."—Gladstone)। ইহা সত্য যে জার্মানী নৌ-শক্তি বৃদ্ধি করিতে যত্নবান হইলে ইংল্যাণ্ডের সামুদ্রিক সাম্রাজ্য বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দিয়াছিল। তথাপি জার্মানীর উপনিবেশ বিস্তারের ব্যাপারে ইংল্যাণ্ড বাধা প্রদান করে নাই।

কয়েকটি কারণে জার্মানী যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। প্রথমতঃ, অস্ট্রিয়ার স্বার্থপরতা, দ্বিতীয়তঃ, জার্মান যুদ্ধ-নায়কগণ বিশেষ করিয়া নবাধক্ষ্য তিরপিট্জ এবং পররাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হলষ্টিনের কুপরামর্শ এবং তৃতীয়তঃ, সার্বিয়ার পক্ষাবলম্বন করিয়া রাশিয়া, অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শত্রুতা করিলে বাধ্য হইয়া ত্রি-শক্তি মৈত্রীর শর্তানুসারে জার্মানীকে অস্ট্রিয়ার পক্ষাবলম্বন করিতে হয়। অবশ্য সার্বিয়ার উপর চরম পত্রের ব্যাপারে জার্মানী অস্ট্রিয়াকে বিরত করিয়া যুদ্ধ বন্ধ করিতে পারিত কিন্তু জার্মানী তাহা করে নাই। সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে অযথা উত্তেজিত করিয়া জার্মানী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত করিয়াছিল।

জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ

ইংল্যান্ডের পরিস্থিতি—বিচ্ছিন্নতার অবসান ঃ নেপোলিয়নীয় যুদ্ধ অবসানের পর হইতে ইওরোপের আন্তর্জাতিক সকল ব্যাপার হইতে ইংল্যাণ্ড নিজেকে মুক্ত রাখিয়া আসিতেছিল। একমাত্র নিকট-প্রাচ্যে রাশিয়াকে প্রতিরোধ করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার্থেই ব্রিটেন ১৮৫৪-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অন্যথায় ইংল্যাণ্ডের নীতি ছিল ইওরোপের আন্তর্জাতিক জটিলতা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখা যাহাকে "Splendid Islation" বলা হইয়া থাকে।

কিন্তু আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইলে ইংল্যাণ্ড 'বিচ্ছিন্নতার নীতি' পরিহার করিতে বাধ্য হয়। মধ্য-এশিয়ায় রাশিয়ার অগ্রগতির ফলে ব্রিটেনের পূর্বাঞ্চলিক সাম্রাজ্য বিপন্ন হইলে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ প্রায় অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবিস্তার লইয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যেও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্ভব হইয়াছিল এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যাসোদা ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধের উপক্রম হইয়াছিল। ইংল্যাণ্ডের প্রতি ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিরোধিতাহেতু ইংল্যাণ্ড জার্মানী ও উহার মিত্রবর্গ অস্ট্রিয়া ও ইটালীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। জার্মানীর সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য ইংল্যাণ্ড ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর নিকট এক সন্ধির প্রস্তাব করে। কিন্তু জার্মানী এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলেও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রশ্ন লইয়া কোনদিন জার্মানী ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ঘটে নাই। বরঞ্চ ইংল্যাণ্ড এই ব্যাপারে জার্মানীকেই সমর্থন করিয়া যায়।

কিন্তু জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম জার্মানীর নৌ-শক্তি বৃদ্ধি করিয়া বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে জার্মানীর প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যত হইলে ইংল্যান্ড আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিল না। উপরন্তু জার্মানী

ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী (১৯০৪)

কর্তৃক বাগদাদ রেলওয়ের সম্প্রসারণ ও পারস্য-উপসাগরে জার্মানীর নৌ-ঘাঁটি স্থাপনের প্রচেষ্টা ইংল্যান্ডকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ল্যান্সডাউন স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "জার্মানীর এই প্রচেষ্টায় গ্রেটব্রিটেন সকল শক্তি দিয়া বাধা প্রদান করিবে।" ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ড ফ্রান্সের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইল। ইহা Anglo French Convention নামে পরিচিত। ইহার দ্বারা নিউফাউন্ডল্যান্ড, শ্যাম, মাদাগাস্কার, পশ্চিম-আফ্রিকা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে এযাবৎ যে সকল বিবাদের কারণ ছিল সেগুলির মীমাংসা হইয়া যায়। ফ্রান্স মিশরে ব্রিটেনের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইল এবং ইহার বিনিময়ে ইংল্যান্ড মরক্কোয় ফ্রান্সের বিশেষ স্বার্থ স্বীকার করিয়া লইল। যদিও এই চুক্তির কোনও সামরিক গুরুত্ব ছিল না, তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে ইংল্যান্ড জার্মানীর নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়। অতঃপর ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ড রাশিয়ার সহিতও অনুরূপ এক সন্ধি সম্পন্ন করিয়া পারস্য, আফগানিস্থান ও তিব্বত সংক্রান্ত সকল বিবাদের নিষ্পত্তি করিল। লর্ড অক্সফোর্ড

ইঙ্গ-রুশ মৈত্রী (১৯০৭)

এই সন্ধি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে "ইহার দ্বারা রাশিয়া কর্তৃক ভারত সাম্রাজ্য বিপন্ন হইবার আশঙ্কা চিরতরে অপসারিত হইল।" এইভাবে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে ত্রি-শক্তি আঁতাত বা ত্রি-শক্তি মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হইল। এই চুক্তিপত্রে ইংল্যান্ড কর্তৃক ফ্রান্স

ত্রি-শক্তি আঁতাত

অথবা রাশিয়াকে সামরিক সাহায্য প্রদানের কোন শর্ত ছিল না, ত্রি-শক্তির মধ্যে সংহতি রক্ষা করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পারস্পরিক সহযোগিতা দ্বারা জার্মানীর ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে নিজেদের স্বার্থ রক্ষাকল্পেই এই আঁতাত সম্পাদিত হইয়াছিল। ত্রি-শক্তি আঁতাতের গুরুত্ব হইল এই যে ইংল্যান্ড ও রাশিয়া জার্মানীর নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায় এবং উভয় রাষ্ট্রই জার্মানী সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠে। জার্মানী উহার চতুর্দিকে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবার আশংকায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। ত্রি-শক্তি আঁতাতের বিপক্ষে একমাত্র লর্ড রোসবেরী (Rosebery) এই মন্তব্য করিয়াছিলেন, "My mournful and supreme conviction is that this agreement is much likely to lead to complication than to peace."

জার্মানীর নৌ-শক্তি বৃদ্ধি ও বাগদাদ রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি ব্যাপারে জার্মানীর সহিত ইংল্যান্ডের স্বার্থসংঘাতের যথেষ্ট কারণ

ইংল্যান্ডের দায়িত্বের আলোচনা

থাকা সত্ত্বেও ইংল্যান্ড ইওরোপের শান্তিরক্ষার জন্য কোনও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। (১) ফ্রান্স ও রাশিয়ার পীড়াপীড়ি সত্ত্বে ইংল্যান্ড

'জার্মানীর বিরুদ্ধে উহাদিগকে অস্ত্র সাহায্যদান করিতে বা উহাদের সহিত সামরিক-সংঘ প্রতিষ্ঠা করিতে স্বীকৃত হয় নাই। কারণ লর্ড-গ্রে-র মতে এইরূপ নীতি ইংল্যাণ্ডের শান্তি প্রচেষ্টা ব্যাহত করার এবং "জার্মানীকে যুদ্ধে আহ্বান করার সামিল হইত"। (২) ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড জার্মানীর সহিত মিত্রতা স্থাপনের প্রচেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু নৌ-শক্তি বৃদ্ধির প্রশ্ন লইয়া ইংল্যাণ্ডের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অপরদিকে সম্ভাব্য ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তারের ব্যাপারে জার্মানী ইংল্যাণ্ডের নিরপেক্ষতা দাবী করিলে ইংল্যাণ্ড তাহাতে ন্যায়সঙ্গতভাবেই আপত্তি জানাইয়াছিল। লর্ড-গ্রে স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন "It would be a disgrace for us to make this bargain with Germany at the expense of France, a disgrace from which the good name of this country would never recover." ইহা অনস্বীকার্য যে জার্মানীর প্রস্তাবে সম্মত হইলে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে তাহা বিশ্বাসঘাতকতারই সামিল হইত। কারণ ইতিপূর্বেই ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের সহিত মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। (৩) সেরাজিভোর হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ্য করিয়া অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে যে তিক্ততা ও নিকট-প্রাচ্যে যে জটিলতার উদ্ভব হইয়াছিল সেই সময়ও জার্মানী, ইটালী ও ফ্রান্সের মধ্যে এক আপোষ-মীমাংসা করার চেষ্টা ইংল্যাণ্ড করিয়াছিল। কিন্তু অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর অনমনীয় মনোভাবের জন্য ইংল্যাণ্ডের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। জার্মানীর সহিত শান্তি স্থাপনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় অগত্যা ইংল্যাণ্ড যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং তাহাও জার্মানী কর্তৃক বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ হইবার পর।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের যোগদান করার দুইটি কারণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বেলজিয়ামকে রক্ষা করার জন্য যে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ছিল তাহা প্রতিপালন করা এবং দ্বিতীয়তঃ, দুর্বল রাষ্ট্রকে শক্তিশালী জার্মানীর নিগ্রহ হইতে রক্ষা করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপন স্বার্থ রক্ষার্থেই ইংল্যাণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। বিশাল সাম্রাজ্য ও পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যকে জার্মানীর লোলুপ হস্তক্ষেপ হইতে রক্ষা করার জন্যই ইংল্যাণ্ড যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। জার্মানীর ক্রমবর্ধমান নৌ-শক্তি এবং বুয়োর যুদ্ধই (Boer war) ইংল্যাণ্ডের জার্মান-বিরোধী মনোভাবের প্রকৃত কারণ ছিল।

বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের কারণ

জার্মানীর আশংকা: ত্রি-শক্তি আঁতাত জার্মানীর আশংকার কারণ হইয়া উঠিল। জার্মানী ইহাকে উহার সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থ করার বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার গভীর চক্রান্ত বলিয়া মনে করিল। উপরন্তু, জার্মানী ইহাও আকাঙ্ক্ষা করিল যে ইংল্যাণ্ড আলসাস্-লোরনে ও বল্কানে যথাক্রমে ফ্রান্স ও রাশিয়ার নীতি সমর্থন করিবে। এই কারণে জার্মানী অভিযোগ করিল যে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাহায্যে জার্মানীর বিরুদ্ধে এক আক্রমণাত্মক বেষ্টনীর রচনা

করিয়াছে। জাপানকেও ত্রি-শক্তি আঁতাতের আওতায় আনা হইল, কারণ-ইতিপূর্বেই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও জাপানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। জার্মানীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক বেষ্টনী রচনার জন্য জার্মানী ইংল্যাণ্ডকে সর্বোতভাবে দায়ী করিল। সুতরাং এই অবস্থায় যুদ্ধ ভিন্ন জার্মানীর নিকট অন্য কোন পথ উন্মুক্ত রহিল না।

আন্তর্জাতিক সংকট (১৯০৫-১৪) (International crisis): জার্মানী ত্রি-শক্তি আঁতাতকে উহার সাম্রাজ্যবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার পথে প্রবল অন্তরায় বলিয়া মনে করিল। এই আঁতাতের দ্বারা জার্মানী উহার আন্তর্জাতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বিপন্ন হইবার আশংকা করিল। সুতরাং ১৯০৭ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানী বল্কান অঞ্চলে উহার নির্ভরশীল মিত্র অস্ট্রিয়াকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে এবং তুরস্ককে নিজের দলে টানিতে যত্নবান হইল। ইহা ভিন্ন বিশ্বরাজনীতিতে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গের সম-মর্যাদার ভিত্তিতে অংশ গ্রহণ করার দাবি করিল। জার্মানীর এই নূতন নীতির ফলে ত্রি-শক্তি আঁতাত ও ত্রি-শক্তি মৈত্রীর অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংকটের সৃষ্টি করিল। এই সংকটের কেন্দ্রগুলি হইল মরক্কো (Morcco) ও বল্কান। মরক্কোর ব্যাপারে জড়িত ছিল ফ্রান্স এবং বল্কানের ব্যাপারে জড়িত ছিল অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া। এই সংকটগুলির মূলে ছিল জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা।

জার্মানীর নূতন নীতি

(১) **মরক্কো সংকট**: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে প্রথম আন্তর্জাতিক সংকটের উদ্ভব হয় স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র মরক্কোকে কেন্দ্র করিয়া। এই সংকটের মূল কারণ ছিল ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত ইঙ্গ-ফরাসী আঁতাত (Anglo-French Entente)। এই চুক্তি দ্বারা ব্রিটেন উত্তর উপকূল অঞ্চলে স্পেনের দাবি স্বীকার করার সাপেক্ষে মরক্কোয় ফ্রান্সের স্বাধীন কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। এই চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স মরক্কোয় অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী হয়। মরক্কোর ব্যাপারে জার্মানীকে উপেক্ষা করায় জার্মানী যারপর নাই অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন মরক্কোয় ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানীর স্বার্থ বিপন্ন করার আশংকা দেখা দেয়। সুতরাং জার্মানী মরক্কোয় ফ্রান্সের বিশেষ অধিকারের প্রতিবাদ করিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান সম্রাট (কাইজার) মরক্কোর প্রধান নগরী তাঞ্জিয়ারে আগমন করেন। তিনি নিজেকে মরক্কোর মুসলমানদের রক্ষক বলিয়া ঘোষণা করেন এবং মরোক্কোর রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। জার্মান সম্রাট মরক্কোর সংকটের সমাধানের জন্য বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের সম্মেলন আহ্বানের দাবি করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আলজেসিরাস-এ একটি আন্তর্জাতিক বৈঠক আহূত হয়। জার্মানীর কূটনৈতিক সাফল্য ঘটিল বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন পক্ষেরই বিশেষ কোন সুবিধা হইল না। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে স্থির হইল যে মরক্কোর রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা অক্ষুন্ন রাখা

আলজেসিরাস ও বৈঠক

হইবে এবং তথায় সকল রাষ্ট্রের সমান বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা থাকিবে। আলজেসিরাস বৈঠকের গুরুত্ব হইল এই যে মরক্কোয় ফ্রান্সের বিশেষ স্বার্থ ও আধিপত্য স্বীকৃত হয়; ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রতা আরও জোরদার হয় এবং ইটালী কর্তৃক ফ্রান্স সমর্থিত হওয়ায় জার্মানী কিছুটা প্রতিঘাত হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ইহার শর্তানুসারে ফ্রান্স সমতার ভিত্তিতে মরক্কোয় জার্মানীর অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা স্বীকার করিয়া লয় এবং পক্ষান্তরে জার্মানী তথায় ফ্রান্সের বিশেষ রাজনৈতিক স্বার্থ স্বীকার করিয়া লয়।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও ফ্রান্স ও জার্মানীর পারস্পরিক সম্পর্কের কোন উন্নতি হইল না। ক্রমেই মরক্কোর উপর ফ্রান্সের কর্তৃত্ব জার্মানীর নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মরক্কোর রাজধানী ফেজ (fez)-এ এক বর্বর উপজাতি বিদ্রোহী হইলে ফ্রান্স তাহা দমন করিতে অগ্রসর হইলে জার্মানী নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিল না।

আগাদির ঘটনা

জার্মানী নিজ-স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত আগাদি বন্দরে 'প্যান্থার' (Panther)-নামে এক যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করিলে পুনরায় মরক্কো সংকটের উদ্ভব হয়। ফ্রান্স ও জার্মানীর যুদ্ধ-প্রস্তুতিতে ইংল্যান্ড অস্বস্তি বোধ করিল। ফ্রান্সের সমর্থনে ইংল্যান্ডও আগাদির বন্দরে একটি যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করিল। এই অবস্থায় জার্মানী মরক্কোর উপর ফ্রান্সের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইল এবং ফ্রান্স তথায় সকল রাষ্ট্রের উন্মুক্ত-দ্বার নীতি (Open door policy) স্বীকার করিয়া ফরাসী কঙ্গোরাজ্যের কিছু অংশ জার্মানীকে সমর্পন করিল।

আগাদির ঘটনার ফলে ত্রি-শক্তি আঁতাত (Triple Entente) আরও জোরদার হইল এবং ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্ক আরও সংহত হইল। ফ্রান্সের জার্মান-বিরোধী মনোভাব আরও তীব্র হইল। অপর দিকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার কারণে জার্মানী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল। প্রকৃতপক্ষে আগাদির ঘটনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ইঙ্গিত জানায়।

আগাদির ঘটনার গুরুত্ব

বল্কান সংকট ঃ মরক্কোর প্রশ্ন লইয়া একদিকে যেমন ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে সংকটের উদ্ভব হইয়াছিল, তেমনি বল্কান অঞ্চলে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত এক গভীর জটিলতার সৃষ্টি করে। মরক্কোর সংকট কোন ক্রমে নিরসন করা হইয়াছিল। কিন্তু বল্কান তথা নিকট-প্রাচ্য সমস্যার পুনরভ্যুদয় বহু জটিলতার সৃষ্টি করে যাহার সমাধান একরূপ অসম্ভব হইয়া দেখা দেয়। যাহা শেষ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য করিয়া তোলে।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বল্কানে তরুণ-তুর্কী আন্দোলনের সুযোগে অস্ট্রিয়া সার্ব-অধ্যুষিত অঞ্চল বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া লয়। অস্ট্রিয়ার এই কার্যকলাপ ছিল বার্লিন-সন্ধি বিরোধী। কারণ বার্লিন-সন্ধি অনুসারে অস্ট্রিয়াকে বোসনিয়া ও হারজেগোভিনায় শুধু প্রশাসনিক অধিকার দেওয়া হইয়াছিল,

প্রথম সংকট

সংযুক্তিকরণের অধিকার দেওয়া হয় নাই। অস্ট্রিয়া জার্মানীর সমর্থনের উপর নির্ভর করিয়াই এই সংযুক্তিকরণ করিয়াছিল। সার্বিয়ার জনগণ এই সংযুক্তিকরণের প্রবল প্রতিবাদ করে এবং ব্রিটেন ও রাশিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ঘোষণা করে। ফলে সংকট ঘনীভূত হইয়া উঠে। জার্মানী অস্ট্রিয়াকে সামরিক সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের পর রাশিয়ার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। সুতরাং অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সেই সময় অস্ত্রধারণ করা রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অস্ট্রিয়ার ন্যায় এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র সার্বিয়া রাষ্ট্রের পক্ষেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর কূটনৈতিক সাফল্য লাভ হইল বটে কিন্তু সার্বিয়া ও রাশিয়া অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া কালযাপন করিতে লাগিল।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের সংকট সাময়িকভাবে ধামাচাপা পড়িল বটে কিন্তু সার্বিয়া ইওরোপের ঝটিকাকেন্দ্রে পরিণত হইল। অনতিকাল মধ্যে সর্ব-শ্লাভ আন্দোলনের (Pan-Slavic movement) সূত্রপাত হইল যাহা অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর পক্ষে অস্বস্তিকর হইয়া উঠিল। এক বিশাল শ্লাভ-জনগোষ্ঠী অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বভাবতই শ্লাভ আন্দোলন অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া দেখা দিল। সুতরাং অস্ট্রিয়া সকল শক্তি দিয়া এই আন্দোলন দমনে প্রয়াসী হইল, সার্বিয়ার ভিতর দিয়া প্রসারিত বার্লিন-বাগদাদ রেলপথের নিরাপত্তার জন্য জার্মানীও সার্বিয়াকে দমন করার পক্ষপাতী ছিল। এককথায় সার্বিয়াকে দমন করার জন্য অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর যৌথ প্রয়াস শুরু হইল।

দ্বিতীয় সংকট

অস্ট্রিয়ার সার্বিয়া-বিরোধী মনোভাব হইতে দ্বিতীয় বল্কান সংকটের উদ্ভব হয়। ১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত বল্কান যুদ্ধে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিল। যুদ্ধের হুমকি দিয়া অস্ট্রিয়া আদ্রিয়াটিক-উপকূলের কয়েকটি নগর ছাড়িয়া দিতে সার্বিয়াকে বাধ্য করিল। জার্মানী অস্ট্রিয়াকে সমর্থন করিল। ব্রিটেন ও রাশিয়া অস্ট্রিয়ার কার্যকলাপ তীব্রভাষায় নিন্দা করিল এবং সার্বিয়ার দাবির সমর্থনে রাশিয়া সামরিক প্রস্তুতিও শুরু করিল। অপরদিকে অস্ট্রিয়াও যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করিল। কিন্তু জার্মানীর চাপে অস্ট্রিয়া যুদ্ধ করা হইতে বিরত হইল।

বল্কান অঞ্চলে যখন বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল, সেই সময় অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্কডিউক ফার্ডিনান্ড জনৈক সার্ব-আততায়ী কর্তৃক সেরাজিভো নগরে নিহত হইলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হইল।

৮.৩. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ (Causes of the First world war): ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কয়েক দশক ধরিয়া ইওরোপের বিভিন্ন ঘটনার চরম পরিণতি হইল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মূলে ছিল একাধিক কারণ।

(১) উগ্র-জাতীয়তাবাদ: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ হইল ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত উগ্র-জাতীয়তাবাদ। ইটালী ও জার্মানীতে জাতীয়তাবাদের সাফল্যের

ফলে তথায় জাতীয়তাবাদ রাজনীতিতে এক অভূতপূর্ব শক্তির সঞ্চার করে। উগ্র-জাতীয়তাবাদ সর্বত্র প্রতিটি জাতির জাতীয় গৌরবের প্রতীক হইয়া দাঁড়ায় এবং প্রতিটি জাতি অপর জাতির তুলনায় অধিক সম্মান ও গৌরব দাবি করিতে থাকে। এই কারণেই এক সময় ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত চিন্তাশীল লর্ড এ্যাকটন (Lord Acton) জাতীয়তাবাদকে একটি অবাস্তব ও অপরাধমূলক আদর্শ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। উগ্র-জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়াই জার্মানী ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে তীব্র নৌ ও সামরিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। উগ্র-জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়াই এশিয়া, আফ্রিকা ও বল্কান অঞ্চলে ইওরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে রাজ্যলাভের জন্য তীব্র সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। আলসাস্-লোরেন নামে প্রদেশ দুইটি হস্তচ্যুত হওয়ায় ফরাসীদের জাতীয় সম্মান ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল যাহা ফরাসীরা ভুলিতে পারে নাই এবং এই কারণে উহারা জার্মানদের প্রবল শত্রুতে পরিণত হয়। অস্ট্রিয়ার নিকট হইতে ট্রিয়েস্ট ও ট্রেণ্টিনো অঞ্চলের ইটালীয় ভাষাভাষী জনগণকে ইটালীর সহিত সংযুক্ত করার ব্যাপারে ইটালীর জনগণ আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। বল্কান অঞ্চলের অধিবাসীদের অতৃপ্ত জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ইওরোপে এক বিরাট বিস্ফোরকের সৃষ্টি করিয়াছিল যাহা শেষ পর্যন্ত সমগ্র ইওরোপকে জ্বালাইয়া দেয়। প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইওরোপের যাবতীয় রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মূলে ছিল জাতীয়তাবাদের বাড়াবাড়ি যাহা শেষ পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি লাভ করে।

(২) **পরস্পর-বিরোধী শক্তিজোট:** দ্বিতীয় কারণ হইল ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের উগ্র-সমরবাদ ও পরস্পর-বিরোধী সামরিক জোট। ইহার মূলে ছিল বিসমার্কের ফ্রান্স-বিরোধী মনোভাব। বিসমার্ক উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি ফ্রান্স কখনও বিস্মৃত হইতে পারে না এবং এই কারণে ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে জার্মানীর নিরাপত্তার জন্য বিসমার্ক সামরিক শক্তিজোটের সূত্রপাত করেন। ইহার বিরুদ্ধে ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতি-সামরিক শক্তিজোট (counter military alliances) গড়িয়া উঠে। ফলে সমগ্র ইওরোপ দুইটি পরস্পর-বিরোধী সামরিক শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়ে। যথা জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইটালীর মধ্যে ত্রি-শক্তি-মৈত্রী (Triple Alliance) এবং ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে ত্রি-শক্তি আঁতাত (Triple Entente)। এই সকল শক্তিজোটের শর্তগুলি ছিল গোপন। শান্তিরক্ষার পরিবর্তে এই শক্তিজোটগুলি অবিশ্বাস ও ভীতির সঞ্চার করে এবং প্রতিটি রাষ্ট্র এক ভয়াবহ যুদ্ধের আশঙ্কায় কালযাপন করিতে থাকে। ১৯০৬ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংকটের সময় এই দুই শক্তিজোট পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই উভয় গোষ্ঠীর কূটনৈতিক প্রতিঘাত ঘটে ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। মরক্কোর ব্যাপারে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নিকট জার্মানী অপদস্থ হয় এবং জার্মানী ও উহার মিত্রবর্গ যথা অস্ট্রিয়া ও ইটালী

তাহা বিস্মৃত হয় নাই। কিন্তু ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বল্কান সংকটে অস্ট্রো-জার্মান গোষ্ঠী জয়লাভ করে এবং রাশিয়া অপদস্থ হয়। এই ঘাত-প্রতিঘাত বৃহত্তর যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

(৩) **সামরিক প্রতিযোগিতা :** বিশ্বযুদ্ধের তৃতীয় অন্যতম কারণ হইল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সামরিক প্রতিযোগিতা। ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী স্বার্থসংঘাত তীব্র আকার ধারণ করিলে সকলেই সমরসজ্জায় সজ্জিত হইতে থাকে। ফলে যুদ্ধের ভীতি অধিকতর সঞ্চারিত হয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াইল ৮,৭০,০০০। ইহার প্রত্যুত্তরে ফ্রান্স বাধ্যতামূলক সামরিক চাকুরীর মেয়াদ তিন বৎসর করিল। রাশিয়াও সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করিল। ব্রিটেন উহার নৌ-বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিল। এই সামরিক প্রতিযোগিতা ও ইঙ্গ-জার্মান নৌ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিল।

(৪) **অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অপর কারণ হইল ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতা। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বিশ্ব-ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল শিল্পগত এবং বাণিজ্যগত সংগ্রাম ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠনের প্রয়াস। সমকালীন আন্তর্জাতিক সংকটের মূলে ছিল এই সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতা। শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় জার্মানী ক্রমেই অগ্রসর হইতে থাকিলে ব্রিটেনের স্বার্থ বিপন্ন হইয়া উঠে। অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ব্রিটেন ও জার্মানীর মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত করে। ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যেও এই প্রতিযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে যাহার ফলে উহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি ঘটে।

যুদ্ধের প্রত্যক্ষকারণ : ২৮শে জুন অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্কডিউক ফার্ডিনাণ্ড বোসনিয়ার রাজধানী সেরাজিভো নগরে প্রকাশ্য দিবালোকে জনৈক সার্ব-আঁততায়ীর হস্তে নিহত হন। ফার্ডিনাণ্ড ছিলেন অস্ট্রিয়ার সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইতিপূর্বেই অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার পারস্পরিক শত্রুতা চরম আকার ধারণ করিয়াছিল। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে ইওরোপে এক ব্যাপক দাবাগ্নির সৃষ্টি হইল এবং ক্রমে তাহা সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইল।

সেরাজিভোর হত্যাকাণ্ড

আঁততায়ী ও তাহার সহকর্মীগণ অস্ট্রিয়ার প্রজা হইলেও জাতিতে উহারা ছিল শ্লাভ। এই অজুহাতে অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে হত্যাপরাধে দায়ী সাব্যস্ত করিয়া সার্বিয়া সরকারের নিকট কতকগুলি শর্ত পূরণের দাবি জানাইয়া এক চরমপত্র প্রেরণ করিল। এই চরমপত্রে দাবি করা হইল যে (ক) সার্বিয়া সরকার সকল প্রকার অস্ট্রিয়া-বিরোধী প্রচারকার্য বন্ধ করিবে,

সার্বিয়াকে দায়ী করা হইল

(খ) সকল প্রকার অস্ট্রিয়া-বিরোধী সংবাদপত্র, সোসাইটি বা সংঘ দমন করিবে, (গ) দুইজন অস্ট্রিয়ার রাজকর্মচারীকে সার্বিয়া রাজ্যে হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য সকল সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে এবং (ঘ) অস্ট্রিয়া-বিরোধী প্রচারকার্যে লিপ্ত সকল সার্বিয়ার কর্মচারী ও স্কুলশিক্ষকগণকে পদচ্যুত করিতে হইবে। এই চরমপত্রের উত্তর প্রদানের জন্য সার্বিয়াকে মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দেওয়া হইল।

অস্ট্রিয়ার চরমপত্র (২৩শে জুলাই, ১৯১৪)

সার্বিয়া চরমপত্রে উল্লিখিত প্রায় সকল শর্তই মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইল কিন্তু বাকি কয়েকটি শর্ত পূরণ করিলে উহার (সার্বিয়ার) সার্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ হইবে এই কারণে সার্বিয়া অস্ট্রিয়ার নিকট একটি আন্তর্জাতিক বৈঠকে এই পরিস্থিতির আলোচনার ইচ্ছা জানাইল। অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল।

সার্বিয়ার প্রস্তাবে অস্ট্রিয়ার অস্বীকৃতি

সার্বিয়ার প্রতি অস্ট্রিয়ার আক্রমণাত্মক মনোভাবে উদ্বিগ্ন হইয়া রাশিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিল না। শ্লাভজাতির রক্ষক হিসাবে ও বল্কান অঞ্চলে নিজস্বার্থ জড়িত থাকায় রাশিয়া কোনমতেই এই ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকিতে পারিল না। রাশিয়া ঘোষণা করিল যে বল্কান-সমস্যা একমাত্র অস্ট্রিয়ারই অভ্যন্তরীণ সমস্যা নহে, ইহা সমগ্র ইওরোপের সমস্যা। সুতরাং রাশিয়া ইহার আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাব করিল। অপরদিকে জার্মানীর সমর্থন লাভ করিয়া (ত্রি-শক্তি মৈত্রীর শর্তানুসারে) অস্ট্রিয়া এই ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ মানিয়া লইতে অসম্মত হইল। ইহা স্মরণযোগ্য যে, জার্মানী অস্ট্রিয়াকে সমর্থন করিয়া এবং ইওরোপে একটি গোলযোগ বাধাইয়া বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের সুযোগ খুঁজিতে ছিল।

রাশিয়া ও জার্মানীর মনোভাব

২৮শে জুলাই (১৯১৪ খ্রীঃ) অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী সার্বিয়া অভিমুখে অগ্রসর হইলে রাশিয়াও সৈন্য সমাবেশ করিতে ত্রুটি করিল না। এমতাবস্থায় ইংল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র-সচিব স্যার এডওয়ার্ড গ্রে ফ্রান্স, জার্মানী ও ইটালীকে এক আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাব জানাইলেন। কিন্তু অস্ট্রিয়া ও জার্মানী ইহাতে অসম্মত হইল; কারণ তাহাদের মতে সেরাজিভোর হত্যাকাণ্ড 'একমাত্র অস্ট্রিয়ারই ঘরোয়া ব্যাপার'।

অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সৈন্য চলাচল: ইংল্যাণ্ড কর্তৃক মীমাংসার প্রস্তাব: অস্ট্রিয়া ও জার্মানী কর্তৃক তাহা অগ্রাহ্য

যুদ্ধ ভিন্ন এই জটিল পরিস্থিতির মীমাংসার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়ার সৈন্য সমাবেশ দেখিয়া ত্রি-শক্তি জোটের (Triple Alliance) শর্তানুযায়ী জার্মানী অস্ট্রিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়া রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। অপরদিকে রুশ-ফরাসী মৈত্রীবন্ধনের শর্তানুসারে ফ্রান্সও রাশিয়ার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইল। জার্মানী ফ্রান্স আক্রমণার্থে বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া

জার্মানী কর্তৃক রাশিয়া ও ফ্রান্স আক্রমণ

সৈন্যচালনার দাবি জানাইলে বেলজিয়াম সরকার তাহা অগ্রাহ্য করিল। কিন্তু বেলজিয়ামের আপত্তিতে কর্ণপাত না করিয়া জার্মানী বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া সৈন্যবাহিনী ফ্রান্স অভিমুখে পাঠাইতে লাগিল।

জার্মানী কর্তৃক বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ

৩১শে জুলাই স্যার এডওয়ার্ড গ্রে ফ্রান্স ও জার্মানীকে বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা রক্ষার ব্যাপারে মতামত জিজ্ঞাসা করিলে ফ্রান্স তাহা রক্ষা করিতে সম্মত হইল কিন্তু জার্মানী তাহা অগ্রাহ্য করিল। জার্মানী বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলে লর্ড গ্রে পুনরায় জার্মানীর নিকট এক চরমপত্র (Ultimatum) প্রেরণ করিয়া জার্মানীকে বিরত হইবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু জার্মানী ইহাতে কর্ণপাত না করায় অবশেষে ইংল্যান্ড ৪ঠা আগস্ট (১৯১৪ খ্রীঃ) জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই প্রসঙ্গে জার্মান চ্যান্সেলারের নিম্নলিখিত ঘোষণা উল্লেখযোগ্য "We are fighting for the fruit of our peaceful labour, for the inheritance bequeathed to us by a great past and for our future...The great hour of trial for our nation has now struck. Our army is in the field, our fleet is ready for action and behind them, the entire German nation."

ইংল্যান্ড কর্তৃক যুদ্ধে যোগদান

৮.৪. **প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ১৯১৪ঃ** পূর্ব হইতে প্রস্তুত না থাকায় ইংল্যান্ড ও মিত্রপক্ষ জার্মানীর অগ্রগতির পথ সাফল্যের সহিত প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। জার্মানবাহিনী বেলজিয়ামের প্রতিরোধ ভঙ্গ করিয়া ফ্রান্স অভিমুখে অগ্রসর হইল এবং সম্মিলিত ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া প্যারিসের প্রায় ৩০ মাইলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। মিত্রপক্ষের প্রধান জেনারেল ফচ্‌-এর (Foch) পরিচালনাধীনে মিত্রপক্ষী বাহিনী মার্ন নদীর দক্ষিণে জার্মানীর অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিল। জার্মানীর ফ্রান্স অধিকার করার কল্পনা ব্যর্থ হইল এবং ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী শক্তি সঞ্চয় করার উপযোগী সময় লাভ করিল।

মার্ন-এর যুদ্ধ ও জার্মানী কর্তৃক ফ্রান্স অধিকারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ

ইতিমধ্যে জার্মানবাহিনী বেলজিয়ামের অধিকাংশ অংশ দখল করিয়া ডানকার্ক ও ক্যালে বন্দরে উপনীত হওয়ার উদ্যম করিলে ইপ্রেস (Ypres)-এর ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর সহিত এক প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইল এবং জার্মানীবাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইল। অতঃপর পশ্চিম সীমান্তে জার্মানীর অবস্থা অচল হইয়া রহিল।

ইপ্রেস (Ypres)-এর প্রথম যুদ্ধ

পূর্ব-সীমান্তিক যুদ্ধ (১৯১৫)ঃ এই সীমান্তে রুশবাহিনী পূর্ব-প্রাশিয়ায় প্রবেশ করার চেষ্টা করিলে জার্মানীর নিকট পরাজিত হইল। ট্যানেনবার্গের যুদ্ধে রুশবাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হইয়া জার্মানী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। এইভাবে পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে জার্মানীর সাফল্যলাভ ঘটিল।

ইতিমধ্যে রাশিয়ার নিকট অস্ট্রিয়া পরাজিত হইল। রুশবাহিনী গ্যালিসিয়া দখল করিয়া হাঙ্গেরীর নিরাপত্তা বিপজ্জনক করিয়া তুলিল। কিন্তু ম্যাকেনসেনের অধিনায়কত্বে জার্মান-বাহিনী অস্ট্রিয়ার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়া রুশবাহিনীকে পরাজিত করিল।

অস্ট্রিয়ার পরাজয়

এই বৎসর ইটালী নিজ নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়া ইংল্যান্ড ও মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। উহার উদ্দেশ্য ছিল অস্ট্রিয়ার অধিকারভুক্ত ইটালীর প্রদেশগুলি পুনরুদ্ধার করা।

মিত্রপক্ষে ইটালীর যোগদান

মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া জাপান জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। সুদূর-প্রাচ্যে জার্মান অধিকারভুক্ত কিয়াও-চাও বন্দর ও সান্টুং অঞ্চল জাপান দখল করিল। অপরদিকে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যোগদান করিয়া দার্দানেলিশের ভিতর দিয়া মিত্রপক্ষ ও রাশিয়ার মধ্যে যে যোগসূত্র এযাবৎ বজায় ছিল তাহা ছিন্ন করিল। ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী দার্দানেলিশে বলপূর্বক প্রবেশ করার চেষ্টা করিলে তুরস্কের নিকট পরাজিত হইল। অতঃপর মিত্রপক্ষ গ্যালিলির সন্নিকটে সৈন্য অবতরণ করাইবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইল।

জাপানের মিত্রপক্ষে ও তুরস্কের জার্মানীর পক্ষে যোগদান

যুদ্ধের প্রথম বৎসর সার্বিয়া অস্ট্রিয়ার আক্রমণ বীরত্বের সহিত প্রতিহত করিয়াছিল। কিন্তু ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ হইতে বুলগেরিয়া ও উত্তর হইতে সম্মিলিত অস্ট্রো-জার্মান বাহিনী আক্রমণ চালাইলে সার্বিয়া শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হইল এবং সার্বিয়া কেন্দ্রীয় পক্ষের (জার্মানী ও তাহার মিত্রবর্গকে এই নামে অভিহিত করা হয়) সম্পূর্ণ অধিকারে আসিল।

সার্বিয়ার পতন

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্বত্রই মিত্রপক্ষ পরাজয় স্বীকার করিল। টাউনসেন্ডের অধিনায়কত্বে একদল ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী 'কুট-এল্-আমারা'-এর যুদ্ধে তুরস্কের নিকট পরাস্ত হয় (এপ্রিল ১৯১৬ খ্রীঃ) এবং ব্রিটেনের মর্যাদা ইহাতে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে সেনাধ্যক্ষ মড্-এর নেতৃত্বে বাগদাদ অধিকৃত হইলে ইংল্যান্ডের লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

পশ্চিম রণাঙ্গণে মিত্রপক্ষ জার্মান বেষ্টনী ভেদ করিবার চেষ্টা করিলে ইপ্রেসে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে জার্মানী সর্বপ্রথম বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করে। ইহার ফলে মিত্রপক্ষ পরাজিত হইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইল।

ইপ্রেসের দ্বিতীয় যুদ্ধ

১৯১৬ঃ এই বৎসর পশ্চিম সীমান্তে ভার্দুন (ফ্রান্সের দ্বার প্রান্তে) ও সোমিতে (Verdun and Somme) জার্মানী ও মিত্রপক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইল। উভয়পক্ষের যথেষ্ট ক্ষতি হইল কিন্তু ফ্রান্সের সেনাপতিদ্বয় জোফার ও পে'তা অদ্ভুত দৃঢ়তার সহিত ভার্দুনকে অবশ্যম্ভাবী পতন হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। অতঃপর সোমিতে

ভার্দুন ও সোমি রণাঙ্গনে যুদ্ধ

ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্যবাহিনী আক্রমণ চালাইয়া কতকগুলি শহর পুনরুদ্ধার করিল। কিন্তু যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়া জার্মান লাইন অটুট রহিল। পূর্ব সীমান্তে রাশিয়া সাফল্য অর্জন করিল এবং অস্ট্রিয়া পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু রাশিয়ার অগ্রগতি জার্মানী প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইল।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় হইতে ব্রিটিশ নৌবহর সমুদ্রের উপর আধিপত্য বজায় রাখিয়াছিল। ব্রিটিশ নৌবহরের ভয়ে জার্মান নৌবহর বাহির সমুদ্রে চলাচল করিতে ভরসা পায় নাই। ফলে জার্মানীর সামুদ্রিক বাণিজ্য একরূপ বন্ধই হইয়া গিয়াছিল, যদিও জার্মানী সাবমেরিন দ্বারা শত্রু রণতরী বা বাণিজ্য জাহাজ বিনষ্ট করিতে ছাড়ে নাই। এই বৎসরের সামরিক ঘটনাবলীর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল জুটল্যান্ডের যুদ্ধ (battle of Jutland)। ইংরাজ নৌবহর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া জার্মান নৌবহর উত্তর সাগরের সীমানা হইতে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়া কিয়েল (Kiel) বন্দরে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইল। সমুদ্রপথে ইংল্যান্ডের আধিপত্য অক্ষুন্ন রহিয়া গেল।

জুটল্যান্ডের নৌ-যুদ্ধ (৩১শে মে, ১৯১১)

এই বৎসরে (১৯১৬ খ্রীঃ) রাশিয়ার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া রুমানিয়া মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া অস্ট্রিয়ার উপর আক্রমণ চালাইল। কিন্তু সম্মিলিত অস্ট্রো-জার্মানবাহিনী রুমানিয়ার সৈন্য-বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া রাজধানী বুখারেস্ট দখল করিয়া লইল।

রুমানিয়ার মিত্রপক্ষে যোগদান

১৯১৭ ঃ এই বৎসরের প্রধানতম ঘটনা হইল দুইটি—প্রথমটি, রাশিয়ার বলশেভিক বিদ্রোহ ও জারতন্ত্রের অবসান এবং দ্বিতীয়টি আমেরিকার মিত্রপক্ষে যোগদান।

জার শাসনের অবসানে রাশিয়ায় দারুণ বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয় এবং সৈন্যবাহিনী দুর্বল হইয়া পড়ে। এই কারণে বলশেভিক দল ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া জার্মানীর সহিত ব্রেষ্ট-লিটোভস্ক-এর (Treaty of Brest-Litovsk) সন্ধি সম্পাদন করিল। এই সন্ধি অনুসারে রাশিয়া যুদ্ধ হইতে সরিয়া দাঁড়াইল এবং রুশ-অধিকৃত জার্মানীর পশ্চিম প্রদেশগুলি জার্মানীকে প্রত্যর্পণ করিল।

রাশিয়ার বিদ্রোহ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রথম হইতেই এই যুদ্ধে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু জার্মানী শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সাবমেরিন যুদ্ধ আরম্ভ করিলে আমেরিকার পক্ষে নিরপেক্ষতা রক্ষা করা বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। কারণ আমেরিকার অনেকগুলি জাহাজ জার্মান টর্পেডোর আঘাতে বিনষ্ট হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক বিধি লঙ্ঘন করার প্রতিবাদ স্বরূপ আমেরিকা জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। উপরি-উক্ত কারণ ছাড়াও অর্থনৈতিক কারণেও আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল।

যুদ্ধে আমেরিকার যোগদান

এই যুদ্ধ আরম্ভ হইলে আমেরিকা ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সকে প্রচুর পরিমাণে ঋণ দান করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধে মিত্রপক্ষের পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকায় ঋণ পরিশোধের

সম্ভাবনাও কম ছিল। সুতরাং লগ্নী অর্থের প্রাপ্তির আশায় এবং মিত্রপক্ষকে সুনিশ্চিত পরাজয়ের হাত হইতে রক্ষা করার জন্যই আমেরিকা যুদ্ধে অবতীর্ণ

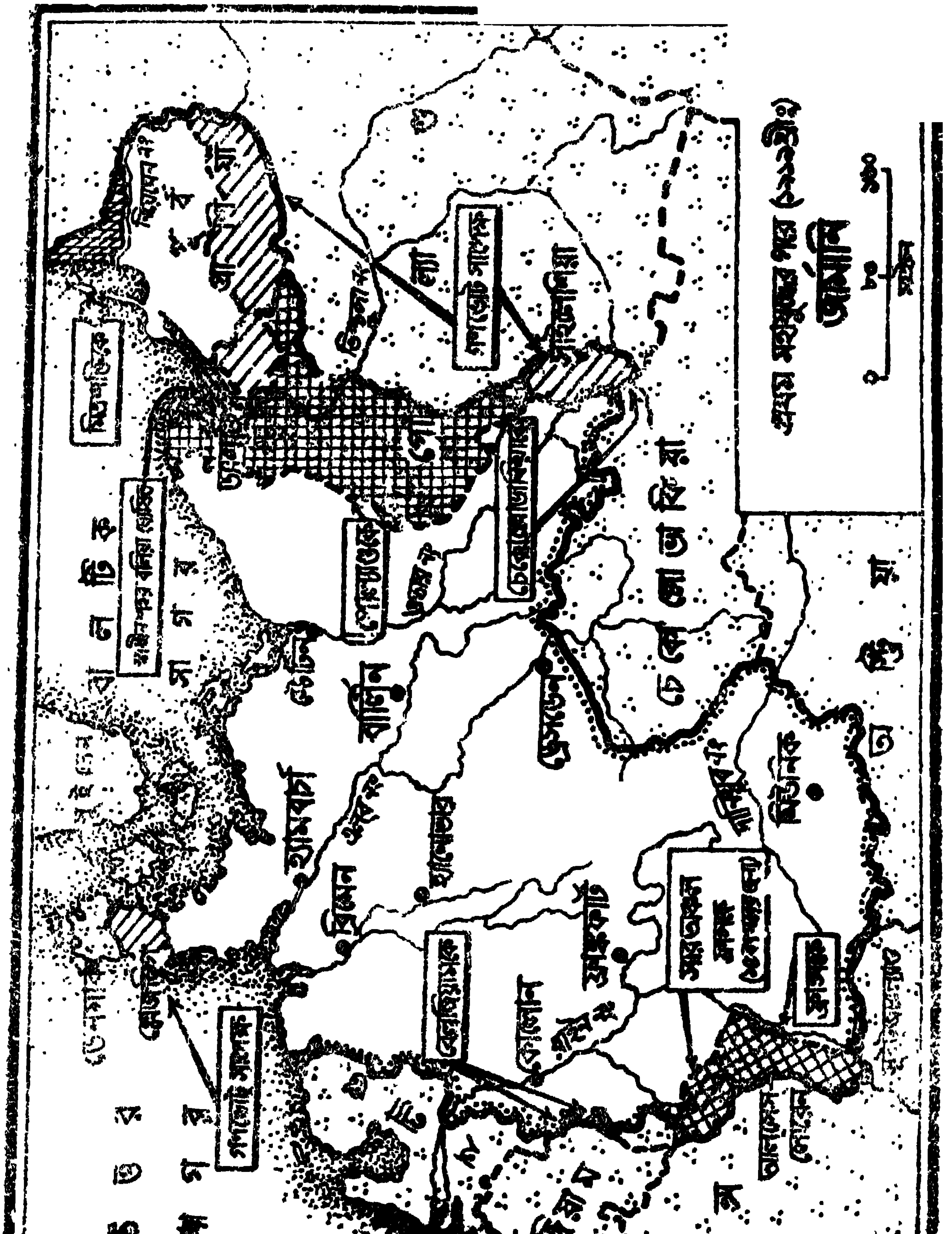

হইল (৬ই এপ্রিল, ১৯১৭ খ্রীঃ)। আমেরিকার যোগদানের পর হইতে যুদ্ধের গতি মিত্রপক্ষের অনুকূলে অগ্রসর হইতে থাকে।

১৯১৮ : রাশিয়ার সহিত শান্তি স্থাপিত হইলে জার্মানী পশ্চিম সীমান্তে জোর আক্রমণ চালাইল। প্রথমে জার্মানবাহিনী আমিন্‌স-এর (Ameins) দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু ইংরাজবাহিনী কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইলে জার্মানবাহিনী ইপ্রেস আক্রমণ করিল এবং প্যারিসের চল্লিশ মাইলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু শীঘ্রই জেনারেল ফচ্ (Foch) মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হইল। মিত্রপক্ষ একের পর এক সাফল্য অর্জন করিয়া চলিল। তুরস্ক, বুলগেরিয়া, অস্ট্রিয়া একে একে পরাস্ত হইয়া মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। ইতিমধ্যে জার্মানীতে অভ্যন্তরীণ বিপ্লব আসন্ন হইয়া উঠিল। নৌ-বাহিনী বিদ্রোহ করিল। ৯ই নভেম্বর (১৯১৮ খ্রীঃ) কাইজার হল্যাণ্ডে পলায়ন করিলে জার্মানীর সর্বত্র সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হইল। এই অবস্থায় জার্মানী ১১ই নভেম্বর (১৯১৮ খ্রীঃ) যুদ্ধ বিরতি প্রার্থনা করিলে যুদ্ধ বন্ধ হইল।

জার্মানীর পরাজয়

যুদ্ধ বিরতি (১১ই নভেম্বর)

৮.৫. প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন—শান্তির শর্তাদি
(Paris Peace Conference—Peace Settlements)

যুদ্ধ-প্রসূত ক্ষতি (Cost of the War) : ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের অবসান হইল। যুদ্ধের ভয়াবহতা, ব্যাপকতা, যান্ত্রিক অস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামের ব্যবহার, প্রাণ ও ধনসম্পত্তির বিনাশ সকল দিক দিয়া বিচার করিলে ১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধকে প্রথম প্রকৃত বিশ্বযুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে যাহা পূর্বে আর কখনও সংঘটিত হয় নাই। ১৭৯০ হইতে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিশ্বে যে সকল যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল (যথা নেপোলিয়নীয় যুদ্ধ, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধ, মার্কিন গৃহযুদ্ধ, রুশো-জাপান যুদ্ধ ইত্যাদি) সেগুলির একত্রে মৃত্যু সংখ্যার তুলনায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মৃত্যুর সংখ্যা ছিল দ্বিগুণ। বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ জনগণ এই যুদ্ধের আওতায় আসিয়াছিল। ইহার মধ্যে মিত্রপক্ষের মৃত্যু সংখ্যা ছিল প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। এই যুদ্ধে ধনসম্পত্তির কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করার উপায় নাই। যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলির সামরিক ব্যয় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ হইয়াছিল। সকল দেশের সকল শ্রেণী প্রায় ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছিল। এই যুদ্ধেই সর্বপ্রথম শিল্প ও কলকারখানাগুলি যুদ্ধের ব্যাপারে ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং যান্ত্রিক মারণাস্ত্রের বহুল প্রয়োগ হইয়াছিল। সৈন্য-গণের মৃত্যুর তুলনায় বে-সামরিক জনগণের মৃত্যু অধিক হইয়াছিল।* খাদ্যাভাব,

যুদ্ধের ব্যাপকতা ও বীভৎসতা

* "In it were concentrated all the bitter fruits of the Industrial Revolution, all the horrors of misdirected and un-coordinated scientific progress and all the ileness of man's inhumanity to man."

রোগ, মহামারী এবং উভয়পক্ষের যথেচ্ছ আক্রমণের ফলেই বে-সামরিক জনগণের মৃত্যুর হার এত অধিক হইয়াছিল।

যুদ্ধবিরতি : (Armistice) : ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর অস্ট্রিয়া ও বুলগেরিয়ার পতনের পর লুডেনডর্ফ (Ludendorf) জার্মান সম্রাট কাইজারকে শান্তি স্থাপনের পরামর্শ দিলেন। ৪ঠা অক্টোবর জার্মান চ্যান্সেলার প্রিন্স ম্যাক্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো-উইলসনকে (Woodro Wilson) জানাইলেন যে তাঁহার 'চৌদ্দ-দফা শর্তে'র (fourteen points) ভিত্তির উপর জার্মান সরকার শান্তিস্থাপনে প্রস্তুত। ইহার উত্তরে উইলসন দাবি করিলেন যুদ্ধবিরতি-চুক্তির শর্তানুসারে (১) জার্মানী মিত্রপক্ষের রাজ্যগুলি হইতে উহার সৈন্য অপসারণ করিবে এবং (২) জার্মানীতে স্বৈরতন্ত্রের স্থলে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করিতে হইবে। ২০শে অক্টোবর জার্মান সরকার এই দাবিগুলিতে সম্মত হইলেন। ৯ই নভেম্বর জার্মান সম্রাট কাইজারের সিংহাসনচ্যুতি ও জার্মানীতে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হইল। ১১ই নভেম্বর মিত্রপক্ষের সেনাপতি মার্শাল ফচ্ (foch) ও জার্মান প্রতিনিধিগণের মধ্যে যুদ্ধবিরতি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। জার্মানী একরূপ বিনাশর্তেই আত্মসমর্পণ করিল।

জার্মানীতে কাইজারের সিংহাসনচ্যুতি ও সাধারণতন্ত্রের ঘোষণা

যুদ্ধবিরতির-চুক্তি অনুসারে জার্মানী—(১) মিত্রপক্ষের রাজ্যাংশ হইতে সৈন্য অপসারণ করিল, (২) রাইন অঞ্চলকে বে-সামরিক অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিল, (৩) প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ, সাবমেরিন (ডুবো-জাহাজ) ও যুদ্ধ-জাহাজ মিত্রপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিল, (৪) রাশিয়ার সহিত পূর্বে সম্পাদিত ব্রেস্ট-লিটভস্ক (Brest Litovsk)-এর সন্ধি বাতিল করিল এবং (৫) রুমানিয়ার সহিত পূর্ব-সম্পাদিত বুখারেস্টের সন্ধি বাতিল করিল।

যুদ্ধবিরতি-চুক্তি

শান্তি-সম্মেলনের নেতৃবর্গ (Leaders of Peace Conference) : ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে বিশ্বের ৩২টি দেশের প্রতিনিধিগণ শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্যারিস নগরীতে সমবেত হইলেন। জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, তুরস্ক ও বুলগেরিয়াকে সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। চুক্তিপত্রের রচনা সম্পূর্ণ হইলে পর তাহা স্বাক্ষর করার জন্য পরাজিত রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করা হইয়াছিল। সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো-উইলসন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ ক্লিমেনশো ও ইটালীর প্রধানমন্ত্রী ভিটোরিও অর্লাণ্ডো-র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে সম্মেলনের কর্মক্ষমতা 'প্রধান চারিজন' (Big four)-এর হস্তেই নিবদ্ধ ছিল।

ভিয়েনা কংগ্রেসে জার প্রথম আলেকজাণ্ডার যেরূপ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে সেইরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন। মার্কিন রাষ্ট্রবিদ্‌গণের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া উইলসন ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সম্মেলনে ব্যক্তিগতভাবে যোগদান করেন। ইওরোপের রাষ্ট্রবিদ্‌গণের তুলনায় ইওরোপের জনগণ উইলসনের আগমনের প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। ইওরোপের জনগণ এইরূপ আশা করিয়াছিল যে জার্মানীর বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্বে যে তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ঊর্ধ্বে থাকিয়া উইলসন গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিবেন। এই কারণে আমেরিকা হইতে ইওরোপে আগমনকালে সর্বত্র জনগণ উইলসনকে গভীরভাবে অভিনন্দিত করিয়াছিল। কথিত আছে যে উইলসনের উপস্থিতিতে ফরাসীগণ আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিয়াছিল। রোম নগরীতে উইলসনের সম্মানার্থে যে ধরনের শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের পর সেইরূপ অনুষ্ঠান আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই।*

উড্রো-উইলসন ও তাঁহার প্রতি ইওরোপীয় জনগণের মনোভাব

এমনকি জার্মানীতেও উইলসনকে 'রক্ষাকর্তা' রূপে অভিহিত করা হইয়াছিল।

ইওরোপের জনগণ উইলসনকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিল বটে কিন্তু আমেরিকা-বাসীর অখণ্ড সমর্থন তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৬ খ্রীঃ) ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী হিসাবে উইলসন প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধাবসানে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে মাকিন কংগ্রেসে ডেমোক্রেটিক দলের পরাজয় ঘটে এবং রিপাবলিকান দল মার্কিন কংগ্রেস ও সেনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। প্যারিসে যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবে উহার গ্রহণ বা বর্জন সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিল মার্কিন সেনেটের উপর। অথচ এই সেনেট ছিল উইলসন সরকারের ঘোর বিরোধী। এতদ্ভিন্ন উইলসন প্যারিস-সম্মেলনে তাঁহার সহিত রিপাবলিকান দলের কোন প্রভাবশালী রাষ্ট্রবিদ্‌কে সঙ্গে না লইয়া মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন। সুতরাং প্যারিস-সম্মেলনে উইলসন যে চুক্তিই সম্পাদন করুন না কেন, উহার প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিকান দলের বিরোধিতা ছিল একরূপ সুনিশ্চিত। ভিয়েনা কংগ্রেসের জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের ন্যায় উইলসন ছিলেন ঘোর আদর্শবাদী এবং এই কারণে তিনি বিশ্ববাসীর নিকট দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ইওরোপের তদানীন্তন সমস্যা সম্পর্কেও তাঁহার সুস্পষ্ট জ্ঞান ছিল না। সুতরাং কূটনীতির ক্ষেত্রে ভিয়েনা কংগ্রেসে জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের ন্যায় প্যারিস-সম্মেলনে উইলসনও ইওরোপীয় রাষ্ট্রবিদ্‌গণের মোটেই সমকক্ষ ছিলেন না।†

উইলসনের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ মার্কিন জনগণের বিরোধিতা ও উহার কারণ

---

* Not since the days of the ancient empire had Rome witnessed such a triumphal procession as that accorded the president of the United States.
Langsam—World Since 1919—P. 5.

† "In deplomacy Wilson was no match for his foreign colleagues at Paris."—
Langsam—op. cit—P. 6.

প্যারিস-সম্মেলনে ব্রিটেনের প্রতিনিধিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ। তিনি ব্রিটিশ জনগণের পূর্ণ সমর্থনপুষ্ট হইয়া প্যারিস-সম্মেলনে আসিয়াছিলেন।

লয়েড জর্জ

প্যারিস-সম্মেলনে লয়েড জর্জই ছিলেন সর্বাধিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রবিদ্। চারিত্রিক গুণাবলী, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং ইওরোপীয় সমস্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লয়েড জর্জকে সম্মেলনে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিল। মার্কিন ও ফরাসী প্রতিনিধিগণের তুলনায় শান্তি-চুক্তি রচনার ব্যাপারে লয়েড জর্জের আগ্রহ ছিল অধিক। শান্তি-চুক্তির শর্তগুলি পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করার ব্যাপারেও তিনি অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।

ফ্রান্সের প্রতিনিধিত্ব করেন জর্জ-ক্লিমেনশো। তাঁহাকে সাধারণভাবে 'বাঘ' (Tiger) বলিয়া অভিহিত করা হইত। মার্কিন গৃহযুদ্ধের সময় ক্লিমেনশো আমেরিকায় সংবাদদাতার (news reporter) কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং রাজনীতি ও যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। ফ্রান্সে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি সকল প্রকার সরকারী নির্যাতন ও সংবাদপত্রের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ১৯১৭ হইতে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি ফ্রান্সে প্রধানমন্ত্রী ও যুদ্ধমন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হইলে সংবাদপত্রের উপর এক নূতন ধরনের নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, প্যারিস-সম্মেলনে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেন এবং বিশ্ব-রাজনীতি সম্পর্কে তাঁহার গভীর জ্ঞান থাকায় অনেক সময় তিনি অন্যান্য ইওরোপীয় রাষ্ট্রবিদ্গণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন। ফ্রান্সের স্বার্থে তিনি মার্কিন ও ব্রিটিশ প্রতিনিধিগণের সন্তুষ্টিসাধনে সর্বদাই যত্নবান ছিলেন। প্যারিস-সম্মেলনে তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সের গৌরব বৃদ্ধি করা; ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিধান করা এবং জার্মানীকে দুর্বল করিয়া রাখা।

ক্লিমেনশো

ক্লিমেনশোর লক্ষ্য

ইটালীর প্রতিনিধিত্ব করেন ভিটোরিও অর্লান্ডো। অর্লান্ডো ছিলেন আইন-বিষয়ে ভূতপূর্ব অধ্যাপক, সুপণ্ডিত, সুবক্তা ও সুচতুর রাষ্ট্রবিদ্। কিন্তু ইংরাজী ভাষায় তাঁহার দক্ষতা না থাকায় সম্মেলনের আলোচনায় তিনি মোটেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। উপরন্তু মিত্রপক্ষে যোগদানের শর্ত হিসাবে ইটালী ইতিপূর্বে যে সকল গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল সেগুলি কার্যে পরিণত করার ব্যাপারে অর্লান্ডো চাপ দিতে থাকিলে প্রেসিডেণ্ট উইলসন তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। অর্লান্ডোর সহকারী অপর দুই ইটালীয় প্রতিনিধি সিগানির নিটি ও টোমানো টিটনীও কূটনীতিবিদ্ হিসাবে সম্মেলনে তেমন সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই।

অর্লান্ডো

উপরি-উক্ত 'বৃহৎ চারিজন' ছাড়াও প্যারিস-সম্মেলনে অন্যান্য কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফরাসী প্রেসিডেণ্ট পঁয়েকার ও ফরাসী সেনাপতি মার্শাল ফচ্ প্রতিনিধি হিসাবে সম্মেলনে যোগদান না করিলেও

তাঁহারা সম্মেলনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের এই দুই নেতার একমাত্র লক্ষ্য ছিল জার্মানীকে সর্বতোভাবে দুর্বল ও পঙ্গু করিয়া রাখা এবং এই ব্যাপারে তাঁহারা ক্লিমেনশোর অপেক্ষায় জার্মানীর প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। পঁয়েকার উইলসনীয় আদর্শের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ছাড়াও ব্রিটেনের অপর দুই উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি ছিলেন আর্থার জেমস বেলফোর ও জর্জ বার্নেস। গ্রীসের প্রতিনিধিত্ব করেন ভেনিজেলস (Venizelos)। পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করেন রোমান দমোস্কি (Roman Dmowski)। দমোস্কি সম্মেলনের অপরাপর রাষ্ট্রবিদ্‌গণের মোটেই সমকক্ষ ছিলেন না। জাপানের প্রতিনিধি ছিলেন কিমোচি সাইওনজি ও নবুয়াকি মাকিনো। তাঁহারা সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইওরোপের ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহারা সম্মেলনে শত্রু বৃদ্ধি করার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু সুদূর-প্রাচ্যের ব্যাপারে তাঁহাদের বক্তব্য ও নীতি ছিল সুস্পষ্ট। সাধারণভাবে জাপানের প্রতিনিধিগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনকে সমর্থন করিয়া যান।

অপরাপর প্রতিনিধিগণ

শান্তি-সম্মেলনের সংগঠন ও সমস্যা (Organisation and Problems of the Conference)**:** যুদ্ধবিরতির বহু পূর্বে যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট প্রধান রাষ্ট্রগুলি ভবিষ্যৎ শান্তি-সম্মেলনে আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোনরূপ সংহতি না থাকায় এবং তথ্যাদি সংগ্রহের কার্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের যুদ্ধ অথবা পররাষ্ট্র ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকায় সংগৃহীত তথ্যাদির অধিকাংশই পরিত্যক্ত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞগণ মধ্য-ইওরোপের অর্থনৈতিক ও ভাষা-সংক্রান্ত বহু বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করেন। এই সকল তথ্যের ভিত্তির উপর প্রেসিডেণ্ট উইলসন তাঁহার 'চৌদ্দ-দফা শর্ত' রচনা করেন। ইওরোপের অন্যান্য দেশেও এই ধরনের প্রস্তুতি চলিয়াছিল। ফলে প্যারিস-সম্মেলনে যোগদানকারী প্রায় সকল প্রতিনিধিই বিভিন্ন প্রকারের নথিপত্র ও স্মারকপত্রসহ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন।

সম্মেলনের সংগঠন: ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী প্যারিস-সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। ৩২টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন।* প্রতিটি রাষ্ট্র-প্রতিনিধির সহিত বহুসংখ্যক সেক্রেটারী, উপদেষ্টা ও সাংবাদিকও যোগদান করেন। ছয়টি প্রকাশ্য অধিবেশনের পর বিবিধ-সমস্যাগুলির আলোচনার অসুবিধা হেতু বৃহৎ পঞ্চরাষ্ট্রের (যথা আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী ও জাপান) দুইজন প্রধান প্রতিনিধিকে লইয়া একটি 'সুপ্রীম কাউন্সিল' গঠিত হইল। সকল

* নিম্নলিখিত রাষ্ট্রগুলি সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিল—আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী, জাপান, বেলজিয়াম, ব্রেজিল, চীন, কিউবা, চেকোশ্লোভাকিয়া, গ্রীস, গুয়েতেমালা, হাইতি, হেজ্জাজ, হণ্ডুরাস, যুগোস্লাভিয়া, লাইবেরিয়া, নিকারাগুয়া, পানামা, পোল্যাণ্ড, পর্তুগাল, রুমানিয়া, শ্যাম, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারত, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা, বলিভিয়া, ইকোয়েডর, পেরু ও উরুগুয়ে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির আলোচনা ও উহাদের সুপারিশগুলি সম্মেলনে পেশ করার দায়িত্ব সুপ্রীম-কাউন্সিলের হস্তে অর্পিত হইল। সুদূর-প্রাচ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলির দায়িত্ব জাপানের হস্তে অর্পিত হওয়ায় সম্মেলনে ইওরোপ সম্পর্কিত বিষয়গুলির আলোচনায় জাপান একরূপ নির্লিপ্ত রহিল। আড্রিয়াটিক অঞ্চল সম্পর্কিত আলোচনার বিরোধিতা করিয়া ইটালী কিছুদিনের জন্য সম্মেলনের কার্যে অংশগ্রহণে বিরত হইলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব লয়েড জর্জ, ক্লিমেনশো ও উইলসনের হস্তে ন্যস্ত হইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে সম্মেলনে উহাদের স্ব স্ব দাবি পেশ করার অধিকার দেওয়া হইল। এতদ্ভিন্ন কাউন্সিলকে সাহায্য করার জন্য বহু কমিশন ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হইল।

সম্মেলনের প্রাথমিক সমস্যা : বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইলেও রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও কূটনৈতিক কারণে সম্মেলনের কার্যাদি শুরু হইতে বিলম্ব হইল। সম্মেলনের সম্মুখে সমস্যাগুলি ছিল যেমন ব্যাপক তেমনি জটিল। প্রথমতঃ, ভিয়েনা-সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিগণের সংখ্যা ছিল কম এবং শক্তির সাহায্যে তাঁহারা ইওরোপের পুনর্গঠন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু প্যারিস-সম্মেলনে ৭০ জন রাজনীতিবিদ্ ও ১০৩৭ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। বিশেষ বিশেষ সমস্যার আলোচনার জন্য ৫৬টি কমিশনও নিয়োগ করা হয়। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকদের সংখ্যাও নেহাৎ নগণ্য ছিল না। সুতরাং প্যারিস-সম্মেলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে প্রচুর অসুবিধা ছিল। ভিয়েনা-সম্মেলনের ন্যায় প্যারিস-সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মুষ্টিমেয় কয়েকজন কূটনীতিকদের হস্তেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

(১) সিদ্ধান্ত গ্রহণের অসুবিধা

দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ চলিতে থাকাকালীন বিশ্বের পুনর্গঠন সম্পর্কে মিত্রপক্ষের মধ্যে বহু আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে এক শান্তিপূর্ণ সমন্বয় সাধন করার মতো উপযোগী কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেতৃবর্গের ছিল না। ফলে, কোন একটি সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসারে যুদ্ধ-প্রসূত সমস্যাগুলির সমাধান করা একরূপ অসম্ভব হইয়া দেখা দিয়াছিল।

(২) সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব

তৃতীয়তঃ, ভিয়েনার নেতৃবৃন্দ প্রধানতঃ ক্ষতিপূরণ নীতির দ্বারা ইওরোপের পুনর্গঠন সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু প্যারিস-সম্মেলনের নেতৃবৃন্দকে নিজেদের স্ব স্ব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করার জন্য বহু যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিতে হয়। উইলসন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে শক্তি-সাম্যের অজুহাতে কোন দেশ বা উহার অধিবাসীগণকে খুশিমত যে কোন রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত করা চলিবে না। উইলসনের আদর্শ ছিল "বিশ্বে গণতন্ত্রের নিরাপত্তার বিধান করা"। কিন্তু এই আদর্শের সহিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের ও বিভিন্ন জাতির স্বার্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ করার পথে যথেষ্ট অন্তরায় ছিল।

(৩) বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর বিরোধী স্বার্থ

চতুর্থতঃ, সম্মেলনের জন্য প্যারিস নগরীর নির্বাচন সময়োপযোগী ছিল না। কারণ যুদ্ধ-বিধ্বস্ত প্যারিসবাসীর মনে জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণাত্মক মনোভাব, এবং জার্মান জাতির বিরুদ্ধে ফরাসী সংবাদপত্রগুলির ও প্যারিসবাসীর প্রকাশ্য বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণভাবে সম্মেলনের আলোচনায় অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্যাসালরী মন্তব্য করিয়াছিলেন যে কোনরূপ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার স্থান হিসাবে প্যারিস নগরী মোটেই উপযোগী নহে। হ্যারল্ড নিকলসনের ভাষায় "We felt like surgeons operating in the ball-room with the auntics of the patient gathered all around."। সম্মেলনের উপযুক্ত স্থান হিসাবে জেনিভা অথবা লুসানের ন্যায় কোন নিরপেক্ষ নগরী নির্বাচিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ফ্রান্সের চাপে প্যারিস নগরীতে শান্তি-সম্মেলনের স্থান নির্বাচিত হইয়াছিল। কারণ জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবার অপূর্ব সুযোগ হারাইতে ফ্রান্স মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

(৪) সম্মেলনের স্থান হিসাবে প্যারিস নগরীর নির্বাচন সময়োপযোগী ছিল না

পঞ্চমতঃ, যে চারিজন নেতার হস্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব অর্পিত ছিল—যথা উইলসন, লয়েড জর্জ, ক্লিমেনশো ও অর্লান্ডো—তাঁহাদের মধ্যে আদর্শগত ঐক্য ছিল না। ফরাসী প্রতিনিধি ক্লিমেনশোর একমাত্র লক্ষ্য ছিল জার্মানীর ক্ষতিসাধন করিয়া ও ফ্রান্সের নিরাপত্তার বিধান যাহাতে হইতে পারে এমন এক সন্ধিপত্র রচনা করা। ফ্রান্সের দুর্দিনে তিনিই ছিলেন উহার একমাত্র ভাগ্যনিয়ন্তা। ক্লিমেনশোর ভাষায় "Lloyd Georeg believes himself to be Napoleon but Wilson believes himself to be Chirst." উইলসনের সমালোচনা করিয়া ক্লিমেনশো একসময় মন্তব্য করেন, "He speaks like Jesus Christ but he acts like Lloyd George."। লয়েড জর্জ সম্পর্কে ক্লিমেনশো মন্তব্য করেন যে গ্রেটব্রিটেনের স্বার্থ রক্ষা করার পরই লয়েড জর্জ ন্যায় ও সত্যের উপর আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনে অধিকতর উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সামাজিক সংস্কারক ও যুদ্ধমন্ত্রী হিসাবে লয়েড জর্জ স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু প্যারিস-সম্মেলনে তিনি যুদ্ধ-মনোভাব একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। অবশ্য ইহাও সত্য যে পরাজিত শত্রুর সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধনেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। উড্রো-উইলসন ছিলেন শান্তির মূর্ত প্রতীক। শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে তিনি ন্যায় ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে দীর্ঘকাল স্থায়ী শান্তি স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। ইওরোপীয় দেশগুলির পুনর্গঠন ও পুনর্বণ্টনে সংশ্লিষ্ট জনগণের মতামতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু আমেরিকা হইতে বহুদূরে থাকায় উইলসন আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে স্বদেশবাসী তথা মার্কিন সেনেটের মনোভাব যথার্থ অনুধাবন করিতে পারেন নাই। ফলে তাঁহার আদর্শের সহিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মার্কিন জনগনের আদর্শের

(৫) সম্মেলনের নেতৃবর্গের মধ্যে আদর্শগত অনৈক্য

সংঘাত দেখা দিয়াছিল। ইটালীর প্রতিনিধি অর্লাণ্ডো বিশ্ব-শান্তি স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন বটে কিন্তু সেই সঙ্গে ইটালীর ভৌমিক স্বার্থ রক্ষা করিতে তিনি সমভাবে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। জার্মানীর প্রতি ফ্রান্সের যেরূপ মনোভাব সম্মেলনের কার্যে সময় সময় অন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়াছিল তেমনি যুগোশ্লাভিয়ার প্রতি ইটালীর মনোভাবও অন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। আদ্রিয়াটিক অঞ্চল সম্পর্কিত আলোচনার বিরোধিতা করিয়া ইটালীর প্রতিনিধি একসময় সম্মেলন পরিত্যাগ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। লীগ্‌-অফ-নেশনস্‌-এর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অর্লাণ্ডোর অভিমত জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "Yes, we believe in the League, but we want the question of Fiume settled first."

এইভাবে প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে মোটামুটি দুইটি পরস্পর-বিরোধী আদর্শের সংঘাত দেখা দেয়। একদিকে উইলসনের ন্যায়, সততা ও মানবতার ভিত্তিতে দীর্ঘকাল স্থায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের আদর্শ এবং অপরদিকে বিজিত দেশগুলির বিরুদ্ধে বিজয়ী দেশগুলির প্রতিশোধ গ্রহণের দৃঢ় সংকল্প। সুতরাং যাঁহাদের উপর বিধ্বস্ত বিশ্বের পুনর্গঠনের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল তাঁহাদের মনোভাব ও আদর্শের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল। ফলে সম্মেলনের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার পথে সময় সময় অন্তরায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল।*

(৬) ইওরোপীর রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে সম্পাদিত গোপন চুক্তির প্রতি উইলসনের বিরোধিতা

ষষ্ঠতঃ, আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের ভিত্তিস্বরূপ উইলসন 'চৌদ্দ-দফা শর্ত' সম্বলিত এক দীর্ঘ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং জার্মানী এই প্রস্তাব আংশিক-ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। অপরদিকে যুদ্ধ চলিতে থাকাকালে বিভিন্ন ইওরোপীয় রাষ্ট্রের মধ্যে বহু গোপন-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল। কিন্তু অনেক বিষয়ে এই গোপন চুক্তিগুলি চৌদ্দ-দফা শর্তের বিরোধী হওয়ায় সম্মেলনের কার্যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কতিপয় মার্কিন সেনেটের সদস্যগণের নিকট ভার্সাই সন্ধির সমর্থনে ভাষণ প্রসঙ্গে উইলসন বলিয়াছিলেন যে সম্মেলনের যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত তিনি গোপন চুক্তিগুলি সম্পর্কে মোটেই অবহিত ছিলেন না। কিন্তু উইলসনের এই মন্তব্য যথার্থ নহে। কারণ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেলফোর কর্নেলহাউস ও উইলসনের সহিত লণ্ডন-চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বেলফোর লণ্ডন-চুক্তিতে (১৯১৫ খ্রীঃ) সংশ্লিষ্ট ইটালীর দাবি সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট উইলসনের অভিমত প্রার্থনা করিয়া

* At the Peace Conference two ideas were struggling for mastery ; on the one side was the conception of an impartial and altruistic distribution of justice ; on the other were notions more familier to the peace conferences, of the balance of the power, of security against a recurrence of danger form the defeated state, of territorial and economic compensation on the part of the victors."—Ketelbey—P 481.

পত্র দিয়াছিলেন। হাউস অফ-কমন্স-এ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বেলফোর মন্তব্য করিয়াছিলেন "I have no secrets form President Wilson. Every thought I have in the way of diplomacy connected with the war is absolutely open to President Wilson"*।

উপরন্তু ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-বিপ্লবের পর রাশিয়ার বলশেভিক সরকার রাশিয়ার যাবতীয় গোপন চুক্তিগুলি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই চুক্তিগুলি যুদ্ধ-বিরতির বহু পূর্বেই লণ্ডন ও আমেরিকার সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কর্ণেল হাউসকে লিখিত এক পত্রে উইলসন এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে "শান্তি-চুক্তি সম্পর্কে গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্সের সহিত আমাদের মতানৈক্য থাকিলেও যুদ্ধের পর আমরা ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে আমাদের মত গ্রহণে বাধ্য করিব"।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পাদিত গোপন চুক্তিগুলি সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট পূর্বেই অবহিত ছিলেন বটে কিন্তু সেগুলি স্মরণে রাখিবার প্রয়োজন তিনি কখনও উপলব্ধি করেন নাই। সুতরাং শান্তি-সম্মেলনে উইলসন গোপন-চুক্তিগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে স্বার্থসংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির নিকট হইতে এক প্রবল প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয় যাহার ফলে সম্মেলনের কার্যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে উইলসনের আদর্শবাদের সহিত জড়বাদের সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় এবং শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে জড়বাদের সাফল্য ঘটে।**

উইলসনের আদর্শবাদের সহিত সংঘর্ষ

৮.৬. **শান্তি স্থাপনের ভিত্তি** (Bases of peace making): কতকগুলি স্বার্থ ও ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া প্যারিস-সম্মেলনে আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের শর্তাদি রচিত হয়। যথা—

(১) **উইলসনের প্রস্তাব**: বিশ্ব ইতিহাসের এক সংকট মুহূর্তে বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যোগদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জার্মানীর অবরোধ নীতি (policy of blocade), জার্মানী কর্তৃক সাবমেরিন ব্যবহারের (ডুবো জাহাজ) ব্যাপকতা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন বাণিজ্যপোতের বিরুদ্ধে জার্মানী কর্তৃক 'টরপেডো' (Torpedo)-র বহুল ব্যবহার প্রভৃতি কারণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল উইলসন ঘোষণা করেন "গণতন্ত্রের জন্য বিশ্বের নিরাপত্তার বিধান করিতে হইবে। বিশ্বের শান্তি রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কোনরূপ স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য আমাদের নাই। রাজ্যগ্রাস বা

* Vide—Langsam—p. 14.

** "Wilson's idealism came into sharp conflict with materialism at the conference and in most cases materialism triumphed"—Langsam—p. 12.

প্রভুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্য আমাদের নাই। মানবাধিকার রক্ষা করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য" *। উইলসনের এই ঘোষণার মধ্যে মিত্রপক্ষের যুদ্ধের আদর্শ সর্বপ্রথম সূচিত হয়। যুদ্ধ চলিতে থাকাকালীন উইলসন চারিবার বিভিন্ন সময়ে মিত্রপক্ষের যুদ্ধের আদর্শ ঘোষণা করেন।

উইলসনের "চৌদ্দ-দফা শর্ত" (Fourteen Points) : ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী মার্কিন কংগ্রেসের নিকট উইলসন আন্তর্জাতিক শান্তির ভিত্তি হিসাবে তাঁহার বিখ্যাত 'চৌদ্দ-দফা' নীতির বিশ্লেষণ করেন। তাঁহার চৌদ্দ-দফা শর্তগুলি ছিল নিম্নলিখিত রূপ :

(১) প্রকাশ্যভাবে আন্তর্জাতিক শান্তির শর্তাদি গৃহীত হইবার পর কোনরূপ গোপন আন্তর্জাতিক চুক্তি গ্রহণ করা চলিবে না। খোলাখুলিভাবেই শান্তির পথ গ্রহণ করিতে হইবে, (২) প্রত্যেক দেশের নিজস্ব উপকূলের সহিত সংলগ্ন সমুদ্রের অংশ ভিন্ন সমুদ্রপথে যুদ্ধ বা শান্তির সময়ে সকল দেশের জাহাজ স্বাধীনভাবে যাতায়াত করিতে পারিবে, (৩) যাবতীয় অর্থনৈতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থার অবসান করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং তাহা রক্ষা করিতে সকলকেই যত্নবান হইতে হইবে, (৪) নিঃস্বার্থ ও খোলাখুলিভাবে ঔপনিবেশিক দাবির পুনর্বিবেচনা করিতে হইবে। কোন রাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক অধিকার পুনর্বিবেচনার সময় সংশ্লিষ্ট জনগণের স্বার্থের কথাও বিবেচনা করিতে হইবে, (৫) রাশিয়ার হৃত রাজ্যাংশ উহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে এবং জাতীয় নীতি অবলম্বনে রাশিয়া যাহাতে সুগঠিত হইতে পারে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, (৬) বেলজিয়াম হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে এবং অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির ন্যায় উহার স্বাধীনতা কিছুমাত্র খর্ব করা চলিবে না, (৭) ফ্রান্সের সকল অঞ্চল হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে এবং সকলের স্বার্থের জন্য আলসাস্-লোরেন প্রদেশ দুইটি ফ্রান্সকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, (৮) জাতীয়তার ভিত্তিতে ইটালীর সীমানা নির্ধারণ করিতে হইবে, (৯) অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরীর জনগণকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হইবে, (১০) রুমানিয়া, সার্বিয়া ও মণ্টিনিগ্রো হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে, উহাদের হৃতরাজ্যাংশ ফিরাইয়া দিতে হইবে; এবং বল্কান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপনের এবং উহাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হইবে, (১১) তুর্কী ভাষাভাষী অঞ্চলগুলির উপর তুর্কী-সুলতানের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখিতে হইবে, কিন্তু তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত অমুসলমান জনগণকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হইবে, সকল দেশের বাণিজ্যপোতগুলির নিকট দার্দানেলিজ প্রণালীকে সর্বদাই উন্মুক্ত রাখিতে হইবে এবং

*"The world must be made safe for democracy Its peace must be planted upon the tested foundations of political liberty. We have no selfish ends to serve. We desire no conquests nor domination. We are but one of the champions of the rights of mankind"—Wilson.

আন্তর্জাতিকভাবে উহার নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, (১২) পোল-ভাষাভাষী জনগণকে লইয়া স্বাধীন পোল-রাষ্ট্র পুনর্গঠিত হইবে ; আন্তর্জাতিকভাবে উহার নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে এবং নূতন পোল্যাণ্ডকে সমুদ্রে পৌঁছিবার সুযোগ দিতে হইবে, (১৩) কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণ ছাড়া সকল দেশের সামরিক শক্তি হ্রাস করিতে হইবে, এবং (১৪) বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও ভৌমিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপন করিতে হইবে।*

উইলসনের 'চার-দফা' নীতি (Wilson's Four-Point Principles) : ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী উইলসন তাঁহার চার-দফা-নীতি বিশ্লেষণ করিয়া বলেন (১) ন্যায়ের ভিত্তির উপর প্রতিটি বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে যাহাতে শান্তি স্থায়ী হইতে পারে, (২) শক্তি-সাম্য নীতির (balance of power) অজুহাতে কোন অঞ্চল বা কোন অঞ্চলের অধিবাসীগণকে ইচ্ছামত এক রাষ্ট্র হইতে অপর রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত করা চলিবে না, (৩) প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পরস্পর আঞ্চলিক দাবিগুলি পারস্পরিকভাবে মীমাংসা করার পরিবর্তে সেই সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থের ভিত্তিতে উহার নিষ্পত্তি করিতে হইবে, এবং (৪) ইওরোপের শান্তিরক্ষার্থে বিভিন্ন জাতিগুলির জাতীয় আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার সকল প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

এই ঘোষণায় উইলসন স্পষ্টভাষায় বলেন "There shall be no annexation no contribution, no punitive damage."।

উইলসনের অন্যান্য ঘোষনা : উল্লিখিত নীতি সম্বলিত ঘোষণাগুলি ছাড়াও উইলসন ৪ঠা জুলাই ও ২৭শে সেপ্টেম্বর (১৯১৮ খ্রীঃ) দুইটি পৃথক ঘোষণায় তাহার শান্তির শর্তাদি বিশ্লেষণ করেন। এই ঘোষণাগুলির মধ্যে তাঁহার প্রধান বক্তব্য ছিল (১) কোন শক্তি নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করিয়া বিশ্বের শান্তি বিপজ্জনক করিয়া তুলিলে উহাকে সম্মিলিতভাবে নিষ্ক্রিয় বা ধ্বংস করিতে হইবে, (২) সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সম্পর্ক - যে কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট জনগণের সমর্থনলাভ করিতে হইবে, (৩) রাষ্ট্রগুলির পরস্পর সম্পর্ক সভ্যসমাজের সাধারণ আইন অনুসারে পরিচালনা করিতে হইবে, (৪) লীগ্-অফ-নেশনস্-এর ভিতর কোনরূপ বিশেষ-রাষ্ট্রজোট বা মৈত্রীস্থাপন করা চলিবে না এবং (৫) সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সন্ধিপত্রাদি বিশ্বের সকলের নিকট প্রকাশ করিতে হইবে।

৪ঠা জুলাই ও ২৭শে সেপ্টেম্বরের ঘোষণা

---

* উপসংহারে উইলসন বলেন "An evident principle runs through the whole programme I have outlined. It is the principle of justice to all people and nationalities and their right to live on equal terms of liberty and safety with one another, whether they be strong or weak."

উইলসনের প্রস্তাবিত শান্তি শর্তাদির সমালোচনা (Criticism of Wilson's programme of world peace) : উইলসনের প্রস্তাবিত শর্তাদি অবলম্বনে প্রকৃত সন্ধি-স্থাপন করার পক্ষে অসুবিধা ছিল। প্রথমতঃ, প্রস্তাবিত শর্তগুলির অধিকাংশই ছিল অস্পষ্ট ও আদর্শগত, সুতরাং প্রকৃতকার্যে রূপান্তরিত করার অনুপোযোগী। দ্বিতীয়তঃ, শর্তগুলি প্রচারকার্য হিসাবে বিশেষ করিয়া রচিত হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, শর্তগুলির কার্যকারিতা যুদ্ধের গতি, কূটনৈতিক প্রয়োজন ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতৃপদের পরিবর্তনের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল। চতুর্থতঃ, বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পাদিত গোপনচুক্তিগুলি প্রস্তাবিত শর্তাদির বিরোধী হওয়ায় বহু রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা অসুবিধাজনক ছিল।

বিপক্ষে যুক্তি

তথাপি উইলসনের পরিকল্পনা শান্তিস্থাপনের ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। প্রথমতঃ, লীগ্-অফ-নেশনস্ নামক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করার ব্যাপারে উইলসন বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে স্থায়ী ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি আন্তর্জাতিকভাবে সংশোধন করা সম্ভব। তাঁহার প্রস্তাব অবলম্বনেই লীগ্-অফ-নেশনস্ গঠিত হইয়াছিল যদিও ইহা আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ, উইলসনের পরিকল্পনা অনুসারে আন্তর্জাতিকভাবে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ইহাই হইল সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা যদিও ইহার যথার্থ সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ ছিল ; তৃতীয়তঃ, সার, রাইনল্যান্ড, ডানজিগ প্রভৃতির ব্যাপারে এবং পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি নূতন রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি এই সর্বপ্রথম যথার্থভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছিল এবং যে সকল অঞ্চলে উহার প্রয়োগ সম্ভব হয় নাই তথায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল ; চতুর্থতঃ, মিত্রপক্ষের সমরবাদী মনোভাব বহুলাংশে মার্কিন প্রেসিডেন্টের উদারনীতির দ্বারা পরিমার্জিত হইয়াছিল। জাপানের পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারেও উইলসনের উদারনীতি ফলপ্রসূ হইয়াছিল।

স্বপক্ষে যুক্তি

(২) **গোপন সন্ধিসমূহ** (Secret Treaties) : বিশ্বযুদ্ধ চলিতে থাকাকালীন বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পরস্পর স্বার্থরক্ষার জন্য বহু গোপন-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।

প্রথমতঃ, কনস্টান্টিনোপল-এর সন্ধি (১৮ মার্চ ১৯১৫ খ্রীঃ) অনুসারে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স কর্তৃক কনস্টান্টিনোপলের উপর রাশিয়ার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল ; পারস্য ও মেসোপটেমিয়ায় ইংল্যান্ডের স্বার্থ স্বীকৃত হইয়াছিল এবং রাশিয়া কর্তৃক জার্মানীর রাইন অঞ্চলে ফ্রান্সের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ, লন্ডনের গোপন-চুক্তি (২৬শে এপ্রিল ১৯১৫ খ্রীঃ) অনুসারে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া কর্তৃক দক্ষিণ-টাইরল, ট্রিয়েস্ট, উত্তর-ডালমাশিয়া, রোডস্ দ্বীপপুঞ্জের উপর ইটালীর অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল।

তৃতীয়তঃ, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত 'সাইকেস-পিক্ট-চুক্তি' অনুসারে তুরস্ক-সাম্রাজ্যের কতক অঞ্চল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে বণ্টন করার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

চতুর্থতঃ, 'সাইকেস-পিক্ট-চুক্তির' কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে ইটালী এশিয়া মাইনরের এক বৃহৎ অংশ দাবি করিয়াছিল। সুতরাং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট-জিন-দ্য-মোরেন (St. Jean-de-Maureinne)-এর সন্ধি দ্বারা ইটালীর দাবি স্বীকৃত হইয়াছিল।

পঞ্চমতঃ, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রুমানিয়াকে মিত্রপক্ষভুক্ত করার উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইটালী ও রুমানিয়ার মধ্যে একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই সন্ধির দ্বারা মিত্রপক্ষ রুমানিয়াকে ট্রানসিলভানিয়া, বুকোভিনা ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর কিছু অংশ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত ছিল।

ষষ্ঠতঃ, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর বিরুদ্ধে জাপানের সাহায্যলাভের উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইটালী জাপানের সহিত সন্ধি করিয়াছিল। এই সন্ধি দ্বারা মিত্রপক্ষ জাপানকে চীনের অন্তর্গত জার্মানীর অধিকৃত সাণ্টং প্রদেশ প্রদান করিলে প্রতিশ্রুত ছিল।

সপ্তমতঃ, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-রুশ সন্ধির দ্বারা রাশিয়া আলসাস্-লোরেনের উপর ফ্রান্সের অধিকার এবং ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের কিছু অংশের উপর রাশিয়ার অধিকার স্বীকার করিয়াছিল।

উপরি-উক্ত সন্ধির শর্তাদি দ্বারা চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রবর্গ পরস্পরের স্বার্থ ও দাবি রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত ছিল; কিন্তু কতকগুলি কারণে সেইগুলির প্রতিপালন করা অসম্ভব হইয়া দেখা দেয়। প্রথমতঃ, উপরি-উক্ত সন্ধিগুলির সহিত যুক্তরাষ্ট্রের কোনরূপ সংস্রব ছিল না। সুতরাং সেইগুলি প্রতিপালন করিতে যুক্তরাষ্ট্র মোটেই বাধ্য ছিল না; দ্বিতীয়তঃ, উইলসন কোনরূপ গোপন কূটনীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। সুতরাং উপরি-উক্ত গোপন-চুক্তিপত্রগুলি তাঁহার আদর্শবাদের বিরোধী ছিল; তৃতীয়তঃ, রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব এবং জার্মানীর পতনের পূর্বেই রাশিয়া কর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ প্রভৃতি কারণে রাশিয়ার সহিত নূতন বন্দোবস্তের প্রয়োজন ছিল; চতুর্থতঃ, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী ও জাপান সন্ধির শর্তগুলি প্রতিপালন করিতে আগ্রহী ছিল এবং পঞ্চমতঃ, সন্ধির শর্তগুলি প্রতিপালিত হইলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অগণিত জনসাধারণ বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িত এবং সেইক্ষেত্রে তাহা উইলসন কর্তৃক প্রস্তাবিত জাতীয়তা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির বিরোধী হইত।

গোপন-চুক্তির বিপক্ষে যুক্তি

তথাপি বিভিন্ন উপায়ে শান্তি স্থাপনের সময় উপরি-উক্ত গোপন-সন্ধিগুলি কতকাংশে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। মিত্রশক্তিবর্গের স্বার্থের খাতিরে অনেক ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি উপেক্ষিত হইয়াছিল। আবার অনেক ক্ষেত্রে পরাজিত রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ বিসর্জন দিয়াও আত্মনিয়ন্ত্রনের দাবি স্বীকৃত হইয়াছিল। এককথায় গোপন সন্ধিগুলিকে ভিত্তি করিয়াই ইওরোপের পুনর্গঠন করা হইয়াছিল।

গোপন-চুক্তির আংশিক স্বীকৃতি

(৩) **রাশিয়ার বলশেভিক-বিপ্লব :** রাশিয়ার বলশেভিক-বিপ্লব প্যারিস শান্তি-সম্মেলনের কার্যাদি বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। রুশ-বিপ্লবের আদর্শ ও উহার ব্যাপকতা পশ্চিম রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। সোভিয়েট রাশিয়া জার-আমলে সম্পাদিত সন্ধিগুলি বাতিল করিলে যে সকল অঞ্চল রাশিয়াকে দেওয়ার কথা ছিল সেইগুলি অন্যান্য রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে বণ্টন করার প্রয়োজন হইল। রুশ-বিপ্লবের ফলে রুশ-সাম্রাজ্য হইতে কতকগুলি নূতন রাষ্ট্র সৃষ্টি করার এবং রুমানিয়াকে সম্প্রসারণ করার সম্ভাবনা দেখা দিল। বিপ্লবী রাশিয়ার প্রভাব হইতে পূর্ব-ইওরোপকে রক্ষা করার জন্য জার্মানীর প্রতি মিত্রপক্ষের মনোভাবের পরিবর্তন করার প্রয়োজন দেখা দিল। একমাত্র জার্মানীই বিপ্লবী রাশিয়ার প্রভাব ও প্রসারতা প্রতিরোধ করিতে পারিত। সুতরাং পরাজিত জার্মানী যাহাতে সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট না হয় তজ্জন্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনও দেখা দিল। লয়েড জর্জের কথায় "জার্মানী সাম্যবাদী নীতি গ্রহণ করিলে এক বৎসরের মধ্যে বলশেভিক-বিপ্লবের স্রোত সমগ্র ইওরোপকে গ্রাস করিবে এবং জার্মান সেনাপতি ও জার্মানীর অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এক বিরাট লাল-ফৌজ পশ্চিম-ইওরোপের উপর নূতন করিয়া আক্রমণ চালাইবে"। সুতরাং রুশ-বিপ্লব প্যারিস-সম্মেলনের সম্মুখে এক নূতন ও জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল এবং ইহার পরিপ্রেক্ষিতে শান্তির শর্তাদি নূতন করিয়া বিবেচনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

(৪) **জাতীয়তাবাদে প্রশ্ন** (Question of Nationalism) **:** চারিটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের পতন, রাশিয়ার বলশেভিক-বিপ্লব, উইলসনের আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতি প্রভৃতি কারণে জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন নূতন করিয়া দেখা দেয় এবং সর্বত্র পদদলিত ও নির্যাতিত জাতিগোষ্ঠীগুলি জাতীয় রাষ্ট্রের দাবি করে। নির্যাতিত জাতিগোষ্ঠী-গুলির উত্থান প্যারিস-সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। প্রথমতঃ, আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির প্রয়োগ করিয়া তুরস্ক, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য হইতে এক বৃহৎ অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া কয়েকটি নূতন রাষ্ট্র সৃষ্টি করার প্রয়োজন ছিল ; যেমন পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া ইত্যাদি, দ্বিতীয়তঃ, যে সকল অঞ্চলে আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির প্রয়োগ সম্ভব ছিল না, সেই সকল অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল; তৃতীয়তঃ, অনেক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের দাবি ও মিত্ররাষ্ট্রবর্গের মধ্যে সম্পাদিত গোপন সন্ধির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা অসম্ভব হইয়া দেখা দেয় এবং ইহার ফলে মিত্ররাষ্ট্রবর্গের মধ্যে মতান্তরের সৃষ্টি হয়।

(৫) **বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ** (National interests of States) **:** পূর্বেই বলা হইয়াছে যে 'প্রধান-চারি' রাষ্ট্রের উপর শান্তির শর্তাদি রচনা করার দায়িত্ব অর্পিত ছিল। সুতরাং শান্তির শর্তাদির সহিত যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালীর জাতীয় স্বার্থও জড়িত ছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভৌমিক স্বার্থ

কিছু ছিল না। উহার লক্ষ্য ছিল (১) ব্রিটিশ নৌ-শক্তিকে দুর্বল করিয়া ইওরোপের রাজনীতিতে প্রাধান্য স্থাপন করা, (২ সর্বত্র অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করা এবং (৩) চীন-সাম্রাজ্যে জাপানের অগ্রগতি প্রতিরোধ করা। ব্রিটেনের জাতীয় স্বার্থ ছিল বিশ্বের রাজনীতিতে শক্তি-সাম্য বজায় রাখা, স্বীয় সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করা এবং বহির্জগৎ হইতে খাদ্যসামগ্রী ও কাঁচামাল সংগ্রহ করা। সুতরাং প্যারিস-সম্মেলনে ব্রিটেনের লক্ষ্য ছিল (১) বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হইতে জার্মানীকে অপসারিত করা, (২) ব্রিটেনের নৌ-শক্তি অক্ষুণ্ন রাখা, (৩) জার্মানীর প্রতি উদার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া সাম্যবাদের প্রভাব হইতে উহাকে রক্ষা করা এবং (৪) আফ্রিকা, মধ্য-প্রাচ্য ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানগুলি স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করা।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ

ব্রিটেনের স্বার্থ

ফ্রান্সের লক্ষ্য ছিল (১) ইওরোপে ফ্রান্সের প্রাধান্য স্থাপন করা, (২) জার্মানীকে সর্বতোভাবে হীনবল করিয়া রাখা, (৩) রাইন নদীর বামতীর পর্যন্ত ফরাসী-সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ করা, (৪) আলসাস্-লোরেন, সার, রুঢ় প্রভৃতি খনিজ প্রধান অঞ্চলগুলি আদায় করা এবং (৫) জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সংযুক্তিকরণে বাধা প্রদান করা।*

ফ্রান্স ও ইটালীর স্বার্থ

ইটালীর লক্ষ্য ছিল (১) ইটালীয়-অধ্যুষিত সীমান্ত অঞ্চলগুলি আদায় করা, (২) সার্বিয়ার বিরুদ্ধে ইটালীয়-সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার বিধান করা, (৩) আদ্রিয়াটিকের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা এবং (৪) ইটালীর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ করা।†

সুতরাং বিভিন্ন সমস্যা, ঘটনা ও রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর স্বার্থ প্যারিস-সম্মেলনের নীতি, আলোচনা ও কার্যাদি প্রভাবিত করে।

৮.৭. ভার্সাই সন্ধির খসড়া ও স্বাক্ষর (Drafting and Signing of the Versailles Treaty): প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে ভার্সাই সন্ধির খসড়া প্রস্তুতকালে কতকগুলি ব্যাপারে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল; যথা—(১) লীগ্-অফ-নেশনস্ সম্পর্কিত চুক্তিপত্রের (League Covenant) যথার্থ ব্যাখ্যা, (২) ফ্রান্সের নিরাপত্তার প্রশ্ন, (৩) ইটালী ও পোল্যান্ডের দাবি, (৪) জার্মানীর উপনিবেশগুলির পুনর্বণ্টন ও তুরস্ক-সাম্রাজ্যের ভূতপূর্ব রাজ্যাংশ সংক্রান্ত প্রশ্ন, এবং (৫) জার্মানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রশ্ন।

শান্তি-চুক্তির সহিত লীগ্-অফ-নেশনস্ সম্পর্কিত চুক্তিপত্র সন্নিবিষ্ট করার

* আলসাস্-লোরেন ও সার অঞ্চল ফ্রান্স লাভ করিয়াছিল বটে কিন্তু উহার রাইন নদীর বাম-উপকূল পর্যন্ত সম্প্রসারণের দাবি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন কর্তৃক সমর্থিত হয় নাই। ইহার পরিবর্তে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। জার্মানীকে সর্বতোভাবে হীনবল করিয়া রাখিবার দাবিও স্বীকৃত হইয়াছিল।

† ইটালীর বহু দাবি উপেক্ষিত হইলেও ইটালীর উত্তর সীমান্ত ব্রেনার-গিরিপথ (Brenner pass) পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হইয়াছিল।

ব্যাপারে এক দারুণ মতানৈক্যের উদ্ভব হয়। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট শান্তি-চুক্তির সহিত লীগ-চুক্তিপত্র সন্নিবিষ্ট করার প্রবল পক্ষপাতী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেণ্টের দাবি জয়যুক্ত হইল। ২৬টি সংশোধন প্রস্তাবের পর লীগ-চুক্তিপত্র গৃহীত হইল। ফ্রান্সের প্রতিবাদের বিরুদ্ধেই লীগ-চুক্তিপত্রে এক নূতন ধারা (Article 21) সন্নিবিষ্ট করা হইল যাহার দ্বারা মনরো-নীতি এই সর্বপ্রথম ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করিল।* জাপান সকল দেশের সম-মর্যাদার নীতি (principle of the equality of nations) লীগ-চুক্তিপত্রে সংযোজিত করার প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়ার প্রবল বিরোধিতার ফলে জাপানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

লীগ-চুক্তিপত্রের ব্যাখ্যা

যুগে যুগে জার্মানী ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিপন্ন করিয়াছিল। সুতরাং জার্মানীর ভবিষ্যৎ আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ফ্রান্স নিরাপত্তার দাবি করিল। ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিধানের একমাত্র উপায় ছিল জার্মানীকে রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করিয়া রাখা, যাহাতে জার্মানী ফ্রান্সের স্বার্থ কখনও বিপন্ন করিতে না পারে। সুতরাং ফ্রান্স দাবি করিল যে রাইন নদী এবং ফ্রান্স-বেলজিয়াম-নেদারল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী দশ হাজার বর্গমাইল অঞ্চল একটি মধ্যবর্তী স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলরূপে ঘোষণা করা হউক। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও রাশিয়া এই ধরনের একটি মধ্যবর্তী রাষ্ট্র (buffer state) গঠন করা সম্পর্কে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু প্যারিস-সম্মেলনে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতায় এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। কিন্তু তথাপি ফ্রান্স উহার নিরাপত্তার দাবি পরিত্যাগ করিল না। অবশেষে রাইন উপকূলের তিনটি অংশ (উত্তর, মধ্য, দক্ষিণ) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মিত্রপক্ষের অধিকারে রাখিবার প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইলে এবং পৃথক পৃথক চুক্তি দ্বারা ব্রিটেন ও আমেরিকা জার্মানীর ভবিষ্যৎ আক্রমণের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলে ফ্রান্স শান্ত হয়।

ফ্রান্সের নিরাপত্তার প্রশ্ন

প্যারিস-সম্মেলনে ইটালীর দাবি আলোচনা করিতে অধিক সময় লাগিয়াছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত লণ্ডন-চুক্তিতে ইটালীকে ব্রেনার-গিরিপথ হইতে আলবানিয়ার অন্তর্গত ভেলোনা বন্দর পর্যন্ত সম্প্রসারণের এবং দোদেকানিজ দ্বীপপুঞ্জ (Dodecanese Islands) সহ আফ্রিকা ও এশিয়ার কিছু অংশ সমর্পণ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। প্যারিস-সম্মেলনে উপরি-উক্ত অঞ্চলগুলি ছাড়াও ইটালী আদ্রিয়াটিকে উপকূলে অবস্থিত ফিউম (Fiume) দাবি করিল। আদ্রিয়াটিক উপকূলে ইটালীর ভূতপূর্ব

ইটালী ও পোল্যাণ্ডের দাবি

---

*"Nothing in the covenant shall be deemed to affect the validity of international engagements, such as treaties of arbitration or regional undertakings like the Mornroe Doctrine for securing the maintenance of peace," vide Langsam—P. 14.

প্রতিদ্বন্দ্বী সার্বিয়া নিশ্চিহ্ন হইলেও এই অঞ্চলে যুগোশ্লাভিয়া নামে এক নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল। সুতরাং ইটালী যুগোশ্লাভিয়ার ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশঙ্কায় ফিউম দাবি করিল। ("Rome knew that without Fiume Yugoslavia could not readily achieve maritime greatness". Langsam—p. 16)। সামরিক ও ভৌগোলিক কারণে ইটালী ফিউম দাবি করিল। এই দাবির সমর্থনে ইটালীর প্রতিনিধি অর্লাণ্ডো এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে সমুদ্র দ্বারা ইটালীর সহিত ফিউমের প্রত্যক্ষ সংযোগ রহিয়াছে কিন্তু পর্বত দ্বারা ফিউম যুগোশ্লাভিয়ার সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। অপরদিকে শ্লাভ প্রতিনিধিগণ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসারে ফিউমের উপর দাবি করেন এবং তাঁহারা ডালমাশিয়ার উপরও ইটালীর দাবির বিরোধিতা করেন। তাঁহারা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন যে ডালমাশিয়ার শ্লাভগণ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং ফিউমে উহারা ছিল ইটালীয়দের সমসংখ্যক। সুতরাং ইটালীর অধীনে এক বৃহৎসংখ্যক শ্লাভ সংখ্যালঘুকে ছাড়িয়া দিতে শ্লাভ প্রতিনিধিগণ সম্মত হইলেন না। এই অবস্থায় প্যারিস-সম্মেলনে ডালমাশিয়ার এক অংশমাত্র ইটালীকে সমর্পণ করিতে সম্মত হইল। অর্লাণ্ডো ইহার প্রতিবাদ করিয়া কিছুদিনের জন্য সম্মেলন পরিত্যাগ করেন। ইটালীর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নিটিও (Nitti) সন্তোষজনক ভাবে ইটালীর স্বার্থ আদায় করিতে অসমর্থ হন। ফলে প্যারিস-সম্মেলনের পরেও ফিউম ও আদ্রিয়াটিক সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক চলিতে থাকে। পরবর্তী কালে ইটালী ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে সরাসরি আলোচনার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হয়।

পোল্যাণ্ড সম্পর্কিত প্রশ্ন ফিউমের ন্যায় এত জটিল ছিল না। ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন পোল্যাণ্ড পুনর্গঠন করার ব্যাপারে মিত্রপক্ষ প্রতিশ্রুত ছিল। সুতরাং সম্মেলনের দায়িত্ব ছিল নূতন পোল্যাণ্ডের সীমানা নির্ধারণ করা সমুদ্রের সহিত পোল্যাণ্ডের যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা। কিন্তু সমুদ্রের সহিত পোল্যাণ্ডের সংযোগ স্থাপনের প্রশ্ন লইয়া সম্মেলনে এক দারুণ বিতর্কের উদ্ভব হইল। সমুদ্রের সহিত পোল্যাণ্ডের সংযোগ স্থাপন করিতে হইলে জার্মানী হইতে পূর্ব প্রাশিয়া বিচ্ছিন্ন করার এবং ডানজিগ শহরসহ কিছু ভূখণ্ড করিডর (Corridor) হিসাবে পোল্যাণ্ডকে সমর্পণ করার প্রয়োজন দেখা দিল। ডানজিগ ছিল জার্মান-অধ্যুষিত। সুতরাং ইহা পোল্যাণ্ডকে সমর্পণ করা হইলে আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির বিরোধিতা করা হইত। কিন্তু পোল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক স্বার্থের খাতিরে সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ তাহা করিতে দ্বিধা করিলেন না। পোল্যাণ্ডকে পোসেন ও পশ্চিম-প্রাশিয়ার এক বৃহৎ অংশ সমর্পণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। এই ব্যবস্থা ফ্রান্সের স্বার্থের অনুকূল হইল কারণ ইহার দ্বারা জার্মানীর স্বার্থ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইল এবং রাশিয়ার পরিবর্তে ফ্রান্স জার্মানীর পূর্ব-সীমান্তে পোল্যাণ্ডকে মিত্র হিসাবে লাভ করিল।

জার্মানীর উপনিবেশ ও তুরস্ক-সাম্রাজ্যের ভূতপূর্ব রাজ্যাংশ সংক্রান্ত প্রশ্নটিও সম্মেলনের নিকট জটিল হইয়া দেখা দিয়াছিল। মিত্রপক্ষের কেহ কেহ জার্মানীর

উপনিবেশ ও তুরস্কের ভূতপূর্ব রাজ্যাংশগুলি মিত্রপক্ষের মধ্যে বণ্টন করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এই যুক্তি মিত্রপক্ষের যুদ্ধ-নীতির বিরোধী হওয়ায় মিত্রপক্ষের অপরাপর কূটনীতিকগণ তাহা সমর্থন করিলেন না। অবশেষে স্থির হইল যে জার্মানী ও তুরস্কের নিকট হইতে প্রাপ্ত অঞ্চলগুলি লীগ্-অফ-নেশনস্-এর অছি-শাসনাধীনে (mandatory system) রাখা হইবে এবং এইগুলির শাসনের ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লীগ মিত্রপক্ষের রাষ্ট্রবর্গের হস্তে অর্পণ করিবে।

জার্মানীর ভূতপূর্ব উপনিবেশ ও তুরস্কের হৃত রাজ্যাংশের প্রশ্ন

প্যারিস-সম্মেলনের সর্বশেষ আলোচ্য বিষয় ছিল ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত প্রশ্ন। যুদ্ধবিরতির পূর্বেই মিত্রপক্ষ যুদ্ধের জন্য জার্মানীকে দায়ী সাব্যস্ত করিয়া উহার নিকট হইতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করার কথা ঘোষণা করিয়াছিল। সম্মেলনে এই সম্পর্কে আলোচনা শুরু হইলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধের জন্য মিত্রপক্ষের সকল ব্যয় এবং জার্মানীর আক্রমণের ফলে মিত্রপক্ষের সামরিক ও বে-সামরিক ক্ষতির জন্য জার্মানীকে দায়ী করিল এবং উহার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করার দাবি করিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক উপস্থাপিত যুক্তির বিরোধিতা করিল। অবশেষে দশটি বিভিন্ন প্রকারের ক্ষতির তালিকা প্রস্তুত করা হইল এবং জার্মানীর নিকট হইতে কি পরিমাণে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইবে তাহা স্থির করার জন্য একটি ক্ষতিপূরণ কমিশন নিয়োগ করার কথা ঘোষিত হইল।

ক্ষতিপূরণ সমস্যা

চারিমাস ধরিয়া কখনও প্রকাশ্যে কখনও বা গোপনে প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনের আলোচনা চলিবার পর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে সন্ধির খসড়া প্রস্তুত হইলে উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করার জন্য জার্মানীকে আদেশ দেওয়া হইল। ইহার উত্তরে জার্মানী অধস্তন কর্মচারী পাঠাইয়া সন্ধিপত্র বার্লিনে লইয়া আসিবার ও তাহা পুনর্বিবেচনার কথা মিত্রপক্ষকে জানাইল। জার্মানীর এই উত্তরে মিত্রপক্ষ অপমানিত বোধ করিল এবং পুনরায় উপযুক্ত প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য জার্মানীকে সতর্ক করিয়া দিল। এই অবস্থায় জার্মানী একদল প্রতিনিধি প্যারিস-সম্মেলনে পাঠাইতে বাধ্য হইল। জার্মান প্রতিনিধিগণকে অপরাপর দেশের প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখা হইল, উহাদের আবাসস্থলের চতুর্দিকে সৈন্য মোতায়েন রাখা হইল এবং প্রহরাধীন অবস্থায় জার্মান প্রতিনিধিগণকে সাধারাণ আসামীর ন্যায় সম্মেলনে লইয়া যাওয়া হইত। ভার্সাই-এর সন্ধিপত্র জার্মান প্রতিনিধিগণের হস্তে অর্পণ করার সময় ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্লিমেনশো মন্তব্য করেন "You have before you the aceredited plenipotentiaries of all the small and great powers united to fight together in the war that has been so cruelly imposed upon them. That time has come when we must settle

ভার্সাই সন্ধিপত্রের রচনা সম্পন্ন সম্মেলনে জার্মান প্রতিনিধিদের আগমন, জার্মান প্রতিনিধিদের প্রতি মিত্রপক্ষের আচরণ

our accounts. You have asked for peace, We are ready to give you peace."*

সন্ধিপত্র গ্রহণের সময় মিত্রপক্ষের প্রতিশোধাত্মক মনোভাব লক্ষ্য করিয়া জার্মান প্রতিনিধিগণ মন্তব্য করেন, "আমরা জানি আমাদের প্রতি কি পরিমাণে ঘৃণা বর্ষণ করা হইতেছে।" ("We are all aware of the weight of hate that is here directed against us.")। যাহা হউক, সন্ধির শর্তাদি গ্রহণের জন্য জার্মান প্রতিনিধিগণকে তিন সপ্তাহ সময় দেওয়া হইল।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে জার্মান প্রতিনিধিগণ সন্ধির শর্তাদির বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানাইলেন। লয়েড জর্জ জার্মানীকে কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ক্লিমেনশো অনমনীয় মনোভাব দেখাইলেন। জার্মান প্রতিনিধিগণ শর্তাদির কঠোরতার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে উইলসনের 'চৌদ্দ-দফা' নীতির উপর ভিত্তি করিয়া জার্মানী আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু মিত্রপক্ষ তাঁহাদের প্রতিবাদের প্রতি কোনরূপ কর্ণপাত না করিয়া জার্মানীকে সন্ধিপত্র গ্রহণের জন্য অতিরিক্ত পাঁচ দিন সময় দিলেন। ২২শে জুন জার্মানীর নূতন সরকার সন্ধিপত্রের ২২৭ হইতে ২৩০ ধারা ছাড়া অপরাপর সকল শর্তে সম্মত হইলেন। উপরি-উক্ত চারিটি ধারায় জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তিদান ও মিত্রপক্ষের হস্তে কাইজারের সমর্পণের দাবি ছিল। ২৮শে জুন ভার্সাই-প্রাসাদে সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল।

ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে জার্মানীর প্রতিবাদ

ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী ও জাপানের সরকারগণ কর্তৃক এই সন্ধি অনুমোদিত হইল কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইহা অনুমোদন করিল না। কারণ যুদ্ধবিরতির (Armistice) পরে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ বিনষ্ট হওয়ার জন্য জার্মানী ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে অস্বীকৃত হয়। যাহা হউক, ১০ই জানুয়ারী (১৯২০ খ্রীঃ) জার্মানী যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষতিপূরণ দানে স্বীকৃত হইলে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র সরকার জার্মানীর সহিত একটি পৃথক সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন।

দুইশত পৃষ্ঠা সম্বলিত ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় লিখিত ভার্সাই সন্ধিতে ৪৩৯টি ধারা ও ১৫টি অধ্যায় সন্নিবিষ্ট ছিল। জার্মানী-সংক্রান্ত শর্তাদি ছাড়াও ইহাতে লীগ্-অফ-নেশনস্, আন্তর্জাতিক শ্রমিক দপ্তর ও একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপনের শর্তগুলিও সন্নিবিষ্ট ছিল।

৮.৮. **ভার্সাই সন্ধির প্রধান শর্তাদি** (Main provisions of the Versailles Treaty): কয়েকটি ভাগে ভার্সাই সন্ধির শর্তাদি আলোচিত হইতে পারে:—

(১) **রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন সম্পর্কিত শর্তাদি** (Territorial arrangements): আলসাস্ ও লোরেন ফ্রান্সকে প্রত্যার্পিত হইল; বেলজিয়াম ও ল্যাক্সেমবুর্গের নিরপেক্ষতার অবসান ঘোষিত হইল এবং উহাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লীগ্-অফ-নেশনস্ কর্তৃক পুনর্বিবেচিত হইবার কথাও ঘোষিত হইল; জার্মানী কর্তৃক আক্রমণের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বেলজিয়ামকে

জার্মানী সম্পর্কে নীতি

*Vide—Langsam—p. 20

[ইউ]রেস্নেট, ইউপেন ও মেসেডি প্রদান করা হইল ; ফ্রান্সের খনিজ অঞ্চলের ধ্বংস [স]াধনের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ জার্মানীর সার অঞ্চল ফ্রান্সকে দেওয়া হইল। সার [উ]পত্যকাকে পনেরো বৎসরের জন্য এক আন্তর্জাতিক পরিষদের অধীনে রাখা হইল [এ]বং ইহাও স্থির হইল যে এই পনেরো বৎসরকাল ফ্রান্স সার-এর কয়লাখনির উপর [ক]র্তৃত্ব করিবে এবং এই মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে সার উপত্যকার অধিবাসীগণ গণভোটের [ম]াধ্যমে উহাদের ভবিষ্যৎ স্থির করিবে। (১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গণভোটের মাধ্যমে সার [উ]পত্যকার অধিবাসীগণ জার্মানীর সহিত সংযুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে তাহা [ক]ার্যকর করা হইয়াছিল।)

গণভোটের মাধ্যমে উত্তর-স্লেশউইগ (Schleswig) ডেনমার্কের সহিত সংযুক্ত [হ]ইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে তাহা কার্যকর করা হইল। এই গণভোট সম্পর্কে [জ]ার্মানীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মন্তব্য করেন "এই গণভোটকে প্রহসন ছাড়া আর কিছুই [ব]লা যায় না···৪০,০০০ জার্মান মনোভাবাপন্ন অধিবাসীকে উহাদের ইচ্ছার [বি]রুদ্ধেই জার্মানী হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল"। দক্ষিণ-স্লেশউইগ জার্মানীর [অ]ন্তর্ভুক্ত থাকিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত [পো]সেন ও পশ্চিম-প্রাশিয়া পোল্যান্ডকে দেওয়া হইল। ইহার ফলে জার্মানীর [ভি]তর একটি 'করিডরের' (Corridor) সৃষ্টি করিয়া জার্মানীকে দ্বিখণ্ডিত করা [হ]ইল। জার্মান-অধ্যুষিত ডানজিগকে 'উন্মুক্ত শহর' বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং [ই]হার শাসনভার লীগ্-অফ নেশনস্-এর হস্তে অর্পিত হইল। মেমেল শহরটি [প্র]থমে মিত্রপক্ষকে এবং পরে লিথুয়ানিয়াকে প্রদান করা হইল। খনিজ প্রধান উচ্চ-[স]াইলেশিয়াকে গণভোটের মাধ্যমে পোল্যাণ্ড বা জার্মানীর সহিত সংযুক্ত হইবার [অ]ধিকার দেওয়া হইল।*

লীগ্-অফ-নেশনস্-এর সর্বসম্মতি ব্যতীত অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর সংযুক্তি [স]াধন করা হইবে না বলিয়া স্থির হইল। জার্মানীকে উহার সকল উপনিবেশ ত্যাগ করিতে হইল। মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রবর্গের রক্ষণাধীনে জার্মানীর উপনিবেশগুলিকে রাখিবার ব্যবস্থা হইল। এইগুলি 'অছি-রাষ্ট্র' (mandatories) রূপে অভিহিত [হ]ইল। 'অছি-রাষ্ট্র'-গুলির সংগঠন ও উহাদের শাসনব্যবস্থার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব [ল]ীগ্-অফ-নেশনস্-এর উপর অর্পিত হইল। ব্রিটেনের শাসনাধীনে টগোল্যাণ্ড ও [ট]াঙ্গানিকাকে (জার্মান ইস্ট আফ্রিকা) রাখা হইল ; জার্মান-দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার [শ]াসনভার দক্ষিণ-আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্রকে দেওয়া হইল ; জার্মান-সামোয়ান [দ্ব]ীপপুঞ্জের ভার নিউজিল্যাণ্ডকে দেওয়া হইল। মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের শাসনভার [জ]াপানকে দেওয়া হইল ; জার্মান-নিউগিয়ানার শাসনভার অস্ট্রেলিয়াকে দেওয়া [হ]ইল ; বেলজিয়ামের অধীনে টাঙ্গানিকার কিয়দংশ রাখা হইল এবং ফ্রান্সের অধীনে [ক]্যামারুনের কিয়দংশ রাখা হইল। জার্মানীর সুদূর-প্রাচ্যের উপনিবেশগুলির

[জা]র্মানীর ঔপনিবেশিক [স]াম্রাজ্যের অবসান

---

* ১৯২১ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত গণভোটের মাধ্যমে স্লেশউইগের অধিবাসী জার্মানীর সহিত সংযুক্ত [হ]ইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু লীগ কাউন্সিল ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া উচ্চ-সাইলেশিয়া [প]োল্যাণ্ডকে প্রদান করিয়াছিল।

প্রশ্ন লইয়া মিত্রপক্ষকে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। জাপান পূর্ব-সম্পাদিত গোপন-চুক্তি অনুসারে চীনের অন্তর্গত জার্মানীর কিয়াওচাও ও সাণ্টুং উপনিবেশ দুইটি দাবি করিল। কিন্তু চীনা-প্রতিনিধিগণও উক্ত অঞ্চল দুইটি প্রত্যর্পণের দাবি করিলেন। মিত্রপক্ষ চীনের দাবি উপেক্ষা করিয়া কিয়াওচাও ও সাণ্টুং জাপানকে অর্পণ করিল।

এইভাবে প্রায় ২৫000 স্কোয়ার মাইল অঞ্চল জার্মানীকে পরিত্যাগ করিতে হইল এবং প্রায় ২,000,000 জার্মান নাগরিককে স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল। এতদ্ভিন্ন জার্মানীর সকল উপনিবেশ মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রবর্গের রক্ষণাধীনে রাখা হইল।

(২) **অর্থনৈতিক শর্তাদি** (Economic Provisions): ভার্সাই সন্ধির প্রধান লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক দিক দিয়া জার্মানীকে দুর্বল করিয়া রাখা। সন্ধির অর্থনৈতিক শর্তগুলি মিত্রপক্ষের মধ্যে মতানৈক্য ও সংকটের সৃষ্টি করিয়াছিল। জার্মানী কি পরিমাণে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে তাহা সন্ধিপত্রের ২৩১ ধারায় বর্ণিত ছিল। ইহাতে বলা হইয়াছিল যে "জার্মানী ও উহার মিত্ররাষ্ট্রবর্গের আক্রমণের ফলে মিত্রপক্ষভুক্ত সরকারগুলি ও উহাদের নাগরিকদের যে ক্ষতি হইয়াছিল জার্মানী তাহা পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবে"। জার্মানীর বৃহদাকার বাণিজ্যপোতগুলি ফ্রান্সকে এবং যুদ্ধজাহাজগুলি ইংল্যাণ্ডকে দেওয়া হইল; জার্মানী নিজ ব্যয়ে জাহাজ নির্মাণ করিয়া ঘাটতি পূরণের জন্য বাধ্য রহিল; জার্মানী শ্যাম, লাইবেরিয়া, মরক্কো, মিশর, তুরস্ক ও বুলগেরিয়া প্রভৃতি স্থানের সকল সম্পত্তি ও 'বিশেষ অধিকার' পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল; জার্মানীর বাহিরে জার্মান নাগরিকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার মিত্রপক্ষের রহিল; দশ বৎসরের জন্য ফ্রান্স, ইটালী ও বেলজিয়ামকে প্রচুর পরিমাণে কয়লা সরবরাহ করিতে জার্মানী বাধ্য রহিল; মিত্রপক্ষকে ৫000 রেলওয়ে ইঞ্জিন ও ১,৫0,000 মোটরগাড়ী প্রদান করিতে জার্মানী বাধ্য রহিল; পাঁচ বৎসরের জন্য জার্মানীর আমদানি ও রপ্তানির ব্যাপারে মিত্রপক্ষের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা রহিল; জার্মানীর এলবা ও ওডার নদীগুলি আন্তর্জাতিক শাসনাধীনে রাখা হইল; এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল সুইজারল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশগুলিকে সমুদ্রে যাইবার সুযোগ দেওয়া; কিয়েল-খালকে (Keil Canal) আন্তর্জাতিক শাসনাধীনে রাখিয়া উহা সকল দেশের বাণিজ্যপোতগুলির নিকট উন্মুক্ত রাখা হইল।

ক্ষতিপূরণ প্রদানের সমস্যা ছিল অত্যন্ত জটিল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে জার্মানী কি পরিমাণ অর্থ মিত্রপক্ষকে প্রদান করিবে তাহা স্থির করা সম্ভব হয় নাই। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ দাবি করেন। মোট দাবি ১৫ শত কোটি ডলার হইতে ২০ শত কোটি ডলারে দাঁড়াইল। কিন্তু ক্ষতিপূরণের সঠিক অংক স্থির করা অসম্ভব হইয়া পড়ায় যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী ও জাপানের প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটি ক্ষতিপূরণ কমিশন (Reparation Commission) নিয়োগ করা হইল।

ক্ষতিপূরণ প্রদানের সমস্যা

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে-র মধ্যে এই কমিশন জার্মানীর দেয় অর্থের পরিমাণ স্থির করিবেন এইরূপ হইল। যুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রবর্গের বে-সামরিক অধিবাসীদের ক্ষতি, মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের সামরিক ভাতা দান বেলজিয়ামের যুদ্ধ-ঋণ প্রভৃতি সকল বিষয় কমিশনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

(৩) **সামরিক শর্তাদি** (Military Provisions) : জার্মানীকে সামরিক শক্তির দিক দিয়াও পঙ্গু করিয়া রাখার ব্যবস্থা হইল। (১) জার্মানীতে বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহের রীতি বন্ধ করা হইল। বারো বৎসরের জন্য জার্মানীকে এক লক্ষ স্বেচ্ছাবাহিনী রাখিবার অধিকার দেওয়া হইল এবং তাহাও কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার কার্যে ব্যবহার করিতে হইবে বলা হইল। (২) রাইন নদীর পূর্বতীর হইতে জার্মান সৈন্য অপসারিত হইল; উহার কামান ও যুদ্ধজাহাজের আকার ক্ষুদ্রতর করা হইল; হ্যালিগোল্যাণ্ডের দুর্গগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল, (৩) জার্মানীর নৌবহরের সংখ্যা হ্রাস করিয়া দেওয়া হইল, (৪) জার্মানীর পক্ষে সামরিক বিমানবহর রাখা নিষিদ্ধ হইল এবং (৫) জার্মানীকে এই সকল শর্তাদি পালন করিতে বাধ্য করার জন্য রাইন নদীর বাম তীরবর্তী অঞ্চল পনেরো বৎসরের জন্য মিত্রশক্তির অধীনে রাখা হইল।

(৪) **আইন-সংক্রান্ত শর্তাদি** (Legal Provisions) : সন্ধির ২১৩ ধারায় জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা ছিল। "সন্ধির শর্তাদি ও আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি উল্লঙ্ঘন করার অপরাধে" কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামকে প্রধান পরাধী হিসাবে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু হল্যাণ্ড পলাতক কাইজারকে মিত্রপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিতে অসম্মত হইলে তাঁহার বিচার করা সম্ভব হইল না। যুদ্ধের আইনকানুন ভঙ্গের জন্য সামরিক বিচারালয়ে একশত জার্মানকে অভিযুক্ত করা হইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাত্র বারোজনকে জার্মানীর বিচারালয়ে বিচার ব্যবস্থা হইল।

(৫) **রাজনৈতিক শর্তাদি** (Political Provisions) : (১) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান লীগ্-অফ-নেশনস্-এর শর্তাদিও ভার্সাই সন্ধির অন্তর্ভুক্ত করা হইল। (২) জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পাদিত ব্রেস্ট-লিটভস্ক-এর সন্ধি ও অপরাপর সন্ধি বাতিল করা হইল; (৩) জার্মানীকে নিজ পূর্ব সীমান্তে সৈন্য সরাইয়া আনিতে হইল এবং (৪) বেলজিয়াম, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল।

ভার্সাই সন্ধির সমালোচনা (Criticism of the Versailles Treaty) : ভার্সাই সন্ধি আধুনিক কালের এক গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কমূলক দলিল। জার্মান-জাতি ইহাকে "Dictated Peace" বা বিজিতের উপর বিজেতার জবরদস্তিমূলক শান্তি-চুক্তি, জার্মানীর সর্বস্বাপহরণের চুক্তি ও একটি "বিরাট অপহরণ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। ভার্সাই সন্ধি সম্বন্ধে জার্মান জাতির এইরূপ অভিমত একেবারে উপেক্ষা করা যায় না।

নিম্নলিখিতভাবে ভার্সাই সন্ধির সাধারণ সমালোচনা করা যাইতে পারে—

প্রথমতঃ, ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানীর বিরুদ্ধে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের ও ইওরোপীয় জনগণের তীব্র অসন্তোষ ও ঘৃণার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। পরাজিত শত্রুর প্রতি শান্তি-সম্মেলনের নেতৃবর্গ পূর্ব হইতেই এরূপ বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন যে শত্রুর পতনের পর উহার প্রতি সততা, অনুকম্পা বা উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করার প্রয়োজন তাঁহারা অনুভব করেন নাই। শত্রুর প্রতি এইরূপ বিরুদ্ধ মনোভাব লইয়া সন্ধিপত্র রচনা করিতে যাইয়া ইওরোপীয় প্রতিনিধিগণ দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নাই।

ইওরোপীয় নেতৃবর্গের দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব

দ্বিতীয়তঃ, জার্মানীর প্রতি ইওরোপীয় শক্তিবর্গের প্রতিহিংসাত্মক ও অপমানজনক ব্যবহারের ফলে মানসিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়া ভার্সাই সন্ধি শান্তির প্রতিকূল ছিল। দুইটি প্রধান নীতি অবলম্বনে ভার্সাই সন্ধি রচিত হইয়াছিল— (১) যুদ্ধ-সৃষ্টির অপরাধে জার্মানীকে সমুচিত শাস্তি দেওয়া এবং (২) জার্মানীর ভবিষ্যৎ আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ হইতে ইওরোপের নিরাপত্তার বিধান করা। সন্ধির খসড়া প্রস্তুতির সময় জার্মান প্রতিনিধিদের সহিত কোনরূপ পরামর্শ করা হয় নাই। এমন কি সন্ধির খসড়ার উপর জার্মান প্রতিনিধিগণকে তাঁহাদের লিখিত মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু জার্মান প্রতিনিধিদের মতামতের কোন মূল্য দেওয়া হয় নাই এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সন্ধির শর্তাদি গ্রহণের জন্য তাঁহাদের প্রতি আদেশ করা হইয়াছিল। এককথায় যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা জার্মান প্রতিনিধিগণকে এই সন্ধি গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন জার্মান প্রতিনিধিগণকে সামান্য অপরাধীর ন্যায় প্রহরাধীনে শান্তি-সম্মেলনের অধিবেশন কক্ষে লইয়া যাওয়া এবং সেই অবস্থায় অধিবেশনে শেষে বাহিরে লইয়া আসা, এইরূপ অপমানজনক ব্যবহার করিয়া অযথা জার্মানজাতির প্রতি ঘৃণা ও অসম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছিল। একথা অস্বীকার করা যায় না যে মিত্রপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল নিতান্ত অনুদার এবং প্রতিশোধাত্মক মনোভাবই ছিল তাঁহাদের সর্বাধিক প্রবল। জার্মান প্রতিনিধিগণ এইরূপ প্রতিহিংসামূলক মনোবৃত্তি লক্ষ্য করিয়াই মন্তব্য করিয়াছিলেন, "আমরা জানি আমাদের প্রতি কি পরিমাণে ঘৃণা বর্ষণ করা হইতেছে।" এই সন্ধি-প্রসঙ্গে লয়েড জর্জের মন্তব্যের মধ্যেও এইরূপ মনোভাবের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন, "যুদ্ধে নিহত বীরদের রক্তে এই সন্ধির শর্তসমূহ লিখিত হইয়াছে—আমরা বিধাতার অনুশাসন অবশ্যই পালন করিব এবং দেখিব যে জাতি এই যুদ্ধের জন্য দায়ী তাহারা যেন ভবিষ্যতে এইরূপ কার্যে পুনরায় লিপ্ত হইতে না পারে—জার্মানগণ বলেন তাঁহারা এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিবেন না, তাঁহাদের সংবাদপত্রগুলি বলে তাহারাও সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবে না; তাঁহাদের রাষ্ট্রবিদ্‌গণও তাই বলেন। কিন্তু আমরা বলিব, মহাশয়! আপনারা নিশ্চয় স্বাক্ষর করিবেন, যদি ভার্সাইতে স্বাক্ষর না করেন তবে বার্লিনে তাহা

জার্মানীর প্রতি অপমানজনক ব্যবহার

করিতে হইবে"।* সন্ধির রচয়িতাগণ শত্রুর মানসিক প্রতিক্রিয়ার দিকটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। শান্তি-চুক্তি অযথা কঠোর হইলে পরাজিত শত্রুর শ্রদ্ধা বা কৃতজ্ঞতা অর্জন করা যায় না। জার্মানীর প্রতি বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের কঠোরতার ও প্রতিহিংসার পরিমাণ কিঞ্চিৎ কম হইলে জার্মানী উহার পরিবর্তিত অবস্থা হয়ত সহজেই স্বীকার করিয়া লইত। ঐতিহাসিক লিপ্সনের ভাষায় "It is possible that if the victorious powers had shown less severity in their resentment of Germany, she might have reconciled herself more readily to her altered status"। সুতরাং জার্মানজাতির প্রতি প্রতিশোধাত্মক মনোভাব ও অযথা অপমানজনক ব্যবহার জার্মানজাতির মনে এক দারুণ ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানজাতির এই মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। হাউস-অফ-লর্ডস-এ (House of Lords) ভার্সাই সন্ধির সমালোচনা প্রসঙ্গে লর্ড ব্রাইস যথার্থই মন্তব্য করিয়াছিলেন, "Peace can come only with content. If the result of these treaties is to make nations discontented, you are preparing for revolts and war."

জার্মানীর মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রতি উপেক্ষা

তৃতীয়তঃ, ভার্সাই সন্ধির অর্থনৈতিক ও ঔপনিবেশিক শর্তগুলি ছিল অনুদার ও অন্যায়মূলকভাবে জার্মানীকে অর্থনৈতিক দিক দিয়া পঙ্গু করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে উহার উপনিবেশগুলি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল, উহার শিল্প-প্রধান ও খনিজ-প্রধান অঞ্চলগুলিও কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। ইহা ছাড়া, জার্মানীর স্কন্ধে এক বিশাল পরিমাণ ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অথচ জার্মানী কিভাবে এই বিশাল ক্ষতিপূরণের অংক পরিশোধ করিবে তাহার কোন ব্যবস্থা সন্ধিপত্রে উল্লিখিত ছিল না। সন্ধির অর্থনৈতিক শর্তগুলিকে উইনস্টন-চার্চিল "এক বিরাট অর্থহীন ও অবাস্তব"† বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। জার্মানীর দেয় ক্ষতিপূরণ জার্মানী ও মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রবর্গের আর্থিক সংকটের সৃষ্টি করিয়াছিল। চার্চিল-এর ভাষায় "History will characterise all these transaction as insane. They helped to breed the martial curse and the economic blizzard"।

অর্থনৈতিক ও ঔপনিবেশিক শর্তাদির অবিচার

* "These terms are written in the blood of fallen heroes. We must carry out the edict of Providence and see that the people who inflicted this (war) shall never be in a position to do so again, The Germans say they will not sign. Their newspapers say they will not sign. Their politicians say the same. We say, gentlemen, you must sign. If you do not do so in Versailles you shall do so in Berlin."—(Lloyd George)

† "The economic clauses were malignant and silly to an extent that made them obviously futile."—Cherchill.

ভার্সাই সন্ধির ঔপনিবেশিক শর্তগুলিও ছিল অনুদার ও অবিচারমূলক। জার্মানীর উপনিবেশগুলি লীগ্-অফ-নেশনস্-এর পরিদর্শনাধীনে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের শাসনাধীনে স্থাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে মিত্রপক্ষের উপনিবেশগুলিও অছি-শাসনাধীনে স্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত হইত। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। উপরন্তু যে সকল রাষ্ট্রের উপর জার্মানীর উপনিবেশগুলির শাসনভার অর্পিত হইয়াছিল তাহারা কোনক্ষেত্রেই জার্মানী অপেক্ষা উন্নততর শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে পারে নাই।

চতুর্থতঃ, জাতীয়তাবাদ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এই দুইটি নীতির ভিত্তির উপর ইওরোপের পুনর্গঠন করা হইয়াছিল। অর্থাৎ একই জাতি এবং একই কৃষ্টি-সম্বলিত জনগণকে পৃথক এবং স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকার দেওয়ার নীতি গৃহীত হইয়াছিল এই নীতির প্রয়োগ দ্বারাই বিভিন্ন জাতি ও ভাষাগোষ্ঠী সমন্বয়ে গঠিত অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হইয়াছিল—যেমন, যুগোশ্লাভিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া। পোল-অধিবাসীগণকে একত্রিত করিয়া পোল্যাণ্ডের পুনর্গঠন করা হইয়াছিল। কিন্তু এই দুইটি নীতি সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই। পোসেন ও পশ্চিম-প্রাশিয়ার অগণিত জার্মান অধিবাসীগণকে পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়; বোহেমিয়াতে শ্লাভদের অধীনে বহু জার্মান রহিয়া যায় এবং ডালমাশিয়াতেও বহু শ্লাভ ইটালীর অধীনে থাকিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে জার্মানজাতির বহু লোককে পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়া এবং দক্ষিণ-টাইরল ইটালীর সহিত সংযুক্ত করিয়া ভার্সাই সন্ধি সংখ্যালঘু সমস্যার (minority problem) সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সংখ্যালঘু সমস্যা পরবর্তী কালে বহু অশান্তির কারণ হইয়াছিল। অপরদিকে মিত্রপক্ষ জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার স্বেচ্ছামূলক সংযুক্তির বিরোধিতা করিয়া জার্মানীর প্রতি নিদারুণ অবিচার করিয়াছিল।

জাতীয়তাবাদ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতির প্রয়োগে পক্ষপাতিত্ব

পঞ্চমতঃ, ভার্সাই সন্ধিতে স্বাক্ষরকারী সকল রাষ্ট্রই যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ও যুদ্ধাস্ত্র হ্রাস করার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। লীগ্-অফ-নেশনস্-এর চুক্তিপত্র অনুসারে স্বাক্ষরকারী সকল রাষ্ট্র নিজ নিজ রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সামরিক শক্তি ভিন্ন সকল প্রকারের উদ্বৃত্ত যুদ্ধাস্ত্র হ্রাস করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই নীতি উপেক্ষিত হইয়াছিল। স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ নিজ নিজ রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি অপরিবর্তিত রাখিয়া জার্মানীর উপরই এই নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করিয়াছিল। জার্মানীর সামরিক শক্তি হ্রাস করা হইয়াছিল এবং উহার নৌ-শক্তিও ধ্বংস করা হইয়াছিল। জার্মানীর ন্যায় এক উন্নত ও শক্তিশালী রাষ্ট্রকে পঙ্গু করিয়া বেলজিয়ামের ন্যায় এক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে জার্মানী অপেক্ষা অধিকতর

সামরিক শক্তি হ্রাসনীতি উপেক্ষিত

শক্তিশালী করিয়া তোলা হইয়াছিল। এই কারণে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী কর্তৃক ভার্সাই সন্ধির সামরিক শর্তাদির উল্লঙ্ঘন খুবই স্বাভাবিক হইয়াছিল।

তিনটি পরস্পর-বিরোধী আদর্শের সংঘাত

ষষ্ঠতঃ, ভার্সাই সন্ধির মধ্যে তিনটি পরস্পর-বিরোধী আদর্শের সংঘাত লক্ষ্য করা যায়, যথা—উইলসনের আদর্শবাদ, ক্লিমেনশোর জাতীয়তাবাদ ও লয়েড জর্জের সুবিধাবাদ। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বার্থসংঘাত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে বিশ্বনেতৃত্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মিত্র রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর গোপন চুক্তিসমূহ গণতান্ত্রিক ও আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির পরিপন্থী হইয়া উঠিয়াছিল।

মিত্রপক্ষের প্রতিশ্রুতি অবহেলিত

সপ্তমতঃ, অনেকের মতে ভার্সাই সন্ধির মধ্যে মিত্রপক্ষের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ জার্মানীকে যে সকল প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহা প্রতিপালিত হয় নাই এবং উইলসনের 'চৌদ্দ-দফা' নীতির পূর্ণ অবলম্বনেও সন্ধিপত্র রচিত হয় নাই। ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে জার্মানীর ইহাই ছিল প্রধান অভিযোগ। সমুদ্রের উপর সকল দেশের জাহাজগুলির অবাধ চলাচলের নীতি সর্বত্র সমভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই। ইওরোপে অবাধ বাণিজ্য-নীতি প্রয়োগ করার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে শুল্ক প্রাচীরের সৃষ্টি করিয়া এই নীতির বিরোধিতা করা হইয়াছিল।

ভার্সাই সন্ধিতে নৈতিকতা ও বাস্তবতার ত্রুটি

অষ্টমতঃ, নৈতিকতা ও বাস্তবতার দিক দিয়াও ভার্সাই সন্ধির ত্রুটি অস্বীকার করা যায় না। ঐতিহাসিক রাইকার (Riker)-এর মতে "The moral defects of the treaty are no more glaring than the practical"। ন্যায়-নীতির ভিত্তির উপর ভার্সাই সন্ধির শর্তাদি রচিত হয় নাই। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে জার্মানীর উপর যে সকল দাবি চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা পূরণ করা জার্মানীর পক্ষে কোনমতেই সম্ভব ছিল না। জার্মানীর সামরিক শক্তি খর্ব করিয়া উহাকে শত্রুর সম্মুখে হীনবল করিয়া রাখা হইয়াছিল। জার্মানীর উপনিবেশগুলি এবং বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। জার্মানী বিজয়ী শক্তিবর্গকে বিবিধ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানে বাধ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহাকে কোন দিক দিয়াই সেই সুযোগ-সুবিধার প্রতিদান দেওয়ার মনোবৃত্তি বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের ছিল না।

(১) ন্যায়নীতির অভাব

জার্মান উপনিবেশগুলিকে অছি-রাষ্ট্রের শাসনাধীনে রাখা হইয়াছিল। নীতির দিক দিয়া এই ব্যবস্থাও সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ অছি-রাষ্ট্রগুলি পূর্ববৎ স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্র অপ্রতিহতভাবেই উপনিবেশগুলিতে বহাল রাখিয়াছিল।

যে সকল রাষ্ট্রের উপর জার্মানীর উপনিবেশগুলির শাসনভার অর্পিত হইয়াছিল উহারা কোন ক্ষেত্রেই জার্মানী অপেক্ষা উন্নততর শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে পারে নাই। জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার ব্যাপারে জাতীয়তা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই। এতদ্ভিন্ন সামরিক শক্তি হ্রাসের নীতি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলেও তাহা কার্যকর করিতে কেহই যত্নবান ছিল না। সুতরাং এই সম্পর্কে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জার্মানীর 'অসাধুতা'র অভিযোগ মিথ্যা নহে।

নীতিগত ত্রুটি ছাড়াও ভার্সাই সন্ধিতে বাস্তব ত্রুটিও যথেষ্ট ছিল। ইহা প্রত্যাশা করা যুক্তিসঙ্গত নহে যে জার্মানীর ন্যায় একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রকে দীর্ঘকাল দুর্বল করিয়া রাখা সম্ভবপর। জার্মানীর ন্যায় রাষ্ট্রের পক্ষে প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বেলজিয়াম অপেক্ষা সামরিক শক্তিতে হীন হইয়া থাকাও সম্ভব ছিল না। পোল্যাণ্ডকে জার্মানীর একাংশ দান করা এবং জার্মানীর ভিতর দিয়া পোলিশ 'করিডর' সৃষ্টি করিয়া জার্মানীকে দ্বিখণ্ডিত করা, সার খনিজ অঞ্চলের উপর ফ্রান্সের কর্তৃত্ব স্থাপন করা প্রভৃতি ব্যবস্থার দ্বারা জার্মানীর জাতীয় মর্যাদা যেভাবে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছিল তাহা জার্মানগণ কোনমতেই বরদাস্ত করিতে রাজী ছিল না। সুতরাং ভবিষ্যতের বহু অশান্তির কারণ এই সন্ধিতে নিহিত ছিল।

(২) সন্ধির বাস্তব ত্রুটি

৮.৯. **ভার্সাই সন্ধির সমর্থনে যুক্তি** (Arguments in favour of the Versailles Treaty): প্যারিস শান্তি-সম্মেলনের নেতৃবর্গের সমর্থনে একথা বলা চলে যে তাঁহারা যে এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং নিজেদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখিতেও ব্যস্ত ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

প্রথমতঃ, যুদ্ধ চলিতে থাকাকালীন উইলসন শান্তিস্থাপনের যে পরিকল্পনা ও বিবৃতি ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা যথাযথভাবে কার্যে পরিণত করার পক্ষে অসুবিধা ছিল বটে, কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে তাঁহার 'চৌদ্দ-দফা' নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই ভার্সাই সন্ধি রচিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ, একথা অস্বীকার করা যায় না যে জার্মানীর প্রতি মিত্রপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল নিতান্ত অনুদার এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রতিশোধাত্মক মনোভাব ছিল সর্বাধিক প্রবল। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহা স্মরণে রাখা দরকার যে সন্ধির শর্তাদি রচিত হইবার সময় জার্মানীর বিরুদ্ধে ইওরোপের জনগণের মনে এক প্রবল প্রতিশোধাত্মক মনোভাব বিরাজ করিতেছিল, যেমন হইয়াছিল ভিয়েনা সন্ধি রচনাকালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইওরোপের জনগণের মনের অবস্থা। পরাজিত শত্রুর প্রতি অনুকম্পা বা উপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শনের প্রয়োজন উপলব্ধি করার মত রাজনৈতিক বিবেচনা নেতৃবর্গের ছিল না।

তৃতীয়তঃ, ব্রেস্ট-লিটভস্ক-এর সন্ধি (Treaty of Brest-Litovsk) দ্বারা

রাশিয়ার প্রতি জার্মানী যেরূপ প্রতিশোধাত্মক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিল উইলসন ও মিত্রপক্ষ তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই এবং তাঁহারা ইহাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে জার্মানী জয়লাভ করিলে মিত্রশক্তির প্রতি জার্মানী অনুরূপ আচরণ করিত।

চতুর্থতঃ, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সম্পর্কে ভার্সাই সন্ধির সমর্থনে ইহা বলা যায় যে উইলসনের 'চৌদ্দ-দফা'-নীতি ঘোষিত হইবার পর যুদ্ধের পরিস্থিতি এরূপভাবে পরিবর্তিত হইতে থাকে যে উইলসন স্বয়ং তাঁহার অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সম্পর্কিত নীতি পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন। অস্ট্রিয়া বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। সুতরাং জার্মানী কর্তৃক গৃহীত 'আত্মসমর্পণের শর্তাদি অস্ট্রিয়া সম্পর্কে প্রযুক্ত করা যাইত না। ইহা ছাড়া লণ্ডনের সন্ধি (১৯১৫ খ্রীঃ) অনুসারে ইটালী মিত্রপক্ষে যোগদান করায় অস্ট্রিয়া সম্পর্কিত উইলসনের নীতির কিছু পরিবর্তন করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল।

পঞ্চমতঃ, সাধারণভাবেই বিশ্বশান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে উইলসনের 'চৌদ্দ-দফা' নীতি ও অন্যান্য প্রস্তাবগুলি ঘোষণা করা হইয়াছিল। কিন্তু বিশ্বের সকল দেশ ও জাতিবর্গের সম্মতি ও অনুমোদন ভিন্ন শান্তি সম্পর্কিত ঘোষিত প্রস্তাবগুলি কার্যে পরিণত করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং শান্তি শর্তাদির আলোচনাকালে সেইগুলির কিছু পরিবর্তন হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল।

ষষ্ঠতঃ, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও জাতীয়তাবাদ নীতি উপেক্ষা করিয়া যে সকল অঞ্চল মিত্রপক্ষের হস্তে হস্তান্তরিত করা হইয়াছিল (যেমন বেলজিয়ামের হস্তে মেলমেডি ও ময়েসনেটের সমর্পণ)—সেই সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের মতামত অনুসারে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার কথাও সন্ধিতে উল্লিখিত ছিল। সার-সম্পর্কিত সাময়িক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা। পনের বৎসর পর গণভোটের মাধ্যমে সার অঞ্চলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। জার্মানীকে সন্ধির শর্তাদি পালনে বাধ্য করার জন্যই রাইন অঞ্চলে মিত্রশক্তির প্রাধান্য স্থাপন করা হইয়াছিল।

সপ্তমতঃ, জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে বিধিব্যবস্থা জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির বিরোধী হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা দরকার যে, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মিত্রপক্ষ ইটালীয়, শ্লাভ, চেকোশ্লোভাক প্রভৃতি জাতিগুলিকে বৈদেশিক শাসনাধীন হইতে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। উপরন্তু স্থায়ী শান্তির জন্য জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সংযুক্তিকরণ কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না।

অষ্টমতঃ, ভার্সাই সন্ধির শর্তাদির অধিকাংশই ছিল সাময়িক শর্ত। এই সন্ধির ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য লীগ্-অফ-নেশনস্ নামে আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সন্ধির শর্তাদি কার্যকর করার সময় সেগুলির কঠোরতা বহুল পরিমাণে হ্রাস করা হইয়াছিল।

ভার্সাই সন্ধির সমর্থনে লিপ্সন মন্তব্য করিয়াছেন, "Taken as a whole, it could scarcely be denied that the map of the new Europe was based on a sense of justice in a greater degree than that of the old Europe"।

লিপ্সনের মন্তব্য

৮.১০. ভার্সাই সন্ধি কি জবরদস্তিমূলক শান্তি? (A Dictated Peace?): জার্মানজাতি, এমন কি ইওরোপের আরও বহু জাতি ভার্সাই সন্ধিকে বিজিতের উপর বিজেতার জবরদস্তিমূলকভাবে চাপান শান্তি-চুক্তি, জার্মানীর সর্বস্বাপহরণের চুক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। জার্মানীর এই অভিযোগ নিম্নলিখিতভাবে আলোচিত হইতে পারে—

প্রথমতঃ, 'ন্যায়-সন্ধি' ('Just Treaty') ও 'অন্যায়-সন্ধি' (Unjust Treaty)-র মধ্যে যথার্থ পার্থক্য বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় না। একটি বিরাট সংঘর্ষ বা যুদ্ধের শেষে ন্যায়-সন্ধির শর্তাদি রচনা করা সম্ভব হয় না। কারণ পরাজিত শত্রু কি পরিমাণে ক্ষতিপূরণ বিজয়ী পক্ষকে প্রদান করিবে, প্রাণনাশের জন্য পরাজিত শত্রুকে কতখানি দায়ী করা যাইতে পারে এই সকল প্রশ্নের সমাধান ন্যায়ের ভিত্তির উপর করা সম্ভব নহে। প্রকৃতপক্ষে সন্ধির যথার্থ সংজ্ঞা নিরূপণ করা বা তাহা রচনা করা যে কোনটির পক্ষে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করা কোনমতেই সম্ভব নহে।

দ্বিতীয়তঃ, জার্মানজাতি অভিযোগ করিয়াছিল যে প্যারিস-সম্মেলনে উহাদের প্রতি বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের প্রতিশোধাত্মক মনোভাব ও অসৌজন্যমূলক আচরণ প্রদর্শিত হইয়াছিল। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে আঞ্চলিক যুদ্ধবিগ্রহও ঘৃণা, বিদ্বেষ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে বিশ্বযুদ্ধ-প্রসূত ঘৃণা, বিদ্বেষ ও উত্তেজনার পরিমাণ সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ভার্সাই সন্ধির রচনাকালে সর্বত্র জার্মানীর বিরুদ্ধে যে বিরাট প্রতিশোধাত্মক মনোভাব বিরাজ করিতেছিল তাহাকে উপেক্ষা করা প্যারিস-সম্মেলনের নেতৃবৃন্দের পক্ষে যেমন সম্ভব ছিল না তেমনি সন্ধির রচয়িতাগণের পক্ষে নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। সেইরূপ পরিস্থিতিতে ন্যায়-সন্ধি রচনা করাও সম্ভব ছিল না।

তৃতীয়তঃ, পরাজিত শত্রুর নিকট সকল শান্তি-চুক্তি অন্যায় ও নিষ্ঠুর বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। পরাজিত শত্রু কর্তৃক শান্তি-চুক্তি সানন্দে গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নাই। কোন দেশই যুদ্ধ-পরাজয়ের জন্য কখনও নিজেকে দায়ী সাব্যস্ত করে না অথবা বিজয়ীপক্ষকে 'ন্যায়-সন্ধি'-র জন্য অভিনন্দিত করে না।

চতুর্থতঃ, ইওরোপীয় নেতৃবর্গের প্রতিশোধাত্মক মনোভাবের বিরুদ্ধে জার্মানী অভিযোগ করিয়াছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে ব্রেস্ট-লিটভস্ক সন্ধির দ্বারা জার্মানী রাশিয়ার প্রতি যেরূপ প্রতিশোধাত্মক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিল তাহা ভার্সাই

সন্ধির রচয়িতাগণ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই এবং তাঁহারা ইহাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে জার্মানী জয়লাভ করিলে মিত্রশক্তিবর্গের প্রতি জার্মানীও অনুরূপ আচরণ করিত। রাশিয়া ও রুমানিয়ার সহিত সম্পাদিত যথাক্রমে ব্রেস্ট-লিটভস্ক ও বুখারেস্টের সন্ধির মধ্যে জার্মানীর প্রতিশোধাত্মক মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সার চার্লস পেট্রি (Sir Charles Petrie)-র ভাষায় "The mind of the rulers of Germany was too clearly revealed by these treaties to permit of any illusion"। সুতরাং এই দিক দিয়া বিচার করিলে জার্মানীর প্রতি ভার্সাই সন্ধির কঠোরতার অভিযোগ খণ্ডন করা যায়।

পঞ্চমতঃ, জার্মানগণ ভার্সাই সন্ধিকে জবরদস্তিমূলকভাবে চাপান শান্তি-চুক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। জার্মানীর এই অভিযোগ আংশিকভাবে সত্য। ঐতিহাসিক কার-এর (E. H. Carr) মতে, যুদ্ধের অবসানকল্পে যে সকল সন্ধি রচিত হয় সেগুলি প্রায় প্রতিটি পরাজিত শত্রুর উপর জবরদস্তিমূলক ভাবে চাপান হইয়া থাকে, কারণ পরাজিত শত্রু কখনও স্বেচ্ছায় উহার পরাজয়ের গ্লানি গ্রহণ করে না। কিন্তু আধুনিক কালে রচিত অপরাপর সন্ধিগুলির তুলনায় ভার্সাই সন্ধিতে বিজিত শত্রুর প্রতি বিজেতার জবরদস্তিমূলক মনোভাবের তীব্রতা অধিক লক্ষ্য করা যায়।* প্যারিস-সম্মেলনে জার্মান প্রতিনিধিগণকে মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন রাখা হইয়াছিল এবং সম্মেলনের অধিবেশনকক্ষে জার্মান প্রতিনিধিদের প্রতি সাধারণ সামাজিক শিষ্টাচারও প্রদর্শিত হয় নাই।

ষষ্ঠতঃ, ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে জার্মানীর অপর প্রধান অভিযোগ ছিল এই যে, জার্মানদের সম্পর্কে উইলসনের আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির পূর্ণ প্রয়োগ করা হয় নাই এবং বহু জার্মানকে পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। ইহার উত্তরে বলা যায় যে বহু ক্ষেত্রে উইলসনীয় নীতির পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব ছিল না। কারণ একস্থানে একাধিক জাতির সংমিশ্রণ এমনভাবে হইয়াছিল যে উহাদিগকে জাতি, ভাষা বা কৃষ্টি হিসাবে যথাযথভাবে পৃথক করিয়া উহাদের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব ছিল না। এই নীতির পূর্ণ প্রয়োগ একমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে স্থানান্তরিত করিতে পারিলেই সম্ভব হইতে পারিত, কিন্তু ইহাতে সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধারই সৃষ্টি হইত। এতদ্ভিন্ন মিত্রশক্তিবর্গ পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়ার সহিত সংখ্যালঘু চুক্তিসমূহ সম্পাদন করিয়া উহাদের সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে জার্মানীর অপর অভিযোগ ছিল এই যে ইহা জার্মানী ও

---

* 'Nearly every treaty which brings a war to an end is, in one sense a dictated peace; for a defeated power seldom accepts willingly the consequences of its defeat. But in the Treaty of Versailles the element of dictation was more apparent than in any previous peace treaty of modern times'. (E. H. Carr)

অস্ট্রিয়ার স্বেচ্ছামূলক সংযুক্তির বিরোধিতা করিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির অবমাননা করিয়াছিল। মিত্রপক্ষের সপক্ষে ইহা বলা যায় যে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সংযুক্তি-করণ মিত্রপক্ষের স্বার্থের প্রতিকূল হইয়া উঠিত এবং জার্মানী অধিকতর শক্তিশালী হইয়া বিশ্বের শান্তি অচিরেই পুনরায় ব্যাহত করিতে পারিত। এই কারণেই মিত্রপক্ষ অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর সংযুক্তিকরণে বাধা দিয়াছিল।

সপ্তমতঃ, ভার্সাই সন্ধির শর্তাদি কার্যকর করার সময় সেগুলির কঠোরতা বহুলাংশে হ্রাস করা হইয়াছিল যথা, (১) জার্মানীর নিকট হইতে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয় নাই, (২) ১৫ বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই জার্মানী হইতে মিত্রপক্ষীয় সেনাবাহিনী অপসারণ করা হইয়াছিল, (৩) কাইজারের বিচার করা হয় নাই এবং জার্মান সরকার কর্তৃক গঠিত বিচারালয় কর্তৃক মাত্র কয়েকজন জার্মান সামরিক কর্মচারীকে সামান্য দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল এবং (৪) ভার্সাই সন্ধির শর্তাদির অধিকাংশই ছিল সামরিক শর্ত এবং সন্ধির যাহা কিছু ত্রুটি ছিল সেগুলি দূর করার উদ্দেশ্যে লীগ্-অফ-নেশনস্ নামক স্থায়ী আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপিত হইয়াছিল।

৮.১১. **অন্যান্য সন্ধি (Other Treaties)** ভার্সাই সন্ধির মূলনীতির অনুকরণে অপরাপর সন্ধি দ্বারা ইওরোপের রাষ্ট্রীয় পুনর্বিন্যাস করা হইয়াছিল, যথা—

(১) **সেণ্ট জার্মেইনের সন্ধি (Treaty of St. Germain, 1919)** : প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনের অধিবেশন শুরু হইবার পূর্বেই অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর যুক্ত সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটিয়াছিল। এই যুক্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইতে কয়েকটি নূতন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। প্যারিস-সম্মেলনে এই সকল রাষ্ট্রের স্বীকৃতির প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছিল। ভার্সাই সন্ধির অনুকরণে অস্ট্রিয়ার সহিত সেণ্ট জার্মেইনের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার শর্তানুসারে (১) অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর যুক্ত স্যাম্রাজ্যকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়, (২) নূতন অস্ট্রিয়া রাষ্ট্রের আয়তন সংকুচিত করা হয়, (৩) অস্ট্রিয়ার শাসনভুক্ত জার্মান, মেগিয়ার, চেক, শ্লোভাক, পোল, সার্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগুলিকে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বণ্টিত করা হয়, (৪) ট্রিয়েস্ট, ইস্ট্রিয়া, ব্রেনার-গিরিপথ ও ডালমেশিয়ার কিছু অংশ ইটালীকে দেওয়া হয়, (৫) বোসনিয়া, হারজেগোভিনা ও ডালমেশিয়ার উপকূল যুগোশ্লাভিয়াকে দেওয়া হয়, (৬) বোহেমিয়া, মোরাভিয়া, শ্লোভাকিয়া—চেকোশ্লোভাকিয়াকে দেওয়া হয়, (৭) গ্যালিশিয়া পোল্যাণ্ডকে এবং বোকোভিনা ও ট্রানসিলভানিয়া রুমানিয়াকে দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন অস্ট্রিয়ার সৈন্যসংখ্যা ৩০,০০০-এ সীমাবদ্ধ করা হয়, ভবিষ্যতে সৈন্য নিয়োগ নিষিদ্ধ হয় এবং

মিত্রপক্ষ ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে সেণ্ট জার্মেইনের সন্ধি

অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের পুনর্বণ্টন

অস্ট্রিয়ার-সামরিক শক্তি হ্রাস

যুদ্ধোপকরণ ও যুদ্ধজাহাজগুলির সংখ্যাও হ্রাস করা হয়। যুগোশ্লাভিয়ার ভিতর দিয়া আদ্রিয়াটিক সাগরে যাইবার অনুমতি অস্ট্রিয়াকে দেওয়া হয়। জার্মানীর ন্যায় অস্ট্রিয়ার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যেরও বিলুপ্তি সাধন করা হয় এবং বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা মিত্রপক্ষকে ত্যাগ করিতে অস্ট্রিয়াকে বাধ্য করা হয়। দানিউব নদীর নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কতকগুলি বিশেষ শর্ত অস্ট্রিয়াকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়।

অস্ট্রিয়ার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি

(২) **ট্রিয়াননের সন্ধি** (Treaty of Trianon, 1920) : যুদ্ধবিরতির শর্তানুসারে (৩রা নভেম্বর ১৯১৮) হাংগেরী বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। চেকোশ্লোভাকিয়া ও রুমানিয়ার আক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গণ-অভ্যুত্থানের ফলে হাংগেরীতে এক দারুণ গোলযোগের উদ্ভব হয়। এই অবস্থায় মিত্রপক্ষের সমর্থনে এ্যাডমিরাল হোর্থি (Admiral Horthy)-এর নেতৃত্বে হাংগেরীতে এক নূতন সরকার গঠিত হয়। ইহার ফলে হোর্থি সরকারের সহিত ট্রিয়াননের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার শর্তানুসারে (১) অস্ট্রিয়া হইতে হাংগেরীকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, (২) রুমানিয়াকে ট্রানসিলভানিয়া প্রদান করা হয়, (৩) যুগোশ্লাভিয়াকে ক্রোশিয়া প্রদান করা হয়, এবং চেকোশ্লোভাকিয়াকে শ্লোভাগ প্রদান করা হয়। এতদ্ভিন্ন হাংগেরীর সৈন্যসংখ্যা ৩৫,০০০-এ সীমাবদ্ধ করা হয় এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য হাংগেরীকে বাধ্য করা হয়।

হাংগেরীর সহিত ট্রিয়াননের সন্ধি

(৩) **নিউলির সন্ধি** (Treaty of Neuilly, 1919) : বুলগেরিয়ার সহিত এই সন্ধিও সম্পাদিত হয়। ইহার শর্তানুসারে (১) বুলগেরিয়ার পশ্চিমাঞ্চল যুগোশ্লাভাকিয়াকে প্রদান করা হয় যদিও এই অঞ্চলের বুলগারগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, (২) পশ্চিম-থ্রেস ও ঈজিয়ান উপকূল গ্রীসকে দেওয়া হয় যদিও ঈজিয়ান উপকূলে যাইবার সুবিধা বুলগেরিয়াকে দেওয়া হয়, (৩) বুলগেরিয়ার সৈন্যসংখ্যা ২০,০০০-এ সীমাবদ্ধ করা হয়, (৪) উহার নৌ-বাহিনী তুলিয়া দেওয়া হয় এবং (৫) বুলগেরিয়াকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য করা হয়। রাষ্ট্রীয় আয়তন, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও সামরিক দিক দিয়া বুলগেরিয়াকে বল্কানের এক দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়।

বুলগেরিয়ার সহিত নিউলির সন্ধি

(৪) **সেভ্রের সন্ধি** (Treaty of Sevres, 1920) : পরাজিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মিত্রপক্ষ কর্তৃক তুরস্কবিজয় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তুরস্কের প্রায় সকল প্রদেশগুলি ও উহার রাজধানী মিত্রপক্ষের দখলে আসিয়াছিল। সেভ্রের সন্ধি অনুসারে, (১) তুরস্ক-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এশিয়া মাইনর, থ্রেস, আদ্রিয়ানোপল ও গ্যালিপলি গ্রীসকে দেওয়া হয়, (২) সিরিয়া ফ্রান্সকে এবং প্যালেস্টাইন ও মেসোপটেমিয়া ইংল্যান্ডকে

তুরস্কের সহিত সেভ্রের সন্ধি

দেওয়া হয়, (৩) হাজাজের রাজাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করা হয়, (৪) তুরস্ক সাম্রাজ্যের আয়তন এশিয়া মাইনরে মধ্যবর্তী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়, (৫) তুরস্কের সৈন্যসংখ্যা ৫০,০০০-এ সীমাবদ্ধ করা হয় ও উহার বিমানবন্দরগুলি মিত্রপক্ষের হস্তে সমর্পণ করা হয় এবং (৬) কনস্টান্টিনোপল, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি তুর্কী-বন্দরগুলি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয়।

(৫) সংখ্যালঘু সন্ধি (Minorities Treaties) ঃ শান্তির শর্তাদি অনুসারে বহু নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। ইহার ফলে বহু রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সমস্যার উদ্ভব হয় এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধার প্রশ্ন জটিল হইয়া দেখা দেয়। জাপানের সকল জাতির সম-অধিকারের প্রস্তাব সমর্থিত হয় নাই। তথাপি সংখ্যালঘুদের জন্য কিছু করার প্রয়োজনও উপেক্ষিত হয় নাই। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে প্যারিস-সম্মেলন কর্তৃক একটি 'নূতন-রাষ্ট্র-কমিটি' (New States Committee) নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি সংখ্যালঘুদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করার পক্ষপাতী ছিল না। যাহা হউক এই সম্পর্কে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ও তুরস্কের সহিত সম্পাদিত সন্ধিগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন মিত্রপক্ষ চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস প্রভৃতি রাষ্ট্রের সহিত পৃথকভাবে সংখ্যালঘু-সন্ধি সম্পাদিত করিয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবর্গ পরস্পরের সহিত সংখ্যালঘু-সন্ধি সম্পাদন করিয়াছিল। এই সকল সন্ধিতে সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানবাধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল। সংখ্যালঘুদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব লীগ্-অফ-নেশনস্‌কে দেওয়া হইয়াছিল।

৮.১২. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ও গুরুত্ব (The results and importance of the First World War) ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল বা উহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব এমন ব্যাপক যে উহার প্রত্যেকটি নির্ধারণ করা সহজ নহে। রণাঙ্গনের ব্যাপকতা, যুদ্ধে যোগদানকারী অগণিত রাষ্ট্রের সংখ্যা, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ফলাফল এবং আন্তর্জাতিকতার ক্রমবিস্তার ইত্যাদি সকল দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে একটি পরিবর্তনকারী বিপ্লব আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। "The Great War was more than an international conflict, it was a revolution."

(ক) জাতীয়তাবাদের জয় ঃ যুদ্ধের একটি প্রধানতম ফল হইল জাতীয়তাবাদের জয়লাভ। এই দিক দিয়া ভিয়েনা-সম্মেলন (১৮১৮ খ্রীঃ) ও প্যারিস-সম্মেলনের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ভিয়েনা-সম্মেলন জাতীয়তাবাদকে সমূলে বিনাশ করিতে যত্নবান হইয়াছিল, কিন্তু প্যারিস-সম্মেলন ইহাকে আন্তর্জাতিক আইন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। যে সকল সাম্রাজ্য জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী বা বহু জাতিগোষ্ঠী সমন্বয়ে গঠিত ছিল সেগুলির অবসান হইল এবং এক ভাষাভাষী

ও এক জাতিগোষ্ঠীর ভিত্তিতে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পুনর্গঠন করা হইল। যেমন পূর্বতন রুশ-সাম্রাজ্য হইতে চারিটি নূতন রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদের নীতি প্রয়োগে গঠিত হইল—ফিনল্যান্ড, এস্টোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি হইতে কিছু অংশ সমন্বয়ে পোল্যান্ড নূতনভাবে গঠিত হইল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য হইতে বহু অঞ্চল বিচ্ছিন্ন করিয়া কয়েকটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হইল। বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার সংযোগে চেকোশ্লোভাকিয়া এবং বোসনিয়া, হারজেগোভিনা ও অন্যান্য দু-একটি অঞ্চল সার্বিয়ার সহিত যুক্ত করিয়া যুগোশ্লাভিয়া নামে অপর একটি নূতন শ্লাভ প্রধান রাষ্ট্র গঠিত হইল। ট্রানসিলভানিয়াকে অস্ট্রিয়ার কবলমুক্ত করিয়া রুমানিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হইল। ফ্রান্সকে আলসাস্-লোরেন ও ডেনমার্ককে ডেন-অধ্যুষিত অঞ্চল শ্লেসউইগ প্রত্যর্পণ করিয়া বহু আকাঙ্ক্ষিত জাতীয় কামনা পূর্ণ করা হইল। সুতরাং ইহা বলা চলে যে জাতীয়তাবাদ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী এবং আন্তর্জাতিক আইন বলিয়া স্বীকৃত হইল। এই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে উগ্র-জাতীয়তাবাদ হইতে পরবর্তী কালে ইটালীতে ফ্যাসিজম্ বা সন্ত্রাসবাদ ও জার্মানীতে নাৎসীবাদের উৎপত্তি হয়।

ইওরোপের বাহিরেও জাতীয়তাবাদের প্রসার চীন, তুরস্ক ও মিশর

জাতীয়তাবাদের প্রভাব ও প্রসার শুধু ইওরোপেই সীমাবদ্ধ রহিল না। জাতীয়তাবোধ চীনকে জাগ্রত করিল এবং তুরস্কের রাষ্ট্রব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটাইল। তুরস্কে সাধারণতন্ত্রী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। মিশরে সংঘটিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সম্মুখে ব্রিটেনকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেটব্রিটেন মিশরের উপর হইতে তাঁহার অভিভাবকত্ব প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইল।

আয়ারল্যান্ডে জাতীয়তাবাদের সাফল্য

আয়ারল্যান্ডে জাতীয়তাবাদ জয়যুক্ত হইল। বিংশ শতকের প্রারম্ভে তথায় সিন ফিন, (Sinn Fein) নামে এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে আন্দোলনকারীগণ ডাবলিন শহরে আয়ারল্যান্ডের জন্য একটি স্বতন্ত্র পার্লামেন্ট স্থাপন করিয়া ডি-ভ্যালেরাকে (De Valera) অস্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত করিল। একই সময়ে আয়ারল্যান্ডে আইরিশ সাধারণতন্ত্রী সংঘ (Irish Republican Association) প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাইতে থাকে। বহু ঘাত-প্রতিঘাত ও রক্তক্ষয়ের পর ইংল্যান্ড ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আয়ারল্যান্ডের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করিল। এই চুক্তি অনুযায়ী দক্ষিণ-আয়ারল্যান্ড একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিল।

(খ) **গণতন্ত্রের প্রসার:** যুদ্ধের ফলে জাতীয়তাবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রবাদেরও প্রসার ঘটিল ও তাহা অধিকতর জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। জার্মানী,

অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও তুরস্কে রাজতন্ত্রের অবসান হইল এবং গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি প্রবর্তিত হইল। একমাত্র রাশিয়াতেই গণতান্ত্রিক-আন্দোলন পরিশেষে সাম্যবাদে রূপান্তরিত হইল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের নিকট পরাজিত হইলে গ্রীসে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিল ও তথায় সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। কিন্তু গণতন্ত্রের সর্বাধিক সাফল্য ঘটে তুরস্কে। সুলতানীতন্ত্রের অবসান করিয়া তথায় জনসাধারণ কামাল পাশার নেতৃত্বে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিল।

(গ) **ডিক্টেটরশিপের আবির্ভাব:** কোন কোন রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক-আন্দোলনের গতি প্রতিহত হইয়া একনায়কতন্ত্রের (dictatorship) আবির্ভাব হইল। যুদ্ধোত্তর ইওরোপের অনেক রাষ্ট্রই অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল এবং বহু ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক উপায়ে সেগুলির সমাধান করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং সমস্যার সমাধান করিতে জনসাধারণ অসমর্থ হওয়ায় ব্যক্তিবিশেষের হস্তে সকল ক্ষমতা অর্পণ করিয়া তাহারাই একনায়কতন্ত্রের সূচনা করিল। ইটালী, তুরস্ক, রাশিয়া ও স্পেনে একনায়কতন্ত্রের পরীক্ষা চলিল। পরবর্তী কালে বলশেভিজম্ (Bolshevism) এবং ফ্যাসিজমের (Fascism) একনায়কতন্ত্রের চরম পরিণতি লাভ করিল।

(ঘ) **সামাজিক জীবনে বিপ্লব:** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইওরোপের সামাজিক জীবনেও এক বিরাট পরিবর্তন আনিয়াছিল। এই যুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করায় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাহারা অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিল। রাজনীতিক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার উন্নয়নমূলক সামাজিক ব্যবস্থারও প্রবর্তন করা হইল। পুরুষেরা যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকায় বহুক্ষেত্রে নারীরা দেশের অভ্যন্তরীণ কাজকর্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহার ফলে সর্বত্র নারীদের সামাজিক মর্যাদা স্বীকৃতি লাভ করিল। ফলে সামাজিক জীবনে এক যুগান্তর আসিল।

শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রীয় চেতনা

নারীর মর্যাদা স্বীকৃত

(ঙ) **আন্তর্জাতিকতা বৃদ্ধি:** এই যুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিকতাবোধ (Internationalism) বৃদ্ধি পাইল। প্রেসিডেন্ট উইলসনের চৌদ্দ-দফা শর্তাদির উপর ভিত্তি করিয়া লীগ্-অফ-নেশনস্ নামক এক আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসংঘ গড়িয়া উঠিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই সংঘের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত না হইলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এবং তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনাল (Third International) নামক কমিউনিস্ট প্রতিষ্ঠান ইহার সাক্ষ্য দেয়।

সুতরাং ফলাফলের দিক হইতে বিচার করিলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক সংগ্রাম বলিয়া বিবেচনা করা সঙ্গত হইবে না। প্রকৃতপক্ষে ইহাকে আন্তর্জাতিক বিপ্লব বলিলে অযৌক্তিক হইবে না।

ভার্সাই সন্ধির মধ্যে অপর একটি যুদ্ধের সম্ভাবনা নিহিত: রাইকার (Riker) ভার্সাই সন্ধিপত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন "The moral defects of the

treaty are no more glaring than the practical"। নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে এই সন্ধির রচয়িতাগণের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ছিল। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যে পরস্পর ঈর্ষা ও বিদ্বেষ ধূমায়িত হইতেছিল তাহার ঊর্ধ্বে উঠিয়া স্থায়ী শান্তি আনয়নের উপযোগী মনোভাব তাঁহারা দেখাইতে পারেন নাই। যে শান্তি তাঁহারা পুনঃস্থাপিত করিলেন তাহা প্রকৃত শান্তি নহে এবং পরবর্তী কালের ঘটনাপরম্পরা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে ভার্সাই সন্ধির মধ্যে আরও একটি যুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল। প্রথমতঃ, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে জার্মানীকে বিবিধ প্রকারে পঙ্গু রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সন্ধির শর্তাদি সম্পর্কে জার্মানীর মতামতের কোনও মূল্য দেওয়া হয় নাই। অপরাধী আসামীর ন্যায় জার্মান প্রতিনিধিগণকে সৈন্যের প্রহরাধীনে প্যারিসের সভাকক্ষে আনা হইত। এইরূপ অপমানজনক ব্যবস্থার মধ্যে জার্মানীর প্রতি বিজয়ী শক্তিবর্গের প্রবল ঘৃণার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। জার্মানী এইরূপ অপমানজনক আচরণ কখনই বিস্মৃত হইতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে জার্মান প্রতিনিধিগণের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "আমরা জানি আমাদের প্রতি কি পরিমাণে ঘৃণা বর্ষিত হইতেছে।" লয়েড জর্জের মন্তব্যের মধ্যেও জার্মানীর প্রতি বিজয়ী শক্তিবর্গের প্রতিশোধাত্মক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন, "যুদ্ধে নিহত বীরদের শোণিতে এই সন্ধির শর্তসমূহ লিখিত হইয়াছে। আমরা বিধাতার অনুশাসন নিশ্চয়ই পালন করিব এবং দেখিব যে জাতি এই যুদ্ধের জন্য দায়ী তাহারা যেন ভবিষ্যতে এইরূপ কার্যে পুনরায় লিপ্ত হইতে না পারে। জার্মানগণ বলেন তাঁহারা এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিবেন না। তাঁহাদের সংবাদপত্রগুলি বলে তাহারা স্বাক্ষর করিবে না; তাঁহাদের রাষ্ট্রবিদ্‌গণও অনুরূপ বলেন। কিন্তু আমরা বলি "মহাশয়! আপনারা নিশ্চয়ই স্বাক্ষর করিবেন, যদি ভার্সাইতে স্বাক্ষর না করেন তবে বার্লিনে তাহা করিতে হইবে।" বিজয়ী শক্তিবর্গের এইরূপ প্রতিশোধাত্মক মনোভাবের মধ্যেই আর একটি যুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল বলা যাইতে পারে।

নীতিগত ত্রুটি

জার্মানীর প্রতি প্রতিশোধাত্মক মনোভাব

দ্বিতীয়তঃ, উদার ন্যায়পরায়ণ নীতির ভিত্তির উপর ভার্সাই সন্ধির শর্তাদি রচিত হয় নাই, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে জার্মানীর উপর যে সকল দাবি-দাওয়া চাপাইয়া দেওয়া হয় তাহা পূরণ করা জার্মানীর পক্ষে অসম্ভব ছিল। জার্মানীর সামরিক শক্তি খর্ব করিয়া তাহাকে শত্রুর সম্মুখে পঙ্গু করিয়া রাখা হইয়াছিল। জার্মানীর উপনিবেশগুলি, তাহার শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলি ও বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। জার্মানী বিজয়ী শক্তিবর্গকে বিবিধ অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহাকে কোন দিকেই সেই সুযোগ-সুবিধার প্রতিদান দেওয়ার মনোবৃত্তি বিজয়ী শক্তিবর্গের ছিল না।

ন্যায়-নীতির অভাব

জার্মান উপনিবেশগুলি অছি-রাষ্ট্রের শাসনাধীনে রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল। নীতির দিক হইতে এই ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ অছি-রাষ্ট্রগুলি পূর্ববৎ স্বৈরাচারী ক্ষমতা অপ্রতিহতভাবেই উপনিবেশগুলিতে বহাল রাখিয়াছিল। অধিকন্তু রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের ব্যাপারে জাতীয়তা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি প্রয়োগ করিলেও জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার ব্যাপারে এই নীতি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই। এতদ্ভিন্ন সামরিক শক্তি হ্রাসের নীতি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলেও তাহা কার্যকর করিতে কেহই যত্নবান ছিল না। সুতরাং এই সম্পর্কে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জার্মানীর 'অসাধুতার' অভিযোগ মিথ্যা নহে।

সন্ধিপত্রের বাস্তব ত্রুটি

নীতিগত ত্রুটি ছাড়াও ভার্সাই সন্ধিতে বাস্তব ত্রুটিও যথেষ্ট ছিল। ইহা প্রত্যাশা করা যুক্তিসঙ্গত নহে যে জার্মানীর ন্যায় একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রকে চিরকালের মত দুর্বল করিয়া রাখা সম্ভবপর। জার্মানীর মত জাতির পক্ষে প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বেলজিয়াম অপেক্ষা সামরিক শক্তিতে হীন হইয়া থাকা সম্ভব নহে। পোল্যাণ্ডকে জার্মানীর একাংশ দান করা এবং জার্মানীর ভিতর দিয়া পোলিশ করিডর (Polish coridor) সৃষ্টি করিয়া জার্মানীকে দ্বিখণ্ডিত করা, সার খনিজ অঞ্চলের উপর ফ্রান্সের কর্তৃত্ব স্থাপন করা প্রভৃতি ব্যবস্থার দ্বারা জার্মানীর জাতীয় মর্যাদা যেভাবে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছিল তাহা জার্মানগণ কোনক্রমেই বরদাস্ত করিতে রাজী ছিল না। জাতীয় মর্যাদা, রাজনৈতিক নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক সচ্ছলতা সকল দিক দিয়াই এইরূপ সন্ধি জার্মানীর ন্যায় শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে মানিয়া লওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং ভবিষ্যতের বহু অশান্তির কারণ এই সন্ধিতে নিহিত ছিল।

৮.১৩. **প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির সাফল্যের কারণ (Causes of the Allied victory in the First World War) :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির সাফল্যের কয়েকটি কারণ ছিল; যথা—ব্রিটিশ নৌ-শক্তির প্রাধান্য এই সাফল্যের প্রধান কারণ। জার্মানীকে অবরোধ করিয়া ও তথায় বাহির হইতে পণ্য-সামগ্রীর যোগানের পথ রুদ্ধ করিয়া জার্মানীকে দুর্বল করিতে ব্রিটিশ নৌ-শক্তি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। জার্মানীর উপনিবেশগুলি দখল করিতেও এই শক্তি সাহায্য করিয়াছিল। আমেরিকার সৈন্য ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাঠাইতেও ব্রিটিশ নৌবহর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

ব্রিটিশ নৌ-প্রাধান্য

যুদ্ধে আমেরিকার যোগদান

মিত্রপক্ষে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যোগদান মিত্রপক্ষের সামরিক শক্তি অভূতপূর্ব-ভাবে বৃদ্ধি করিয়াছিল। যুদ্ধের প্রথমদিকে আমেরিকা নিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু সমুদ্রে জার্মানী যথেচ্ছভাবে ডুবো-জাহাজের (Submarine) যুদ্ধ শুরু করিলে আমেরিকা নিজ-স্বার্থেই উহার বিরাট রণসম্ভার, সম্পদ ও লোকবল লইয়া মিত্রপক্ষে যোগদান করে। ফলে যুদ্ধের পরিস্থিতি মিত্রপক্ষের অনুকূল হইয়া উঠে।

জার্মানী দ্রুত সাফল্যের আশা করিয়াছিল, কিন্তু চারি বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলিবার ফলে উহার প্রচুর লোকক্ষয় হয় এবং এই কারণে সকল রণক্ষেত্রে একটানা যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া অসম্ভব হয়।

জার্মানীর লোকবলের অভাব

অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, ভারত প্রভৃতি কমনওয়েলথ্‌ভুক্ত দেশগুলির সমর-সম্ভার মিত্রপক্ষের সহায়ক হইয়াছিল।

কমনওয়েলথ্‌ভুক্ত দেশগুলির অবদান

জার্মানীর মিত্রশক্তিগুলির অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও উহাদের পতন জার্মানীর বিপর্যয় ত্বরান্বিত করিয়াছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও তুরস্ককে রক্ষা করিতে যাইয়া জার্মানীর নিজস্ব-শক্তি ও সম্পদের দারুণ অপচয় ঘটিয়াছিল এবং যাহা জার্মানীকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছিল।

জার্মানীর মিত্রশক্তিগুলির দুর্বলতা

৮.১৪. **প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের কারণ (Causes of Germany's defeat in the First World War) :** বিশ্বযুদ্ধের প্রথমদিকে যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলির সমরোপকরণের তুলনা করিলে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে সমরোপকরণের দিক দিয়া জার্মানী ছিল শ্রেষ্ঠ। সমরোপকরণের পরিমাণ, সৈন্য ও সমরনায়কদের দক্ষতা, স্থায়ী সৈন্যের সংখ্যা প্রভৃতি দিক দিয়া জার্মানী ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। জার্মানীর ক্ষেপণাস্ত্র ও ডুবো-জাহাজগুলি ছিল প্রবল বিধ্বংসকারী। কিন্তু প্রাথমিক সকল সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও একাধিক কারণে জার্মানীকে পরাজয় বরণ করিতে হয়।

প্রথমতঃ, যুদ্ধের প্রারম্ভে জার্মানীর যে সুযোগ-সুবিধাগুলি ছিল তাহা স্বল্পকালীন যুদ্ধের উপযোগী ছিল। প্রথমদিকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও দীর্ঘদিন ধরিয়া তাহা ধরিয়া রাখা জার্মানীর পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। আধুনিক যুদ্ধ হইল অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ, দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা জার্মানীর ছিল না। জার্মানীর তুলনায় লোকবলে মিত্রপক্ষ ছিল বলীয়ান। একমাত্র রাশিয়ার জনসংখ্যাই ছিল জার্মানী ও উহার মিত্রপক্ষের জনসংখ্যার প্রায় সমান। জার্মানীর তুলনায় মিত্রপক্ষের অর্থনৈতিক ও শিল্পসম্পদ ছিল অনেক বেশী। দীর্ঘদিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিবার ফলে জার্মানীর সঞ্চিত অর্থনৈতিক ও শিল্পসম্পদ প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, সৈন্য পরিচালনার দিক দিয়াও জার্মানীর অসুবিধা ছিল। পূর্ব ও পশ্চিম রণ-সীমান্তে জার্মানীকে সৈন্য সমাবেশ করিতে হইয়াছিল—ফলে উহার সৈন্য-বাহিনী দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। উভয় সীমান্তে জার্মানীকে এককহস্তে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে হয়। বহু মাইল পরিব্যাপ্ত রণ-সীমান্তে সময়মত সৈন্য পরিচালনা করা জার্মানীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল।

তৃতীয়তঃ, আক্রমণাত্মক রণ-নীতি গ্রহণ করিয়া জার্মানী প্রথমদিকে শত্রু-দেশে প্রবেশ করিয়া তাহা দখল করিয়াছিল। কিন্তু স্বদেশের মাটিতে জার্মানীকে আত্মরক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। রাশিয়ার বিপুল সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে জার্মানীর ভূখণ্ডে জার্মানীর পক্ষে এক রণাঙ্গন হইতে অপর রণাঙ্গনে সৈন্য স্থানান্তরিত অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। চারিদিক হইতে মিত্রপক্ষ জার্মানীর সীমান্তে চাপ সৃষ্টি করিলে জার্মানীর বিপর্যয় ঘটে।

চতুর্থতঃ, স্থলবাহিনীকে উপযুক্তভাবে সাহায্য করার ব্যাপারে জার্মানীর নৌ-বাহিনী সক্ষম ছিল না। একান্ত স্থলযুদ্ধের দিনও তখন ছিল না। যুদ্ধজয়ের চাবিকাঠি ছিল নৌ-বাহিনী। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার নৌ-বাহিনীর তুলনায় জার্মান নৌ-বাহিনী ছিল নিতান্তই সামান্য। মিত্রপক্ষের নৌ-বাহিনী জার্মানী অবরোধ করিলে উহার পক্ষে বিদেশ হইতে পণ্য-সামগ্রী আমদানি করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত জার্মানীতে দারুণ পণ্য-সামগ্রীর অভাব দেখা দিলে জার্মানী যুদ্ধ সম্বরণ করিতে বাধ্য হয়।

পঞ্চমতঃ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল প্রধানত 'জনযুদ্ধ ('War of the People')। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বের জনমতের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। স্বৈরতন্ত্রী দেশ জার্মানীর জনগণের তুলনায় ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার ন্যায় গণতন্ত্রী দেশগুলির জনগণ অকাতরে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপন আপন সরকারকে সাহায্য করিয়াছিল। ১৮৭০-৭১ সালের পরাজয়ের গ্লানি ফরাসীগণকে জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবার অপূর্ব সুযোগ দিয়াছিল এবং ফরাসী জনগণ মরণপণ করিয়া যুদ্ধে অংশ-গ্রহণ করিয়াছিল। নিরপেক্ষ দেশগুলির নিকট হইতেও মিত্রপক্ষ সকল প্রকার সাহায্য লাভ করিয়াছিল যাহা জার্মানীর অদৃষ্টে ঘটে নাই। জার্মানীর পরাজয়ের ও মিত্রপক্ষের জয়লাভের ইহা একটি অন্যতম কারণ।

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর সংকেত

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [উঃ ৮.৩.]

২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানীর দায়িত্ব আলোচনা কর। [উঃ ৮.২.]

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে আন্তর্জাতিক সংকটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ ৮.২.]

৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ডের যোগদানের কারণ কি? [উঃ ৮.২.]

৫। প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনের নেতৃবর্গের ও তাঁহাদের মতাদর্শের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [উঃ ৮·৫.]

৬। প্যারিস শান্তি-সম্মেলনের সংগঠন ও উহার প্রাথমিক সমস্যাগুলির বিবরণ দাও। [উঃ ৮·৫.]

৭। উইলসনের 'চৌদ্দ-দফা' শর্তগুলি কি ছিল? তাঁহার প্রস্তাবিত শান্তি-শর্তাদির সমালোচনা কর। [উঃ ৮·৬,]

৮। কোন্ কোন্ নীতির ভিত্তির উপর ভার্সাই-সন্ধি রচিত হইয়াছিল? [উঃ ৮·৬.]

৯। ভার্সাই সন্ধির শর্তাদির বিবরণ দাও। [উঃ ৮.৮.]

১০। ভার্সাই সন্ধির সমালোচনা কর। [উঃ ৮.৮.]

১১। ভার্সাই সন্ধির সমর্থনে যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ কর। [উঃ ৮.৯.]

১২। ভার্সাই সন্ধিকে কি 'জবরদস্তিমূলক শান্তি' (Dictated Peace) বলা যায়? [উঃ ৮.১০.]

১৩। ভার্সাই সন্ধির ত্রুটিগুলির আলোচনা কর। [উঃ ৮.৮.]

১৪। "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ ভার্সাই সন্ধিতে নিহিত ছিল"—এই মন্তব্য কতদূর যথার্থ, আলোচনা কর। [উঃ ৮.১২.]

১৫। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর। [উঃ ৮.১২.]

১৬। "প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুধু এক আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ ছিল না; ইহা ছিল এক বিপ্লব" আলোচনা কর। [উঃ ৮.১২.]

১৭। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের সাফল্যের কারণ কি? [উঃ ৮.১৩.]

১৮। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের কারণ কি? [উঃ ৮.১৪.]

নবম অধ্যায় ।— রাশিয়ার ইতিহাস (১৮৮১-১৯৩৯)
(History of Russia, 1881-1939)

৯.১. জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার (Czar Alexander III, 1881-94) : আততায়ীর হস্তে 'মুক্তিদাতা' জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র তৃতীয় আলেকজাণ্ডার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন অসীম শারীরিক শক্তির অধিকারী কিন্তু অত্যন্ত একগুঁয়ে। তিনি ছিলেন সংকীর্ণমনা। মানসিক উৎকর্ষ বলিয়া তাঁহার কিছুই ছিল না। পিতার উদার মনোভাবের যৎকিঞ্চিৎ অংশেরও অধিকারী তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন উগ্র রাজতন্ত্রের সমর্থক। সুতরাং এক কথায় তিনি ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল ও নূতন যুগের পরম শত্রু। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে গণতান্ত্রিক বা পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া রাশিয়ার উন্নতি সম্ভব নহে ; রাশিয়ার উন্নতি উহার নিজস্ব মৌলিক ঐতিহ্যগত আদর্শের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল এবং মৌলিক আদর্শের মূর্ত প্রতীক হইল রাজতন্ত্র। তাঁহার মতে পাশ্চাত্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ রাশিয়ার পক্ষে অবাস্তব, কারণ তাহা ছিল রাশিয়ার ঐতিহ্যের বিরোধী। 'এক জার, এক চার্চ ও এক রাশিয়া'—এই মতবাদে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। রাজত্বের প্রথম হইতেই তিনি প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করিয়া রাশিয়া হইতে সকল প্রকার উদার মতবাদ উচ্ছেদ করিতে প্রয়াসী হন। তিনি 'নিহিলিস্ট' (Nihilist) নামে উগ্র বিপ্লবীদের দমন করার ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেষ্ট হন। কারণ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে নিহিলিস্ট মতবাদ (Nihilism) ও নিহিলিস্টদের কার্যকলাপের ফলে রুশ-সাম্রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হইয়াছিল এবং নিহিলিস্ট বিপ্লবীদের হস্তে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

চরিত্র ও আদর্শ

তৃতীয় আলেকজাণ্ডার রুশ-বিপ্লবীদের নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠনের দাবিকে 'যুগের এক রাজনৈতিক মিথ্যা' (Political Lie) বলিয়া নিন্দা করেন। তিনি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সংসদ বা পার্লামেণ্টকে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ (Institution to satisfy personal interests) করার সংস্থা বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি গণতান্ত্রিক আদর্শের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে উদারনীতিবাদ ও গণতন্ত্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য আদর্শ রুশ-জনগণকে বিকৃত মনোভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রতিক্রিয়াশীল নীতি

সুতরাং প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বশবর্তী হইয়া তৃতীয় আলেকজাণ্ডার পিতামহ প্রথম নিকোলাস-এর ন্যায় দমননীতি গ্রহণ করেন। সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করা হয় এবং ইহার ফলে বহু সংবাদপত্রের প্রকাশন বন্ধ হইয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাতন্ত্র্য হরণ করা হয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করা

হয়; স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে উদার মতবাদী শিক্ষক ও অধ্যাপকদের বিতাড়িত করা হয়। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের হত্যার সহিত জড়িত এইরূপ সন্দেহজনক বহু ব্যক্তিকে কারাদণ্ডে বা সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হয়। উদারনৈতিক মতাবলম্বী বহু সহস্র নাগরিকের ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ করা হয়। নূতন করিয়া সামন্ত-প্রথা প্রবর্তন করিয়া কৃষকগণকে সামন্ত-প্রভুদের নিয়ন্ত্রণাধীনে পুনরায় রাখা হয়। গ্রামবাসীদের কঠোর শাসনাধীনে রাখিবার জন্য 'ল্যাণ্ড-ক্যাপ্টেন' নামে এক শ্রেণীর নূতন রাজকর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। ইহাদের হস্তে পুলিশী ও প্রসাশনিক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। স্বেচ্ছাচারীভাবে দায়িত্ব পালনের সকল সুযোগ-সুবিধা ইহাদের দেওয়া হয়।

ইহার পর তৃতীয় আলেকজাণ্ডার রুশ-সাম্রাজ্যে বসবাসকারী ইহুদী, জার্মান, ফিনু, পোল প্রভৃতি সংখ্যালঘুদের প্রতি রুশীকরণ নীতি গ্রহণ করেন। নিজ নিজ মাতৃভাষা শিক্ষার পরিবর্তে রুশ ভাষা শিক্ষার জন্য এই সংখ্যালঘুদের বাধ্য করা হয়। ইহুদী নিধন-নীতি গ্রহণ করিয়া তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ইহুদীদের সকল সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করেন। ইহার প্রতিবাদে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বহু ইহুদী বিদ্রোহী হয় এবং অনেকে আমেরিকায় পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করে।

রুশীকরণ নীতি

প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া সত্ত্বেও, তৃতীয় আলেকজাণ্ডার রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। তাঁহার মন্ত্রী কাউণ্ট উইট (Count Witte)-এর আগ্রহে ও উৎসাহে রাশিয়ায় বিদেশী মূলধনের যোগান শুরু হয়। রাশিয়ার খনিজ-সম্পদ বৃদ্ধি পায় ও রাশিয়া ক্রমে শিল্পোন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হয়। দেশের যাতায়াতের ও যোগাযোগের উন্নতির জন্য রেলপথের সম্প্রসারণ করা হয়।

ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নতির সূচনা

৯২. রাশিয়ায় বিপ্লবী-আন্দোলনের অগ্রগতি

(Development of Revolutionary Movements)

ইওরোপের সমকালীন বিপ্লবী-আন্দোলনের সহিত রাশিয়ার বিপ্লবী-আন্দোলনের যোগ ছিল। যদিও রাশিয়ার বিপ্লবী-আন্দোলন ছিল অধিক সংগঠিত ও তীব্র। পাশ্চাত্যের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রুশ-বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। রুশ সরকারের কঠোর বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক আদর্শ রাশিয়ার শিক্ষিত সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার কতকগুলি উদারনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করিলে, রুশ উদার-নীতিকদের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু পোল-বিদ্রোহ দমনের সময় দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার প্রতিক্রিয়াশীল নীতির আশ্রয় লইলে রুশ উদারনীতিকগণ হতাশ হইয়া পড়েন। এই সময় হইতে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত বিরোধিতার

উন্মেষ ঘটে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর প্রবল দমনমূলক বিধি-ব্যবস্থার ফলে প্রকাশ্য বিদ্রোহ সম্ভব না হওয়ায় রাশিয়ায় বহু গুপ্ত বিপ্লবীসংঘ গড়িয়া উঠে। সরকারপক্ষ এই গুপ্ত সংঘগুলি যতই আবিষ্কার করিয়া বিপ্লবীদের নানা দণ্ডে দণ্ডিত করিতে থাকেন, বিপ্লবীগণ ততই ভয়ংকর হইয়া উঠিতে থাকে এবং উহারা বোমা প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র গোপনে তৈয়ারী করিয়া ক্রমেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়।

নিহিলিজম্-এর উৎপত্তি

রাশিয়ার জারতন্ত্রের বিরোধীদের মধ্যে মতাদর্শের পার্থক্য ছিল। বিরোধীদের মধ্যে 'নিহিলিস্ট'গণ ছিল সর্বাধিক উগ্র ও সংঘবদ্ধ। নিহিলিজম্'-এর অর্থ হইল 'সর্বাত্মক ধ্বংস'। শিক্ষিত উগ্রপন্থীদের লইয়া এই দল গঠিত ছিল। ইহাদের আদর্শ ছিল সমাজের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটানো। নিহিলিস্টদের ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে যে ইহারা কাহারও কর্তৃত্ব স্বীকার করিত না এবং অপ্রমাণিত কোন আদর্শ বা নীতি গ্রহণ করিত না। ইহাদের লক্ষ্য ছিল পূর্বতন আমলের (Old Regime) সব কিছু ভাঙ্গিয়া চুরমার করা—যথা জারের ক্ষমতা, রাষ্ট্রের ক্ষমতা, গির্জার অনুশাসন ও ক্ষমতা ও চিরাচরিত সামাজিক কর্তব্য ইত্যাদি। এই মতবাদের প্রধান কথাই ছিল "জনগণের মধ্যে যাও" ("Go among the People") এবং এই মতবাদে বিশ্বাসী শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা গ্রামে, গঞ্জে ও শহরে যাইয়া কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে উগ্র-বিপ্লবের আদর্শ (নিহিলিজম্) প্রচার করে। ক্রমে এই আন্দোলন সন্ত্রাসবাদে রূপান্তরিত হয়। সরকার ইহাদের দমনে প্রবৃত্ত হইলে নিহিলিস্টগণ-সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ও সরকারী কর্মচারী হত্যা করিতে থাকে। সরকারের নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নিহিলিস্টগণও হিংসাশ্রয়ী হইয়া উঠে। এই পরিস্থিতিতে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার কতকগুলি সংস্কারমূলক কার্যসূচী গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু সংস্কার প্রবর্তনের জন্য যেদিন তিনি একটি রাজকীয় অনুশাসন জারী করেন, সেইদিন জনৈক নিহিলিস্ট কর্তৃক তিনি নিহিত হন।

ফলাফল

দ্বিতীয় আলেকজান্ডার নিহত হইলে সংস্কার-কার্যসূচী বাতিল হইয়া যায় এবং রুশ সরকার কঠোর দমননীতির আশ্রয় লন। রাশিয়ায় উদারনৈতিক সরকার গঠনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা স্তব্ধ হইয়া যায়।

৯.৩. জার দ্বিতীয় নিকোলাস ১৮৯৪-১৯১৭ (Czar Nicholas II)

জারের দুর্বল চরিত্র ঃ প্রতিক্রিয়াশীল পন্থীদের প্রভাবাধীন

রোমানফ-বংশীয় রাশিয়ার শেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাস পিতা তৃতীয় আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার ন্যায় তিনিও নির্যাতন দমননীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। দুর্বলচিত্তহেতু তিনি শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে জারিনা ও সন্ন্যাসী রাসপুটিনের প্রভাবাধীন ছিলেন। তিনি প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক পেবিডনোস্টেফ (Pebeydonosteff) এবং নির্যাতনমূলক শাসনযন্ত্রের চালক

প্লিভির (Plehve) উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। ইহারা গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া এবং নিজস্ব সংবাদপত্রের উপর নির্ভর করিয়া শাসনকার্য পরিচালনাও করিতেন। ফলে দুর্বল রাজার অধীনে সরকার অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠে। যে কোনও ধরনের গণতান্ত্রিক আলোচনা বা কার্যকলাপ কঠোরহস্তে দমন করা হইতে থাকে। ইহুদী-বিরোধী আইনগুলি কার্যকর করা হইল। বুদ্ধিজীবীরাই সকল বিপ্লবী মতবাদের উৎস ও প্রচারক—এই বিশ্বাসে শিক্ষক ও ছাত্রসম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পাইল। এক বৎসরের মধ্যে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশকে কারাগারে ও সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হইল।

ফিনদের উপর অত্যাচার

নিকোলাস তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের ন্যায় 'রুশীকরণ' (Russianistion) নীতি গ্রহণ করেন। রুশ-সাম্রাজ্যভুক্ত ফিনল্যাণ্ড এক শতাব্দীকাল ধরিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় নিকোলাস ফিনল্যাণ্ডের স্বতন্ত্র শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া ফিনদের উপর নির্যাতন আরম্ভ করেন। অনুরূপভাবে জার্মান ও পোলগণের উপরও নির্যাতন চলে। কিন্তু এইরূপ দমনমূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও জার নিকোলাস কাউণ্ট-উইটের পরামর্শক্রমে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধনে সচেষ্ট ছিলেন। বিদেশী মূলধনের সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক ও যাতায়াত ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়।

গণ-আন্দোলনের সূচনা ও অভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রচেষ্টা

তাঁহার রাজত্বকালেই ১৯০৪-১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং রাশিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া দেশের মধ্যে ভীষণভাবে দেখা দিল। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হইল এবং জনসাধারণ শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের দাবি জানাইল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে একদল ধর্মঘটকারী ফাদার গ্যাপন নামক এক ধর্মযাজকের নেতৃত্বে তাহাদের দাবি জানাইবার জন্য জারের 'উইণ্টার-প্যালেসের' অভিমুখে অগ্রসর হইলে জারের সৈন্যদল তাহাদের উপর গুলিবর্ষণ করিয়া বহু লোক হতাহত করিল। এই হত্যাকাণ্ড 'রক্তাক্ত রবিবার, (Bloody Sunday, 23rd. January 1905) নামে খ্যাত। এই ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হইলে প্রকাশ্য বিদ্রোহের সূত্রপাত হইল।

বিদ্রোহ দমনে অসমর্থ হইয়া জার নিকোলাস শাসনতন্ত্র সংস্কারের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। 'ডুমা' বা জাতীয়-পরিষদ পুনর্গঠন করা হইবে বলিয়া জার অঙ্গীকার করেন।

প্রথম ডুমা (১৯০৬)

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ডুমার অধিবেশন হইল। কিন্তু শাসনতন্ত্র রচনা করা সম্ভব হইল না। ইহার কারণ ছিল সংস্কার-বিরোধী ও সংস্কার-কামী এই দুই দলের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ। অপরদিকে বিপ্লবী নেতাগণের মধ্যেও নূতন শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে মতানৈক্য ছিল অনেক। উদারপন্থীগণ জার-প্রচারিত ঘোষণাপত্র অনুযায়ী সংস্কার সাধনের পক্ষপাতী ছিল। গণতান্ত্রিকগণ দায়িত্বশীল প্রতিনিধিমূলক সরকার দাবি

করিল। সমাজতন্ত্রীগণও তাহাদের পৃথক দাবি উত্থাপন করিল। অপরদিকে কৃষকদের নেতৃবর্গ বিনা ক্ষতিপূরণে কৃষকগণকে জমির মালিকাণা-স্বত্ব প্রদানের দাবি জানাইল। বিপ্লবীগণের মধ্যে এইরূপ পরস্পর-বিরোধী মতবাদের সুযোগ লইয়া জার বলপূর্বক ডুমা ভাঙিগয়া দিলেন। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া গণতন্ত্রী দল খাজনা বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য রাশিয়ার জনসাধারণকে উত্তেজিত করিল। কিন্তু জার সরকার বল প্রয়োগ করিয়া এই বিদ্রোহ দমন করেন।

বিভিন্ন দলের মধ্যে মতানৈক্য

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ডুমা আহূত হইল। মন্ত্রিবর্গকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার প্রশ্ন লইয়া সদস্যগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে জার ইহার অধিবেশন স্থগিত রাখেন।

দ্বিতীয় ডুমা (১৯০৭)

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তৃতীয় ডুমা আহূত হইল। সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই ডুমার নির্বাচন হইয়াছিল বলিয়া ইহার অধিকাংশ সদস্যই জারের সমর্থক ছিলেন। সুতরাং এই অধিবেশনে সংস্কারমূলক কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার অধিবেশন চলে এবং এই বৎসরেই চতুর্থ ডুমা আহূত হয়। এই ডুমার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও জাতির প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইহা স্বীকৃত হয়। ইহার মধ্যে গণতন্ত্রের বীজ নিহিত ছিল।

তৃতীয় ডুমা (১৯০৭)

চতুর্থ ডুমা (১৯১২)

এইভাবে রাশিয়ার গণতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরতন্ত্র পূর্ববৎ দমন-নীতি চালাইয়া যাইতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী স্টোলিপিন (Stolypin), যাঁহাকে 'রাশিয়ার বিসমার্ক' বলা হয়, কিছু সংস্কার প্রবর্তন করিয়া এক শক্তিশালী সরকার গঠনে সচেষ্ট হন। তিনি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ কঠোরহস্তে দমন করিয়া কৃষককুল ও শ্রমিকশ্রেণীকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। কৃষকদিগকে 'মির' হইতে মুক্ত করিয়া উহাদের জমির মালিকানা-স্বত্ব দেওয়া হয়। 'ট্রেড-ইউনিয়ন' আইনসংগত বলিয়া স্বীকৃত হয়। কিন্তু হঠাৎ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে আঁততায়ীর হস্তে স্টোলিপিনের মৃত্যু হইলে স্বৈরতন্ত্র দুর্বল হইয়া পড়ে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অবনতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে এবং জার-বিরোধী আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠে। জার্মানীর হস্তে রাশিয়ার ক্রমাগত পরাজয়ের ফলে জারতন্ত্রের অযোগ্যতা ও অসারতা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। দেশের সর্বত্র গণ-আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং রুশ-সৈন্যবাহিনী এই আন্দোলনে যোগদান করে। অবশেষে কেরেনস্কির নেতৃত্বে একটি জরুরী ডুমা জার নিকোলাসকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া এক অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে রাশিয়ার রোমানফ রাজবংশের অবসান ঘটে।

স্টোলিপিন কর্তৃক সংস্কার প্রবর্তন

গণ-আন্দোলন ও জারতন্ত্রের অবসান

৯.৪. রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি (Foreign Policy of Russia, 1881-1917) ঃ পররাষ্ট্রক্ষেত্রে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত ফ্রাঙ্কো রাশিয়ান মৈত্রী জার তৃতীয় আলেকজান্ডারের রাজত্বের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে কোনরূপ রাজনৈতিক মিত্রতা ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু সেই বৎসরে সেডানের যুদ্ধে জার্মানী জয়লাভ করিলে ইওরোপে বল-সাম্যের বিপর্যয় ঘটে। ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকা পর্যন্ত বিসমার্ক রাশিয়ার সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন, কিন্তু কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের উগ্র-সাম্রাজ্যবাদী নীতি রাশিয়াকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল এবং কাইজারের অস্ট্রিয়া-প্রীতি রাশিয়াকে সন্দিহান করিয়া তুলিয়াছিল। অপরদিকে অভ্যন্তরীণ গঠনমূলক কার্যের জন্য রাশিয়ার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। জার্মানী রাশিয়াকে ঋণ প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলে রাশিয়া ক্রমশঃ ফ্রান্সের দিকে ঝুঁকিল এবং বস্তুতঃ রাশিয়ার সৈন্য, নৌবহর ও রেলপথ নির্মাণের জন্য ফ্রান্স প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য করে। ইহার ফলে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তৃতীয় আলেকজান্ডার ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত মৈত্রী-সূত্রে আবদ্ধ হন। ফ্রান্সের মিত্রচ্যুত অবস্থার অবসান ঘটে ও অপরদিকে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে রাশিয়া একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের মিত্রতা লাভ করিয়া রাশিয়ার আনুকূল্যে বল-সাম্য (balance of power) বজায় রাখে।

জার তৃতীয় আলেকজান্ডারের আমল

পররাষ্ট্রক্ষেত্রে জার দ্বিতীয় নিকোলাস শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন। জার্মান রাজকুমারীর সহিত বিবাহ ও জার্মান সম্রাটের গুণগ্রাহী হওয়া সত্ত্বেও জার নিকোলাস ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন ও ইংল্যান্ড হইয়া প্যারিসে সফর করিতে আসিলে জার ও জারিনাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। ফরাসী সৈন্যবাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন-কালে নিকোলাস এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন, "The army (French) was a powerful support of the principle of equity upon which peace, order and the well being ef nations were founded"। তিনি এইরূপ ঘোষণাও করেন যে রুশ-সাম্রাজ্য ও ফরাসী সাধারণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক অচ্ছেদ্য।

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের আমল

১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ ও মাঞ্চুরিয়া অধিকার রাশিয়াকে বিচলিত করে, কারণ, বহুদিন হইতেই মাঞ্চুরিয়ার উপর রাশিয়ার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। উপরন্তু চীন সাম্রাজ্যের উপর জাপানের প্রভাব বিস্তার সুদূর-প্রাচ্যে রাশিয়ার স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। যাহা হউক, রাশিয়ার প্রচেষ্টায় জাপান সিমোনসেকির সন্ধি দ্বারা প্রাপ্ত পোর্ট আর্থার ও লিয়াওতাং ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে চীনকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

অতঃপর চীনে বক্সার-বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া রাশিয়া বলপূর্বক মাঞ্চুরিয়া

অধিকার করিয়া তথায় সামরিক আধিপত্য স্থাপনের প্রয়াস করিতেছিল। কিন্তু ইওরোপীয় শক্তিবর্গের প্রতিবাদে এবং ইঙ্গ-জাপান মৈত্রীর ফলে রাশিয়া ছয় মাসের ব্যবধানে মাঞ্চুরিয়া হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে সম্মত হয়। প্রথম কিস্তিতে সৈন্য অপসারণ করিয়া রাশিয়া পুনরায় মাঞ্চুরিয়াতে রুশ-আধিপত্য স্থাপন করিতে উদ্যোগী হয়। মাঞ্চুরিয়াতে রাশিয়ার আধিপত্য জাপানের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া পড়ে এবং জাপান রাশিয়াকে এক চরমপত্র প্রেরণ করে। রাশিয়া তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-১৯০৫) আরম্ভ হয়। যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হইয়া পোর্টস্‌মাউথের সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হয়। এই পরাজয়ের ফলে সুদূর-প্রাচ্যে রাশিয়ার অগ্রগতি সাময়িকভাবে স্থগিত রহে এবং রাশিয়ায় ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রাজতন্ত্রের উপর জনসাধারণের তীব্র বিদ্বেষ ও অনাস্থা বৃদ্ধি পায়।

মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়া কর্তৃক আধিপত্য স্থাপনের প্রচেষ্টা

রুশ-জাপান যুদ্ধ ও উহার প্রতিক্রিয়া

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপারে রাশিয়ার দায়িত্ব কম ছিল না। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সার্বিয়াকে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি রাশিয়া প্রদান করিলে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে অন্তর্বিপ্লব হেতু রাশিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হয় এবং বলশেভিক দলের পরিচালনাধীনে রাশিয়া জার্মানীর সঙ্গে ব্রেস্ট লিটোভস্ক-এর সন্ধি সম্পাদন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে।

রাশিয়ার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান, পরে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ

মধ্য-প্রাচ্যে সম্প্রসারণ-নীতি রাশিয়া অব্যাহত রাখে। পারস্য ও আফগানিস্থানের সহিত মিত্রতা স্থাপিত হইলে ব্রিটেনের সহিত রাশিয়ার বিবাদ-বিসম্বাদের উদ্ভব হয়। এতদ্ভিন্ন ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন কংগ্রেসে ব্রিটেনের ব্যবহারে রাশিয়া যারপরনাই রুষ্ট হইয়াছিল।

রাশিয়া ও মধ্য-প্রাচ্য

ব্রিটেনের রুশ-বিরোধী নীতির প্রতিবাদেই প্রধানতঃ রাশিয়া মধ্য-প্রাচ্যে স্বীয় প্রতিপত্তি স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিল। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত-সমস্যা ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিদ্‌গণকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল।

জার দ্বিতীয় নিকোলাস উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে রাশিয়ার সম্প্রসারণের পথে প্রধান অন্তরায় ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তবর্তী পর্বতমালা ও ব্রিটেন। কিন্তু ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে রাশিয়া সুদূর-প্রাচ্যে সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করিলে ব্রিটেনের সহিত রাশিয়ার সম্পর্কের কিছু উন্নতি হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-রুশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে মধ্য-প্রাচ্যে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদের অবসান ঘটে। বার্লিন-চুক্তি অনুসারে বাটুম ও কার্স রাশিয়ার হস্তগত হইলে ককেসাস (Caucasus) অঞ্চলে রাশিয়ার প্রতিপত্তি ও পারস্যের সহিত রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

ককেসাস

মধ্য-এশিয়া, বিশেষ করিয়া আফগানিস্থানের দিকে রাশিয়ার ক্রমাগ্রগতি ব্রিটেনের ভারতীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। যাহা হউক শেষ পর্যন্ত ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তি অনুসারে রাশিয়া আফগানিস্থানে ব্রিটেনের স্বার্থ স্বীকার করিয়া লয় এবং আফগানিস্থান ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যবর্তী রাজ্য হিসাবে স্বীকৃত হয়।

আফগানিস্থান

পারস্যেও রাশিয়া ও ব্রিটেনের স্বার্থসংঘাত ঘটে। রাশিয়া ও ব্রিটেন যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ পারস্যে নিজেদের স্বার্থ গড়িয়া তুলিয়াছিল। পারস্যের উত্তরাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগ করিয়া রাশিয়া যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন রাশিয়া পারস্য হ্রদে নৌ-ঘাঁটি গড়িয়া তুলিতেও যত্নবান হইয়াছিল। ফলে ব্রিটেনের সহিত রাশিয়ার সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। যাহা হউক শেষ পর্যন্ত ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া ও ব্রিটেন উভয়েই পারস্যের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লয়; উত্তর পারস্য রাশিয়ার প্রভাবিত অঞ্চল এবং দক্ষিণ পারস্য ব্রিটেনের প্রভাবিত অঞ্চল বলিয়া স্বীকৃত হয়।

পারস্য

৯.৫. রুশ-বিপ্লব ও জারতন্ত্রের পতন
(Russian Revolution and fall of the Czarist Regime)

বিংশ শতাব্দীর রুশ-বিপ্লব বিশ্বের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। বিশ্বযুদ্ধের ফলে পশ্চিম-ইওরোপে যখন এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিতে চলিয়াছিল সেই সময় রাশিয়ার এই বিপ্লব সংঘটিত হয় (১৯১৭ খ্রীঃ)। একাধারে এই বিপ্লবকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব বলা যাইতে পারে। ফরাসী-বিপ্লবের পর এই ধরনের বিরাট সামাজিক উৎক্ষেপণ বিশ্বে আর কোথাও সংঘটিত হয় নাই। এই বিপ্লব শুধু রাশিয়াতেই অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনিয়াছিল এমন নহে পরবর্তী কালে ইহার প্রভাব সমগ্র বিশ্বে পরিলক্ষিত হয়।

রুশ-বিপ্লবের কারণসমূহ
(Causes of the Russian Revolution)

ফ্রান্সের ন্যায় রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্রও অকর্মণ্য ও অযোগ্য প্রতিপন্ন হইয়াছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে, জাপানের সহিত যুদ্ধে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে রাশিয়ার একাধিক সামরিক বিপর্যয় জনসাধারণের নিকট জার-তন্ত্রের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। ইহার ফলে অভ্যন্তরীণ বিপ্লব অনিবার্য হইয়া উঠে।

স্বৈরতন্ত্রের অযোগ্যতা

ফ্রান্সের ন্যায় রাশিয়ার সমাজজীবনে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর স্বার্থসংঘাত বিদ্রোহানুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল। রাশিয়ার সামাজিক অবস্থা

তদানীন্তন ইওরোপে সর্বাপেক্ষা হীন ছিল। সমাজ-ব্যবস্থার উচ্চস্তরে অভিজাতশ্রেণী ও নিম্নস্তরে সার্ফ ব্যতীত অন্য কোন মধ্যবর্তী শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। প্রতি হাজার রুশের মধ্যে মাত্র সতেরজন ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত। রাশিয়ার বেশীর ভাগ জমি ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের দখলে এবং ইহারা সরকারের প্রায় সকল উচ্চপদেই নিযুক্ত হইবার একমাত্র অধিকারী ছিল। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সার্ফগণকে মুক্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'মির' নামক গ্রাম্য সমিতির হস্তে গ্রামের সমস্ত জমি অর্পিত হওয়ার ফলে কৃষকগণকে অপর একটি অত্যাচারী সংস্থার অধীনে রাখা হইয়াছিল। এককভাবে জমি চাষ করার মত ক্ষমতা ইহাদের ছিল না। ফলে ইহাদের অর্থনৈতিক দুর্দশা চরমে উঠিয়াছিল এবং যে কোন পরিবর্তনকে ইহারা সাদরে গ্রহণ করিতে ও সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিল।

সার্ফগণের অসন্তোষ

রাশিয়ার বিভিন্ন কারখানার প্রায় পঁচিশ লক্ষ শ্রমিকের আর্থিক অবস্থা সার্ফগণের ন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। কারখানায় ধর্মঘট বা ট্রেড-ইউনিয়ন গঠন করা নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী প্রচার তাহাদিগকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের শ্রমিক-বিদ্রোহ তাহাদের মানসিক চেতনার পরিচয় দিয়াছিল। ইহার পর হইতে রাশিয়ায় বড় বড় শ্রমিক-আন্দোলন নিয়তই লাগিয়া থাকিত এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাহাদের সংগঠন আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে।

শ্রমিক অসন্তোষ

ফ্রান্সের ন্যায় রাশিয়াতেও সাহিত্য-সেবীদের লেখনীর প্রভাব রুশ-বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। ফ্রান্সের ন্যায় পাশ্চাত্য ভাবধারা রুশ সাহিত্যের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। টলস্টয়, ডসটয়েভস্কি, টুর্গেনিভ প্রভৃতি দার্শনিকগণের লেখা সর্বত্র স্বৈরাচারী শাসনের প্রতি এক দারুণ ঘৃণার উদ্রেক করিয়াছিল। এমন কি বাকুনিন ও কার্ল-মার্ক্সের লেখা অভিজাত ও মূলধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেও জার-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং রাশিয়ার শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে স্বদেশের শাসনপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন দাবি করিল।

পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাব

ভাবজগতে বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় নিহিলিজম্ (Nihilism) মতবাদের উদ্ভব হয় যাহার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ার তদানীন্তন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা। অবশ্য পরিশেষে নিহিলিজমের পরিবর্তে সমাজতন্ত্রবাদই অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠে।

অর্থনৈতিক সমস্যা জনসাধারণকে সমগ্রভাবে বিপ্লবমুখী করিয়া তুলিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কয়লার আমদানি হ্রাস পাওয়ায় কলকারখানা বন্ধ হয় এবং যানবাহন একরূপ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। অবশেষে বহুসংখ্যক কৃষককে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান

অর্থনৈতিক সংকট

করিতে বাধ্য করা, সৈন্যবাহিনীতে রসদের অভাব এবং শহর অঞ্চলের খাদ্যদ্রব্যের শোচনীয় অভাব প্রভৃতি কারণে রুশ-বিপ্লব অনিবার্য হইয়া উঠে। জারের এই নীতির বিরুদ্ধে ইহুদী ও জাতীয়তাবাদী প্রজাবর্গের অসন্তোষ প্রকাশ ও তাহাদের বিরোধিতাও বিপ্লবের অন্যতম কারণ।

রুশীকরণ নীতি

রুশ-বিপ্লবের প্রথম অধ্যায়ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টাদশ দশক হইতেই বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল। শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিল। ম্যাক্সিম গোর্কি'র বিপ্লবী সমাজতন্ত্রবাদ কলকারখানার শ্রমিক ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তরোত্তর প্রসারলাভ করিতে থাকে। শিল্প-বিপ্লবের ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় এবং ব্যবসায়ী ও কলকারখানার মালিকগণও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্রের দাবি করিতে থাকে। জনসাধারণও সর্বত্র প্রতিনিধিমূলক জাতীয় পরিষদ, দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা, সকল শ্রেণীর নাগরিকগণের সমান অধিকার, সংবাদপত্রের ও ধর্মের স্বাধীনতা প্রভৃতি নানা বিষয়ের দাবি করে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রী প্লিভির (Plehve) প্রভাবাধীন জার নিকোলাস এই সকল দাবি উপেক্ষা করিয়া কঠোর নীতি গ্রহণ করেন।

সংস্কার আন্দোলন ১/

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের নিকট রাশিয়া পরাজিত হইলে দেশের সর্বত্র গোলযোগের সৃষ্টি হইল। কলকারখানার শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিল এবং কৃষকগণ জমিদারগণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিল। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনিতে অসমর্থ হইয়া জার নিকোলাস ডুমা বা জাতীয়-পরিষদ আহ্বান করিয়া সংস্কার প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু কার্যতঃ স্বৈরতন্ত্রের সহিত পার্লামেন্টারী শাসনতন্ত্রের আপোষ-মীমাংসা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মন্ত্রী স্টলিপিনের (Stolypin) নেতৃত্বে রুশ সরকার দমননীতির আশ্রয় লইলেন। জনসাধারণের অসন্তোষের বহ্নি ইহাতে নির্বাপিত না হইয়া ক্রমশঃই তীব্র আকার ধারণ করিল।

ডুমা বা জাতীয়-পরিষদ 2/

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে জাতি, ধর্ম ও দল নির্বিশেষে জনসাধারণ স্বদেশ রক্ষার্থে জারতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিল এবং জাতীয়-পরিষদে (Duma) সাময়িকভাবে দলগত বিভেদের অবসান হইল। কিন্তু ক্রমাগত জার্মানীর নিকট পরাজিত হইলে এবং গ্যালিসিয়া ও পোল্যান্ড হইতে রুশসৈন্য বিতাড়িত হইলে দেশ-প্রেমিকগণ সামরিক নেতৃবর্গের অযোগ্যতা ও জার সরকারের অকর্মণ্যতার তীব্র নিন্দা করিল। জারিণা তাঁহার পরামর্শদাতা রাসপুটিনের সাহায্যে জার্মানীর সহিত পৃথক সন্ধি করিতে অগ্রসর হইলে পরিস্থিতি আরও জটিল হইয়া উঠিল। জনসাধারণ এই সংবাদে ক্ষিপ্ত হইয়া রাসপুটিনকে হত্যা করিল। অতঃপর সর্বত্র গণ-অভ্যুত্থান দেখা দিল, কৃষকগণ বিদ্রোহী হইল, শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিল এবং রুশসৈন্য দলে দলে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার ক্রমাগত পরাজয় ৩/

রণাঙ্গন পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সর্বোপরি স্বদেশে খাদ্যাভাব এই পরিস্থিতিকে আরও সংকটময় করিয়া তুলিল।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিকগণ পেট্রোগ্রাড শহরে ধর্মঘট করিল। সৈন্যবাহিনী শান্তি স্থাপনের পরিবর্তে ধর্মঘটকারীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিল। গণ-বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ও স্থানীয় শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সৈনিক ও শ্রমিকগণ সম্মিলিতভাবে রাজধানীতে একটি সোভিয়েট বা পরিষদ গঠন করিল। ইতিমধ্যে জার পেট্রোগ্রাডে আসিতে চেষ্টা করিলে মধ্যপথে রেলের লাইন তুলিয়া তাঁহার আসিবার পথ বন্ধ করা হইল। অবশেষে জারের সেনাপতি আইভানভ (Ivanov) পেট্রোগ্রাড পুনরাধিকার করিতে অসমর্থ হইলে জার নিকোলাস নিরুপায় হইয়া দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠন করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন; কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি অতি বিলম্বেই আসিল। জনসাধারণের দাবি হইল জারের সিংহাসন ত্যাগ এবং অবশেষে জার দ্বিতীয় নিকোলাস তাহা করিতে বাধ্য হইলেন। এইভাবে রাশিয়ার প্রাচীন রোমানফ রাজবংশের অবসান ঘটিল এবং রুশ-বিপ্লবের প্রথম অধ্যায় সম্পন্ন হইল। ডুমা বা জাতীয়-পরিষদ একটি অস্থায়ী সরকার স্থাপন করিল।

পেট্রোগ্রাডে বিদ্রোহ

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের সিংহাসন ত্যাগ

রুশ-বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ এই অস্থায়ী সরকার মুখ্যতঃ বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। বিভিন্ন নরমপন্থী বা মডারেট দলের প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই সরকারের উদ্দেশ্য হইল গণতান্ত্রিক, পার্লামেণ্টারী সরকার স্থাপন করা; মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া জার্মানীর সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগের অধিকার রক্ষা করা, গণ-পরিষদ গঠন করিয়া ভূমি-সংক্রান্ত ব্যাপারের মীমাংসা করা এবং নির্বাচিত গণ-পরিষদের মাধ্যমে রাশিয়ার শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করা। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী ও জাপান রাশিয়ার এই পরিবর্তনকে স্বীকার করিয়া লইল। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে এই সরকার কয়েকটি সংস্কার প্রবর্তন করিলেন (যেমন ধর্ম, সংবাদপত্র ও বাক্-স্বাধীনতা)। কিন্তু রাশিয়ার ন্যায় একটি অনগ্রসর দেশের জনসাধারণ রাজনৈতিক সংস্কারের প্রতি বিশেষ উৎসাহী ছিল না। তাহাদের দাবি ছিল দেশে শান্তি ও আর্থিক সচ্ছলতা সুনিশ্চিত করা।

অস্থায়ী সরকার ও উহার উদ্দেশ্য

অস্থায়ী সরকার জনসাধারণের এই দাবি পূরণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় পুনরায় গোলযোগের সূত্রপাত হইল। রাশিয়ার সর্বত্র শ্রমিক ও সৈনিকগণ সোভিয়েট (Soviet) গঠন করিয়া জোর প্রচারকার্য চালাইতে লাগিল। শ্রমিকগণ উচ্চহারে মজুরী দাবি করিয়া ধর্মঘট করিল এবং সৈনিকগণ ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের আদেশ অমান্য করিয়া বিদ্রোহী হইল। কৃষকগণ বলপূর্বক অভিজাত সম্প্রদায়ের জমি দখল

উদারনৈতিকগণের পতন ও মেনশেভিক দলের উত্থান

করিল এবং ফিন, পোল ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী প্রজাবর্গ তাহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করিল। অবশেষে এই সরকারের নেতৃবর্গ বিতাড়িত হইলেন এবং মেনশেভিক (Mensheviks) নামে সমাজতন্ত্রীদল সরকারের কার্যভার গ্রহণ করিল।

কেরেনস্কির নীতি

ইহাদের নেতা ছিলেন আলেকজাণ্ডার কেরেনস্কি (Kerensky) তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল শাসনতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার প্রবর্তন করা এবং জার্মানীর সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া। কিন্তু তাঁহার এই নীতি উগ্রপন্থী সমাজতন্ত্রীদলের (বলশেভিক) মনঃপূত হইল না। বলশেভিক দল (Bolsheviks) যুদ্ধ বন্ধ করার ও বলপ্রয়োগে বর্তমান অবস্থার অবসান করিয়া প্রোলেটেরিয়টদের একাধিপত্য স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল। প্রথমদিকে কেরেনস্কি ও তাঁহার দল সাফল্যলাভ করিলেও, রাশিয়ার অভ্যন্তরে জার্মানীর অগ্রগতি প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইলেন। বলশেভিক দল কর্তৃক

বলশেভিক দল কর্তৃক শাসনভার গ্রহণ

প্রভাবিত হইয়া সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইল। দেশের অশান্তিময় পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া বলশেভিক দলের নেতা লেলিন (Lenin) তাঁহার সহকর্মীদ্বয় ট্রট্স্কি (Trotsky) ও স্টালিনের (Stalin) সাহায্যে বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করিলেন (নভেম্বর ১৯১৯ খ্রীঃ)। এইভাবে রুশ-বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পন্ন হইল এবং রাশিয়ায় প্রোলেটেরিয়টদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল।

১.৬. **রুশ-বিপ্লবের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব (International Significance of the Russian Revolution):** ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বা বলশেভিক বিপ্লব আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। গতি, প্রকৃতি, বিস্তৃতি, আদর্শ ও প্রত্যক্ষ ফলাফলের দিক দিয়া বিচার করিলে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বলশেভিক বিপ্লবকে মহা-বিপ্লব ও বিশ্ব-ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়রূপে বর্ণনা করা যায়। কেবলমাত্র রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেই নহে, বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রেও এই বিপ্লব এক দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। খ্রীষ্টধর্মের অনুশাসন ও উদারনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি বলশেভিক বিপ্লব এক বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানাইয়াছিল। কারণ পশ্চিমী সভ্যতার মূল শক্তির বিরুদ্ধে বলশেভিক বিপ্লব এক নূতন সংগ্রামের সন্ধান দিয়াছিল। পশ্চিম-ইওরোপে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আদর্শ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক আদর্শের উপর বলশেভিক বিপ্লব চরম আঘাত হানিয়াছিল। বলশেভিক বিপ্লব বিশ্বের ধন-সম্পত্তিভোগী সম্প্রদায়ের মনে এক দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল যাহার ফলে গণতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের পর ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের মূলে ছিল সাম্যবাদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ। বলশেভিক বিপ্লব ঔপনিবেশিক জগতেও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ জনগণকে বলশেভিক বিপ্লব মুক্তির সন্ধান দিয়াছিল। এই বিপ্লব পরাধীন

দেশ ও জাতিগুলির সম্মুখে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছিল। চীনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উপর বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাব গভীরভাবে পড়িয়াছিল। সর্বত্র মুক্তি আন্দোলনের সহিত সমাজ উন্নয়নমূলক আন্দোলনেরও সূত্রপাত হইয়াছিল। এককথায় বিশ্বের সর্বত্র প্রচলিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আদর্শের উপর বলশেভিক বিপ্লব এক চরম আঘাত হানিয়াছিল।

৯.৭. **বলশেভিক সরকার ঃ** নব প্রতিষ্ঠিত বলশেভিক সরকারের সম্মুখে বহুবিধ সমস্যা ছিল। প্রথমতঃ, বিপ্লব ও বিপ্লব-প্রসূত পরিবর্তনকে স্থায়ী করা এবং সংখ্যালঘু এই বলশেভিক দলের পশ্চাতে জনসাধারণের সমর্থন লাভ করা। দ্বিতীয়তঃ, অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে বৈদেশিক যুদ্ধের অবসান করা। তৃতীয়তঃ, মার্ক্সবাদকে কার্যে রূপায়িত করা ও বিশ্বে তাহা জনপ্রিয় করিয়া তোলা।

নূতন সরকারের সমস্যা

অভ্যন্তরীণ নীতি ঃ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ও মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া লেনিন স্বদেশের পুনর্গঠন ব্যাপারে মনোযোগী হন। লেনিনের ক্ষমতালাভের প্রাক্কালে রাশিয়ায় গণতান্ত্রিক উপায়ে একটি সংবিধান সভা (Constituent Assembly) নির্বাচিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে বলশেভিকদের সংখ্যা নিতান্ত কম থাকায় ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে বলশেভিকগণ দেশময় এক সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু করে। অভিজাত, জমিদার, জার আমলের সামরিক কর্মচারী ও যাজক—যাহারা বলশেভিক সরকারকে স্বীকার করিতে অসম্মত হইল, উহাদের অধিকাংশকেই হত্যা বা নির্বাসিত করা হয়। বলশেভিক-বিরোধী সকল রাজনৈতিক দলগুলিকে কঠোর হস্তে দমন করা হয়। এমন কি বলশেভিকদের নির্যাতনের হাত হইতে ভূতপূর্ব জার দ্বিতীয় নিকোলাস ও তাঁহার পরিবারবর্গও রক্ষা পান নাই। বলশেভিক সরকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উৎপাদনের উপাদান অর্থাৎ জমি, শ্রম, ইত্যাদি রাষ্ট্রীয়করণ করিলেন। অতঃপর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিতে কাহারও কিছু রহিল না। বিনা ক্ষতিপূরণে কলকারখানা রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত করা হইল। জারের আমলের সমস্ত রাষ্ট্রীয় ঋণ নাকচ করা হইল। রাশিয়ার চার্চকে সরকারী সাহায্য ও সমর্থন হইতে বঞ্চিত করা হইল। সকলের পক্ষে শ্রম বাধ্যতামূলক করা হইল। এককথায় বলশেভিক সরকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া সাম্যবাদ নীতির অনুকরণে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল।

বলশেভিকদের নির্যাতনমূলক নীতি

এই ধরনের অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘরে ও বাইরে প্রতিকূল অবস্থা ও বিরোধী দলের সৃষ্টি করিল। শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সকল সম্প্রদায় যেমন জমিদারশ্রেণী, যাজকশ্রেণী ও বিত্তশালী শ্রেণী বিশেষ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইল। সুতরাং তাহারা বলশেভিক সরকারের বিরোধিতা করিতে লাগিল। ক্ষমতাচ্যুত মেনশেভিক দলও ইহাদের সঙ্গে যোগ দিল। কিন্তু ফ্রান্সের জ্যাকোবাইনদের মত

রাশিয়ার বলশেভিকদল দমন-নীতির আশ্রয় লইয়া দেশময় বিভীষিকার সৃষ্টি করিল। কঠোর দমন-নীতির ফলে বিপক্ষদলের সংহতি বিনষ্ট হইল এবং বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিরোধিতা লোপ পাইল।

পররাষ্ট্রনীতি (১৯১৭-১৯১৯) ঃ পররাষ্ট্রনীতিতে বলশেভিক সরকারের প্রথম কর্তব্য হইল জার্মানীর সহিত একটি আপোষ-মীমাংসা করিয়া শান্তিস্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যে পররাষ্ট্রবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ট্রট্স্কি পেট্রোগ্রাডে অবস্থিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিবর্গের নিকট একটি নোট পাঠাইয়া রুশ সরকারের শান্তির প্রস্তাব জ্ঞাপন করেন। মিত্রপক্ষ ট্রট্স্কির নোট উপেক্ষা করিল বটে কিন্তু কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গ ইহাতে সাড়া দিল। কিছুদিন আলোচনা চলিবার পর ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ বলশেভিক সরকার জার্মানীর সহিত ব্রেস্ট লিটভস্ক (Treaty of Brest-Litovsk)-এর সন্ধি সম্পাদন করিল। এই সন্ধির শর্তগুলি ছিল এইরূপ—(১) রাশিয়া পোল্যাণ্ড, কুরল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়া পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল এবং এই সকল রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভার জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার হস্তে ছাড়িয়া দিল। (২) রাশিয়া লিভোনিয়া, এস্টোনিয়া ও ফিনল্যাণ্ডকে আপন অধিকার হইতে মুক্ত করিতে স্বীকৃত হইল। (৩) রাশিয়া অর্ধাহান, কার্স ও বার্টুম প্রদেশগুলি তুরস্ককে প্রত্যর্পণ করিল এবং (৪) ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে কোনরূপ বলশেভিক প্রচারকার্য চালাইবে না বলিয়া রাশিয়া অঙ্গীকার করিল।

ব্রেস্ট লিটভস্কের সন্ধি (১৯১৮)

এইভাবে রাশিয়া জার্মানী তথা কেন্দ্রীয় শক্তিগুলির সহিত শান্তি স্থাপন করিল। কিন্তু ইহার বিনিময়ে পিটার দি গ্রেটের সময় হইতে রাশিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহার প্রায় সব কিছুই জার্মানীর হস্তে সমর্পণ করিতে হইল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সার্থক করিবার জন্য রাশিয়াকে এই অপমানজনক সন্ধি স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল।

কিন্তু শীঘ্রই ধনতান্ত্রিক জগতে সাম্যবাদী রাষ্ট্র শঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে ইওরোপের সর্বত্রই অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এই অবস্থায় রাশিয়ার শ্রমিক রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত অন্যত্র শ্রমিকগণকে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতে পারে—পশ্চিমী শক্তিবর্গ এইরূপ আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এই কারণে মিত্রশক্তি রাশিয়ার বলশেভিক সরকারকে স্বীকার করিতে চাহিল না। উপরন্তু জার-আমলের যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ঋণ লেনিন নাকচ করায় পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ অধিকতর অসন্তুষ্ট হইল। সুতরাং তাঁহারা সম্মিলিতভাবে রাশিয়ার নব-প্রতিষ্ঠিত বলশেভিক শাসনকে উচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইল। উত্তর-রাশিয়াতে বলশেভিক-বিরোধী দলকে সাহায্য করার জন্য মিত্র-রাষ্ট্রবর্গের সৈন্যবাহিনী আরচাঞ্জেল (Archangel) ও মারমানস্ক (Murmansk) অঞ্চলে প্রবেশ করিল।

ইওরোপীয় অন্যান্য রাষ্ট্রের বিরোধিতা

রাশিয়ার সাফল্য

অপরদিকে জাপানের সৈন্যবাহিনী ভ্ল্যাডিভস্টক (Vladivostak) দখল করিয়া লইল। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ককেসাস ও ফরাসী সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ-রাশিয়ার কিছু অঞ্চল দখল করিয়া রুশ-বিপ্লব বিরোধী আন্দোলনকে সাহায্য করিতে লাগিল। রাশিয়া যখন চতুর্দিকে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত সেই সময় পোল্যাণ্ড ফ্রান্সের সমর্থন লাভ করিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। দুই বৎসর ধরিয়া রাশিয়ায় অন্তর্বিপ্লব ও বৈদেশিক আক্রমণ চলিতে থাকায় এক দারুণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাবে অগণিত রুশ নরনারী প্রাণ হারায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলশেভিকদের জয়লাভ ঘটে। পশ্চিমী শক্তিবর্গ রণক্লান্ত হইয়া রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ বন্ধ করে ও উহাদের সেনাবাহিনী রাশিয়া হইতে সরিয়া আসে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বলশেভিক সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ প্রতি-বিপ্লবের অবসান ঘটে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী এবং দশ বৎসর পরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার কমিউনিস্ট সরকারকে স্বীকার করিয়া লয়।

সাফল্যের কারণ

বলশেভিক সরকারের সাফল্যের কারণ হইল (১) বিপ্লব-বিরোধী দলগুলির মধ্যে সংহতির অভাবহেতু তাহারা সম্মিলিতভাবে অধিকদিন সংগ্রাম চালাইতে পারে নাই। সাধারণতন্ত্রীদের সহিত রাজতন্ত্রী এবং রাষ্ট্রবিদ্‌গণের সহিত সামরিক নেতৃবর্গের মনোমালিন্য ও মতদ্বৈততা বলশেভিক সরকারকে বিদ্রোহ দমন করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। (২) বিপ্লব-বিরোধী আন্দোলন সফল হইলে পূর্বতন অত্যাচারী জমিদারগণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইবে এই আশঙ্কায় রাশিয়ার কৃষক সম্প্রদায় সর্বতোভাবে বলশেভিক সরকারকে সাহায্য করিয়াছিল। (৩) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে বিদেশী আক্রমণকারীদের নিজ নিজ দেশে বিবিধ সমস্যা থাকার ফলে তাহারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইয়া অযথা অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা সকলেই নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী রাশিয়া হইতে অপসারণ করিয়া লইল। এইভাবে বলশেভিক সরকার আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়া রাশিয়ায় বিপ্লব স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিল।

অতঃপর রাশিয়া পোল্যাণ্ড ও বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহের সহিত শান্তি স্থাপন করিল। ইউক্রেন ট্রান্স-ককেসিয়ান প্রদেশসমূহ ও সাইবেরিয়াতে সোভিয়েটতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। ইওরোপের সর্বত্র রাষ্ট্রদূত পাঠাইয়া বলশেভিক সরকার কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে যত্নবান হইল।

৯.৮. **সোভিয়েট সংবিধান (Soviet Constitution) :** মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট সংবিধান রচিত ও গৃহীত হইলে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় কাঠামো সুনির্দিষ্ট হয়। প্রতিটি শহরে ও জেলায় সোভিয়েটে বা শ্রমিক-সংঘ গঠিত হয়। আঞ্চলিক সোভিয়েটগুলির নির্বাচিত সদস্যগণ প্রাদেশিক সোভিয়েটে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার দেওয়া হয়। প্রাদেশিক সোভিয়েটগুলির

প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হয় সর্ব-রাশিয় কংগ্রেস। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা এই কংগ্রেসে ন্যস্ত হয়। কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি (Central Executive Committee) নির্বাচন করার অধিকার জাতীয় কংগ্রেসকে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিকে রাষ্ট্রের মন্ত্রিসভা (People's Commissars) গঠনের অধিকার দেওয়া হয়। সোভিয়েট নির্বাচনের আঠার বৎসর বা তদূর্ধ্ব সকল পুরুষ বা নারীকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। এই ভোটাধিকারের একমাত্র শর্ত ছিল নিজ শ্রম দ্বারা উপার্জন করা। বিপ্লবী সৈনিক ও নাগরিকগণকেও ভোটাধিকার দেওয়া হয়। তবে ভোট-প্রথা এমনভাবে স্থির করা হয় যাহাতে গ্রামের কৃষকদের তুলনায় শহরের শ্রমিকদের প্রতিপত্তি বেশী লাভ করিতে পারে। নূতন সংবিধানে রাশিয়ার নামকরণ হইল ইউনিয়ন অফ সোস্যালিস্ট সোভিয়েট রিপাবলিক (U.S.S.R)। সাম্রাজ্যের পরিবর্তে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। সমগ্র রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রোলেটেরিয়েটদের বা জনসাধারণের একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার বলশেভিকদের (Bolshevists) একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। বলশেভিকদলের প্রধান ছিলেন লেনিন।

সোভিয়েট শাসনব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—যথা, প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতা একমাত্র প্রোলেটেরিয়টদের হস্তেই সীমিত রাখা হয়। সোভিয়েট শাসনব্যবস্থা হইল একদলীয় একনায়কতন্ত্র। অর্থাৎ একমাত্র শ্রমিক ও কৃষকদের হস্তেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সীমিত রাখা হয়। অবশ্য সোভিয়েট সংবিধানের প্রধান লক্ষ্য ছিল শ্রেণীগত বৈষম্যের অবসান এবং শ্রেণীগত সংঘর্ষের অবসান করা। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল পরোক্ষ প্রতিনিধিত্বের ব্যাপকতা। সমগ্র রুশ জনগণের শতকরা ৮০ ভাগ যুক্তরাষ্ট্রের কোন ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, সোভিয়েট শাসনব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বণ্টনের ব্যবস্থা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়। বিচারব্যবস্থাও যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয় এবং বিপ্লব-প্রসূত সমাজ-ব্যবস্থা রক্ষা করাই বিচার বিভাগের প্রধান দায়িত্ব বলিয়া স্থির হয়।

সোভিয়েট শাসনের বৈশিষ্ট্য

'বলশেভিজম্' বা বলশেভিক মতবাদ হইল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন। ইহার রাজনৈতিক আদর্শ হইল প্রোলেটেরিয়েট বা শ্রমিকদের একনায়কতন্ত্র। বলশেভিক মতবাদ হইল একমাত্র শ্রমিক ছাড়া অন্যান্য সকল সামাজিক শ্রেণীর অস্তিত্ব অস্বীকার করা এবং একমাত্র শ্রমিক ছাড়া অন্যান্য সকল শ্রেণীকে উৎখাত করা। বলশেভিক মতবাদের অর্থনৈতিক আদর্শ মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধনতন্ত্রবাদের অবসান ঘটাইয়া সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা করাই বলশেভিকদের মূল লক্ষ্য। সকল প্রকারের ব্যক্তিগত মূলধনের অবসান ঘটাইয়া জমি ও উৎপাদনের মাত্রা সকল উপাদান রাষ্ট্রীয়করণ করাই হইল বলশেভিজম্-এর আদর্শ।

বলশেভিক মতবাদ

১.৯. রাশিয়ার অর্থনৈতিক পুনর্গঠন (Economic Reconstruction of Russia) :

রাশিয়ায় কমিউনিস্ট শাসনের প্রথম তিন বৎসরে রাজনৈতিক পরিবর্তনের তুলনায় অর্থনৈতিক পরিবর্তন অধিকতর বৈপ্লবিক আকার ধারণ করিয়াছিল। মার্ক্সবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা অনুসারে পুঁজিপতি ও জমিদারগণের অত্যাচার ও শোষণ হইতে শ্রমিক ও প্রজাবর্গকে রক্ষা করার এবং ভূমি, বন, খনি, যানবাহন, বাণিজ্য প্রভৃতি জাতীয় জীবনে প্রয়োজনীয় সকল কিছুর রাষ্ট্রীয়করণ বা জাতীয়করণ (nationalisation) করার প্রয়োজন রাশিয়ার কমিউনিস্ট শাসকগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারা উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও উপভোগ্য ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত করিয়া সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় বেকার-সমস্যা ও শ্রমিক-মালিক বিরোধের অবসান ঘটাইবার পক্ষপাতী ছিলেন।

বলশেভিকদের জাতীয়করণ ও রাষ্ট্রীয়করণ কর্মসূচীর ফলে সাম্যবাদী আদর্শের সম্মুখে এক কঠিন সমস্যার উদ্ভব হয়। জমিদারদের অত্যাচার হইতে মুক্ত হইয়া কৃষকগণ রাষ্ট্রায়ত্তের পরিবর্তে জমি নিজেদের ভোগ-দখলে রাখিবার দাবি করে এবং ফসলের লভ্যাংশ সরকারকে দিতে অস্বীকার করে। সরকার উহাদের দাবি মানিয়া লইতে অসম্মত হইলে কৃষকরা স্বেচ্ছায় উৎপাদন কমাইয়া দেয়। ফলে রাশিয়ায় দারুণ খাদ্যের অভাব দেখা দেয় এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তথায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটে। দুর্ভিক্ষের ফলে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। আমেরিকায় ও ইওরোপের অনেক দেশ অকাতরে ত্রাণের ব্যবস্থা করিলে অবস্থার উন্নতি ঘটে।

কৃষক অসন্তোষ

কৃষির ন্যায় শিল্পের ক্ষেত্রেও এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

সোভিয়েট শাসনের প্রথমদিকে রাশিয়ায় মার্ক্সীয় সাম্যবাদের অনুসরণে অভ্যন্তরীণ নীতি পরিচালিত হয়। প্রথমদিকে কমিউনিস্ট শাসকগণ কেবলমাত্র বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করেন। কিন্তু অচিরেই তাঁহারা ছোট, বড় সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে থাকেন। জমি-জায়গা, কল-কারখানা, খনি প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদানগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে রাশিয়ার অর্থনৈতিক জীবনে এক দারুণ সংকট দেখা দেয় এবং সর্বত্র এক দারুণ গোলযোগ ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। কলকারখানার শ্রমিকদের হস্তেই উহাদের পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছিল। কিন্তু শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার অভাবহেতু কলকারখানাগুলি বন্ধ হইয়া যায়। দেশের উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং ইহা ছাড়া সোভিয়েট সরকার পূর্বতন সংগঠক ও কারিগরদের সহযোগিতালাভে বঞ্চিত হন। বিদেশ হইতেও উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানী করা সম্ভব ছিল না। ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় এক দারুণ অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক

প্রথম দিকে মার্ক্সীয় সাম্যবাদ নীতির প্রয়োগ ও উহার কুফল

কমিটিগুলির (Labour Committee) মধ্যে কোনরূপ যোগাযোগ ও সহযোগিতা না থাকায় শিল্প-সংকটের উদ্ভব হয়।

শিল্প-সংকটের অবসানকল্পে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে শিল্প-পরিচালনার দায়িত্ব কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থাপন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার শিল্পকেও রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। অন্তর্দেশীয় এবং বহির্বাণিজ্যও রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। বাণিজ্যপোত ও ব্যাংকগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় এবং উহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। দেশের অর্থনৈতিক জীবন সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে একটি সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদ (Supreme Economic Council) গঠন করা হয়। উহার হস্তে কারখানাগুলিতে কাঁচামাল, কয়লা ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার এবং শ্রমিকগণকে খাদ্য সরবরাহ ও বেতন প্রদান করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কিন্তু রাশিয়ার তদানীন্তন পরিস্থিতিতে 'সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদ' উহার দায়িত্ব-পালনে অসমর্থ হয়, উৎপাদনের পরিমাণ অভাবনীয়ভাবে কমিয়া যায় এবং সকল প্রকার সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে কৃষকদের সঙ্গেও সোভিয়েট সরকারের বিরোধ শুরু হয়। শস্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিশেষ বিভাগের প্রতিষ্ঠা করা হয়। বলপ্রয়োগে কৃষকদের নিকট হইতে শস্য আদায় করা হয়। ফলে কৃষকদের মধ্যে এক দারুণ অসন্তোষ দেখা দেয় এবং উহারা নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ শস্য উৎপাদনে বিরত থাকে।

সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদের প্রতিষ্ঠা

সাম্যবাদের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় প্রয়োগের ফলে প্রথমদিকে রাশিয়ার অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয় আসিয়াছিল। শিল্প-শ্রমিকগণ কৃষকগণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনে অসমর্থ হয়। অপরদিকে কৃষকগণ শস্যের বিনিময়ে কোনরূপ ফললাভে ব্যর্থ হইলে শস্য উৎপাদনের পরিমাণ কমাইয়া দেয়। ফলে শস্যের ঘাটতি হয় এবং শিল্প-শ্রমিকগণকে উহাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করিতে সোভিয়েট সরকার অসমর্থ হয়। ফলে শিল্পাঞ্চলগুলিতে শ্রমিক-অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং শহরগুলিতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার উদ্ভব হয়।

প্রাথমিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফলাফল

এইরূপ পরিস্থিতিতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে লেনিন তাঁহার 'নূতন অর্থনৈতিক নীতির' (New Economic Policy—N. E. P.) কথা ঘোষণা করেন। পরিবহণ ব্যবস্থা, বৃহদাকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে সরকারী কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সোভিয়েট সরকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু সুযোগ-সুবিধা মঞ্জুর করেন। 'নূতন অর্থনৈতিক নীতি' অনুসারে সরকার কৃষকদের নিকট হইতে বলপূর্বক শস্য আদায় করার পরিবর্তে উহাদের উপর নির্দিষ্ট হারে কর ধার্য করেন। কর প্রদানের পর যে শস্য উদ্বৃত্ত থাকিত তাহা কৃষকগণ ইচ্ছামত বিক্রয় করার অধিকার পাইল। ইহার ফলে

নূতন অর্থনৈতিক নীতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

'নূতন অর্থনৈতিক নীতি' কৃষি

অধিক পরিমাণে শস্য উৎপাদনে কৃষকগণ পুনরায় উৎসাহিত হইল এবং চাষের মাত্রাও বৃদ্ধি পাইল। জমির প্রচলিত মালিকানাস্বত্ব সুনির্দিষ্ট হইল। যদিও জমির উপর সরকারের কর্তৃত্ব ঘোষিত হইতে থাকে তথাপি সকল দিক দিয়া জমির মালিকানাস্বত্ব কৃষকগণেরই রহিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্দোবস্ত করার এবং কৃষির ব্যাপারে নির্দিষ্ট সংখ্যক মজুর নিয়োগ করার অধিকার স্বীকৃত হইল।

শিল্প

শিল্পের ব্যাপারেও রাষ্ট্রায়ত্তকরণ নীতি কিঞ্চিৎ শিথিল করা হয়। ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও ক্ষুদ্র কলকারখানাগুলির উপর হইতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া লওয়া হইল। তবে বৃহদাকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণের অধিকার পূর্বতম সরকারের হস্তেই নিবন্ধ রহিল। কতকগুলি স্বতন্ত্র ইউনিট বা বিভাগে-শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সংগঠন করা হইল এবং প্রতিটি বিভাগ সরকারের নিকট দায়িত্বশীল রহিল। এই শিল্প-বিভাগগুলিকে কাঁচামাল সংগ্রহের এবং শিল্পোৎপাদিত সামগ্রী নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করার অধিকার দেওয়া হইল।

ব্যবসা বাণিজ্য

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে রহিল। বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করার ব্যবস্থা হইল। অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে ব্যক্তিগত মূলধন নিয়োগ করার অধিকার স্বীকার করা হইল। ফলে ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমশঃ প্রসারলাভ করিতে লাগিল। পুনরায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা স্বীকৃত হইল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে লেনদেন শুরু হইল।

'নূতন অর্থনৈতিক নীতির'-র ফলাফল

সুতরাং 'নূতন অর্থনৈতিক নীতি'-র প্রয়োগের ফলে বৃহদাকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রের একচেটিয়া হইল এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য, কৃষি ও ক্ষুদ্রাকার শিল্পে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হইল। প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র ও ব্যক্তিগত ধনতন্ত্রের এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটিল। গোঁড়া সাম্যবাদী নীতি বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হইলেও এই নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফলে রাশিয়া অর্থনৈতিক বিপর্যয় হইতে রক্ষা পাইল। শিল্প ও কৃষির উৎপাদন অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইল এবং পাঁচ বৎসরের মধ্যে রাশিয়ার যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থা ফিরিয়া আসিল। অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ভিত্তিও সুদৃঢ় হইল।

৯.১০. যোসেফ স্টালিনের উত্থান (Rise of Stalin) ঃ 'নূতন অর্থনৈতিক নীতি' অনুসারে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনকার্য চলিতে থাকাকালীন কমিউনিস্টদলের নেতৃবর্গের মধ্যে এক দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। যতদিন লেনিন রাশিয়ার

কর্তৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত এই অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রবল হইয়া উঠে নাই কারণ লেনিনের প্রভাব ও ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ এবং সকলেই তাঁহার নেতৃত্ব বিনা প্রতিবাদে অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল। কিন্তু ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যু হইলে কমিউনিস্ট নেতৃবর্গের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিবাদ প্রবল আকার ধারণ করে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূল লক্ষ্য ছিল কমিউনিস্টদলের সর্বোচ্চ নেতৃপদ লাভ করা।

লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব

এই সকল নেতৃবর্গের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিলেন—ট্রট্স্কি (Trotsky), জিনোভিয়েভ (Zinoviev), স্টালিন (Stalin), রিকভ (Rykov), কেমেনেভ (Kamenev) প্রভৃতি। ট্রট্স্কি ছিলেন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রথম 'কমিশার' (Commissar) এবং লাল ফৌজের (Red Army) স্রষ্টা। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত বক্তা ও প্রতিভাসম্পন্ন বিপ্লবী। এতদ্ভিন্ন ট্রট্স্কি ছিলেন সাম্যবাদে ঘোর বিশ্বাসী এবং অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন অপেক্ষা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদ বিস্তারের প্রতি তাঁহার অধিক আগ্রহ ছিল। লেনিনের পর ট্রট্স্কি যে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবেন সে বিষয়ে বিদেশীয়গণেরও কোন সন্দেহ ছিল না। জিনোভিয়েভ ছিলেন তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল (Third International)-এর সংগঠক এবং তিনি সমগ্র বিশ্বে প্রোলেটারিয়েট বিপ্লব ঘটাইবার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদের প্রচার-কার্যে বিশ্বাস করিতেন। স্টালিন ছিলেন কমিউনিস্ট নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে অন্যতম। সাম্যবাদী কার্যকলাপের জন্য তিনি একাধিকবার কারাদণ্ডে ও নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। রাশিয়ার বিপ্লব পরিচালনা ও বলশেভিক দলের সংগঠন ব্যাপারে তাঁহার দান অপরিসীম। তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট দলের জেনারেল সেক্রেটারী এবং কমিউনিস্ট মুখপাত্র 'প্রাভদা'র (Pravda) সম্পাদক। দলের জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে তিনি প্রভূত ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিলেন। লেনিন স্টালিনকে অনেক সময় 'অত্যন্ত নিষ্ঠুর' ও অত্যন্ত নির্মম বলিয়া অভিহিত করিয়া-ছিলেন। রিকভ অল্পবয়সে লেনিনের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। সাম্যবাদী কার্যকলাপের জন্য তিনিও বহুবার কারাদণ্ডে ও নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন লেনিনের ব্যক্তিগত সচিব (Private Secretary) ও এক সময় সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদ-এর (Supreme Economic Council) সভাপতি। কেমেনেভ ছিলেন ফ্রান্সের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট মিলেরাঁ-র অধীনে আইন-শ্রেণীর ছাত্র এবং পরে শ্রমিক ও প্রতিরক্ষা পরিষদের সভাপতি। লেনিন কেমেনেভকে যথার্থ কমিউনিস্ট বলিয়া মনে করিতেন না। রাশিয়ার এই প্রথম স্তরের নেতৃবর্গের মধ্যে স্টালিন, জিনোভিয়েভ ও কেমেনেভের মধ্যে একটি ত্রি-মৈত্রী জোট (triumvirate) গঠিত হয় এবং ইহার মধ্যমণি ছিলেন স্টালিন। এই দল হইতে ট্রট্স্কিকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরাইয়া রাখা হয় এবং তাঁহার বিরুদ্ধে একরূপ জেহাদ ঘোষণা করা হয়।

লেনিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্টালিন ও ট্রটস্কি কর্তৃক পরিচালিত দুই পরস্পর-বিরোধী দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। স্টালিনবাদী দল বিশ্বাস করিত যে নিকট ভবিষ্যতে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির দ্বারা রাশিয়া আক্রান্ত হইতে পারে না। অপরদিকে ট্রটস্কিবাদী দল বিশ্ব-বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিল। স্টালিনবাদী দল রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সহযোগিতা কামনা করিত। কিন্তু অপরদিকে ট্রটস্কিবাদী দল এইরূপ সহযোগিতা কমিউনিস্ট আদর্শের ঘোর বিরোধী বলিয়া মনে করিত। প্রকৃতপক্ষে স্টালিনবাদী ও ট্রটস্কিবাদী দল যথাক্রমে রাষ্ট্রীয় সংহতি ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সমর্থন করিতেছিল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে ট্রটস্কি স্টালিনের নিকট পরাজিত হইয়া দেশত্যাগী হন এবং ট্রটস্কি অনুচরবর্গ ও রাষ্ট্রীয় ও সামরিক বিভাগ হইতে বহিষ্কৃত হন।

স্টালিন বনাম ট্রটস্কি

ট্রটস্কি পরাজিত ও বিতাড়িত হইলে পর স্টালিন, জিনোভিয়েভ ও কেমেনেভের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রভুত্ব স্থাপনে উদ্যোগী হন। কৃষককুল ছিল স্টালিনের প্রধান সমর্থক। কিন্তু এই সময় কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দারুণ অসন্তোষ দেখা দিলে স্টালিন কৃষকগণকে সন্তুষ্ট করার জন্য নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা মঞ্জুর করার সুপারিশ করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বৈদেশিক রাষ্ট্রের নিকট হইতে অর্থনৈতিক সাহায্যলাভের জন্যও উদ্যোগী হন। কিন্তু জিনোভিয়েভ ও কেমেনেভ স্টালিনের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন। তথাপি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে স্টালিন কমিউনিস্ট দলের সর্বোচ্চ কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যকে স্বপক্ষভুক্ত করিতে সমর্থ হন। ইহার ফলে ট্রটস্কির ন্যায় জিনোভিয়েভ ও কেমেনেভ স্টালিন কর্তৃক অপমানিত ও ক্ষমতাচ্যুত হন এবং রাশিয়ায় স্টালিনের সর্বাত্মক ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

স্টালিন, জিনোভিয়েভ ও কেমেনেভের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব

দলীয় কংগ্রেসে স্টালিনবাদীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ ও স্টালিনের সাফল্য

অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ঃ স্টালিনের সহিত বিরোধের কালে ট্রটস্কি এই কথাই প্রচার করিতেছিলেন যে স্টালিন ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন করিয়া রুশ-বিপ্লব ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর। প্রকৃতপক্ষে স্টালিন ও তাঁহার অনুচরগণ লেনিনের নূতন অর্থনৈতিক নীতিকে সাময়িক পরিকল্পনা হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কৃষককুল তথা 'কুলাক' সম্প্রদায়কে (সমৃদ্ধ কৃষকশ্রেণী) কিছু সুযোগ-সুবিধা মঞ্জুর করিতেও সম্মত ছিলেন। কিন্তু ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পর স্টালিন তাঁহার পূর্বতন নীতি পরিবর্তন করেন। রাশিয়ার শিল্প ও কৃষির উন্নয়নের জন্যই তিনি দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Five-year Plans) গ্রহণ করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯২৮-৩৩ খ্রীঃ) গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল (১) আধুনিক কারিগরী শিক্ষার প্রবর্তন করা, (২) রাশিয়াকে

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯২৮-৩৩)

কৃষিপ্রধান দেশ হইতে শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত করিয়া ধনতান্ত্রিক দেশগুলির উপর রাশিয়ার নির্ভরশীলতার অবসান করা,* (৩) ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি সাধন করা, (৪) বৃহদাকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া শিল্প, পরিবহণ ও কৃষির উপযোগী যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা এবং (৫) রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা।

উৎপাদন, বণ্টন ও আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য পরিকল্পনা গৃহীত হয়। যন্ত্রের সাহায্যে এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নের চেষ্টা শুরু হয়।

রাষ্ট্রাধীনে কৃষি যৌথ প্রতিষ্ঠান

পরিকল্পিত অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তির উপর কৃষির উন্নয়ন সাধন করা প্রয়োজন ছিল। কতকগুলি কৃষি যৌথ প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে রাখা হয়। ইহার ব্যয়ভার রাষ্ট্রের হস্তেই ন্যস্ত করা হয় এবং এইগুলির উৎপাদনও রাষ্ট্রের অধিকারে রাখা হয়। এতদ্ভিন্ন কৃষির উন্নতির জন্য বৃহদায়তনের যৌথ কৃষিক্ষেত্রও গড়িয়া তোলা হয়।

কৃষি সমবায়

সমাজতন্ত্রের ভিত্তির উপর কৃষি-উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায় ছিল কুলাক-শ্রেণী (Kulak)। সুতরাং কুলাক বা সমৃদ্ধিশালী কৃষকগণকে উচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তাহা কার্যকর করা হয়। কুলাকগণ ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে ও সরকারকে নানাভাবে বাধা দিতে থাকে। ফলে হাজার হাজার কুলাকগণকে জমিচ্যুত করা হয় এবং যাহারা বাধা প্রদান করিল উহাদের অধিকাংশকেই নির্বাসিত ও হত্যা করা হয়। ইহার ফলে প্রথমদিকে কৃষির যথেষ্ট অবনতি ঘটে এবং ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৃষি-সমবায় আন্দোলন সফল হয় এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাশিয়ার শতকরা ৯৮ ভাগ জমি রাষ্ট্রায়ত্ত হয়।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকর করার পথে সমস্যাও ছিল প্রচুর। এগুলির মধ্যে আর্থিক সমস্যা ছিল সর্বপ্রধান। পরিকল্পনা সার্থক করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েট

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যে অন্তরায় আর্থিক সমস্যা

সরকার খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করেন এবং জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করেন। বৈদেশিক রাষ্ট্র হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য রাশিয়া উদ্বৃত্ত শস্য রপ্তানি করার নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার ফলে রাশিয়ার রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য অভাবনীয়ভাবে কমিয়া যায়। ইহার ফলে রাশিয়ার নূতন অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। এই অবস্থায় সোভিয়েট সরকার রপ্তানির উপযোগী সামগ্রীর উৎপাদন হ্রাস করেন এবং কঠোর খাদ্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক বেনস্ (Benns)-এর

*"The five year plan, nevertheless, undoubtedly constituted a land-mark in Russian industrial history."—(Benns —P.292)

ভাষায় "The world beheld the curious anomaly of a people forced to live on short rations."

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকর করার পথে রাশিয়ার অপর সমস্যা ছিল অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ও সুদক্ষ শ্রমিকের অভাব। এই সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্য বহু কারিগরী শিক্ষার কেন্দ্র ও শিক্ষায়তন স্থাপন করা হয়। এতদ্ভিন্ন বৈদেশিক কারিগরী প্রতিষ্ঠান (Technical firms) ও বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। বৈদেশিক ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞগণ রাশিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেন।

অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ও সুদক্ষ শ্রমিক সমস্যা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল (Results of the First Five Year Plan) ঃ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে রাশিয়া কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে অনেকটা স্বাবলম্বী হইয়া উঠিল। বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প গড়িয়া উঠিল। এই সময়ের মধ্যে (১৯২৮-৩৩ খ্রীঃ) বিশ্বের অন্যান্য বৃহৎ রাষ্ট্রের তুলনায় রাশিয়া শিল্পোন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইল। যন্ত্রপাতি ও পেট্রোলিয়াম পরিকল্পনার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা অতিরিক্ত উৎপাদিত হইল। কিন্তু অপরদিকে লৌহ, ইস্পাত, কয়লা ও বস্ত্র উৎপাদনের দিক দিয়া আশানুরূপ সাফল্য ঘটিল না। এতদ্ভিন্ন বৃহদায়তন শিল্প গড়িয়া উঠিল বটে, কিন্তু সেগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ব্যাপারে বহুবিধ অসুবিধা রহিয়া গেল। কৃষির ক্ষেত্রেও উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পাইল এবং যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কৃষির ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য ঘটিল না।

সমগ্রভাবে বিচার করিলে বলা যায় যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রুশ জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে সক্ষম হয় নাই। যদিও মুদ্রার মান বৃদ্ধি পায় তথাপি দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয় হ্রাস পায় নাই এবং ইহার ফলে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায় নাই। ইহার প্রধান কারণ ছিল (১) রপ্তানি হইতে আশানুরূপ আয় হয় নাই এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে জিনিষপত্রের দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। (২) দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীর ছিল একান্ত অভাব। কৃষি-জমি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু উপযুক্ত চাষ ও পরিকল্পনার অভাবে কৃষির উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। ইহার ফলে ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সর্বত্র দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেয়। (৩) বৃহদায়তন শিল্প স্থাপন এবং ইস্পাত, পেট্রোলিয়াম ও কয়লা উৎপাদনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হওয়ায় দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীর উৎপাদন অবহেলিত হয়। ফলে এই সকল সামগ্রীর অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। তথাপি রাশিয়ার শিল্পোন্নতির ইতিহাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ছিল যুগান্তকারী ঘটনা।* ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট

* "The five year plan was a declaration of economic independence against the outside world."—Benns—Europe since 1914—P. 199.

পার্টি কংগ্রেস দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করিল এবং তাহা ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে চালু করা হইল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইল। শ্রমিকগণের উপযুক্ত শিক্ষা, উৎপাদনে খরচ হ্রাস এবং উৎপাদিত সামগ্রীর মান উন্নয়ন প্রভৃতির উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হইল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জনসাধারণের বৈষয়িক উন্নয়নের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হইল। নূতন নূতন শহরের প্রতিষ্ঠা এবং নাগরিকগণের সকল প্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৩৩-৩৮)

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল আশানুরূপ হইয়াছিল। লোহ, ইস্পাত, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি বৃহদায়তন শিল্পগুলির উৎপাদন পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট ইউনিয়ন লোহ ও ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন শ্রমিকগণের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন খরচ হ্রাস পায়। কৃষির ক্ষেত্রেও অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় যে পরিমাণে শস্যের ফলন হইয়াছিল তাহা ইহার পূর্বে কখনও হয় নাই। তামাক, ফল, তুলা ও চিনির উৎপাদন অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। এক কথায় ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতিসাধনের ফলে রাশিয়া বহুল পরিমাণে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে সমর্থ হয়। যৌথ কৃষিক্ষেত্রে যোগদান করিতে রাশিয়ার কৃষকগণ প্রথমদিকে আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু যৌথ কৃষিকার্যের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া উহারা অতঃপর স্বেচ্ছায় দলে দলে ইহাতে যোগদান করে। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। কৃষকগণ উহাদের উদ্বৃত্ত শস্য উপযুক্ত দামে বাজারে বিক্রয় করার অধিকার পাওয়ায় উহাদের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল

৯.১১. ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের শাসনতন্ত্র) The Constitution of 1936) : প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া সোভিয়েট নেতৃবর্গ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষণা করেন যে সাম্যবাদের অগ্রগতির পথে রাশিয়া উহার প্রাথমিক লক্ষ্যে পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছে। এ যাবৎ কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধবাদী দলগুলির বিরুদ্ধে যে সকল বাধানিষেধ প্রবর্তন করা হইয়াছিল সেগুলি কিঞ্চিৎ পরিমাণে শিথিল করার সিদ্ধান্ত সোভিয়েট নেতৃবর্গ গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যাপারে জনসাধারণকে কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ সোভিয়েট কংগ্রেস একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিল। ইহা 'স্টালিন-শাসনতন্ত্র' (Stalin Constitution) নামেও পরিচিত। এই নূতন শাসনতন্ত্র ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চালু করা হইল। এই শাসনতন্ত্র অনুসারে সর্বোচ্চ সোভিয়েট কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা

সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বোচ্চ সোভিয়েট (Supreme Soviet of the U.S.S.R.)-এর হস্তে অর্পণ করা হইল। প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্রের (Union Republics)' গঠনতন্ত্রেও কিছু পরিবর্তন সাধন করা হইল। ভোটদানের ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হইল। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে আঠারো বৎসরের ঊর্ধ্বের সকল নাগরিককে জাতি, ধর্ম, গোষ্ঠী ও শিক্ষা নির্বিচারে ভোট প্রদানের ও প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হইল। অবশ্য একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিক-সংঘ, যুব-প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মনোনীত প্রার্থীই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকারী ছিলেন। হস্ত-উত্তোলনের পরিবর্তে 'সিক্রেট-ব্যালট' (Secret ballot) বা 'গোপন-পত্রের মাধ্যমে ভোটদানের ব্যবস্থা করা হইল। পরোক্ষ নির্বাচনের পরিবর্তে প্রায় সকল ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের নীতি গৃহীত হইল। এযাবৎ প্রোলেটারিয়েটদের অনুকূলে কৃষকদের বিরুদ্ধে যে বৈষম্যমূলক নীতি প্রচলিত ছিল তাহা বাতিল করা হইল। কৃষকগণকে প্রোলেটারিয়েটদের সম-অধিকার প্রদান করা হইল।

রাশিয়ার কমিউনিস্ট নেতৃবর্গ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের শাসনতন্ত্রকে গণতন্ত্রসম্মত বলিয়া প্রচার করিলেও ইহাকে ব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের শাসনতন্ত্রের ন্যায় যথার্থ গণতন্ত্রসম্মত বলা যায় না। প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে রুশ-ভোটদাতাদের কোন প্রকার মনোনয়ন বা বাছাই করার সুযোগ ও অধিকার ছিল না।

নূতন শাসনতন্ত্রের সমালোচনা

এতদ্ভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কোন প্রকার আন্দোলন করা বা উহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সমালোচনা করা দেশদ্রোহিতা বলিয়া বিবেচিত হইল। প্রকৃতপক্ষে স্টালিনের বিরুদ্ধে এবং স্টালিনবাদের (Stalinism) বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করার অপরাধে বহু গণ্যমান্য রুশ নেতাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল।

৯.১২. **শিক্ষা ও ধর্ম (Education and Religion) :** অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়নসাধন ছাড়াও সোভিয়েট নেতৃবর্গ শিক্ষা ও ধর্মের ক্ষেত্রেও বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। রাশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট সরকার শিক্ষাবিস্তারের প্রতিও বিশেষ যত্নবান

সোভিয়েট সরকারের শিক্ষা-নীতির লক্ষ্য

ছিলেন। লেনিন এক সময় এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে "মানসিক বিপ্লব ছাড়া সাম্যবাদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল হইতে পারে না।" ("Communist economic scheme was not possible without an intellectual ravolution.")। শিক্ষায়তনের মাধ্যমে সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি দেশবাসীকে অনুরক্ত করিয়া তোলাই সোভিয়েট সরকারের শিক্ষানীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য ইহা ছাড়া রাশিয়া হইতে অজ্ঞানতা দূর করিয়া বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার করাও সরকারের শিক্ষা-নীতির অপর লক্ষ্য ছিল। জারতন্ত্রের আমলে রাশিয়ার শতকরা ৯৫ ভাগ জনসাধারণ অজ্ঞানতার অন্ধকারে

নিমজ্জিত ছিল। সেই আমলে উচ্চ ও মধ্য পর্যদ বিদ্যালয়গুলিতে কৃষক ও মজুরদের প্রবেশাধিকার ছিল না। একমাত্র সুবিধাভোগী শ্রেণীই শিক্ষালাভের অধিকারী ছিল। সোভিয়েট সরকার এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাইয়া ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারে যত্নবান হন।

ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইল এবং উর্ধ্বতন শিক্ষায়তনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিচারে সকলকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইল। ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ হইল এবং শিক্ষায়তনে সাম্যবাদী আদর্শের বিরুদ্ধে সকল প্রকার প্রচার নিষিদ্ধ করা হইল। বহু স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠা হইল। কারিগরী শিক্ষায়তন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য উপযুক্ত শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা হইল। শিক্ষায়তনগুলি ছিল অবৈতনিক। মার্ক্সীয় আদর্শ অনুসারেই প্রধানতঃ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইল।

শিক্ষার ব্যবস্থা

সোভিয়েট সরকার খ্রীষ্টধর্মের বিরোধী ছিলেন। ফলে চার্চগুলির অধিকাংশই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল, চার্চগুলির অধিকাংশই রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করা হইল, যাজকগণকে নানাভাবে নির্যাতিত করা হইতে লাগিল এবং ধর্মপ্রচার নিষিদ্ধ করা হইল। এতদ্ভিন্ন সোভিয়েট সরকার 'নাস্তিক সমিতি' ('Society of the Godless') নামে একটি সংস্থা গঠন করিয়া এবং ইহার মাধ্যমে জোর প্রচারকার্য চালাইয়া রাশিয়ার যুবসমাজকে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব হইতে বিমুক্ত করিতে যত্নবান হইলেন। বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি ব্যাপারেও চার্চের ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হইল এবং তাহা সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হইল। নানাভাবে চার্চের ক্ষমতা ও প্রভাব বিনষ্ট করা হইল বটে, কিন্তু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের কোন প্রকার বাধা-নিষেধ প্রয়োগ করা হয় নাই। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের ব্যাপারে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যগণের উপরেই নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছিল।*

ধর্ম-নীতি

৯.১৩. সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি

(Foreign Policy of Russia, 1919-39)

১৯১৭ হইতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। রুশ-বিপ্লবের অব্যবহিত পরে ধনতান্ত্রিক ইওরোপে সাম্যবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ আতঙ্কিত হইয়া সম্মিলিতভাবে রাশিয়া আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হয় এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ উহাদের সেনাবাহিনী রাশিয়া হইতে অপসারণ করিয়া লয়।

* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েট সরকার চার্চকে কিছু সুযোগ-সুবিধা মঞ্জুর করিয়াছিলেন এবং প্রধান যাজক নির্বাচন করার অধিকারও চার্চকে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ধর্মীয় পুস্তকাদি প্রকাশিত করার অধিকারও চার্চকে দেওয়া হইয়াছিল।

১৯১৭ হইতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির দুইটি প্রধান লক্ষ্য ছিল—প্রথমতঃ, জার্মানী তথা কেন্দ্রীয় শক্তিগুলির সহিত শান্তি স্থাপন করা এবং দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত করা। বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সার্থক করার জন্যই রাশিয়ার পক্ষে জার্মানী তথা কেন্দ্রীয় শক্তিগুলির সহিত শান্তি স্থাপন করার প্রয়োজন ছিল। এই উদ্দেশ্যে রাশিয়া জার্মানীর সহিত ব্রেস্ট-লিট্‌ভস্কের সন্ধি এবং লিভোনিয়া, এস্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলির সহিতও সন্ধি সম্পাদন করিয়াছিল।

১৯১৭ হইতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পররাষ্ট্রনীতির দুইটি সমস্যা

ইতিমধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাইতে উদ্যোগী হইল। বলশেভিক নেতৃবর্গ রুশ-বিপ্লবকে বিশ্বব্যাপী জাতীয় বিপ্লবের সূচনামাত্র বলিয়া মনে করিতেন। লেনিনের কথায় "That there will be a Socialist revolution in Europe is in the nature of a scientific prediction"। বিপ্লবের পর রাশিয়া সর্বত্র সাম্যবাদী ও ধনতন্ত্রবাদী দেশগুলির মধ্যে অনিবার্য সংঘর্ষের কথা প্রচার করিতে থাকে। রুশ-নেতৃবৃন্দ প্রথম দিকে ইহাই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে সমগ্র বিশ্বে প্রোলেটারিয়েটদের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হইলে রাশিয়ার নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র নিরাপদ হইতে পারে না। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া কয়েকটি কর্মপন্থা গ্রহণ করে—যথা, (১) পশ্চিম-ইওরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া শ্রমিক-সমাজকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতে সাহায্য করা, (২) পশ্চিম-ইওরোপের উপনিবেশগুলিকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতে সাহায্য করা এবং (৩) পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ ও বিভেদের সৃষ্টি করা।

বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাইতে রাশিয়ার প্রচেষ্টা

কর্মপন্থা

সমগ্র বিশ্বে শ্রমিক-বিপ্লব সংঘটিত করিয়া সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল (Third International) স্থাপিত হইল*। সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতন্ত্রবাদের উচ্ছেদসাধন করিয়া শ্রেণীহীন সমাজ ও প্রোলেটারিয়েটদের একনায়কতন্ত্র (dictatorship of the proletariat) স্থাপন করার আহ্বান জানান হইল। এশিয়ার জনগণকে সাম্যবাদের প্রতি প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে বলশেভিক সরকার পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের তীব্র নিন্দা করিতে থাকেন; জারের আমল হইতে রাশিয়া চীন ও তুরস্কে যে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিল বলশেভিক সরকার সেগুলি পরিত্যাগ করেন এবং ব্রিটেনের বিরুদ্ধে

তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল

* প্রথম ইন্টারন্যাশনাল ১৮৬৪ হইতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনাল স্থাপিত হইয়াছিল।

আফগানিস্থানকে উত্তেজিত করিতে থাকেন। রাশিয়ার এই নীতির ফলে অন্যান্য শক্তিবর্গ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং কিছু সময়ের জন্য রাশিয়া ইওরোপের রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

কিন্তু লেনিন ও অন্যান্য সোভিয়েট নেতৃবর্গ উপলব্ধি করেন যে পশ্চিমী দুনিয়া হইতে ধনতন্ত্রবাদ মুছিয়া ফেলা মোটেই সম্ভব নহে। এমনকি রাশিয়াতেও বিশুদ্ধ সাম্যবাদী নীতি ব্যর্থ হয় এবং লেনিনকে নূতন অর্থনৈতিক নীতির (N. E. P.) মাধ্যমে তাহা কিছু পরিমাণে সংশোধন করিতে হয়। ক্রমেই লেনিন উপলব্ধি করেন যে বুর্জুয়াদের সহিত আপোস করিয়া রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। তিনি ইহাও উপলব্ধি করেন যে সাম্যবাদী প্রচার বন্ধ না করিলে বৈদেশিক কারিগরী ও শিল্প প্রশিক্ষণ লাভ করাও সম্ভব নহে। এই কারণে লেনিন সোভিয়েট রাশিয়ার বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটাইতে প্রয়াসী হন। তিনি ব্রিটেনের সহিত আলাপ-আলোচনা শুরু করিয়া ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করেন। ইহার শর্তানুসারে রাশিয়া এশিয়ায় ব্রিটেনের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য বন্ধ করিতে প্রতিশ্রুত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই রাশিয়া অপর এগারটি রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পন্ন করে। এইভাবে সোভিয়েট রাশিয়া বিদেশী শক্তিগুলির বাস্তব স্বীকৃতি লাভ করে, যদিও উহাদের সরকারী পর্যায়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক তখনও স্থাপিত হয় নাই। ইতিমধ্যে ব্রিটেনে শ্রমিক সরকার গঠিত হইলে ব্রিটেন রাশিয়াকে স্বীকার করিয়া লয় (১৯২৪)। ইহার পর ইটালী ও ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়াকে স্বীকৃতি দান করে। এইভাবে রাশিয়া পুনরায় বিশ্ব-রাজনীতিতে প্রবেশ করে।

রাশিয়ার বিচ্ছিন্নতার অবসান

লেনিনের ন্যায় স্টালিনও উপলব্ধি করেন যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সহিত শান্তি স্থাপন একান্ত প্রয়োজন। বিদেশী মূলধন ও বিদেশী কারিগরী সাহায্য ভিন্ন রাশিয়ার শিল্পোন্নতি সম্ভব ছিল না। এই কারণে স্টালিন বিশ্ব-সাম্যবাদের পরিকল্পনা আপাতত পরিত্যাগ করেন। অবশ্য সেইসঙ্গে তিনি সুদূর-প্রাচ্যে জাপানের নূতন সাম্রাজ্যবাদ নীতি ও জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল (১৯৩২) এবং জার্মানীতে হিটলার ও নাৎসীদের সাফল্যের প্রতি যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। রাশিয়ার দুই সীমান্তে জার্মানী ও জাপানের আক্রমণের সম্ভাবনায় রাশিয়া স্বভাবতঃই আতঙ্কিত হইয়া উঠে এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সহিত সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করে। এইরূপ মনোভাবের বশবর্তী হইয়া স্টালিন ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থায়ী সদস্য রূপে লীগ্-অফ-নেসনস্-এ যোগদান করেন। পরবৎসর তিনি ফ্রান্সের সহিত পুনরায় মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন।

পশ্চিম ইওরোপের সহিত সহযোগিতার নীতি গ্রহণ

ইহার পর রুশ পররাষ্ট্রনীতির অপর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত মিত্রতা স্থাপন। সুদূর-প্রাচ্যে জাপান রাশিয়া ও আমেরিকার

প্রধান শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। রাশিয়া ও আমেরিকা পরস্পরের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষা করিতে ও উভয়ের বিরুদ্ধে কোনরূপ ক্ষতিকর প্রচারকার্য না চালাইতে সম্মত হয়। কিন্তু ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সহিত জার্মানীর 'মিউনিক-চুক্তি' স্বাক্ষরিত হইলে রুশ পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন ঘটে। মিউনিক-চুক্তিকে রাশিয়া উহার বিরুদ্ধে জার্মানীর আক্রমণের পূর্বাভাস বলিয়া মনে করে। সুতরাং নিজের নিরাপত্তার জন্য রাশিয়া জার্মানীর সহিত ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষর করিল। এই চুক্তির ফলে রাশিয়া যুদ্ধ-প্রস্তুতির প্রয়োজনীয় সময় লাভ করিল।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী অনাক্রমণ-চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া রাশিয়া আক্রমণ করিলে রাশিয়া পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সহযোগিতার আশায় আতলান্তিক সনদ ও মিত্রপক্ষের যুদ্ধসংক্রান্ত যাবতীয় ঘোষণাপত্রগুলি স্বাক্ষর করিল। এইভাবে রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান করিল।

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত

১। জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ ৯.১,]

২। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়ার বিপ্লবী-আন্দোলনের প্রসার সম্বন্ধে কি জান? [উঃ ৯.২.]

৩। রুশ-বিপ্লবের কারণ কী? এই বিপ্লবের আন্তর্জাতিক গুরুত্বের মূল্যায়ন কর। [উঃ ৭.৯.৫, ৯.৬.]

৪। ১৯১৭ হইতে ও ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কালে রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির বিবরণ দাও। [উঃ ৯.৭.]

৫। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত রাশিয়ার সংবিধানের পরিচয় দাও। [উঃ ৯.৮.]

৬। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে রাশিয়ার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের বিবরণ দাও। [উঃ ৯.৯.]

৭। স্টালিনের ক্ষমতালাভের পটভূমিকা বর্ণনা কর। [উঃ ৯.১০.]

৮। রাশিয়ার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে স্টালিনের অবদানের মূল্যায়ন কর। [উঃ ৯.১০.]

৯। ১৯১৯ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ ৯.১৩.]

দশম অধ্যায় | যুদ্ধোত্তর ইওরোপ ও বিশ্ব (১৯১৯-৩৯)
(Post-war Europe and the World)

১০.১. যুদ্ধোত্তর বিশ্বের প্রধান সমস্যা : ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইলে বিশ্বের জনগণ আশা করিয়াছিল যে অতঃপর পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া বিশ্বের সকল রাষ্ট্র ও সকল জাতি মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বিশ্বে শান্তি অব্যাহত রাখিবে ও নিজ নিজ রাষ্ট্রে জনকল্যাণমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিবে। কিন্তু বিশ্বের জনগণের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। বরং ১৯১৯ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কালে ইওরোপ তথা বিশ্বের সর্বত্র অশান্তির আগুন জ্বলিতে থাকে। ভার্সাই-সন্ধির পর হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী কালে ইওরোপ তথা বিশ্বের সম্মুখে বহু সমস্যার উদ্ভব হয়। রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা এবং বিভিন্নমুখী গণ-আন্দোলন ইওরোপ তথা বিশ্বে এক দারুণ অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। ভার্সাই-সন্ধি দ্বারা শান্তি ঘোষিত হইলেও প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হয় নাই। বহু সমস্যা অমীমাংসিত থাকিয়া যায় এবং বহু ক্ষেত্রে ভার্সাই-সন্ধি লঙ্ঘিত হওয়ায় বহু নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ ও স্বার্থসংঘাত লাগিয়াই থাকে। ভার্সাই-সন্ধির ফলে যে সকল রাষ্ট্র উহাদের রাজ্যাংশ হারাইল, উহারা ক্ষুব্ধ রহিল এবং যাহারা পুরস্কৃত হইল উহারাও উপযুক্ত পুরস্কার না পাওয়ায় অসন্তুষ্ট রহিল।

ভার্সাই-সন্ধির শর্তানুযায়ী জাতীয়তার ভিত্তিতে ইওরোপের নূতন মানচিত্র অঙ্কিত হয়। উত্তরে ফিনল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া প্রভৃতি বাল্টিক অঞ্চলগুলিকে রাশিয়ার অধিকার হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া হয়। পোল্যাণ্ডের বিভিন্ন অংশগুলিকে রাশিয়া, জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার কবল হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন পোল্যাণ্ডরাষ্ট্র পুনর্গঠন করা হয়। দক্ষিণে অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত বোহেমিয়া, মোরাভিয়া, সাইলেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের চেক্ ও শ্লোভাকগণকে সম্মিলিত করিয়া নূতন চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। সার্বিয়ার প্রতিবেশী সকল সার্ব-অধ্যুষিত অঞ্চল একত্রিত করিয়া নূতন যুগোশ্লাভিয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাশিয়া, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরীর কিছু অংশ লইয়া রুমানিয়া গঠিত হয়। অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী দুইটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা

উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় পুনর্বিন্যাসের ফলে বহু জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়। পূর্ব ইওরোপের প্রায় আট কোটি জনসাধারণকে এক রাষ্ট্র হইতে অন্য রাষ্ট্রে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। সাইলেশিয়া ও ডানজিগের কর্তৃত্ব লইয়া জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের

মধ্যে তীব্র বিরোধের সত্রপাত হয়। বাল্টিক অঞ্চলে চারিটি রাষ্ট্র গঠিত হইলে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে বিবাদ ও খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে লীগ্-অফ-নেশনস্ কর্তৃক ফিনল্যাণ্ডকে প্রদত্ত আল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের (Aland Islands) অধিকার লইয়া ফিনল্যাণ্ড ও সুইডেনের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। ভিলনা (Vilna) শহরের কর্তৃত্ব লইয়া লিথুয়ানিয়া ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস-সন্ধি লঙ্ঘন করিয়া লিথুয়ানিয়া মেমেল (Memel) অধিকার করিয়া লয়। রাশিয়া উহার পূর্বে অধিকৃত সীমান্ত অঞ্চলগুলি পুনরায় নিজের অধীনে আনয়ন করিতে এবং এশিয়া ও ইওরোপে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হয়। যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া ও চেকোশ্লাভাকিয়ার নিকট কয়েকটি প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হওয়ায় হাঙ্গেরী ক্ষুব্ধ হয়। বাসারাবিয়ার কর্তৃত্ব লইয়া রুমানিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। আড্রিয়াটিক সাগরের উপকূল অঞ্চল লইয়া ইটালী, যুগোশ্লাভিয়া ও আলবানিয়ার মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ দেখা দেয়। সেভার্সের সন্ধির শর্তাবলী অগ্রাহ্য করার জন্য তুরস্ক গ্রীসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং এশিয়া মাইনর হইতে গ্রীকগণকে বিতাড়িত করে। ভার্সাই-সন্ধি চীনকে সন্তুষ্ট করিতে না পারায় চীনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র হয় এবং সাণ্টুং প্রদেশ জাপানকে সমর্পণ করায় চীন ক্ষুব্ধ রহে।

পুনর্বিন্যাসের ফলাফল

জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বহু নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই নীতির কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা স্থির করা হয় নাই। ভাষার ভিত্তিতে এক একটি নূতন রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল। ইহার ফলে বহু লোককে তাহাদের স্থায়ী বাসস্থান হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন হয়। যেমন প্রায় তিন লক্ষ অস্ট্রিয়ার অধিবাসী ইটালীর অন্তর্ভুক্ত হয়, তেমন প্রায় ত্রিশ লক্ষ জার্মান ও পাঁচ লক্ষ হাঙ্গেরীয়ানকে চেকোশ্লোভাকিয়াতে স্থানান্তরিত করা হয়। রুমানিয়াতেও বহুসংখ্যক হাঙ্গেরীয়ান, জার্মান ও সার্ব অধিবাসী রহিয়া যায়। গ্রীস হইতে বহু তুর্কীকে তুরস্কে ও তুরস্ক হইতে বহু গ্রীককে গ্রীসে স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন হয়। ইহার ফলে একদিকে বহু রাষ্ট্রে নবাগত উদ্বাস্তুদের আশ্রয় ও ভরণপোষণের সমস্যা ও অপরদিকে একভাষাগোষ্ঠী রাষ্ট্রে অন্য ভাষাভাষী সংখ্যালঘুদের সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্ত সংখ্যালঘুদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লীগ্-অফ-নেশনস্ গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু উহাদের সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা রাষ্ট্রসংঘ অবলম্বন করিতে পারে নাই। 'বৃহৎ রাষ্ট্র-চতুষ্টয়' সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও উহাদের ভাষা, কৃষ্টি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংখ্যালঘুদের সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা পালন করিতে কোন রাষ্ট্রেরই উৎসাহ ছিল না। এই সংখ্যালঘুদের কেন্দ্র করিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ ও সংঘর্ষ নূতন করিয়া শুরু হয়।

শরণার্থী ও সংখ্যালঘু সমস্যা

একাধিক নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হওয়ায় ইওরোপের 'ব্যালেন্স-অব-পাওয়ার' বা রাষ্ট্রীয় ভারসাম্যে এক নূতন পরিবর্তন আসে। যুদ্ধ-পূর্ব ও যুদ্ধোত্তর কালের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান গড়িয়া উঠে। যুদ্ধ-পূর্ব যুগে বিশ্বরাজনীতিতে কয়েকটি ইওরোপীয় রাষ্ট্রের প্রাধান্য ছিল, যেমন গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া। ইহারাই ইওরোপ তথা বিশ্বের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিত, কিন্তু যুদ্ধশেষে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের ও ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে রাশিয়ার বিচ্ছিন্নতার ফলে প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র বলিতে রহিল গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী ও পরে জার্মানী। দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্র হিসাবে রহিল চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যান্ড এবং রুমানিয়া। ক্রমশঃ ইহারা ইওরোপীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিতে থাকে। অপরদিকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও এশিয়ার উদীয়মান রাষ্ট্র জাপান ইওরোপীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিতে অগ্রসর হয়। ফলে ইওরোপের রাজনীতিতে যুদ্ধ-পূর্ব রাষ্ট্রগুলির একাধিপত্যের অবসান হয় এবং অতঃপর বিশ্বের যে কোন অংশের রাজনৈতিক সমস্যামাত্রই আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়।

ইওরোপীয় রাজনীতির স্থলে বিশ্ব রাজনীতির উদ্ভব

ইওরোপের ভারসাম্যের নবরূপায়ণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত সমস্যা এক দারুণ সংকটের সৃষ্টি করে। ক্ষতিপূরণ (Reparation) সমস্যা ও যুদ্ধ-ঋণ (war-debts) সম্পর্কিত সমস্যা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল এবং এই দুই সমস্যা ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার (economic depression) কারণ হইয়াছিল। ভার্সাই-সন্ধির যুদ্ধাপরাধ শর্তটি অবলম্বনে ক্ষতিপূরণ-নীতি গৃহীত হয়। এই শর্তটি শেষ পর্যন্ত জার্মানীতে নাৎসীদের উত্থান ও ফ্রান্সের আশঙ্কার কারণ হয়। অপরদিকে ক্ষতিপূরণ ও যুদ্ধ-ঋণ সম্পর্কিত বিষয় ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি করে। ক্ষতিপূরণ সমস্যা ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি করে এবং ইহার ফলে ইওরোপের নিরাপত্তা ও শান্তি পুনরায় ব্যাহত হইবার উপক্রম হয়।

যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের সমস্যা

বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষ পরস্পর পরস্পরকে যুদ্ধোপকরণ ও অর্থ-ঋণ দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। আমেরিকা ও ব্রিটেন ফ্রান্সকে প্রচুর পরিমাণে ঋণ দিয়াছিল। অপরদিকে ব্রিটেন ও অপরাপর মিত্ররাষ্ট্রবর্গ আমেরিকার নিকট হইতে প্রচুর ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। যুদ্ধের শেষে যুদ্ধ-ঋণ পরিশোধের প্রশ্নে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়। যুদ্ধ-ঋণ বাতিল করার যুক্তি ব্রিটেন ও ফ্রান্স অবতারণা করিলে আমেরিকা ক্ষুব্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দানে জার্মানীর সক্ষমতার কারণে এই সমস্যার সমাধান হয়।

যুদ্ধ-ঋণ সমস্যা

প্যারিস শান্তি-সম্মেলনে বিশ্বে শান্তি অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের অস্ত্রশস্ত্র যথাসম্ভব সীমিত রাখার নীতি গৃহীত হইয়াছিল। এই নীতি গ্রহণ করিয়া মিত্রপক্ষ জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়ার সমরাস্ত্র হ্রাস করে। লীগ্-অফ-নেসনস্-এর মাধ্যমে ও লীগ্-অফ-নেশনস্-এর বাহিরে নিরস্ত্রীকরণ-সমস্যার সমাধানের বহু চেষ্টা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভার্সাই-সন্ধির শর্তাদি ভঙ্গ করিয়া জার্মানী পুনরায় সমরসম্ভার বৃদ্ধি করিতে প্রয়াসী হইলে নিরস্ত্রীকরণের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সমগ্র বিশ্বে এক দারুণ অর্থনৈতিক মন্দার যুগ শুরু হয়। বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই ইহার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনও আহূত হয়। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মতানৈক্যের ফলে শেষ পর্যন্ত সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা

যুদ্ধোত্তর ইওরোপ ও বিশ্বের এই সকল সমস্যাগুলি পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচিত হইল।

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত

১। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর বিশ্বের প্রধান সমস্যাগুলি কি ছিল? [উঃ ১০.১]

ক্ষতিপূরণ সমস্যা
(Problem of Reparation)

১১.১. ক্ষতিপূরণের ভিত্তি (Basis of Reparation) : প্রধানতঃ 'যুদ্ধাপরাধ শর্তের' উপর ভিত্তি করিয়াই ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

"জার্মানী ও উহার মিত্রবর্গের আক্রমণের ফলে বিজয়ী মিত্রপক্ষভুক্ত রাষ্ট্রের সরকার ও উহাদের বেসামরিক অধিবাসীদের যে ক্ষতি হইয়াছিল জার্মানী উহার জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য"—ইহাই ছিল ক্ষতিপূরণ প্রদানের মূল নীতি। যুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের জনসাধারণকে ইহাই আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল যে যুদ্ধের সকল ব্যয় জার্মানীর নিকট হইতে আদায় করা হইবে। উইলসনের একাধিক ঘোষণাপত্রে (যাহার উপর ভিত্তি করিয়া শান্তি-সন্ধি সম্পাদিত হইয়াছিল) বলা হইয়াছিল যে জার্মানীকে সকল আক্রান্ত অঞ্চল হইতে সরিয়া আসিতে হইবে এবং সেইগুলি স্বার্থসংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রবর্গকে প্রত্যর্পণ করা হইবে। উইলসনের ঘোষণাপত্রগুলি অনুসারে মিত্রপক্ষ উহাদের নিজ নিজ সরকার ও বেসামরিক অধিবাসীদের একমাত্র বৈষয়িক ক্ষতির জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল অর্থাৎ মিত্রপক্ষ যুদ্ধের সমগ্র ব্যয় আদায় করার দাবি পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু ইংরাজ ও ফরাসীদের সন্তুষ্টির জন্য 'বেসামরিক ক্ষতি' হিসাবে আঘাতপ্রাপ্ত সৈনিক ও সামরিক কর্মচারীদের স্ত্রী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র-কন্যাদের বৃত্তি ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেন্সন বাবদ ব্যয়, মৃত সৈনিকদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ব্যয় প্রভৃতি বিবিধ ব্যয় জার্মানীর নিকট হইতে আদায় করার দাবি করা হইলে এই দাবি উইলসনের সমর্থন লাভ করে। সুতরাং নিম্নলিখিত বাবদে জার্মানীর উপর ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়,—(১) বেসামরিক অধিবাসীদের ধনসম্পত্তি নাশের জন্য ক্ষতিপূরণ, (২) জার্মানী কর্তৃক বাণিজ্যপোতগুলির বিনাশের জন্য ক্ষতিপূরণ, (৩) মিত্ররাষ্ট্রগুলিকে পেন্সন বাবদ ক্ষতিপূরণ। একমাত্র বেলজিয়ামের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। জার্মানীর আক্রমণের ফলে বেলজিয়ামের সমগ্র ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করা হয়।

ক্ষতিপূরণের নীতি

বেসামরিক জনসাধারণের ধনসম্পত্তির ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ

বিভিন্ন বাবদে ক্ষতিপূরণ আদায়ের নীতি

কি কি বাবদে জার্মানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইবে ইহা স্থির হইয়া যায়। ইহার পর কি পরিমাণ অর্থ উহার নিকট হইতে আদায় করা হইবে সেই প্রশ্ন দেখা দেয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ স্থির করা হয় নাই। দুইটি উপায়ে অঙ্কের পরিমাণ নির্ধারণ করা যাইতে পারিত। প্রথমটি হইল ক্ষতির পরিমাণ হিসাবে ক্ষতিপূরণের অঙ্ক ধার্য করা এবং দ্বিতীয়টি হইল জার্মানীর সাধ্যানুসারে উহা স্থির করা। জার্মানীর দেয়

ক্ষতিপূরণ বাবদ অঙ্কের পরিমাণ নির্ধারণ করার উপায়

ক্ষতিপূরণ বাবদ অঙ্কের পরিমাণ নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তী কালে কিছু ক্ষতিপূরণ দানে জার্মানীকে বাধ্য করার জন্য ফ্রান্স প্রস্তাব করে। এতদ্‌ভিন্ন ফ্রান্স সমগ্র ক্ষতিপূরণ বাবদ অঙ্কের পরিমাণ নির্দিষ্ট করার জন্য একটি ক্ষতিপূরণ কমিশন (Reparation Commission) নিযুক্ত করার প্রস্তাবও করে। লয়েড জর্জ প্রথম দিকে ফ্রান্সের প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা গৃহীত হয়। পরে লয়েড জর্জ তাঁহার মত পরিবর্তন করিলেও উইলসন ফ্রান্সের প্রস্তাব সমর্থন করেন।

ক্ষতিপূরণ কমিশন নিয়োগ

১১.২. **ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত সন্ধির শর্তাদি:** ভার্সাই-সন্ধিতে বিভিন্ন বাবদে জার্মানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রস্তাব করা হইল যদিও ইহার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয় নাই। একটি ক্ষতিপূরণ কমিশন নিযুক্ত করিয়া উহার হস্তে সমগ্র ক্ষতিপূরণের তালিকা প্রস্তুত করা, ক্ষতিপূরণ বাবদ অঙ্কের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা এবং ত্রিশ বৎসরের মধ্যে উহা আদায় করার ব্যবস্থা অবলম্বন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। কমিশন ১লা মে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উহার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবেন ইহাও স্থির হয়। যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইটালী হইতে দুইজন করিয়া স্থায়ী সদস্য এবং বেলজিয়াম, জাপান ও যুগোশ্লাভিয়া হইতে একজন করিয়া সদস্য কমিশনে গ্রহণ করা হয়। কমিশনের নিকট বক্তব্য পেশ করার অধিকার জার্মানীকে দেওয়া হয় এবং ইহাও স্থির হয় যে জার্মানীর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। শেষ পর্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কমিশনে যোগদান না করায় ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের সদস্যদের হস্তেই চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব ন্যস্ত রহে। প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র কমিশনে যোগদান না করায় ফ্রান্স সভাপতির আসন গ্রহণ করে। যুদ্ধের ফলে ফ্রান্স সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল এবং জার্মানীর প্রতি ফ্রান্সের প্রতিশোধাত্মক মনোভাব ছিল প্রবল। সুতরাং ফ্রান্সের সভাপতিত্বে উদার মনোভাব লইয়া কমিশন উহার কার্যাদি নিষ্পন্ন করিতে পারেন ইহা অচিন্তনীয়। সাধারণতঃ ফ্রান্স ও বেলজিয়াম মিলিতভাবে ইংল্যান্ড ও ইটালীর সকল প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে থাকে এবং চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভোট (Custing Vote) ফ্রান্সের হস্তে থাকায় স্বভাবতঃই ইংল্যান্ড ও ইটালীর সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইতে থাকে। ক্ষতিপূরণ কমিশন কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে মিত্রপক্ষ জার্মানীর স্পা (Spa) নামক স্থানে মিলিত হইয়া আদায়ীকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ নিম্নলিখিত ভাবে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করার ব্যবস্থা করে। মোট ক্ষতিপূরণের ৫২ শতাংশ ফ্রান্সকে, ২২ শতাংশ ব্রিটেনকে, ১০ শতাংশ ইটালীকে, ৮ শতাংশ বেলজিয়ামকে, ৬·৫ শতাংশ, গ্রীস, রুমানিয়া ও যুগোশ্লভিয়াকে এবং ১·৫ শতাংশ জাপান ও ও পর্তুগালকে দেওয়া হইবে স্থির হয়।

স্পা সম্মেলনে ক্ষতিপূরণের হার নির্ধারণ

কিন্তু জার্মানী কি উপায়ে ক্ষতিপূরণের দেয় অর্থ প্রদান করিবে সেই প্রশ্নই

ইহার পর জটিল হইয়া দেখা দেয়। (১) স্বর্ণ প্রদান করিয়া জার্মানী ক্ষতিপূরণের দেয় অর্থ পরিশোধ করিতে পারিত, কিন্তু সেই সময় উহার স্বর্ণসঞ্চয়ের পরিমাণ নিতান্ত কম থাকায় উহার পক্ষে স্বর্ণ প্রদান করা সম্ভব ছিল না। (২) জার্মানী বৈদেশিক রাষ্ট্র হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া ক্ষতিপূরণের দেয় অর্থ পরিশোধ করিতে পারিত এবং সেই সময় একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই জার্মানীকে ঋণদান করিতে পারিত। কিন্তু একটিমাত্র রাষ্ট্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ আশানুরূপ হওয়া সম্ভব ছিল না। (৩) জার্মানগণ মিত্রপক্ষভুক্ত দেশগুলিতে বিনা মজুরিতে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত হইয়া ক্ষতিপূরণের দেয় অর্থ পরিশোধ করিতে পারিত। কিন্তু এই প্রস্তাব মিত্রপক্ষের নিকট মোটেই সুবিধাজনক হইল না, কারণ ইহার দ্বারা মিত্রপক্ষের দেশগুলিতে বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা ছিল। (৪) জার্মানী কয়লা ও জাহাজ সরবরাহ করিয়াও ক্ষতিপূরণের দেয় অর্থ পরিশোধ করিতে পারিত। কিন্তু মিত্রপক্ষের নিকট এই ব্যবস্থাও সুবিধাজনক ছিল না। জার্মানী ইটালী ও ফ্রান্সকে কয়লা সরবরাহ করিয়াছিল, কিন্তু ইহার ফলে ব্রিটেনের কয়লা-শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। অধিকন্তু ব্রিটেনের পক্ষে জার্মানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ বাবদ জাহাজ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না, কারণ ব্রিটেনের নিজস্ব জাহাজের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট। (৫) আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনঃপ্রসার ঘটিলেই জার্মানীর পক্ষে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ পরিশোধ করা সম্ভব হইত। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের পরে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি স্ব স্ব রাষ্ট্রে শুল্ক-প্রাচীরের সৃষ্টি করিলে জার্মানীর পক্ষে ইওরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করা অসম্ভব ছিল। প্রকৃতপক্ষে জার্মানীর বাণিজ্য-প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধেই শুল্ক-প্রাচীরের সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

জার্মানীর পক্ষে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ পরিশোধের উপায়

সুতরাং জার্মানী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ পরিশোধ করার প্রশ্ন জটিল হইয়া দেখা দেয়।

১১.৩. প্যারিস প্রস্তাব (Paris resolution): পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্যারিস শান্তি-সম্মেলনে ক্ষতিপূরণ বাবদ একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক স্থির করা সম্ভব হয় নাই। জার্মানীকে অন্তর্বর্তী কালের জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ একশত কোটি পাউণ্ড মিত্রপক্ষকে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ভার্সাই-সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার সময় জার্মানীকে উহার ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করার জন্য বলা হইয়াছিল। কিন্তু জার্মানী তাহা করে নাই। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত স্পা-সম্মেলনে জার্মানী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব মিত্রপক্ষের মনঃপূত হয় নাই। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস-প্রস্তাব অনুসারে মিত্রপক্ষ স্থির করিল যে, ৪২টি বাৎসরিক কিস্তিতে জার্মানী ক্ষতিপূরণ বাবদ ১১,৩০০,০০০,০০০ পাউণ্ড প্রদান করিবে। জার্মানী এই প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া প্রস্তাব করিল যে (১) জার্মানী ক্ষতিপূরণ বাবদ এককালীন মোট ১৫০

জার্মানী ও মিত্রপক্ষের মধ্যে ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে মতানৈক্য

কোটি পাউন্ড প্রদান করিবে, (২) ইহার জন্য মিত্রপক্ষকে জার্মানী হইতে সৈন্যবাহিনী অপসারণ করিতে হইবে এবং (৩) উচ্চ সাইলেশিয়া জার্মানীর দখলে থাকিবে। কিন্তু মিত্রপক্ষ জার্মানীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল এবং প্রাথমিক ১০০ কোটি পাউন্ডের কিস্তি জার্মানী প্রদান করে নাই এই অজুহাতে মিত্রপক্ষ জার্মানীর ডুইসবার্গ (Diusburg), রুহরর্ট (Ruhrort) ও ডুসেলডর্ফ (Dusseldorf) দখল করিল। মিত্রপক্ষের এই আচরণ সমর্থনযোগ্য নহে। ঐতিহাসিক হার্ডির (Hardy) ভাষায় "It is difficult to find any legal justification for the procedure adopted by the Allies."

মিত্রপক্ষ কর্তৃক ডুইসবার্গ, রুহরর্ট ও ডুসেলডর্ফ দখল

১১৪. **লন্ডন-সিডিউল** (London Schedule, 1921): মিত্রপক্ষের আক্রমণাত্মক কার্যাদির বিরুদ্ধে জার্মানী লীগ্-অফ-নেশনস্-এর নিকট প্রতিবাদ জানাইয়া এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতা প্রার্থনা করে। ইতিমধ্যে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ক্ষতিপূরণ কমিশন উহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। কমিশন জার্মানীর দেয় অঙ্কের মোট পরিমাণ ৬৬০০,০০০,০০০ পাউন্ড ধার্য করেন। মিত্রপক্ষ ইহা গ্রহণ করিয়া লন্ডনে এক বৈঠকে মিলিত হয়। আলাপ-আলোচনা চলিবার পর কিভাবে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ গ্রহণ করা হইবে সেই সম্পর্কে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। ইহা 'লন্ডন-সিডিউল' নামে পরিচিত। ইহাতে জার্মানীর দেয় ক্ষতিপূরণ তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। জার্মানী ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ঘোষণা করিল যে, এই বিশাল পরিমাণ অঙ্ক জার্মানীর পক্ষে পরিশোধ করা অসম্ভব এবং তাহা করিলে উহার অর্থনৈতিক জীবন ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিন্তু মিত্রপক্ষ জার্মানীর এই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিল এবং জার্মানীর নিকট একটি চরম-নির্দেশ (ultimatum)-পত্রে বলা হইল যে জার্মানী 'লন্ডন-সিডিউল' গ্রহণে অসম্মত হইলে মিত্রপক্ষ রুঢ় অঞ্চল দখল করিবে। সেই সময় জার্মানীর অভ্যন্তরে এক দারুণ গোলযোগ চলিতেছিল। যাহা হউক, জার্মানীর নূতন মন্ত্রিসভা বাধ্য হইয়া বিনাশর্তে মিত্রপক্ষের দাবিতে সম্মত হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের মধ্যে জার্মানী প্রথম কিস্তি বাবদ অর্থ প্রদান করে। এইভাবে ক্ষতিপূরণ সমস্যার প্রথম পর্ব শেষ হয়।

লীগের নিকট জার্মানীর প্রতিবাদ

জার্মানী কর্তৃক 'লন্ডন-সিডিউল' গ্রহণ

১১.৫. **রুঢ় অঞ্চল দখল** (The Ruhr Occupation): 'লন্ডন-সিডিউল' দ্বারা ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধান হইল না। এই সিডিউল অনুসারে জার্মানীর পক্ষে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা সম্ভব ছিল না। লন্ডনে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া জার্মানী প্রথম কিস্তি প্রদান করিয়াছিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাস হইতে জার্মানীর মুদ্রার মান অভাবনীয় ভাবে হ্রাস পাইতে থাকে। 'লন্ডন-সিডিউল' অনুসারে জার্মানী যাহাতে পরবর্তী কিস্তিগুলি প্রদান করিতে পারে সেইজন্য উহার

অর্থনৈতিক পরিস্থিতির তত্ত্বাবধানের ভার ক্ষতিপূরণ কমিশনের হস্তে ন্যস্ত করা হইল। ইতিমধ্যে ক্ষতিপূরণ বণ্টনের ব্যাপারে মিত্রপক্ষের মধ্যে মতভেদের উদ্ভব হইল। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে এই মতভেদ প্রকাশ্য বিরোধে পরিণত হইল। জার্মানী 'লন্ডন-সিডিউল' অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া দ্বিতীয় কিস্তির জন্য কয়েক মাস অধিক সময় প্রার্থনা করিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীকে ছয়মাসের জন্য সময় দেওয়া হইল। কিন্তু জার্মানী আরও তিন বৎসরের সময় ও ঋণ চাহিল। ফ্রান্স জার্মানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ বাবদ সমগ্র অর্থের পূর্ণ পরিশোধ দাবি করিল। কারণ অর্থনৈতিক দিক দিয়া জার্মানীকে চিরকালের জন্য পঙ্গু করিয়া রাখিয়া ফ্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষা করাই ফ্রান্সের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। উপরন্তু ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির আশায় ইতিমধ্যেই ফ্রান্সকে পেনসন ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ব্যাপারে বহু ব্যয় করিতে হইয়াছিল। সুতরাং দ্বিতীয় কিস্তি প্রদানে জার্মানীর অক্ষমতাকে ফ্রান্স উহার ইচ্ছাকৃত অক্ষমতা বলিয়াই ধরিয়া লইল। অপরদিকে ইংল্যান্ড উদারনীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিল। যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে ইংল্যান্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। জার্মানীর ন্যায় ইওরোপের এক শিল্পপ্রধান দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উন্নত হইলে সমগ্র ইওরোপের অর্থনৈতিক জীবন স্বাভাবিক রূপ ধারণ করিবে এবং সেই সঙ্গে ইংল্যান্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিবে ইহাই ছিল ইংল্যান্ডের ধারণা। ইংল্যান্ডের মতে জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন না হওয়া পর্যন্ত ইওরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ও জার্মানীর পক্ষে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষমতা কখনই সম্ভব নহে। অধিকন্তু ফ্রান্সের ন্যায় ইংল্যান্ডের পক্ষে জার্মানীর পুনর্গঠন মোটেই আশঙ্কার কারণ ছিল না। কারণ বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর নৌ-শক্তি বলিয়া কিছুই ছিল না।

ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে মতানৈক্য

ফ্রান্সের দাবি

ইংল্যান্ডের মনোভাব

যাহা হউক, ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধান ও মিত্রপক্ষের মধ্যে এক আপোস-মীমাংসার জন্য মিত্রপক্ষ ক্যানে বৈঠকে (Cannes Conference, 1922) মিলিত হয়। এই বৈঠকে জার্মানীর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর মিত্রপক্ষের অধিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও আগামী বৎসরের জন্য জার্মানীর দেয় ক্ষতিপূরণের অঙ্ক আংশিকভাবে হ্রাস করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ফ্রান্স ও বেলজিয়াম কর্তৃক এই প্রস্তাব তীব্রভাবে সমালোচিত হইলেও, ইংল্যান্ড ফ্রান্সের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদের নিষ্পত্তি হইল।

ক্যানে বৈঠক

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদানে অসমর্থ হইল। ইতিমধ্যে ক্যানে বৈঠকে জার্মানীর প্রতি উদার মনোভাব প্রদর্শন

করায় ফরাসী মন্ত্রী ব্রিয়াঁ (Briand)-এর পতন ঘটে এবং ঘোর জার্মান-বিরোধী পাঁয়েকার (Poincare) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ফলে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে পুনরায় তীব্র মতভেদের উদ্ভব হয় এবং সেই সঙ্গে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপারেও এক স্থিতাবস্থার উদ্ভব হয়। এই স্থিতাবস্থার অবসানকল্পে ইংল্যাণ্ডের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

পুনরায় ইংগ-ফরাসী মতানৈক্য

ফ্রান্সের চাপে ক্ষতিপূরণ কমিশন ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত অঙ্গীকার ভঙ্গের অপরাধে জার্মানীকে অপরাধী বলিয়া ঘোষণা করেন। প্রতিশ্রুতি অনুসারে জার্মানী ফ্রান্সকে কয়লা সরবরাহ করে নাই এই অজুহাতে পঁয়েকার-এর আদেশে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের এক সম্মিলিত বাহিনী জার্মানীর রূঢ় অঞ্চল দখল করে।

ফ্রান্স ও বেলজিয়াম কর্তৃক রূঢ় অঞ্চল দখল

ফ্রান্স ও বেলজিয়াম কর্তৃক রূঢ় অঞ্চল দখল কোন ক্রমেই সমর্থনযোগ্য ছিল না। ইংল্যাণ্ডের মতে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম কর্তৃক রূঢ় অঞ্চল দখল ছিল অবৈধ। কারণ প্রথমতঃ, ক্ষতিপূরণ প্রদানে জার্মানীর অক্ষমতা ছিল স্বাভাবিক এবং দ্বিতীয়তঃ, জার্মানীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-প্রধান রূঢ় অঞ্চল বিদেশী রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত হইলে উহার অর্থনৈতিক ধ্বংস ছিল সুনিশ্চিত।

সমালোচনা

জার্মানী প্রত্যুত্তরে রূঢ় অঞ্চলে অসহযোগ-আন্দোলন শুরু করিল। খনির মালিকগণ ও শ্রমিকগণ উৎপাদন হ্রাস করিল, জার্মান সরকার ক্ষতিপূরণ বাবদ কয়লা ও লৌহ সরবরাহ নিষিদ্ধ করিলেন এবং রূঢ় অঞ্চলের অধিবাসীগণ ফ্রান্সকে শুল্ক বা খাজনা প্রদান করা বন্ধ করিল। ফ্রান্সও ইহার প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইল। রূঢ় অঞ্চলের প্রধান শিল্পপতিগণকে গ্রেফতার করা হইল, বহুসংখ্যক শ্রমিককে বিতাড়িত করা হইল এবং এই অঞ্চলের যাবতীয় খাদ্য-সামগ্রী ও ব্যাঙ্কের আমানত বাজেয়াপ্ত করা হইল। ইহার ফলে (১) জার্মানীর অর্থনৈতিক জীবন অচল অবস্থায় আসিয়া পেঁৗছিল, (২) জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে এক দারুণ তিক্ততার সৃষ্টি হইল, (৩) জার্মানীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ধ্বংসের সম্মুখীন হইল এবং (৪) রূঢ় অঞ্চল দখল ফ্রান্সের পক্ষে ব্যয়বহুল হইয়া উঠিল। জার্মানী ক্ষতিপূরণ প্রদান বন্ধ করিল।

রূঢ় অঞ্চলে জার্মানীর অসহযোগ আন্দোলন

১১.৬ ডাওয়েজ পরিকল্পনা (Dawes Plan) : শিল্পের ক্ষতি, মুদ্রাসংকট, রাইন অঞ্চলে আন্দোলন, জার্মানীর কুনো (Cuno) সরকারের পতন (১৯২৩ খ্রীঃ) প্রভৃতি কারণে জার্মানী রূঢ় অঞ্চলে প্রতিরোধ আন্দোলন বন্ধ করিল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্রেসম্যান (Stressman) ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইলে জার্মান সাধারণতন্ত্র পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। যুদ্ধোত্তর জার্মানীর তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক। সেই সময় জার্মানীতে উগ্র বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। ইংল্যাণ্ড ইতিপূর্বেই ফ্রান্স ও বেলজিয়াম কর্তৃক রূঢ় অঞ্চল

দখল সমর্থন করিতে পারে নাই। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার রাষ্ট্রনায়কগণ উপলব্ধি করিলেন যে জার্মানীর শিল্প-সম্পদ ধ্বংস হইলে জার্মানীর নিকট হইতে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ আদায় করা অসম্ভব হইবে। এমন কি ফ্রান্সও পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিল। ক্ষতিপূরণ প্রদান করার ব্যাপারে জার্মানীর সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী বলডউইন (Boldwin) আমেরিকার নিকট আবেদন জানাইলেন। আমেরিকা ইংল্যাণ্ডের প্রস্তাব সমর্থন করিল এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ চার্লস ডাওয়েজ (Charles Dawes)-এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির প্রধান কর্তব্য ছিল জার্মানীর আয়ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা এবং উহার মুদ্রাসংকটের অবসান করা। ১৪ই জানুয়ারী (১৯২৪ খ্রীঃ) প্যারিসে ডাওয়েজ কমিটির অধিবেশন বসে এবং ৯ই এপ্রিল (১৯২৪ খ্রীঃ) উহার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়।

ডাওয়েজ কমিটি গঠন

ডাওয়েজ কমিটির সুপারিশগুলি ছিল এইরূপ (১) ক্ষতিপূরণ সমস্যাকে রাজনীতির দিক দিয়া বিচার করা চলিবে না ; জার্মানীর অভ্যন্তরীণ সম্পদ উহার নিয়ন্ত্রণাধীনে ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং জার্মানীতে এক উন্নত ধরনের মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। নূতন মুদ্রা প্রচলনের দায়িত্ব জার্মান সরকারের কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত একটি জাতীয় ব্যাংকের হস্তে অর্পিত থাকিবে।

ডাওয়েজ কমিটির সুপারিশ

(২) বাৎসরিক কিস্তিতে স্বল্পপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দীর্ঘকাল ধরিয়া জার্মানীর নিকট হইতে আদায় করিতে হইবে।

(৩) ক্ষতিপূরণ আদায়ের নিশ্চয়তার জন্য জার্মানীর কতকগুলি নির্দিষ্ট রাজস্ব হইতেই উহা আদায় করিতে হইবে।

(৪) মিত্রশক্তি জার্মানীকে শিল্পোন্নয়নের জন্য সাহায্য করিবে।

(৫) জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য রূঢ় অঞ্চল হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে।

ডাওয়েজ পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার পর স্বার্থসংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রবর্গ ১৬ই জুলাই (১৯২৪ খ্রীঃ) লণ্ডনে এক বৈঠকে মিলিত হয়। ৯ই আগস্ট ম্যাকডোলাণ্ড হেরিয়ট ও স্ট্রেসম্যান সুপারিশগুলি গ্রহণ করিয়া এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ৩১শে আগস্ট জার্মানীর রাইখস্ট্যাগ প্রয়োজনীয় আইন পাস করিয়া সুপারিশগুলি গ্রহণ করিলে ডাওয়েজ পরিকল্পনা কার্যকর হয়। ফ্রান্স ও বেলজিয়াম রূঢ় হইতে সৈন্যবাহিনী অপসারণ করে।

বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে ডাওয়েজ পরিকল্পনাতেই অর্থনৈতিক সমস্যার প্রথম অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা হইয়াছিল। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও স্বার্থসংঘাত হইতে ক্ষতিপূরণ সমস্যাকে মুক্ত করিয়া যথার্থ অর্থনৈতিক ভাবে উহার সমাধান করাই ডাওয়েজ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল। জার্মানীর সামর্থ্য অনুযায়ী মিত্রপক্ষের

দাবি সীমাবদ্ধ করা হইয়াছিল। জার্মানীর দেয় বাৎসরিক কিস্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া এবং জার্মানীর জন্য বৈদেশিক ঋণের ব্যবস্থা করিয়া ডাওয়েজ কমিটি জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করিয়াছিল। ("The purpose of the Dawes plan was to give Germany a breathing spell financially.")। অপরদিকে ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে মিত্রপক্ষ নিশ্চিন্ত হইল। জার্মানী ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইলেও ক্ষতিপূরণ কমিশনের সর্বসম্মতিক্রমে ভোট গ্রহণ না করিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে কোনরূপ সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা নিষিদ্ধ হইল। ডাওয়েজ পরিকল্পনার ফলে জার্মানীর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উন্নত হইল এবং মধ্য-ইওরোপে ইংল্যান্ড ও আমেরিকা মূলধন নিয়োগ করিতে শুরু করিল।

ডাওয়েজ পরিকল্পনার ফলাফল

ডাওয়েজ পরিকল্পনা মিত্রপক্ষ ও জার্মানী এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পর্কের যথেষ্ট উন্নতি করিল। জার্মানী ইহার পর কয়েক বৎসর ধরিয়া ক্ষতিপূরণের দেয় অর্থ পরিশোধ করিতে লাগিল যদিও ক্ষতিপূরণ সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ডাওয়েজ পরিকল্পনাকে অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করা হইয়াছিল। এককথায় এই পরিকল্পনাকে ক্ষতিপূরণ সমস্যার ভবিষ্যৎ সমাধানের ভিত্তি হিসাবেই গ্রহণ করা হইয়াছিল।* আপাততঃ মিত্রশক্তিবর্গ ক্ষতিপূরণ সমস্যার একরূপ সমাধান করিয়া বিশ্বের বৃহত্তর স্বার্থ, শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে আত্মনিয়োগ করার অবকাশ পাইল। প্রকৃতপক্ষে ডাওয়েজ পরিকল্পনার ফলস্বরূপ—'লোকার্নো মনোবৃত্তি'র (Locarno Spirit) উদ্ভব ঘটিয়াছিল যাহা পরবর্তী কালে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল।

ডাওয়েজ পরিকল্পনার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব

তথাপি ডাওয়েজ পরিকল্পনা ত্রুটিহীন ছিল না। প্রথমতঃ, বাৎসরিক কিস্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করার ব্যবস্থা হইলেও ইহার সময় নির্দিষ্ট করা হয় নাই। কতদিন পর্যন্ত জার্মানী ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে সেই বিষয়ে ডাওয়েজ পরিকল্পনা ছিল নীরব। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থ সঞ্চয়ের ব্যাপারে জার্মানী মোটেই উৎসাহিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যাপারে জার্মানীকে বৈদেশিক ঋণদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করিয়া জার্মানী যাহাতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে পারে তাহার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। ফলে জার্মানী অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে মনোযোগী হইবার পরিবর্তে বৈদেশিক ঋণের উপর অধিকতর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল।

ত্রুটি

* "The results achieved......do not by themselves mark a final settlement. They are rather the starting-point from which readjustment must proceed."

Hardy—A Short History of International Affairs—P. 59.

১১.৭. ইয়ং কমিটি (Young Committee, 1928-29) **:** ডাওয়েজ পরিকল্পনার দ্বারা ক্ষতিপূরণ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয় নাই, কারণ জার্মানীর দেয় ক্ষতিপূরণের সমগ্র পরিমাণ অমীমাংসিতই রহিয়া গিয়াছিল। সুতরাং ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকটি কারণে এই সমস্যার পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন হইল। প্রথমতঃ, ১৯২৪ হইতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ডাওয়েজ পরিকল্পনা অনুসারে জার্মানী উহার দেয় ক্ষতিপূরণ প্রদান করিল। কিন্তু জার্মানবাসী ক্রমশঃ ক্ষতিপূরণ প্রদানের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিতে লাগিল এবং উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে লাগিল। দ্বিতীয়তঃ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রচুর পরিমাণ ঋণ জার্মানীকে দেওয়া হইলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারও ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়িল। তৃতীয়তঃ, ইতিমধ্যে ফ্রান্স যুদ্ধ-ঋণ পরিশোধের জন্য জার্মানীর নিকট হইতে স্বীয় প্রাপ্য আদায় করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। চতুর্থতঃ, ক্ষতিপূরণ সমস্যার পুনর্বিবেচনার দাবি তুলিয়া জার্মানী রাইন অঞ্চল ফেরত পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল এবং পঞ্চমতঃ, গ্রেটব্রিটেনও ক্ষতিপূরণ সমস্যার এক সুষ্ঠু সমাধানের জন্য তৎপর হইয়া উঠিল। সুতরাং সমস্যার একটি পূর্ণাঙ্গ এবং চূড়ান্ত সমাধানের উদ্দেশ্যে এবং ডাওয়েজ পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে আমেরিকার অপর এক অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ আওয়েন ইয়ং (Owen Young)-এর সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠিত হইল। ক্ষতিপূরণ গ্রহীতা রাষ্ট্রবর্গের প্রতিটির দুইজন ও আমেরিকার দুইজন প্রতিনিধিকে লইয়া এই কমিটি গঠিত হয়।

ইয়ং কমিটি নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা

ইয়ং পরিকল্পনা (Young plan) **:** ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ং কমিটি ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধানকল্পে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিল। ইহা জার্মানী ও মিত্রপক্ষ গ্রহণ করিল। পরিকল্পনাটি ছিল নিম্নরূপ :

প্রথমতঃ, জার্মানীর সমগ্র ঋণের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইল। অতঃপর জার্মানী ৩৭টি বাৎসরিক কিস্তিতে ১০০,০০০,০০০ পাউন্ড প্রদান করিবে স্থির হইল। এতদ্ভিন্ন জার্মানী ২২টি বাৎসরিক কিস্তিতে সামান্য পরিমাণ অর্থ আমেরিকার নিকট মিত্রপক্ষের যুদ্ধ-ঋণ বাবদ পরিশোধ করিবে। দ্বিতীয়তঃ, কোন সময় জার্মানীর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ হইলে জার্মানীকে বাৎসরিক কিস্তি পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত দুই বৎসর সময় দেওয়া হইবে। তৃতীয়তঃ, ডাওয়েজ পরিকল্পনা অনুসারে জার্মানীর উপর যে বৈদেশিক কর্তৃত্ব স্থাপন করা হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করা হইল। ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়িত্ব ক্ষতিপূরণ-গ্রহীতা রাষ্ট্রবর্গের পরিবর্তে জার্মানীর হস্তে ন্যস্ত করা হইল। চতুর্থতঃ, একটি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থগ্রহণ ও উহার বিতরণ করার ব্যবস্থা হইল। ক্ষতিপূরণ কমিশন ও ডাওয়েজ পরিকল্পনা অনুসারে স্থাপিত সকল সংস্থাগুলি বিলুপ্ত করা হইল এবং এই সংস্থাগুলির দায়িত্ব আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের উপর অর্পিত

ইয়ং কমিটির সুপারিশ

হইল। জার্মানী ও ক্ষতিপূরণ-গ্রহীতা রাষ্ট্রবর্গের প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত একটি বোর্ড-এর হস্তে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের শাসনক্ষমতা ন্যস্ত করা হইল। পঞ্চমতঃ, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুনের মধ্যে মিত্রপক্ষকে রাইন অঞ্চল পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হইল।

ইয়ং পরিকল্পনা বিবেচনা করার জন্য ফ্রান্স, ইটালী, জাপান, ব্রিটেন ও জার্মানীর প্রতিনিধিগণ হেগ শহরে এক বৈঠকে মিলিত হন। ব্রিটেনের প্রতিনিধি ফিলিপ স্নোডেন (Philip Snowden) ব্রিটেনের জন্য অধিক ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। ইয়ং পরিকল্পনায় ব্রিটেনকে দেয় ক্ষতিপূরণের অংশ কম করা হইয়াছিল। ইংরাজ প্রতিনিধির অনমনীয় মনোভাবের ফলে হেগ-বৈঠকের আলোচনা কিছুদিনের জন্য মুলতুবি রহে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় হেগ-বৈঠকের অধিবেশন বসিল। এই বৈঠকে, (১) ইংল্যাণ্ডের দাবি স্বীকৃত হইল, (২) ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় নির্ধারিত করা হইল এবং (৩) জার্মান রাষ্ট্রবর্গের দেয় ক্ষতিপূরণও মীমাংসিত হইল (যেমন, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়ার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে স্থির হইল যে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অস্ট্রিয়া ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে না, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হাঙ্গেরী কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ রুমানিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হাঙ্গেরীয় নাগরিকগণকে প্রদান করা হইবে এবং বুলগেরিয়া ৩৬টি বাৎসরিক কিস্তিতে উহার দেয় ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে)। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে ইয়ং পরিকল্পনা কার্যকর করা হইল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে Bank of International Settlement স্থাপিত হইল এবং রাইন অঞ্চল হইতে মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনী অপসারিত হইল।

মিত্রপক্ষ কর্তৃক ইয়ং পরিকল্পনা অনুমোদন

ইয়ং পরিকল্পনা গৃহীত হইলে জার্মানী ব্রিটেন ও আমেরিকার নিকট হইতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করিয়া ক্ষতিপূরণের দেয় অর্থ পরিশোধ করিতে লাগিল। কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সমগ্র বিশ্বে এক দারুণ অর্থনৈতিক অবনতি (economic depression) দেখা দিল। ফলে জার্মানীর পক্ষে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। এযাবৎ মিত্রপক্ষ জার্মানীর নিকট হইতে আদায়ীকৃত ক্ষতিপূরণের দ্বারা আমেরিকার ঋণ পরিশোধ করিতেছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দার ফলে জার্মানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা অসম্ভব হইলে মিত্রপক্ষ আমেরিকার ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইল। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করিল। অর্থনৈতিক মন্দার ঢেউ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও আসিয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং আমেরিকার পক্ষেও জার্মানীকে ঋণ দান করা সম্ভব হইল না। উপরন্তু বিদেশী শিল্পপতিগণ জার্মানী হইতে উহাদের মূলধন ও আমানত উঠাইয়া লইতে লাগিল। ফলে জার্মানীর অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং জার্মানীর পক্ষে ক্ষতিপূরণের দেয় অর্থ পরিশোধ করাও

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক মন্দা

অসম্ভব হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর ঋণ পরিশোধ এক বৎসরের জন্য (১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে) স্থগিত রাখিবার কথা ঘোষণা করিলেন। এই ঘোষণা 'Hoover Moratorium' নামে খ্যাত। প্রেসিডেন্ট হুভারের প্রস্তাবক্রমে জার্মানীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ পরিশোধের জন্য এক বৎসরের সাময়িক বিরতি মঞ্জুর করা হইল। কিন্তু এই বিষয় লইয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হইল। ব্রিটেন হুভারের প্রস্তাব সমর্থন করিল কিন্তু ফ্রান্স তাহা করিল না।

হুভার মরাটোরিয়াম

ক্ষতিপূরণের অবসান (End of reparation): ক্ষতিপূরণের দেয় অর্থ পরিশোধের জন্য এক বৎসরের সাময়িক বিরতি মঞ্জুর করা সত্ত্বেও জার্মানীর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কোনরূপ আশাজনক পরিবর্তন হইল না। Bank of International Settlement ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ঘোষণা করিল যে জার্মানীর পক্ষে ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা অসম্ভব। জার্মানী তথা বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকট, যুদ্ধকালীন ঋণ ও ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত সমস্যাগুলির আলোচনার জন্য ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালী, জাপান ও জার্মানীর প্রতিনিধিগণ লুসান বৈঠকে (Lausanne Conference) মিলিত হইলেন। এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে (১) ইয়ং পরিকল্পনা বাতিল করা হইল এবং (২) এককালীন একটি কিস্তিতে মোট ১৫ কোটি পাউন্ড ক্ষতিপূরণ প্রদান করার সুযোগ জার্মানীকে দেওয়া হইল। এই শর্তগুলির বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নাই।

জার্মানীর ক্ষতিপূরণ দানে অক্ষমতা

লুসান বৈঠক

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মিত্রশক্তিবর্গ জার্মানীর নিকট হইতে এই সামান্য ক্ষতিপূরণের দেয় অর্থ আদায় করিতে পারিবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়া যায়। বেনস্ (Benns)-এর কথায় "The Lausanne agreement constituted one more recession in the series of diminishing demands upon Germany for reparations."

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী ক্ষতিপূরণের দেয় অর্থ পরিশোধ করা বন্ধ করিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার ক্ষতিপূরণের অবসানের কথা সরকারীভাবে ঘোষণা করিলে এই সমস্যার সমাধান হইয়া যায়।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষতিপূরণ সমস্যার অবসান

১১.৮. অর্থনৈতিক বিপর্যয় (Econommic crisis): ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের এক দশক কাল অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে এক দারুণ অর্থনৈতিক মন্দার যুগ দেখা দেয়। কৃষিজাত উৎপন্নের পরিমাণ অভূতপূর্ব ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় জিনিসপত্রের মূল্য হ্রাস পায়। অপরদিকে শিল্পোন্নতির ফলে

যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে বহু শ্রমিক কলকারখানা হইতে ছাঁটাই হইয়া বেকারে পরিণত হয়। নূতন যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সেই পরিমাণে চাহিদার অভাবহেতু এবং প্রত্যেক রাষ্ট্র কর্তৃক শুল্ক-প্রাচীরের সৃষ্টির ফলে একদিকে শিল্প-প্রধান দেশগুলির উৎপন্ন পণ্যসামগ্রী স্ফীত হইয়া উঠিতে থাকে এবং অপরদিকে উৎপাদনের বৃদ্ধি হেতু কলকারখানা বন্ধ হইয়া যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় অচল অবস্থায় আসিয়া পড়ায় ইওরোপ তথা বিশ্বের অর্থনৈতিক ভারসাম্যের বিপর্যয় ঘটে। ব্রিটেন স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ও অবাধ বাণিজ্য-নীতি বর্জন করে এবং বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র ব্রিটেনের পন্থা অনুসরণ করে। এমন কি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে।

অর্থনৈতিক মন্দা শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই ছিল না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করিতে অসমর্থ হইলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি স্বদেশের জনগণের অশ্রদ্ধাভাজন হইয়া পড়ে। অনেক রাষ্ট্রে সরকারের পতন ঘটে এবং জার্মানী, ইটালী ও স্পেনে একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হয়। অর্থনৈতিক মন্দার অবসানের উদ্দেশ্যে সর্বত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইবার আন্দোলন শুরু হয়।

বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এই অর্থনৈতিক মন্দার কারণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তথাপি মোটামুটিভাবে ইহার মূলে কয়েকটি প্রধান কারণ সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ নাই। প্রথমতঃ, অর্থনৈতিক সাম্যাবস্থার বিনাশ, মুদ্রামানের অবনতি, বৈদেশিক মূলধনের যোগানের অভাব, শুল্ক-প্রাচীরের সৃষ্টি করিয়া আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ এবং বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে যুদ্ধ-পূর্ব যুগে প্রচলিত উদার ধনতন্ত্রবাদের (Liberal Capitalism) ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়ে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অসাম্যাবস্থার প্রকৃতি ভিন্ন হইলেও সর্বত্র পূর্বতন অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বযুদ্ধের ফলে স্বর্ণ-বিনিময় মানের অবনতি, কমিউনিস্ট রাশিয়া কর্তৃক পূর্বতন জার-সরকারের কৃত সকল ঋণ বাতিল করার ফলে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির আর্থিক ক্ষতি, মিত্রপক্ষ কর্তৃক আমেরিকার নিকট কৃত ঋণপরিশোধের অক্ষমতা প্রভৃতি কারণে অর্থনৈতিক সংকটের উদ্ভব হয়। তৃতীয়তঃ, বিশ্বে স্বর্ণের যোগান হ্রাস পাওয়ায় আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ইহার ফলে পণ্যসামগ্রীর মূল্য বহুক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায়।

অর্থনৈতিক মন্দার কারণ সম্বন্ধে মতভেদ

চতুর্থতঃ, অনেকের মতে রৌপ্যের আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় উহার মূল্য কমিয়া যায়। এবং জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা কমিয়া যায়। সমগ্র বিশ্বে কৃষিজাত পণ্য অতিরিক্ত মাত্রায় উদ্বৃত্ত হইয়া পড়ায় উহার মূল্য কমিয়া যায় এবং ফলে কৃষি-জীবীদের পক্ষে শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী ক্রয় করার ক্ষমতাও কমিয়া যায়।

পঞ্চমতঃ, যুদ্ধের পর কলকারখানায়, নানা ধরনের যান্ত্রিক উন্নয়নের ফলে শ্রমিক-চাহিদা কমিয়া যায় এবং ফলে শ্রমিকদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

ষষ্ঠতঃ, শিল্পে অনগ্রসর দেশগুলি নিজ নিজ শিল্প-স্বার্থ রক্ষার্থে আমদানি শুল্ক-প্রাচীরের সৃষ্টি করে। ফলে শিল্পপ্রধান দেশগুলির শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী জমিয়া যায়, কলকারখানা বন্ধ হইলে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং অপরদিকে শিল্পে-অনগ্রসর দেশগুলির উৎপন্ন পণ্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পায়।

বিশ্ব-অর্থনৈতিক সম্মেলন ও উহার ব্যর্থতা

এই সকল কারণে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য অচল অবস্থায় আসিয়া পেঁছায় এবং ১৯৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপের বহু রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। এই সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলন (World Economic Conference) আহূত হয়। বিশ্বের ৬৪টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা ইহাতে যোগ দেন। কিন্তু উহাদের মধ্যে মতানৈক্যের ফলে সম্মেলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত

১। জার্মানীর দেয় ক্ষতিপূরণ সমস্যা কিরূপ ছিল? জার্মানী এই সমস্যা সমাধানের জন্য কি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল? [উঃ ১১.১, ১১.২, ১১.৪, ১১.৫]

২। ক্ষতিপূরণ সমস্যা সমাধানের জন্য মিত্রপক্ষের ভূমিকা আলোচনা কর। [উঃ ১১.৩, ১১.৪, ১১.৫, ১১.৬, ১১.৭]

৩। ভার্সাই-সন্ধিতে ক্ষতিপূরণ সমস্যার শর্তাদি কি ছিল? [উঃ ১১.১]

৪। কোন্-নীতির উপর ভিত্তি করিয়া ক্ষতিপূরণের দাবি করা হইয়াছিল? [উঃ ১১.১]

৫। ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত ডাওয়েজ পরিকল্পনা ও ইয়ং পরিকল্পনা কি ছিল? [উঃ ১১.৬, ১১.৭]

৬। ১৯৩০ দশকের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ কি ছিল? এই সমস্যার সমাধানের জন্য কি প্রচেষ্টা হইয়াছিল? [উঃ ১১.৮]

দ্বাদশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিধানের প্রচেষ্টা : নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা
(Quest for International Security : Disarmament Problem)

১২.১. ভূমিকা : বিশ্বের ইতিহাসে নিরবচ্ছিন্নভাবে শান্তি বা যুদ্ধের যুগ কখনও আসে নাই। যুদ্ধের পর শান্তি এবং শান্তির পর যুদ্ধ—একের পর এক চলিয়া আসিতেছে। যুদ্ধের বীভৎসতা ও যুদ্ধপ্রসূত দুঃখ-দুর্দশার সমাধানের উপায় হিসাবে মানুষ শান্তি কামনা করিয়াছে। আবার কখনও কখনও আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদের সমাধানের উপায় হিসাবে যুদ্ধের প্রয়োজনও অনুভব করিয়াছে। মানব-সভ্যতার প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার আশায় রাষ্ট্রসংঘ বা রাষ্ট্র-সমবায় গঠনের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে। মীমাংসা ও সহযোগিতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদ ও বিরোধ নিষ্পত্তি করার প্রচেষ্টা যুগে যুগে হইয়া আসিতেছে এবং মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ইহার বহু নজিরও আছে। সকল যুগেই দার্শনিকগণ শান্তির বাণী প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। গ্রীকদের 'প্রাকৃতিক-আইন' (Natural Law), বৌদ্ধধর্ম আন্দোলন, আলেকজান্ডার ও অগস্টাসের ঐক্য-আন্দোলন প্রভৃতিতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার নিদর্শন পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীতে ইহার চরম প্রকাশ দেখা যায় লীগ-অফ্-নেশনস্-এর সংগঠনে।

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা

আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে ইওরোপে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করার প্রথম যথার্থ চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। 'পবিত্র-চুক্তি' (Holy Alliance) ও 'কনসার্ট অফ ইওরোপের' (Concert of Europe) গঠনের মধ্যে। ফরাসী বিপ্লব একটি বিশিষ্ট রাষ্ট্রের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিপ্লবে পরিণত হইয়াছিল। নেপোলিয়নের শাসনাধীনে ফ্রান্স ইওরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে বলসাম্য (Balance of Power) বিনষ্ট করিয়াছিল। সুতরাং নেপোলিয়নের পতনের পর ফ্রান্স যাহাতে পুনরায় ইওরোপের শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিতে না পারে তজ্জন্য ইওরোপের রাষ্ট্র-বিদ্গণ আন্তর্জাতিক সংস্থা সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। ইওরোপের খ্রীষ্টান রাষ্ট্রবর্গের শান্তি স্থাপন ও উহাদের পরস্পর স্বার্থরক্ষার করার উদ্দেশ্যে জার প্রথম আলেকজান্ডারের চেষ্টায় 'পবিত্র-চুক্তি' সম্পাদিত হইয়াছিল। নানা কারণে এই চুক্তির উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলেও ইহা অস্বীকার করা যায় না যে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের ইহাই হইল প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। ইহার পর 'কনসার্ট অফ্ ইওরোপ' নামে আর

আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার চেষ্টা

একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সংগঠন করিয়া ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ যুদ্ধের পরিবর্তে সহযোগিতা ও আপোস-মীমাংসার দ্বারা ইওরোপের শান্তি বজায় রাখিতে যত্নবান হইয়াছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ-অফ্-নেশনস্ নামক আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হয়। পূর্ববর্তী আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি হইতে লীগের মূল নীতি ছিল পৃথক। লীগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমবেতভাবে বিশ্বের নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষা করা এবং বিশ্বের জনগণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন করা। পূর্ববর্তী আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির মূল লক্ষ্য ছিল ইওরোপের রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে শক্তিসাম্য' বজায় রাখা। কিন্তু লীগ-অফ্-নেশনস্-এ শক্তিসাম্য নীতির প্রাধান্যের পরিবর্তে সমবেতভাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নীতির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

পূর্বগামী আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি হইতে লীগ-অফ-নেশনস্ এর পার্থক্য

১২.২. নিরাপত্তার সমস্যা : লীগ-অফ্-নেশনস্-এর মাধ্যমে নিরাপত্তা বিধানের প্রচেষ্টা (Problem of Security : Security through the League) :

বিশ্বযুদ্ধের পর নিরাপত্তা বিধানের অনুকূল পরিবেশ : প্যারিস শান্তি-সম্মেলনের সম্মুখে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সেইগুলির অধিকাংশই সমাধান করা হইয়াছিল। ইওরোপ ও নিকট-প্রাচ্যের রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন একরূপ সম্পূর্ণ হইয়াছিল এবং ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান না হইলেও কিছুদিনের জন্য উহা স্থগিত রাখিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল। যদিও রুশ-বিপ্লবীদের আন্তর্জাতিক কার্যকলাপ ইওরোপের রাষ্ট্রবর্গের সহিত রাশিয়ার সম্পর্ক তিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তথাপি ইওরোপের কয়েকটি প্রধান রাষ্ট্র রাশিয়ার নূতন সরকারকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

সুতরাং, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যুদ্ধের ভীতি দূর করিয়া শান্তি ও সংহতি স্থাপনের অনুকূল হইয়া উঠিয়াছিল। বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব-শান্তি রক্ষার ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা শুরু হয়। আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তি করা এবং আক্রমণের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে নিরাপত্তা ও শান্তিরক্ষা করার উদ্দেশ্য লইয়া লীগ-অফ্-নেশনস্ নামক আন্তর্জাতিক সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। এই নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা শুধু যে লীগ-অফ্-নেশনস্-এর মাধ্যমেই করা হইয়াছিল এমন নহে, লীগের বাহিরেও ইহার চলিয়াছিল।

নিরাপত্তার সমস্যা : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তিবর্গের জয়লাভের উল্লাস প্রশমিত হইলে ফ্রান্স জার্মানীর ভবিষ্যৎ আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজ নিরাপত্তার প্রতি মনোযোগী হয়। ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে ফ্রান্সই নিরাপত্তার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল।

ফ্রান্সের জার্মান ভীতি

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের পর ইওরোপের সকল ব্যাপারে ফ্রান্স উহার নিরাপত্তার কথা

সর্বাগ্রগণ্য বলিয়া দাবি করিয়া আসিতেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে সেডানের যুদ্ধের (১৮৭০ খ্রীঃ) শোচনীয় পরাজয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর আক্রমণের তীব্রতা ফ্রান্স কখনও ভুলিতে পারে নাই। ফ্রান্স ইহাও ভুলিতে পারে নাই যে একমাত্র মিত্রপক্ষের সমবেত সাহায্যেই ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত অনিবার্য ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স চরম সাফল্যলাভ করিয়াছিল ও জার্মানী চরম পরাজয় বরণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও জার্মানীর ভবিষ্যৎ আক্রমণের আশংকা ফরাসী জনগণ ও ফরাসী নেতৃবর্গের এক দারুণ অস্বস্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে জার্মানী বিশ্বযুদ্ধে পরাজয় বরণ করিলেও জনবল, প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্পসম্পদ ও সামরিক শক্তির দিক দিয়া ফ্রান্সের তুলনায় জার্মানী ছিল অধিক সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী। ইহা ছাড়া বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন ইওরোপের রাজনীতি হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতা, ইটালী ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ প্রভৃতি কারণে ফ্রান্স জার্মানীর ভবিষ্যৎ আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধোত্তর যুগের অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল ফ্রান্সের নিরাপত্তার সমস্যা। কার (Carr)-এর ভাষায় "The most important and persistent single factor in European affairs in the years following 1919 was the French demand for security"।*

রাইন পর্যন্ত ফ্রান্সের সীমানা সম্প্রসারণের দাবি, ইঙ্গ-ফরাসী ও ইঙ্গ-মার্কিন চুক্তি

ফ্রান্স নিরাপত্তা সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে প্যারিস শান্তি-সম্মেলনে রাইন নদীর উপকূল পর্যন্ত উহার সীমানা সম্প্রসারণের দাবি করিল। কিন্তু এই দাবি মানিয়া লইলে প্রায় পাঁচ লক্ষ জার্মানবাসী ফ্রান্সের শাসনভুক্ত হইয়া পড়িবে, এই কারণে মিত্রশক্তিবর্গ এই দাবির বিরোধিতা করিয়ামাত্র পনেরো বৎসরের জন্য ফ্রান্সকে রাইন নদীর বাম তীরবর্তী অঞ্চল দখলের অধিকার দিল। এতদ্ভিন্ন জার্মানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে সাহায্য করার জন্য ফ্রান্স ও ব্রিটেন এবং ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ভার্সাই-সন্ধি গ্রহণে অসম্মত হইলে প্রকৃতপক্ষে ইঙ্গ-মার্কিন যুগ্ম-নীতির কোন মূল্য রহিল না। ফ্রান্স কালবিলম্ব না করিয়া পোল্যাণ্ডের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইল (১৯২১ খ্রীঃ)। শান্তির শর্তাদি রক্ষা করার ব্যাপারে ফ্রান্স ও

ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে চুক্তি

পোল্যাণ্ডের স্বার্থ ছিল অভিন্ন। সুতরাং দুই রাষ্ট্রের মধ্যে আত্মরক্ষামূলক চুক্তি সময়োপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি ফ্রান্সের আশংকা দূরীভূত হইল না এবং ফ্রান্স পুনরায় ইংল্যাণ্ডের নিকট হইতে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দাবি করিল। ইংল্যাণ্ড এই ধরনের প্রতিশ্রুতি প্রদানে অসম্মত হইলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা

---

* Carr—International Relations between the two world wars—P 25.

ব্যর্থ হইল। ফ্রান্সকে সামরিক প্রতিশ্রুতি দানের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের যুক্তি ছিল এই যে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সামরিক-চুক্তি সম্পাদিত হইলে অপরাপর রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও আক্রমণাত্মক জোটের (hostile combination) উদ্ভব হইবে। ইহার পর ফ্রান্স তৃতীয় পন্থা অনুসরণ করিল। ফ্রান্স রুঢ় অঞ্চল দখল করিল। ফ্রান্সের উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীর শিল্পোন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া ফ্রান্সের নিরাপত্তার বিধান করা এবং উহার সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করা। কিন্তু ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মানদের অসহযোগ-আন্দোলন এবং রুঢ় অঞ্চল দখলে রাখিতে ফ্রান্সের প্রচুর অর্থক্ষয় প্রভৃতি কারণে ফ্রান্সের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল এবং এই উপলক্ষে ব্রিটেনের সহিত উহার মনোমালিন্যের উদ্ভব হইল।

ফ্রান্স কর্তৃক রুঢ় দখল

এই অবস্থায় ফ্রান্স নিজ নিরাপত্তার জন্য চতুর্থ পন্থা হিসাবে প্রস্তাব করিল যে শান্তির শর্তাদি অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থার কোনরূপ পরিবর্তন করা চলিবে না। ফ্রান্স নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament) নীতির সহিত নিরাপত্তার প্রশ্নটি জড়িত করিয়া নিরাপত্তার জন্য নিরস্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ দাবি করিল। ইহা ভিন্ন ফ্রান্স লীগ-অফ্-নেশনস্-এর মাধ্যমে যুগ্ম-নিরাপত্তার (Collective Security) ব্যবস্থা কার্যকর করিবার চেষ্টা করিল। লীগ-অফ্-নেশনস্-এর দশম ও ষোড়শ শর্তে যুগ্ম বা সম্মিলিতভাবে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার কথা বর্ণিত ছিল। দশম শর্তে বলা হইয়াছিল যে লীগের সদস্য-রাষ্ট্রবর্গ পরস্পরের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে এবং কোন সদস্য-রাষ্ট্র বৈদেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হইলে অপরাপর সদস্য-রাষ্ট্র উহার সাহায্যে অগ্রসর হইবে। ষোড়শ শর্তে বলা হইয়াছিল যে লীগের সকল সদস্য-রাষ্ট্র আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিবে এবং আক্রান্ত রাষ্ট্রকে [illegible] বে। কিন্তু জেনিভাতে লীগের সাধারণ সভায় উপরোক্ত দশম ও ষোড়শ শর্তের কিছু পরিবর্তন করিয়া বলা হইয়াছিল যে আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কি প্রকারের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে তাহা প্রত্যেক রাষ্ট্রের সরকার স্থির করিবেন। এই দুই শর্তের নূতন ব্যাখ্যার ফলে লীগের যুগ্ম নিরাপত্তার শর্ত দুর্বল হইয়া পড়িল এবং এই কারণে লীগের যুগ্ম নিরাপত্তা শর্তের উপর ফ্রান্সের আস্থাও হ্রাস পাইল। সুতরাং ফ্রান্স নিজ নিরাপত্তার জন্য পঞ্চম পন্থা হিসাবে যুদ্ধ-পূর্ব যুগের অনুসৃত আঞ্চলিক ভাবে নিরাপত্তা বিধানে উদ্যোগী হইল। একই সময় আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে নিরাপত্তা বিধানের প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল।

ফ্রান্সের চতুর্থ পন্থা ঃ লীগের মাধ্যমে নিরাপত্তার বিধান

ফ্রান্সের পঞ্চম পন্থা ঃ আঞ্চলিক ভাবে নিরাপত্তার বিধান

১২.৩. পরস্পর সাহায্য সংক্রান্ত চুক্তির খসড়া ঃ আঞ্চলিক ভাবে নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে লীগ-অফ্-নেশনসকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার ইহাই হইল প্রথম

গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সরকারের চেষ্টায় 'পরস্পর সাহায্য-সংক্রান্ত চুক্তির খসড়া' (Draft Treaty of Mutual Assistance) প্রস্তুত করা হয়। লীগ-চুক্তিপত্র (League Covenant) অনুসারে আঞ্চলিক ভাবে নিরাপত্তা বিধানের পক্ষে কোন বাধা ছিল না। পরস্পর সাহায্যসংক্রান্ত চুক্তির খসড়ায় এই আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত চুক্তির স্বরূপ সুস্পষ্ট করা হইল। ইহাতে আক্রমণাত্মক যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। (ইহাতে বলা হইল যে কোন রাষ্ট্র যুদ্ধ আরম্ভ করিলে চারিদিনের মধ্যে লীগ-কাউন্সিল কোন্ পক্ষ 'আক্রমণকারী' তাহা ঘোষণা করিবে এবং লীগের সদস্য-রাষ্ট্রবর্গ আক্রান্ত রাষ্ট্রকে সামরিক বা অর্থনৈতিক সাহায্য দান করিবে।)

চুক্তির শর্তাদি

এই চুক্তিপত্র মাত্র ১৮টি রাষ্ট্রের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া এই চুক্তির পক্ষপাতী ছিল না। ইংল্যাণ্ডও ইহা বাতিল করিল। ফ্রান্সও এই চুক্তি গ্রহণে উৎসাহিত হইল না, কারণ ইহাতে আক্রমণের যথার্থ ব্যাখ্যা নিরূপণ করা হয় নাই এবং নিরাপত্তা বিধানের পূর্বেই নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। সুতরাং নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে লীগ-অফ্-নেশনস্‌কে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হইল এবং 'পরস্পর-সাহায্য সংক্রান্ত চুক্তিও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল।

১২.৪. জেনিভা প্রোটোকল (Geneva Protocol, 1924): ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম কর্তৃক রূঢ় অঞ্চল দখলের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে উগ্র জার্মানবিরোধী ফরাসী মন্ত্রী পঁয়েকার-এর পদচ্যুতির পর উদারপন্থী হেরিয়ট (Herriot) পররাষ্ট্র-মন্ত্রী নিযুক্ত হন। অপরদিকে ম্যাকডোনাল্ড-এর অধীনে ইংল্যান্ডে শ্রমিক সরকার গঠিত হয়। সুতরাং নূতনভাবে নিরাপত্তার বিধান করার পক্ষে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনুকূল হইয়া উঠে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে জেনিভায় আহূত এক সম্মেলনে গ্রীক ও চেক্ প্রতিনিধিগণ জেনিভা প্রোটোকল নামক এক চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করেন। ইহাতে প্রস্তাব করা হয় যে (১) আঞ্চলিক নিরাপত্তার পরিবর্তে বিশ্ব-নিরাপত্তার বিধান করিতে হইবে, (২) চুক্তি-স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ সকল বিরোধের ব্যাপারে স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের (Permanent Court of International Justice) কর্তৃত্ব স্বীকার করিবে, (৩) আন্তর্জাতিক আইনের বহির্ভূত সকল বিবাদ লীগ-কাউন্সিলের নিকট উপস্থাপিত করিতে হইবে, (৪) লীগ-কাউন্সিলের মধ্যস্থতায় সকল বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বিবদমান রাষ্ট্রবর্গ গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে, (৫) লীগ-কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিলে কাউন্সিল সালিস (Arbitrators) নিযুক্ত করিয়া উহাদের হস্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ন্যস্ত করিবে এবং সালিসদের সিদ্ধান্ত বিবদমান উভয়পক্ষ মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবে, (৬) সালিসদের আলাপ-আলোচনা চলিতে থাকাকালীন বিবদমান কোন পক্ষ সৈন্য সমাবেশ করিবে না,

জেনিভা প্রোটোকলের শর্তাদি

(৭) কোন রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আসিতে অসম্মত হইলে কিংবা সালিসদের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে অসম্মত হইলে উহাকে 'আক্রমণকারী দেশ' (Aggressor) বলিয়া অভিহিত করা হইবে, (৮) লীগ-কাউন্সিল আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে অর্থনৈতিক বয়কট ঘোষণা করিতে পারিবে অথবা প্রয়োজনবোধে উহার বিরুদ্ধে সামরিক শক্তিও প্রয়োগ করিতে পারিবে, (৯) যুদ্ধ-সৃষ্টির অপরাধে আক্রমণকারী দেশের উপর ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হইবে, অবশ্য আক্রমণকারী দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ধার্য করা হইবে, (১০) লীগ কাউন্সিলের সদস্যবর্গের অধিকাংশ জেনিভা প্রোটোকল অনুমোদন করিলে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন (Disarmament Conference) আহ্বান করা হইবে এবং (১১) বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করার অধিকার লীগ-কাউন্সিলের থাকিবে।

বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক জেনিভা প্রোটোকল প্রত্যাখ্যান

ক্ষুদ্র রাষ্ট্রবর্গ জেনিভা প্রোটোকল সমর্থন করিল বটে, কিন্তু বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি তাহা প্রত্যাখ্যান করিল। কারণ ইহার শর্তানুসারে সকল দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্পর্কে লীগ-কাউন্সিলকে বিচার-বিবেচনা করার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলিও প্রোটোকলের ঘোর বিরোধী ছিল।

জেনিভা প্রোটোকলের গুণ

জেনিভা প্রেটোকল প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার কতকগুলি বিশেষ গুণ ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। জেনিভা প্রোটোকলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিধানের এক বিরাট পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ, প্রোটোকলে উল্লিখিত কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ইহাতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গের পক্ষে কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

যুদ্ধবিগ্রহের নিষিদ্ধকরণ

দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক ও আইন-সংক্রান্ত সকল বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য বিবদমান রাষ্ট্রবর্গের পক্ষে সালিসি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, ইহাতেই সর্বপ্রথম যুদ্ধকে 'বে-আইনী' বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। চতুর্থতঃ, জেনিভা প্রোটোকলের দ্বারা লীগ-চুক্তিপত্রের (League Covenant) কতকগুলি ত্রুটি দূর করার চেষ্টা হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের জন্য লীগ-চুক্তিপত্রে কতকগুলি শর্ত সন্নিবিষ্ট ছিল। কিন্তু লীগ-কাউন্সিলে মতানৈক্যের উদ্ভব হইলে কি উপায়ে আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করা হইবে তাহার কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ লীগ-চুক্তিপত্রে ছিল না। জেনিভা প্রোটোকল সেইরূপ পরিস্থিতিতে সালিসি-ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়াছিল। বিবদমান রাষ্ট্রের উপর সালিসদের সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ প্রোটোকলে দেওয়া হইয়াছিল।

সালিসিগ্রহণের ব্যবস্থা

সর্বপ্রথম যুদ্ধ বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত

সালিসি-ব্যবস্থার মাধ্যমে লীগ-কাউন্সিলের অন্যতম ত্রুটি দূর করার চেষ্টা

পঞ্চমতঃ, অভ্যন্তরীণ সমস্যা-প্রসূত বিবাদ-বিসংবাদে হস্তক্ষেপ করার বা তাহা প্রতিরোধ করার অধিকার লীগ-কাউন্সিলের ছিল না। এইরূপ পরিস্থিতিতে জেনিভা প্রোটোকল লীগ-কাউন্সিলের মাধ্যমে সালিসির ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং বিবদমান কোন পক্ষ সালিসদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসম্মত হইলে উহাকে আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত করার নির্দেশ দিয়াছিল।

অভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদে লীগের হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা

ষষ্ঠতঃ, কোন রাষ্ট্র আক্রমণাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হইলে উহার বিরুদ্ধে যথোচিত ও সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা লীগ-কাউন্সিলের পক্ষে সকল সময় সম্ভব ছিল না। সেই ক্ষেত্রে জেনিভা প্রোটোকল যুদ্ধ-বিরতির নির্দেশ দিয়াছিল। সপ্তমতঃ, নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে জেনিভা প্রোটোকল নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহ্বানের ব্যবস্থা করিয়াছিল, যে ব্যবস্থা লীগ-চুক্তিপত্রে ছিল না। প্রকৃতপক্ষে জেনিভা প্রোটোকল লীগ-চুক্তিপত্রের কতকগুলি আইন-সংক্রান্ত ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করিয়াছিল। আক্রমণাত্মক যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা যথাসম্ভব দূর করিয়া স্থায়ী শান্তির ভিত্তির উপর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়ন করার চেষ্টা জেনিভা প্রোটোকলে লক্ষ্য করা যায়। লীগ-কাউন্সিলের ত্রুটি দূর করিয়া উহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার ইহাই হইল প্রথম প্রচেষ্টা।

যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা

নিরস্ত্রীকরণের সম্মেলন আহ্বানের ব্যবস্থা

উপসংহার

১২৫. লোকার্নো-চুক্তিসমূহ (The Locarno Agreements, 1925): জেনিভা প্রোটোকল পরিত্যক্ত হইলেও ইওরোপে শান্তিভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন অনিবার্য রূপে দেখা দেয়। কোথাও সামান্য ধরনের বিবাদ বা বিরোধের উৎপত্তি হইলে উহার নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা হয়ত লীগ-অফ-নেশনস্-এর ছিল। কিন্তু জার্মানী শক্তিশালী ও পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিবার পূর্বেই ইওরোপের নিরাপত্তা শক্তিশালী করিয়া তুলিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে ফ্রান্স ও উহার পূর্ব-ইওরোপীয় মিত্রবর্গের সহযোগিতা লাভ করিতে হইলে ইওরোপের নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজন অনুভূত হইল। জার্মানীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্ট্রেসমান (Stressmann) ঘোষণা করিলেন যে, জার্মানীর আলসাস-লোরেন-এর উপর দাবি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত এবং তিনি একাধিক আঞ্চলিক আত্মরক্ষামূলক চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাবও করিলেন। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হইল। ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রিয়াঁ (Briand) পূর্ব ও পশ্চিম ইওরোপে সম্মিলিত নিরাপত্তার দাবি করিয়া ব্যর্থ হইলেন। কারণ ইংল্যান্ড জার্মানীর পূর্ব সীমান্তের নিরাপত্তার ব্যাপারে মোটেই আগ্রহশীল ছিল না। আগত্যা ফ্রান্স পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা বিধানেই সম্মত হইল। কিন্তু ফ্রান্স

পটভূমিকা

সেই সঙ্গে দাবি করিল যে, বিনা শর্তে জার্মানীকে লীগ-অফ-নেশনস্-এর সদস্যপদ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এই প্রস্তাবে জার্মানী সম্মত হইতে পারিল না; কারণ তাহা হইলে র‍্যাপালো-সন্ধি অনুসারে জার্মানী ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে স্থাপিত সম্পর্ক ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং শেষ পর্যন্ত ইহা স্থির হইল যে নিজ নিজ সামরিক স্বার্থ ও ভৌগোলিক পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া লীগের প্রতিটি সদস্য-রাষ্ট্র লীগের কার্যাদি সমর্থন করিবে। প্রারম্ভিক আলাপ-আলোচনা শেষ হইলে পর বেলজিয়াম, ব্রিটেন, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী ও পোল্যান্ডে প্রতিনিধিগণ লোকার্নোতে সমবেত হইয়া একাধিক সন্ধিপত্র রচনা করিলেন। এইগুলি লোকার্নো-চুক্তি নামে খ্যাত। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর লন্ডনে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিপত্রগুলি স্বাক্ষরিত হইল। লোকার্নো-চুক্তিগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত চুক্তিগুলি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ :—

(ক) পারস্পরিক সালিসি-চুক্তি (Treaty of Mutual Arbitration) : বেলজিয়াম, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইটালীর মধ্যে সম্পাদিত এই চুক্তি অনুসারে (১) জার্মানী ও ফ্রান্স এবং জার্মানী ও বেলজিয়ামের সীমানা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল এবং রাইন অঞ্চলের স্থায়ী বেসামরিকীকরণ অনুমোদন করা হইল, (২) বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও জার্মানী পরস্পরের নিকট এই মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল যে রাইন অঞ্চল সম্পর্কিত বিধি, পরস্পরের সীমানা ভঙ্গ এবং আত্মরক্ষা ছাড়া একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে না; (৩) জার্মানীর পশ্চিম সীমান্ত ভঙ্গ হইলে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রবর্গ সম্মিলিত ভাবে উহা প্রতিরোধ করিতে যত্নবান হইবে; (৪) চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রবর্গের সীমান্তভঙ্গের অভিযোগ লীগ-কাউন্সিল তদন্ত করিবে। কিন্তু যদি কোন চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র আত্মরক্ষা-হেতু আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে কাউন্সিলকে পূর্বাহ্নেই জানাইতে হইবে এবং কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলে বাধ্য থাকিবে।

(খ) জার্মানী ও বেলজিয়াম এবং ফ্রান্সের মধ্যে সালিসি-চুক্তি (Arbitration Convention) : এই চুক্তি অনুসারে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রবর্গ শান্তিপূর্ণভাবে পরস্পরের মধ্যে সকল বিবাদের মীমাংসা করিবে স্থির হইল।

(গ) জার্মানী ও পোল্যান্ড এবং জার্মানী ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে সালিসি-চুক্তি (Arbitration Treaties) : জার্মানীর পূর্ব সীমান্ত সম্পর্কেই এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল। ব্রিটেন জার্মানীর পূর্ব সীমান্ত সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি প্রদানে অসম্মত হইলে জার্মানী পোল্যান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সহিত পৃথকভাবে দুইটি চুক্তি সম্পাদন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই চুক্তি অনুসারে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে বিরোধের উৎপত্তি হইলে উহার নিষ্পত্তির জন্য সালিসি গ্রহণে বাধ্য থাকিল। জার্মান-পোল কিংবা জার্মান-চেক্ সীমান্ত ভঙ্গ হইলে ব্রিটেন ও ইটালী পোল্যান্ড বা চেকোশ্লোভাকিয়ার সাহায্যার্থে আসিতে বাধ্য থাকিল না।

(ঘ) ফ্রান্স ও পোল্যান্ড এবং ফ্রান্স ও চেকোশ্লাভাকিয়ার পরস্পর প্রতিশ্রুতি-সম্বলিত চুক্তি (Treaties of Guarantee) : এই চুক্তিগুলির শর্তানুসারে স্থির হয় যে লোকার্নো-চুক্তি ভঙ্গকারী কোন দেশ ফ্রান্স, পোল্যান্ড অথবা চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বার্থ বিপন্ন করিলে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলি পরস্পর পরস্পরকে যথোচিত সাহায্য দানে বাধ্য থাকিবে।

১২.৬. লোকার্নো-চুক্তিগুলির সমালোচনা (Criticism of the Locarno Treaties) : বিশ্বের কূটনৈতিক ইতিহাসে প্যারিস-শান্তি সম্মেলনের পর লোকার্নো-চুক্তিগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জার্মানীকে লীগ-অফ-নেশনস্‌-এর স্থায়ী সদস্য রূপে গ্রহণ করা হইলে ডাওয়েজ পরিকল্পনার যথার্থ উদ্দেশ্য সফল হইল। যদিও জার্মানীকে অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রসংঘে স্থান দেওয়া হয় নাই, তবুও এই চুক্তিগুলির দ্বারা সর্বপ্রথম জার্মানীর প্রয়োজনে ভার্সাই-সন্ধির পুনর্বিবেচনার দাবি ও ফ্রান্সের নিরাপত্তার দাবির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হইল এবং সেই সঙ্গে ইওরোপের রাষ্ট্রীয় বিন্যাস অব্যাহত রাখা হইল।

লোকার্নো-চুক্তি সম্পর্কে সমসাময়িক ধারণা

এই কারণেই চেম্বারলেন মন্তব্য করিয়াছিলেন, "The Locarno drew the real dividing line between the years of war and the years of peace." ফ্রান্সের মতে লোকার্নো-চুক্তি ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী পুনঃস্থাপনে সাহায্য করিল। অপরদিকে ইংল্যান্ডের মতে এই চুক্তি দ্বারা জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে বলসাম্য বজায় রাখিয়া উভয়ের বিরোধ নিষ্পত্তি করার অধিকার ইংল্যান্ড লাভ করিল। প্রকৃতপক্ষে লোকার্নো-চুক্তিগুলির পশ্চাতে বার্লিন, লন্ডন ও প্যারিসের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং এই দিক দিয়া যুদ্ধের পর হইতে অনুসৃত ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন হইল বলা যায়। ইংল্যান্ডের অনমনীয় মনোভাবের জন্যই পূর্বে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল, যেমন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তি; ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের পরস্পর-সাহায্যমূলক চুক্তি (Treaty of Mutual Assistance) এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের জেনিভা প্রোটোকল। প্রতিটি প্রস্তাব ইংল্যান্ড প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; কারণ ফ্রান্সের উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীকে চিরতরে পঙ্গু করিয়া রাখা। লোকার্নো-চুক্তি দ্বারা ফ্রান্সের জার্মান-বিরোধী মনোভাবের কিছু পরিবর্তন হইল এবং জার্মানীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া উহাকে রাষ্ট্রসংঘে গ্রহণ করা হইল, যদিও রাষ্ট্রসংঘের অপরাপর সদস্যদের সহিত জার্মানীর সমমর্যাদা স্বীকৃত হইল না। এতদ্ভিন্ন ইংল্যান্ডের বিরোধিতাহেতু আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিদানের পরিবর্তে ইংল্যান্ড আঞ্চলিকভাবে উহা প্রদান করিল। এইভাবে প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে প্রদর্শিত জার্মানীর বিরুদ্ধে বিজেতা রাষ্ট্রবর্গের মনোভাব, রূঢ় অঞ্চল দখল করার পশ্চাতে ফ্রান্সের জার্মান-বিরোধী মনোভাব এবং এযাবৎ অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলিতে রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে পারস্পরিক মনোমালিন্য ও বিদ্বেষভাব প্রভৃতির অবসান ঘটিল

এবং সর্বত্র জনসাধারণ আপোসমূলক ও শান্তিমূলক মনোভাব গ্রহণ করিল। এককথায় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে সর্বত্র যে বিদ্বেষপূর্ণ ও প্রতিশোধাত্মক মনোভাবের প্রকাশ দেখা দিয়াছিল লোকার্নো-চুক্তির পর সেই অস্বস্তিকর পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিল এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অনেকাংশে উন্নত হইল।

লোকার্নো-চুক্তিসমূহের ত্রুটি : জার্মানীর পূর্ব-সীমান্ত সমস্যা অমীমাংসিত

লোকার্নো-চুক্তিগুলি ত্রুটিহীন ছিল না। প্রথমতঃ, জার্মানী ও ফ্রান্স যথাক্রমে আলসাস-লোরেন ও রাইন অঞ্চলের দাবি পরিত্যাগ করিলেও জার্মানীর পূর্ব-সীমান্তিক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হইল না এবং শান্তিপূর্ণভাবে উহার সমাধানের কোন নিশ্চয়তাও ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, জার্মানীর পূর্ব-সীমান্ত রক্ষা করার ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের অসম্মতি ইহাই প্রমাণিত করিল যে, ইংল্যাণ্ড আন্তর্জাতিক ভিত্তির উপর সমগ্র ইওরোপের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক। ফলে লীগ-অফ-নেশনস্-এর শর্তাদিতে যুগ্ম নিরাপত্তার যে আদর্শ গৃহীত হইয়াছিল তাহা কার্যতঃ ব্যর্থ প্রতিপন্ন হইল। তৃতীয়তঃ, লোকার্নো-চুক্তিগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলেও প্রচ্ছন্নভাবে পূর্বতন ও নূতন আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদ রহিয়া যায়।

যুগ্ম নিরাপত্তা, আদর্শের ব্যর্থতা

পূর্বতন ও নূতন আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলি অমীমাংসিত

ফ্রাঙ্কো-পোল মৈত্রীর দুর্বলতা রাশিয়ার মনোভাব

চতুর্থতঃ, ফ্রাঙ্কো-জার্মান সম্পর্কের উন্নতিসাধন এবং উহাদের মধ্যে সহযোগিতার সম্ভাবনা ফ্রাঙ্কো-পোল মৈত্রীর (Franco-Polish Alliance) ভিত্তি দুর্বল করিল। পঞ্চমতঃ, লোকার্নো-চুক্তিগুলিকে রাশিয়া নিজের বিরুদ্ধে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের ষড়যন্ত্র বলিয়া মনে করিল।

জার্মানীর লাভ

সংক্ষেপে বলিতে গেলে লোকার্নো-চুক্তি একমাত্র জার্মানীর পক্ষেই লাভজনক হইয়াছিল। প্রথমতঃ, ইহার দ্বারা ফ্রান্সের মৈত্রীজোট দুর্বল হইয়া পড়িল। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্সকে রাইন অঞ্চল পরিত্যাগ করিতে হইল। তৃতীয়তঃ, জার্মানী পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইল এবং চতুর্থতঃ জার্মানী ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের সম-মর্যাদা লাভ করিল। ইহার ফলে ভার্সাই-সন্ধিতে জার্মানীর যে জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হইয়াছিল তাহা লোকার্নো-চুক্তি বহুলাংশে দূরীভূত করিল।

১২.৭. কেলোগ-ব্রিয়াঁ-চুক্তি (Kellogg-Briand Pact, 1928): লোকার্নো-চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর অপর গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তি হইল কেলোগ-ব্রিয়াঁ-বা 'প্যারিসের চুক্তি'। এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, "The Pact of Paris was born of American initiative and French courtesy."। কিছুদিন হইতে আমেরিকায় যুদ্ধবিগ্রহকে 'বে-আইনী' বলিয়া ঘোষণা করার এক আন্দোলন চলিতেছিল। এই আন্দোলনের নেতৃবর্গের ধারণা ছিল এই যে, বিশ্ব হইতে যুদ্ধ-

বিগ্রহের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি করার চিরাচরিত প্রচেষ্টা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শান্তি স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। আমেরিকার বাহিরেও এইরূপ মতবাদ ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে লীগ-অফ-নেশনস্-এর সাধারণ সভা (General Assembly) সর্বসম্মতিক্রমে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ-নীতি পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সকল আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি করার উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে নিখিল-আমেরিকা-সম্মেলনেও (Pan American Conference) অনুরূপ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল। ইতিমধ্যে ফরাসী মন্ত্রী ব্রিয়াঁ (১৯২৭ খ্রীঃ) আমেরিকা ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধনীতি বর্জন করার প্রস্তাব করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারী-অফ-স্টেট কেলোগ-ব্রিয়াঁর আদর্শ গ্রহণ করিয়া আন্তর্জাতিক ভাবেই যুদ্ধ-নীতি বর্জন করার প্রস্তাব করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কেলোগ ব্রিটেন জার্মানী, ইটালী ও জাপানের নিকট প্রস্তাবিত চুক্তির খসড়া পাঠাইলেন। এই সকল রাষ্ট্রের সম্মতি লাভ করার পর ২৩শে জুন কেলোগ-চুক্তির শেষ খসড়াটি চৌদ্দটি রাষ্ট্রের নিকট পাঠাইলেন (ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, ভারত, স্বাধীন আইরিশ রাষ্ট্র, ইটালী, জাপান, নিউজিল্যান্ড, পোল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা)। কেলোগ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, সকল রাষ্ট্রই নিজেদের আত্মরক্ষাহেতু যুদ্ধ করার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে। সকল রাষ্ট্রের সম্মতিলাভ করার পর প্যারিস নগরীতে পনেরটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া কেলোগ-ব্রিয়াঁ-চুক্তি (প্যারিসের সন্ধি) স্বাক্ষর করেন (২৯শে আগস্ট, ১৯২৮)। ফ্রান্সের চেষ্টায় রাশিয়াও এই চুক্তিতে সম্মতি প্রকাশ করে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ৬৯টি রাষ্ট্র চুক্তিবদ্ধ হইল।

কেলোগ-ব্রিয়াঁ-চুক্তির শর্তাদি

এই চুক্তির শর্তানুসারে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ (সংখ্যা হইল ৬২), (১) যুদ্ধ-বিগ্রহকে জাতীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ না করিতে এবং জাতীয় উন্নতির জন্য যুদ্ধ পরিহার করিতে স্বীকৃত হইল, (২) শান্তিপূর্ণভাবে সকল প্রকার পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ নিষ্পত্তি করিতে স্বীকৃত হইল এবং (৩) এই চুক্তিপত্র অপরাপর রাষ্ট্রের স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত রাখিতে সম্মত হইল।

১২.৮. জেনারেল অ্যাক্ট (General Act): লীগ-অফ-নেশনস্-এর মাধ্যমে নিরাপত্তা বিধানের সর্বশেষ চেষ্টা হইল লীগ কর্তৃক গৃহীত জেনারেল অ্যাক্ট। ইহাতে বলা হইল যে, (১) বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আইন-সংক্রান্ত বিবাদ-বিসংবাদ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং বিবদমান পক্ষের উপর বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক হইবে এবং (২) আইন-সংক্রান্ত বিবাদ-বিসংবাদ ছাড়া অন্যান্য সকল বিবাদ-বিসংবাদ লীগের সালিসি-কমিটির নিকট উপস্থাপিত করিতে হইবে। ১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মাত্র ২৩টি রাষ্ট্র এই আইন গ্রহণে সম্মত হয়। যুদ্মভাবে নিরাপত্তা বিধানের এই চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১২.৯ঃ লীগ-অফ-নেশনস্-এর বাহিরে নিরাপত্তা বিধানের প্রচেষ্টা
(Security outside the League)

লীগ-অফ-নেশনস্-এর মাধ্যমে নিরাপত্তা বিধানের যেরূপ চেষ্টা হইয়াছিল লীগের বাহিরেও তেমনই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আঞ্চলিকভাবে পরস্পর চুক্তি সম্পাদন করিয়া নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা চলিয়াছিল। লীগ-চুক্তিপত্র অনুযায়ী আঞ্চলিক মৈত্রীচুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার বিধান করার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। আঞ্চলিক ভাবে নিরাপত্তা বিধানের প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত পরস্পর সাহায্যমূলক চুক্তির (Treaty of Mutual Assistance) মধ্যে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর হইতে ফ্রান্স ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট জার্মানীর ভবিষ্যৎ আক্রমণের বিরুদ্ধে লীগ-অফ-নেশনস্-এর মাধ্যমে যুগ্ম নিরাপত্তার (Collective Security) দাবি করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিল। লীগ-অফ-নেশনস্ও এই বিষয়ে বিশেষ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ প্রমাণিত হইয়াছিল। ১৯২৯-৩২ খ্রীষ্টাব্দের অর্থনৈতিক বিপর্যয়, ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সামরিক প্রস্তুতির প্রতিযোগিতা, জার্মানী কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখলের প্রচেষ্টা (১৯৩১ খ্রীঃ), জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ (১৯৩১ খ্রীঃ), জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুত্থান (১৯৩৩ খ্রীঃ), বিশ্ব-অর্থনৈতিক সম্মেলনের ব্যর্থতা (১৯৩২ খ্রীঃ), বিশ্বনিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ব্যর্থতা (১৯৩৩ খ্রীঃ) প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে বিশ্বের সর্বত্র এক গভীর আতংক ও অস্বস্তিকর পরিবেশের উদ্ভব হইয়াছিল। এই অবস্থায় পুনরায় আঞ্চলিক ভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা শুরু হয়।

ভূমিকা

নূতন রাষ্ট্রজোটের উৎপত্তি (New System of Alliances) ঃ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর নিরাপত্তা বিধানের প্রচেষ্টা হইতে পুনরায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একাধিক রাষ্ট্রজোটের উদ্ভব হয়।

১) **ফ্রান্সের মৈত্রীজোট ঃ** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই-সন্ধি অপরিবর্তিত রাখিয়া জার্মানীর সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা হিসাবে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি ত্রি-শক্তি-মৈত্রী স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের প্রস্তাব সমর্থন না করায় ফ্রান্সের নিরাপত্তার সমস্যা জটিল হইয়া উঠে। লীগ-চুক্তিপত্রের শর্তাদিও ফ্রান্সের নিরাপত্তার বিধান করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং ফ্রান্স নিজ নিরাপত্তার জন্য অন্যত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে শত্রু-বিবেচনা করিয়া এবং প্রতিবেশীর প্রতিবেশীকে মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়া ("Your neighbour is your enemy but your neighbour's neighbour is your friend.") ফ্রান্স জার্মানীর প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত একাধিক রাষ্ট্রজোট গঠনে উদ্যোগী হইল। সংক্ষেপে ফ্রান্সের লক্ষ্য হইল জার্মানীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ইওরোপের ক্ষুদ্র

ফ্রান্সের জার্মান-ভীতি ও নিরাপত্তার অন্বেষণে ফ্রান্স

রাষ্ট্রগুলির সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং জার্মানীর চতুর্দিকে জার্মান-বিরোধী রাষ্ট্রবর্গের একটি আবেষ্টনী গঠন করা।

এই উদ্দেশ্যে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স বেলজিয়ামের সহিত আত্মরক্ষামূলক সন্ধিতে আবদ্ধ হয়। জার্মানীর সম্ভাব্য আক্রমণের আশংকা বেলজিয়ামেরও ছিল। সুতরাং ফ্রান্সের আমন্ত্রণে বেলজিয়াম অতি সহজেই ফ্রান্সের সহিত মিত্রতায় আবদ্ধ হয়। এই সন্ধি ও লোকার্নো-চুক্তি অনুসারে রাইন অঞ্চলের বে-সামরিকীকরণ (demilitarisation) ফ্রান্সের পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষিত করিল।

ফ্রান্স-বেলজিয়াম চুক্তি

জার্মানীর পূর্ব-সীমান্তে ফ্রান্স পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিল। পোল্যান্ডের দুইটি প্রধান শত্রু ছিল, পশ্চিম সীমান্তে জার্মানী এবং পূর্ব সীমান্তে রাশিয়া। ভার্সাই-সন্ধি অনুসারে জার্মানীর ভিতর দিয়া যে 'পোলিশ-করিডর' (Polish Corridor)-এর সৃষ্টি করা হইয়াছিল জার্মানী তাহা কখনই স্বীকার করিয়া লয় নাই। কারণ এই করিডর জার্মানীকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিল। কমিউনিস্ট রাশিয়াও পোল্যান্ডের নিরাপত্তার পক্ষে সর্বদাই বিপজ্জনক ছিল এবং ইতিমধ্যেই পোল্যান্ডের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে কমিউনিস্ট প্রভাব বিস্তার লাভ করিতেছিল। সুতরাং জার্মানী ও রাশিয়ার ন্যায় শত্রু-প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পোল্যান্ডের পক্ষে আবার এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের মিত্রতার প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও পোল্যান্ডের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়। ফ্রান্স পোল্যান্ডের সামরিক বাহিনী গঠন করিতে এবং উহার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হয়। এতদ্ভিন্ন ফ্রান্স ও চেকোশ্লোভাকিয়া (১৯২৬ খ্রীঃ) ফ্রান্স ও রুমানিয়া (১৯২৬ খ্রীঃ) এবং ফ্রান্স ও যুগোশ্লাভিয়া (১৯২৭ খ্রীঃ)-এর মধ্যেও সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধিগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল নিরাপত্তা-সংক্রান্ত ব্যাপারে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করা, আক্রমণের বিরুদ্ধে যুগ্ম প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ইওরোপের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এইভাবে পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া ফ্রান্স নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়।

ফ্রান্স ও পোলান্ড সন্ধি (১৯২১ খ্রীঃ)

ফ্রান্স-চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স-যুগোশ্লাভিয়া ও ফ্রান্স-রুমানিয়া সন্ধি : সন্ধিগুলির উদ্দেশ্য

(২) চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়ার মধ্যে মৈত্রীস্থাপন (Little Entente) : ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও রুমানিয়া কেবলমাত্র ফ্রান্সের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, উহারা পরস্পরের সহিতও একাধিক মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিল যাহা 'Little Entente' নামে পরিচিত। এই মৈত্রীগুলির উদ্দেশ্য ছিল ইওরোপে প্যারিসের-শান্তিচুক্তি অব্যাহত রাখা এবং পূর্ববর্তী

উদ্দেশ্য

শত্রুরাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক বলপূর্বক সীমান্ত পরিবর্তনের প্রচেষ্টা বা ভূতপূর্ব হ্যাপ্সবার্গ রাজবংশের পুনঃ-স্থাপনের প্রচেষ্টায় বাধাপ্রদান করা। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে চেক-রুমানিয়া সন্ধি, সেই বৎসর যুগোশ্লাভ-রুমানিয়া সন্ধি এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে চেক-যুগোশ্লাভ সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

(৩) **ইটালী কর্তৃক রাষ্ট্রজোট গঠন :** ফ্রান্স ও পূর্ব ইওরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রবর্গ (চেকোশ্লোভাকিয়া ও রুমানিয়া) ভার্সাই-এর ব্যবস্থা অনুসারে নিজেদের নিরাপত্তা বিধানের উদ্যোগ করিতেছিল। অপরদিকে পরাজিত রাষ্ট্রবর্গ যেমন অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়া ভার্সাই-কৃত ব্যবস্থার পুনর্বিবেচনার দাবি করিতেছিল। বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে ইটালীও এই দলভুক্ত ছিল। আশানুরূপ পুরস্কৃত না হওয়ায় ইটালী অসন্তুষ্ট ছিল এবং এই কারণে ইটালী শান্তির সন্ধিগুলি পুনর্বিবেচনার দাবি করিল। ফ্রান্সের ন্যায় ইটালীকেও কেন্দ্র করিয়া রাষ্ট্রজোটের উৎপত্তি হইল।

মুসোলিনীর পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল দানিউব অঞ্চলের রাষ্ট্রবর্গের সহযোগিতায় মধ্য-ইওরোপে ইটালীর প্রাধান্য স্থাপন করা। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী হাঙ্গেরীর সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া হাঙ্গেরীর অনুকূলে রাষ্ট্রীয় পুনর্বিন্যাসের দাবি করিল। ইটালী জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সংযুক্তিকরণের ঘোর বিরোধী ছিল, কারণ সেই ক্ষেত্রে ব্রেনার গিরিপথ (Brenner Pass) পর্যন্ত জার্মানীর সীমানা সম্প্রসারিত হইবার সম্ভাবনা ছিল এবং অস্ট্রিয়ার নিকট হইতে প্রাপ্ত দক্ষিণ টাইরল ইটালীর হস্তচ্যুত হইবার সম্ভাবনা ছিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনী অপর একটি কূটনৈতিক সাফল্য অর্জন করেন। ইটালী, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর মধ্যে একটি চুক্তি সম্পন্ন হইল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও অধিকার অক্ষুণ্ন করিয়া ইওরোপে শান্তি বজায় রাখা এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ত্বরান্বিত করা। এতদ্ভিন্ন চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রবর্গ পরস্পরের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার করিতেও স্বীকৃত হইল।

ইটালী, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর মধ্যে চুক্তি (১৯৩৪) 'রোম প্রটোকল'

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ইটালী, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী প্যারিসের শান্তি-চুক্তির পুনর্বিবেচনার দাবি করিতেছিল। ফলে এই তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে 'রোম প্রোটোকল' (Rome Protocol) নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল পরস্পরের নিরাপত্তার বিধান করা।

ইটালী, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর মধ্যে সম্পাদিত 'রোম প্রোটোকল'

(৪) **স্কাণ্ডিনেভিয়ান রাষ্ট্রজোট** (Scandinavian Bloc) : স্কাণ্ডিনেভিয়ান রাষ্ট্রগুলি—ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, আইসল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ড প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষ ছিল। যুদ্ধের পর লীগ্-অফ-নেশনস্-এর ভিতরে ও বাহিরে উহারা পরস্পরের সহিত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা স্থাপন

করিল। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রবর্গের নিরাপত্তা বিপজ্জনক হইয়া দেখা দিলে এবং সম্মিলিত নিরাপত্তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হইলে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মে ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ ইওরোপের যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিয়া পরস্পরের সহিত আত্মরক্ষামূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাশিয়া ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে (১৯৩৯-৪০ খ্রীঃ) এবং জার্মানী নরওয়ে ও ডেনমার্ক দখল করিলে স্কাণ্ডিনেভিয়ান রাষ্ট্রগুলির আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিধানের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, আইসল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি (১৯৩৮)

(৫) **বাল্টিক চুক্তি (Baltic Pact) :** জার্মানীতে নাৎসী-বিপ্লব সফল হইলে বাল্টিক রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা বিপজ্জনক হইয়া উঠে। নাৎসী জার্মানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও এস্তোনিয়া ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাল্টিক-চুক্তি সম্পন্ন করিল। ইহার শর্তানুসারে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রবর্গ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা স্থাপন করিতে এবং পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিয়া পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করিতে সম্মত হইল। এতদ্ভিন্ন উহারা ইওরোপের যুদ্ধে নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিতেও সম্মত হইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া অভিযান চালাইয়া বাল্টিক রাষ্ট্রগুলিকে দখল করিলে উহাদের নিরাপত্তা বিধানের সকল ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে।

ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও এস্তোনিয়ার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি (১৯৩৪)

১২.১০. হিটলারের অভ্যুত্থান ও নুতন মৈত্রীজোটের উদ্ভব

(Rise of Hitler and the rise of new system of alliances)

জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুত্থান (১৯৩৩ খ্রীঃ) ও নাৎসীদলের কর্মসূচী ইওরোপে এক দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে নিরাপত্তা হিসাবে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে নূতন করিয়া মৈত্রীজোটের উদ্ভব হইল।

(১) **সোভিয়েট রাশিয়া :** হিটলারের অভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ ফল হইল ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে মিত্রতার পুনঃস্থাপন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে একটি অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে রাশিয়ার মনে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হয় ; কারণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াই হিটলার রাশিয়া তথা সাম্যবাদের বিরুদ্ধে জোর প্রচারকার্য চালাইতে থাকেন প্রকৃতপক্ষে হিটলারের 'মেই-ক্যাম্ফ' (Mein Kampf) নামক গ্রন্থে রাশিয়াকে জার্মানীর সম্প্রসারণের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করা হইয়াছিল। সুতরাং হিটলার ও নাৎসী জার্মানীর তীব্র রুশ-বিরোধী মনোভাব লক্ষ্য করিয়া রাশিয়া ভার্সাই-সন্ধির শর্তাদি অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। ফ্রান্স এ

সুযোগে রাশিয়াকে লীগ-অফ-নেশনস্-এর সদস্যভুক্ত করিয়া জার্মানীর সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে তৎপর হইল। প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সের চেষ্টায় সোভিয়েট রাশিয়া লীগ-অফ-নেশনস্-এ যোগদান করিল (১৯৩৪ খ্রীঃ)। কিন্তু রাশিয়া নিজ নিরাপত্তার ব্যাপারে শুধু লীগ-অফ-নেশনস্-এ যোগদান করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। ফ্রান্সের সহিত মিত্রতাবন্ধ হইতেও রাশিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার যথোচিত ব্যবস্থা হিসাবে ব্রিটেন ফ্রান্স, রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে পরস্পর সাহায্যমূলক চুক্তির প্রস্তাব করিল। কিন্তু জার্মানী এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলে ফ্রান্স ও রাশিয়া স্বস্তিবোধ করিল এবং ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ফ্রান্স ও রাশিয়া পরস্পর সাহায্যমূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হইল।

(২) **পোল্যাণ্ড ঃ** হিটলারের অভ্যুত্থান পোল্যাণ্ড ও জার্মানীর মধ্যে পুনরায় মৈত্রীবন্ধনের পথ প্রশস্ত করিল যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পোল্যাণ্ডে জার্মান সংখ্যালঘুদের সমস্যা ও ডানজিগের প্রশ্ন উভয় দেশের মধ্যে যথেষ্ট তিক্ততার সৃষ্টি করিয়াছিল। নাৎসী জার্মানীর প্রতি পোল্যাণ্ডের ঝুঁকিবার প্রধান কারণ ছিল সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে পোল্যাণ্ডের স্বাভাবিক ভীতি, Little Entente বা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রজোটের প্রতি ফ্রান্সের অধিক পক্ষপাতিত্ব এবং জার্মানী ও সোভিয়েট রাশিয়াকে পরস্পরের সহিত বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত করিয়া ইওরোপীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে পোল্যাণ্ডের তীব্র অভিলাষ।

পোল-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তি (১৯৩৪)

ইহা ভিন্ন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে সম্পাদিত র‍্যাপালো-সন্ধি পোল্যাণ্ডের নিরাপত্তার পক্ষেও বিপজ্জনক ছিল। সুতরাং পোল্যাণ্ড রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা হিসাবে জার্মানীর সহিত ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দশ বৎসরের জন্য একটি অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষর করিল।

(৩) **ফ্রান্স, ইটালী ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রজোট (Little Entente) ঃ** হিটলারের অভ্যুত্থান ইটালীকেও আশঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই কারণে ইটালী জার্মানীকে সন্তুষ্ট করার জন্য শান্তি-চুক্তিসমূহ পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন অনুভব করিল। ইটালীর উদ্যোগে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইটালী, ব্রিটেন, জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে 'রোম-চুক্তি' সম্পাদিত হইল (ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে)। কিন্তু এই 'চুক্তির' বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ড ও Little Entente-ভুক্ত রাষ্ট্রগুলি তীব্র প্রতিবাদ করিল। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের চাপে রোম-চুক্তির কিছু পরিবর্তন করা হইল। ফলে মূল রোম-চুক্তির গুরুত্ব অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হইল।

ইটালীর উদ্বেগ

১২.১১. যুগ্মনিরাপত্তা বিধানের ব্যর্থতার কারণ ঃ (Causes of the failure of collective security)**ঃ** আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিধানের শর্তাদি লীগ-

চুক্তিপত্রে সন্নিবিষ্ট ছিল। ভবিষ্যৎ আক্রমণাত্মক যুদ্ধবিগ্রহের বিরুদ্ধে যুগ্মভাবে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা লীগ-চুক্তিপত্রে করা হইয়াছিল। প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে লীগ-চুক্তিপত্রের আলোচনার সময় ফ্রান্স আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক পুলিসবাহিনী নিয়োগের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্সের পরিকল্পনা মিত্রশক্তিবর্গের সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন লীগ-অফ-নেশনস্-এর অধীনে মার্কিন বাহিনী নিয়োগ করার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। বরঞ্চ তিনি শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিশ্বের শক্তিগুলিকে পরস্পরের প্রতি আস্থা স্থাপন করার পরামর্শ দিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সের পরিকল্পনা অগ্রাহ্য হওয়ায় আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিধানের সমর্থকগণ এক দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস ও আস্থার অভাব থাকায় যুগ্মনিরাপত্তার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুগ্মনিরাপত্তা বিধানের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইহার প্রধান কারণ ছিল—(১) ইওরোপের কোন রাষ্ট্র লীগ-অফ-নেশনস্-এর অধীনে নিজেদের সৈন্যবাহিনী রাখিবার পক্ষপাতী ছিল না (২) লীগ-অফ-নেশনস্-এর অধীনে সৈন্যবাহিনী রাখিয়া কোন রাষ্ট্র সকলের উপকারের জন্য অনর্থক কোন যুদ্ধে জড়িত হইবার বিরোধী ছিল। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ স্বার্থ ভিন্ন কোন রাষ্ট্র অন্যের স্বার্থে আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহে জড়িত হইবার মোটেই পক্ষপাতী ছিল না। (৩) ভার্সাই-সন্ধি ও লীগ-চুক্তিপত্রে আক্রমণের বিরুদ্ধে পরস্পর সাহায্য ও সহায়তার প্রতিশ্রুতি সংবলিত শর্তাদি সন্নিবিষ্ট থাকা সত্ত্বেও লোকার্নো-চুক্তি, কেলোগ-ব্রিয়াঁ প্রভৃতি চুক্তিসমূহ সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল। কারণ বিশেষ করিয়া লোকার্নো-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রবর্গের মনে এই ধারণাই জন্মিয়াছিল যে রাষ্ট্রবর্গ স্বাধীনভাবে পরস্পরের সহিত প্রতিশ্রুতি দ্বারা আবদ্ধ না হইলে ভার্সাই-সন্ধি তথা এই ধরনের আন্তর্জাতিক সন্ধি পালনের কোন বাধ্যবাধকতা উহাদের থাকিবে না। সুতরাং লীগ-চুক্তিপত্রে সন্নিবিষ্ট আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিধানের শর্তাদি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। (৪) ফ্রান্স কর্তৃক অনুসৃত আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিধানের প্রচেষ্টা যথার্থ নিরাপত্তা বিধানের পরিবর্তে ইওরোপে একাধিক পরস্পর বিরোধী মৈত্রী-জোটের সৃষ্টি করিয়াছিল। ল্যাংসাম (Langsam)-এর কথায় "Thus in 1927...Europe was again divided into armed camps...The outlook was hardly one to inspire confidence in the hearts of any European peoples." Little Entente বা ক্ষুদ্র

আন্তর্জাতিক সৈন্যবাহিনী গঠনে অনিচ্ছা

আন্তর্জাতিক যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি

ভার্সাই-সন্ধি ও লীগ-চুক্তিপত্রের প্রতি অবহেলা

নিরাপত্তার নামে পরস্পর বিরোধী মৈত্রীজোটের উদ্ভব

রাষ্ট্রজোটের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া ফ্রান্স যে শুধু ভার্সাই-সন্ধি অপরিবর্তিত রাখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল এমন নহে, সমগ্র ইওরোপে ভার্সাই-কৃত ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবার গুরুদায়িত্ব ফ্রান্সকে লইতে হইয়াছিল যাহা উহার পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। নাৎসী জার্মানীর প্রতি পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির তোষণনীতি যুগ্মনিরাপত্তার বিধানের সকল প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ করে।

জার্মানীর প্রতি তোষণ-নীতি

১২.১২. **নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা (Disarmament problem) :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইহাই প্রমাণিত করিয়াছিল যে অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্য শান্তির পরিপন্থী। যুদ্ধশেষে অনেকেই এইরূপ মত পোষণ করিতে থাকেন যে অস্ত্র-প্রস্তুতি আন্তর্জাতিক অবিশ্বাস ও ভীতির সঞ্চারকারী এবং ইহার অনিবার্য পরিণতি হইল যুদ্ধ। প্যারিস শান্তি-সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ বিশ্বের শান্তি অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের অস্ত্রশস্ত্র যথাসম্ভব হ্রাস করার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সকল রাষ্ট্রের অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করার নীতি গ্রহণ

এই নীতি গ্রহণ করিয়া মিত্রপক্ষ প্রথমেই জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়ার সামরিক শক্তি হ্রাস করিল এবং ইহাও ঘোষণা করিল যে লীগ-অফ-নেশনস্-এর পরিচালনাধীনে ইওরোপের অপর সকল রাষ্ট্রেরই সামরিক শক্তি ন্যূনতম পর্যায়ে সীমাবদ্ধ করা হইবে। অতঃপর লীগ-অফ-নেশনস্ সামরিক সজ্জা হ্রাস করার ব্যাপারে অগ্রণী হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে এই উদ্দেশ্যে একটি কমিশন নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু কমিশন এইরূপ মত প্রকাশ করে যে, নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা সার্থক করিতে হইলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সম্পর্কে মিত্রপক্ষকে অঙ্গীকার প্রদান করিতে হইবে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্নোতে আহূত এক বৈঠকে জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পোল্যান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে এই মর্মে এক চুক্তি হয় যে, সীমান্ত সম্পর্কিত বিরোধ তাহারা আপোস-আলোচনার মাধ্যমে মিটাইয়া লইবে এবং চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রবর্গের সীমানা অপর কোন রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহারা সম্মিলিতভাবে তাহা প্রতিহত করিবে। জার্মানী লীগ-অফ-নেশনস্-এ যোগদান করিলে পর এই চুক্তি কার্যকর হয়।

লোকার্নো-চুক্তি (১৯২৫)

ইতিমধ্যে ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটনে আহূত এক বৈঠকে গ্রেটব্রিটেন আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে দুইটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। প্রথমটির দ্বারা উপরোক্ত রাষ্ট্রবর্গ উহাদের নিজ নিজ যুদ্ধজাহাজগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র করিতে ও নির্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত জাহাজ নির্মাণ না করিতে সম্মত হয়। দ্বিতীয়টির দ্বারা যুদ্ধের সময় বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয় এবং সাবমেরিনের ব্যবহার সীমাবদ্ধ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেন ক্ষুদ্র জাহাজের সংখ্যা ও ফ্রান্স সাবমেরিনের সংখ্যা হ্রাস করিতে অসম্মত হয়। ব্রিটেনের অসম্মতির ফলে ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। অবশেষে ১৯৩২-৩৬ খ্রীষ্টাব্দের

ওয়াশিংটনের বৈঠক (১৯২১-২২)

মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণকে লইয়া ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব হ্যাণ্ডারসনের সভাপতিত্বে 'বিশ্ব-নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের (World Disarmament Conferenee) অধিবেশন বসে। এই বিষয়ে উপস্থিত রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে সামরিক শক্তি হ্রাস করার ব্যাপারে জার্মানীই সর্বাপেক্ষা অধিক অসুবিধাগ্রস্ত ছিল। এস্থলে স্মরণ রাখা দরকার যে ভার্সাই-সন্ধি অনুসারে সকল রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি হ্রাস করিয়া ন্যূনতম পর্যায়ে আনিবার কথা ছিল এবং এই শর্তেই জার্মানী নিজ সামরিক শক্তি হ্রাস করিতে সম্মত হইয়াছিল। কিন্তু বস্তুতঃ কোন রাষ্ট্রই এই নীতি কার্যকর করিতে উৎসাহিত ছিল না। সুতরাং এই বৈঠকে ফ্রান্সের শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত জার্মানী প্রস্তাব করিল যে, জার্মানীর সামরিক শক্তি অন্ততঃ ফ্রান্সের সামরিক শক্তির সমপর্যায়ে উন্নীত করা হউক। অপরদিকে ফ্রান্স জার্মানী অপেক্ষা নিজ সামরিক শক্তি অধিক রাখার দাবি জানাইল। সোভিয়েট রাশিয়া সকল রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি সমানুপাতিক ভাবে হ্রাস করার প্রস্তাব করিল। আমেরিকা সকল রাষ্ট্রের বর্তমানঅস্ত্রশস্ত্রের এক তৃতীয়াংশ হ্রাস করার পক্ষে মত প্রকাশ করিল। কিন্তু ব্রিটেন এই সকল প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিল না।

বিশ্ব-নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক (১৯৩২-৩৬)

জার্মানীর প্রস্তাব

ফ্রান্স, রাশিয়া এবং আমেরিকার প্রস্তাবে ব্রিটেনের অসম্মতি

এইভাবে সামরিক শক্তি হ্রাস করার ব্যাপারে রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হইলে ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দের নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জার্মানীর দাবি স্বীকৃত হইলেও ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী লীগ-অফ-নেশনস্-এর সদস্যপদ পরিত্যাগ করিয়া ঘোষণা করিল যে, ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র সাধারণভাবে উহাদের সামরিক শক্তি হ্রাস করিতে অসম্মত হওয়ায় ফ্রান্সের সমপর্যায়ে জার্মানীর সামরিক শক্তি উন্নীত করার কোনও মূল্য নাই। ইহার পরে আরও দুই বৎসর কাল ধরিয়া লীগ-অফ-নেশনস্ এই ব্যাপারে প্রচেষ্টা করিয়া পরিশেষে ব্যর্থ হয়।

নিরস্ত্রীকরণের সকল প্রচেষ্টার ব্যর্থতা

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত

১। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ ১২.১—১২.৯]

২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের নিরাপত্তার সমস্যা কি ছিল? এই সমস্যার সমাধান করিতে ফ্রান্স কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছিল? [উঃ ১২.২]

৩। লীগ-অফ-নেশনস্-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিধানের প্রচেষ্টা কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছিল? [উঃ ১২.২, ১২.৩. ১২.৪, ১২.৫, ১২.৭, ১২.৮]

৪। লীগ-অফ-নেশনস্-এর বাহিরে আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল? [উঃ ১২.৯]

৫। লোকার্নো-চুক্তির (১৯২৫) পটভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [উঃ ১২.৫]

৬। লোকার্নো-চুক্তির সমালোচনা কর। [উঃ ১২.৬]

৭। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নিরস্ত্রীকরণ-সমস্যার প্রকৃতি সংক্ষেপে আলোচনা কর। [উঃ ১২—১২]

৮। নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানের জন্য লীগ-অফ-নেশনস্-এর প্রয়াস সংক্ষেপে লিখ। [উঃ ১২.১২]

৯। নিরস্ত্রীকরণের ব্যর্থতার কারণ কি? [উঃ ১২.১২]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জার্মানীর ইতিহাস (১৯১৮-১৯৩৯)

(History of Germany, 1918-1939)

ভূমিকা ঃ ইওরোপের অন্তঃস্থলে অবস্থিত জার্মানী বিগত চারিশত বৎসর ধরিয়া ইওরোপের ইতিহাসে এক সমস্যাস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। পঁচিশ বৎসরের মধ্যে দুইবার জার্মানীর উগ্র সমরবাদ বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত করিয়াছিল। এমনকি ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পরেও জার্মানীকে কেন্দ্র করিয়া ঠাণ্ডা-লড়াই-এর আবহাওয়ার উদ্ভব হইয়াছিল যাহা বিশ্বশান্তি বিপজ্জনক করিয়া তুলিয়াছিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপের এগারোটি দেশের সীমানা ও জার্মানীর সীমানার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য ছিল না। পশ্চিম ও পূর্ব ইওরোপের মধ্যে সহজ পথটি জার্মানীর ভিতর দিয়াই প্রসারিত। পশ্চিম ও পূর্ব ইওরোপের মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায় জার্মানী ইওরোপের বাণিজ্যের আদানপ্রদানের কেন্দ্রস্থল। জার্মানীর ভৌগোলিক অবস্থান উহাকে ইওরোপীয় কূটনীতির কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে। প্রাকৃতিক সম্পদের সমৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, শিল্পোন্নয়ন ও সামরিক সংগঠন প্রভৃতি কারণে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের পর চল্লিশ বৎসরের মধ্যে জার্মানী ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও সামরিক ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করিয়াছিল।

প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়া জার্মানী খুবই সমৃদ্ধ। রুঢ়, উচ্চ-সাইলেশিয়া ও স্যাক্সনীর কয়লাখনিগুলি খুবই মূল্যবান। জন-শক্তির উন্নতিসাধন করিয়া জার্মানী উহার তৈলের অভাব পূরণ করিয়াছিল ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে লোহ-খনিজ অঞ্চল আলসাস-লোরেন ফ্রান্সকে সমর্পণ করা হইলে শতকরা ৭০ ভাগ লোহ জার্মানীর হস্তচ্যুত হইয়াছিল। তথাপি বিদেশ হইতে লোহ-পিণ্ড (iron ores) আমদানি করিয়া জার্মানী উহার লোহের অভাব পূরণ করিয়াছিল। বন-সম্পদের দিক দিয়াও জার্মানী সমৃদ্ধ।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে জার্মানীর গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপের প্রায় সকল ক্ষুদ্র দেশগুলি জার্মানীর উপর অর্থনৈতিক ভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল। অপর দিকে জার্মানীও বল্কান রাজনীতিতে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল এবং স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে উক্ত অঞ্চলে ফ্যাসিবাদী-আন্দোলনে উৎসাহ প্রদান করিতেছিল। দ্বিতীয়তঃ, জার্মানীর ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তি ফ্রান্স ও বিটেনের সহিত উহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র করিয়া তুলিতেছিল। তৃতীয়তঃ, জার্মানীর নিজ সীমান্ত সংরক্ষণের চেষ্টা প্রতিবেশী দেশগুলিকে উদ্বিগ্ন করিয়া চতুর্থতঃ, পূর্বতন প্রাশিয়ার জঙ্গীবাদের ঐতিহ্য জার্মানবাসীর মনে সাম্রাজ্যবিস্তারের স্পৃহা তীব্রতর করিয়া তুলিতেছিল। জার্মানীর বিশ্বের এক অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্রে পরিণত হইবার আকাঙ্ক্ষা হইতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভব হইয়াছিল।

১৩.১. জার্মান-বিপ্লব ও ভাইমার সাধারণতন্ত্র
(German Revolution and Weimar Republic)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় ঘটিলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেমন জার্মানীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, তেমনি আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ এক বিরাট রাজনৈতিক বিপ্লবে পরিণতি লাভ করিয়াছিল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের পর জার্মানীর শাসন-ক্ষমতা যাঁহাদের হস্তগত হয় তাঁহারা মোটেই উহার উপযুক্ত ছিলেন না। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হার্টলিং (Hertling)-এর পদত্যাগের সময় পর্যন্ত জার্মানীতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা সম্ভবপর হয় নাই। জার্মানীর নূতন চ্যান্সেলার প্রিন্স ম্যাক্স (Prince Max) জার্মানীতে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পরিকল্পনা ঘোষণা করিলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উইলসন তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ মিত্রপক্ষ রাজতন্ত্রবাদীদের সহিত কোনরূপ মীমাংসায় আসিবার পক্ষপাতী ছিল না। ফলে জার্মানীতে গণ-বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। দেশব্যাপী অসন্তোষ, বিশৃঙ্খলা ও খাদ্যাভাবে প্রপীড়িত জার্মানবাসী উত্তরোত্তর রুশ-বিপ্লবের আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া উঠিতে থাকে। জার্মান যুদ্ধবন্দীগণ রাশিয়া হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বদেশবাসীর নিকট রুশ-বিপ্লবের আদর্শ প্রচার করিতে থাকে। জার্মান সেনাপতি লুডেন-ডর্ফ (Luden Dorff—যিনি লেনিনকে জার্মানীর ভিতর দিয়া রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দিয়াছিলেন)-এর কথায় "I never contemplated that the Russian Revolution might one day undermine our own strength ; our enemies gave us revolution"। সুতরাং জার্মানীর সামরিক শক্তির বিপর্যয়, বে-সামরিক জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা, রুশ-দুর্দশা, রুশ-বিপ্লবের আদর্শ প্রভৃতি কারণে জার্মানবাসীর সকল আক্রোশ কাইজারের উপর পড়ে এবং রাজতন্ত্র-বিরোধী আন্দোলন শীঘ্রই তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কিয়েল বন্দরে নৌ-বাহিনী বিদ্রোহী হইলে দেশব্যাপী বিপ্লবের সূচনা করে। সমাজতন্ত্রীগণ (socialists) সর্বত্র রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইতে থাকে। ব্যাভেরিয়ায় গণ-অভ্যুত্থান ঘটে এবং বার্লিনে শ্রমিকগণ ধর্মঘট করে। অভ্যন্তরীণ অরাজকতা ও রাজতন্ত্র-বিরোধী আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিলে দ্বিতীয় কাইজার আত্মরক্ষার্থে জার্মানীর সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সপরিবারে ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাইজারের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া বহু জার্মান রাজন্যবর্গ দেশত্যাগী হন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলের নেতা হের ইবার্ট (Herr Ebert)-এর নেতৃত্বে জার্মানীতে রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষিত হয় এবং সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে জার্মানী

বিপ্লবের কারণ

জার্মানীতে রাজতন্ত্রের অবসান ও সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (১৯১৯)

এই সময় জার্মানীতে কমিউনিজম বা সাম্যবাদ বিশেষ প্রসারলাভ করিতেছিল। রাশিয়ার বলশেভিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ জার্মান কমিউনিস্টগণ (ইহারা স্পার্টাকাস—'Spartacus' নামে পরিচিত ছিল) সোভিয়েট রাশিয়ার অনুকরণে প্রোলেটেরিয়টদের একনায়কতন্ত্র ঘোষণা করিয়া সর্বত্র সোভিয়েট গঠন করিল। জার্মান স্পার্টাকাসগণ জার্মানীর শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রীয়করণ করার ও বিশ্বব্যাপী শ্রমিক-আন্দোলন সৃষ্টি করার পক্ষপাতী ছিল। এই উদ্দেশ্যে উহারা সমগ্র জার্মানীতে সৈনিক ও শ্রমিকগণকে উত্তেজিত করিয়া বিপ্লব সংঘটিত করিতে উদ্যোগী হইল। বার্লিন ও ইপেন শহরে কমিউনিস্টদের পরিচালনাধীনে প্রায় পাঁচ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করিল। এক সপ্তাহ ধরিয়া এই ধর্মঘট চলিল। ধর্মঘটকারীগণ সরকারের নিকট এক চরম পত্র পাঠাইয়া দাবি করিল যে, (১) ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিয়া মিত্রশক্তির সহিত শান্তি স্থাপন করিতে হইবে, (২) দেশের সকল শ্রমিক প্রতিনিধিগণকে শান্তি-আলোচনায় যোগদান করার সুযোগ দিতে হইবে, (৩) রাজনৈতিক বন্দীগণকে অবিলম্বে মুক্তিদান করিতে হইবে এবং (৪) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও নারীদের ভোটাধিকার স্বীকার করিতে হইবে। স্পার্টাকাসগণ সর্বত্র এক দারুণ অরাককতার সৃষ্টি করিল।

কমিউনিস্ট আন্দোলন

কমিউনিস্টদের দাবি

জার্মানীতে অন্তর্বিপ্লবের সূচনা হইলে ইবার্ট ও তাঁহার সমাজতন্ত্রী সমর্থকগণ কমিউনিস্টগণকে দমন করিতে বদ্ধপরিকর হন। সাধারণতন্ত্রী সরকার এই ব্যাপারে সামরিক কর্মচারী, অভিজাত ও বিত্তশালীদের সাহায্য লাভ করেন। অপরদিকে কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীগণ সম্মিলিতভাবে নব-প্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্রকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হয়। ফলে দুই পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয় এবং দশ দিনের মধ্যে কমিউনিস্টগণের আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করা হয়।

কমিউনিস্ট ও সাধারণতন্ত্রের মধ্যে সংঘর্ষ

কমিউনিস্ট আন্দোলন দমন

অতঃপর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র জার্মানীতে গণভোটের মাধ্যমে গণ-পরিষদের (Constituent Assembly) নির্বাচন সম্পন্ন হয়। সেই বৎসর ভাইমার নামক স্থানে জার্মান জাতির প্রতিনিধিবর্গ মিলিত হইয়া জার্মানীর জন্য এক যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করেন। ইহা Weimar Constitution নামে পরিচিত। ইবার্ট এই সাধারণতন্ত্রের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন।

ভাইমার শাসনতন্ত্র

শাসনতন্ত্র অনুযায়ী স্থির হইল যে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চে থাকিবেন। সাত বৎসরের জন্য তিনি বহাল থাকিবেন ও রাইখস্ট্যাগের নিকট দায়ী মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। রাইখস্ট্যাডেট (Reichstdet) বা উচ্চ-পরিষদ ও রাইখস্ট্যাগ (Reichastag) বা নিম্ন-পরিষদ

নূতন শাসনতন্ত্র

নামে দুইটি প্রতিনিধিসভা লইয়া জার্মান পার্লামেণ্ট গঠিত হয়। বিশ বৎসর বয়সের ঊর্ধ্বে জার্মানীর সকল পুরুষ ও নারীকে ভোটাধিকার প্রদান করা হয়।

ভাইমার সাধারণতন্ত্রের কৃতিত্ব (Achievements of the Weimar Republic) : **আভ্যন্তরীণ (Domestic) :** প্রতিষ্ঠার প্রথম হইতেই উগ্র দক্ষিণপন্থী ও উগ্র বামপন্থী দলগুলির তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ভাইমার সাধারণতন্ত্র অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাওয়েজ পরিকল্পনা (Dawes Plan) গৃহীত হইবার পর হইতে জার্মানী সমৃদ্ধির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে। যুদ্ধ-পূর্ব যুগের তুলনায় জার্মানীর শিল্পোৎপাদনের মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হয় এবং বেকারত্বের সংখ্যা হ্রাস পায়। বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও বিপত্তির অন্ত ছিল না। ভার্সাই-সন্ধির অপমানজনক শর্তাদি গ্রহণ করায় সাধারণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে এক গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। জার্মানীর বিত্তশালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণ এই সাধারণতন্ত্রকে কখনও প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। সার উপত্যকায় মিত্রশক্তির প্রাধান্য তাহারা সহ্য করিতে পারেন নাই। অপরদিকে উগ্র দেশপ্রেমিক ও সমরনীতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ জার্মানীর রাজ্যনাশ ও তথায় বিদেশীগণের প্রাধান্যে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। ফলে নবগঠিত সাধারণতন্ত্রকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যে গোপন ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে।

(ক) সাধারণতন্ত্রের বিপত্তি

সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিন হইতেই কমিউনিস্টগণ ইহার বিরুদ্ধে নানারূপ বাধার সৃষ্টি করিতে থাকে। তাহারা কমিউনিস্ট রাশিয়ার অনুকরণে শ্রমিক-রাজ্য স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল। নানা স্থানে বিদ্রোহ, ধর্মঘট ও সামরিক বিপ্লব ঘটাইয়া তাহারা সাধারণতন্ত্রকে বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

কমিউনিস্টগণের বাধার সৃষ্টি

কমিউনিস্টগণ ছাড়াও জার্মানীর অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি সাধারণতন্ত্রকে বিপন্ন করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত কমিউনিস্টগণ জার্মানীতে সক্রিয় ছিল ততদিন প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি সাধারণতন্ত্রকে আক্রমণ করা হইতে বিরত থাকে। কারণ মধ্যবিত্তশ্রেণী কর্তৃক পরিচালিত সাধারণতান্ত্রিক সরকার অপেক্ষা কমিউনিস্টগণকেই তাহারা অধিকতর ভীতির চক্ষে দেখিত। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কমিউনিস্ট প্রাধান্যের আশঙ্কা দূরীভূত হইলে জার্মানীর প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি সক্রিয় হইয়া উঠে এবং নবপ্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতে থাকে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার এক সামরিক কর্মচারী ডক্টর উলক গ্যাংকাপ (Kapp) বলপ্রয়োগ করিয়া বার্লিন দখল করেন এবং ইবার্ট সরকার পলায়ন করেন।

অপরাপর প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির আক্রমণ

কিন্তু ডক্টর কাপের সাফল্য অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। রাষ্ট্রপতি ইবার্ট ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাহায্যে সমগ্র দেশব্যাপী ধর্মঘট চালাইয়া ডক্টর কাপ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাময়িক সরকারকে বিপন্ন করিয়া তোলেন। অবশেষে এক সপ্তাহের মধ্যে কাপ সরকারের পতন হয় এবং গ্যাংকাপ সুইডেনে পলায়ন করেন। ইহার পর ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল লুডেনডর্ফ (General Ludendorff) বলপূর্বক শাসনক্ষমতা অধিকার করিতে চেষ্টা করেন এবং এই সময় তাঁহার সহকর্মী ছিলেন হিটলার (Adolf Hitler)। তাঁহাদের পরিকল্পনা ছিল বার্লিন দখল করিয়া তথায় হিটলারের সভাপতিত্বে লুডেনডর্ফের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু অবশেষে তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং হিটলার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

(খ) ক্ষতিপূরণের সমস্যা

বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ জার্মানীর উপর যে বিরাট ঋণের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা সাধারণতান্ত্রিক সরকারের এক অন্যতম সমস্যা ছিল। ক্ষতিপূরণ কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জার্মানী কয়েক কিস্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়া ক্ষান্ত রহে। ফ্রান্স জার্মানীকে ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে বেলজিয়ামের সহিত যুগ্মভাবে জার্মানীর খনিপ্রধান রুঢ় (Ruhr) অঞ্চল দখল করিয়া বসে (১৯২৩ খ্রীঃ)। জার্মানগণ ইহার প্রত্যুত্তরে উক্ত অঞ্চলে ধর্মঘট চালাইয়া সমগ্র দেশব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে। জার্মানীর শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং জার্মান মুদ্রা মার্ক-এর মূল্য অভাবনীয়ভাবে হ্রাস পায়।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্রেসম্যান (Stresman) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে জার্মান সাধারণতন্ত্র পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। যুদ্ধোত্তর জার্মানীর তিনিই ছিলেন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রাজনীতিক। তিনি রুঢ় অঞ্চলে ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন, এবং ফ্রান্স ও বেলজিয়ামকে ক্ষতিপূরণের দেয় অর্থ প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার রাষ্ট্রনায়কগণ উপলব্ধি করেন যে জার্মানীর শিল্পসম্পদ ধ্বংস হইলে জার্মানীর নিকট হইতে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ আদায় করা অসম্ভব হইবে। সুতরাং তাঁহাদের প্রচেষ্টায় ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ চার্লস ডাওয়েজ-এর (Charles Dawes) সভাপতিত্বে একটি ক্ষতিপূরণ কমিশন গঠিত হয়।

ডাওয়েজ পরিকল্পনা (১৯২৪)

এই কমিশন (১) বাৎসরিক কিস্তিতে অল্প অল্প করিয়া দীর্ঘকালে জার্মানীর নিকট লইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করার সুপারিশ করে। অধিকন্তু কমিশন এইরূপ মতও প্রকাশ করে যে, (২) মিত্রশক্তি যেন জার্মানীকে শিল্পোন্নয়নের জন্য যথোপযুক্ত অর্থসাহায্য করেন। জার্মানী কমিশনের এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে ফ্রান্স রুঢ় হইতে সৈন্য অপসারণ করে।

ডাওয়েজ কমিশনের সুপারিশের ফলে জার্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়াছিল এবং কয়েক কিস্তিতে ক্ষতিপূরণ দান করিতেও জার্মানী সমর্থ

হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ জার্মান জনসাধারণ ক্ষতিপূরণ দানের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিতে লাগিল। এই অবস্থায় জার্মানীর আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য মিত্রশক্তি আমেরিকার অপর এক অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ ওয়েন-ইয়ং-এর (Owen Young) সভাপতিত্বে এক কমিশন গঠন করে। এই কমিশন সুপারিশ করিল যে, (১) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ তিন-চতুর্থাংশ কমাইয়া দেওয়া হউক, (২) জার্মানীকে ৫৮ বৎসর ধরিয়া ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করার সুবিধা দেওয়া হউক, (৩) ক্ষতিপূরণ আদায় ব্যাপারে বিদেশী পরিদর্শন ব্যবস্থা বন্ধ করা হউক এবং (৪) একটি আন্তর্জাতিক ব্যাংক-এর মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ গ্রহণ ও বিতরণ করা হউক।

ইয়ং কমিশন (১৯২৯)

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ং পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়। কিন্তু ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিশ্বব্যাপী আর্থিক বিপর্যয় দেখা দিলে ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা সম্পর্কে পুনরায় গোলযোগের সৃষ্টি হয়। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা জার্মানীকে ঋণস্বরূপ অর্থসাহায্য করার অক্ষমতা জানাইল। ফলে জার্মানীর পক্ষে ক্ষতিপূরণ দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িল এবং ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান সরকার বার্ষিক কিস্তি পরিশোধ করার অক্ষমতা জানাইলেন। এইভাবে ক্ষতিপূরণ ও আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যবস্থার অবস্থার অবসান ঘটে।

পররাষ্ট্রনীতি, ১৯১৯-৩০ (Foreign Policy): পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও ভাইমার সাধারণতন্ত্র কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিল। ১৯১৯ হইতে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানীকে একটি সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ফ্রান্সের সহিত জার্মানীর সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে রুঢ় অঞ্চল দখল করার পূর্বে দুইবার ফরাসী বাহিনী জার্মানীর অন্তর্দেশে প্রবেশ করিয়াছিল। সকল দিক দিয়া জার্মানীকে পঙ্গু করিয়া রাখাই ফরাসী পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল। রাইন অঞ্চল ফ্রান্সের প্ররোচনায় জার্মান-বিরোধী আন্দোলন (যাহা Separatist Movement নামে খ্যাত) উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে তিক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

ফ্রান্সের সহিত সম্পর্কের অবনতি

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চ-সাইলেশিয়া অধিবাসীগণ গণভোটের মাধ্যমে জার্মানীর সহিত সংযুক্ত হইবার অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে জার্মানী সমগ্র উচ্চ-সাইলেশিয়া দাবি করে। পোল্যাণ্ড জার্মানীর এই দাবির বিরোধিতা করিলে লীগ-অফ-নেশনস্-এর নিকট প্রশ্নটি উপস্থাপিত করা হয়। লীগ-অফ-নেশনস্ উচ্চ-সাইলেশিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ জার্মানীকে এবং শিল্প-প্রধান অবশিষ্টাংশ পোল্যাণ্ডকে প্রদান করিলে জার্মানী অসন্তুষ্ট হয়।

উচ্চ-সাইলেশিয়ার একাংশ লাভ

আলোচ্য সময়ের মধ্যে জার্মানীর পররাষ্ট্রনীতির অপর সমস্যা ছিল মিত্রপক্ষকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা। ইহার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।

ক্ষতিপূরণ

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত র‍্যাপালোর সন্ধি (Treaty of Rapallo) স্বাক্ষর করে। ইহার শর্তানুসারে (১) উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, (২) উভয় পক্ষ পরস্পরের প্রতি সকল দাবিদাওয়া পরিত্যাগ করে এবং (৩) পরস্পরের সহিত বাণিজ্য বিনিময়ে সম্মত হয়। এই সন্ধির গোপন শর্তানুসারে রাশিয়াও জার্মানীর সামরিক কর্মচারীগণকে রাশিয়ার সমর-কৌশল সম্বন্ধে শিক্ষালাভের জন্য সুযোগপ্রদানে সম্মত হয়। রাশিয়া ও জার্মানীর চতুর্দিকে মিত্রপক্ষ যে আক্রমণাত্মক বেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা ভাঙিয়া ফেলার চেষ্টা র‍্যাপালো-সন্ধির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

রাশিয়ার সহিত মৈত্রী-বন্ধন

সুতরাং, র‍্যাপালো-সন্ধি পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের বিশেষ করিয়া ফ্রান্সের উদ্বেগের কারণ হয়। ফ্রান্স প্রতিশোধগ্রহণে উদ্যোগী হইয়া রূঢ় অঞ্চল বলপূর্বক দখল করে (১৯২৩ খ্রীঃ)। ইহার প্রতিবাদস্বরূপ জার্মানী রূঢ় অঞ্চলে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অসহযোগ-আন্দোলন শুরু করে। এই অবস্থায় জার্মানী ও উহার শত্রুপক্ষের মধ্যে মীমাংসার জন্য ব্রিটেন উদ্যোগী হয়। এইস্থলে স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির প্রথম হইতে ব্রিটেন পরাজিত জার্মানীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। এই কারণে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম যুগ্মভাবে রূঢ় দখল করিলে ব্রিটেন উহার তীব্র নিন্দা করিয়াছিল। যাহা হউক, ফ্রান্স রূঢ় অঞ্চলে দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জার্মান শিল্পপতি ও জার্মান কর্মচারীগণকে নির্বিচারে বন্দী করে। ইতিমধ্যে ফ্রান্স মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটিলে অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং ফ্রান্স রূঢ় অঞ্চল হইতে উহার সৈন্যবাহিনী অপসারণ করিতে স্বীকৃত হয়। ফরাসী মন্ত্রী ব্রিয়াঁ ও জার্মান মন্ত্রী স্ট্রেসম্যান উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। স্ট্রেসম্যান-এর উদ্দেশ্য ছিল ইওরোপীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে জার্মানীর বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটাইয়া জার্মানীর মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। এই কারণে ফ্রান্সের সহিত জার্মানীর আপোস-মীমাংসার একান্ত প্রয়োজন ছিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও ইটালীর সহিত জার্মানী লোকার্নো-চুক্তি স্বাক্ষর করে। ইওরোপের ইতিহাসে এই চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ। ইহার ফলে ফ্রান্স-জার্মান সম্পর্কের উন্নতি হয়, পরবৎসর (১৯২৬ খ্রীঃ) জার্মানী স্থায়ী সদস্যরূপে লীগ-অফ-নেশনস্-এ যোগদান করে, ফ্রান্স উহার নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয় এবং সমগ্রভাবে ইওরোপে স্থায়ী শান্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানীর বিভিন্ন

ফ্রান্স কর্তৃক রূঢ় দখল ও জার্মানীর অসহযোগ আন্দোলন (১৯২৩)

জার্মানীর প্রতি ব্রিটেনের সহানুভূতি

ফ্রান্সের মন্ত্রিসভার পরিবর্তন এবং ফ্রান্স-জার্মান আপোস

জার্মানী কর্তৃক লোকার্নো-চুক্তি স্বাক্ষর (১৯২৫)

লীগ-অফ-নেশনস্-এ জার্মানীর যোগদান (১৯২৬)

অঞ্চল হইতে বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী অপসারিত হয় এবং মিত্রপক্ষের সামরিক কমিশনেরও অবসান ঘটে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত সম-মর্যাদা লাভ করিয়া প্যারিসের চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ং-কমিশনের সুপারিশ অনুসারে জার্মানীর উপর মিত্রপক্ষের ক্ষতিপূরণের দাবির পরিমাণ হ্রাস করা হয় এবং জার্মানীর অর্থনৈতিক জীবনের উপর হইতে যাবতীয় আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনের অবসান ঘোষিত হয়। ইওরোপের নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সহিত জার্মানীর নিরস্ত্রীকরণ সমস্যাটিও জড়িত ছিল। এই ব্যাপারে লীগ-অফ-নেশনস্-এর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলেও জার্মানীকে ইওরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সহিত সমমর্যাদা দেওয়া হয় অর্থাৎ পরোক্ষভাবে জার্মানীকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইবার অধিকার দেওয়া হয়।

জার্মানী হইতে বৈদেশিক সৈন্য অপসারণ

ইয়ং কমিশনের সুপারিশ জার্মানীর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইবার পরোক্ষ সম্মতি

ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ঢেউ জার্মানীতেও আসিয়া পেঁছায়। জার্মানীর সাধারণতন্ত্রী সরকার অর্থনৈতিক বিপর্যয় হইতে দেশকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হন। জার্মানীর এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির সুযোগে হিটলার ও তাঁহার নাৎসী দল জার্মানীর রাজনীতিক্ষেত্রে আবিভূর্ত হন।

অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সাধারণতন্ত্রের পতন

১৩.২. **ভাইমার সাধারণতন্ত্রের ব্যর্থতা :** হের স্ট্রেসম্যানের নেতৃত্বে (১৯২৩-২৯ খ্রীঃ) যুদ্ধোত্তর ইওরোপের পুনর্গঠন ব্যাপারে জার্মানী এক গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছিল। ডাওয়েজ পরিকল্পনা (Dawes Plan) কার্যকর করা হইয়াছিল এবং জার্মানী লীগ-অফ-নেশনস্-এ প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল। জার্মানীর রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির কিছু উন্নতি হইলেও একথা অনস্বীকার্য যে তখন পর্যন্ত জার্মান সাধারণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে (যেমন গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক প্রভৃতি) সাধারণ-তান্ত্রিক সরকার গঠিত হইয়াছিল। সুতরাং অভ্যন্তরীণ সংস্কার প্রবর্তনের ব্যাপারে এই সরকার কোন সুনির্দিষ্ট পন্থা ও নীতি অনুসরণ করিতে পারে নাই। উপরন্তু সাধারণতান্ত্রিক সরকারের পররাষ্ট্রনীতি জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। সাধারণতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভার্সাই-সন্ধির শর্তাদি উল্লংঘন করিয়া জার্মানীর সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ও বিশ্বরাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা। যথাযথভাবে বলিতে গেলে জার্মান পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য ছিল—(১) বিদেশীগণের দখল হইতে দেশকে মুক্ত করা, (২) সামরিক ব্যাপারে জার্মানীর স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা এবং (৩) রাইন অঞ্চলকে পুনরায় জার্মানীর অধিকারভুক্ত করিয়া তাহা সুরক্ষিত করা। যুদ্ধের পর জার্মান রাজনীতিবিদ্গণ তাঁহাদের স্বদেশের মুক্তির জন্য রাশিয়ার প্রতি বন্ধু-

জার্মান পররাষ্ট্রনীতির বিফলতা

ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে 'র‍্যাপালো সন্ধি' (Treaty of Rapallo) নামে এক সন্ধি সম্পাদিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জার্মানীর পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। উপরন্তু ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম কর্তৃক রুঢ় অঞ্চল অধিকৃত হইলে জার্মানী অধিকতর দুর্বল হইয়া পড়ে ও তাহার সার্বভৌমিক সত্তা ক্ষুন্ন হয়।

অর্থনৈতিক বিপর্যয়

অপরদিকে বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বৎসর জার্মানীতে এক দারুণ আর্থিক বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে স্পষ্টতই দেখা যায় যে, সাধারণতন্ত্রী সরকার কর্তৃক অর্থনৈতিক পুনর্গঠন প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে চলিয়াছিল। ইয়ং কমিশন কর্তৃক আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে জার্মানীকে ঋণদানের যে সুপারিশ করা হইয়াছিল তাহা কার্যে পরিণত করা হয় নাই। জার্মানীর শিল্পজাত উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য বিদেশী বাজারের সম্ভাবনাও জার্মানীর ছিল না। অপরদিকে মুদ্রাস্ফীতি ও কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য অভাবনীয়ভাবে হ্রাস পাওয়ায় জার্মানীর অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি অচল অবস্থায় আসিয়া পেঁছায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বেকারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে স্ট্রেসম্যানের মৃত্যু হওয়ায় উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে জার্মানীর সাধারণতন্ত্র অধিকতর দুর্বল হইয়া পড়ে।

স্ট্রেসম্যানের মৃত্যু

হিটলার ও নাৎসীদলের আবির্ভাব

জার্মানী যখন অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন, জনসাধারণের দুর্দশা যখন চরমে সেই সময় দেশের দুঃখদুর্দশার অবসানের পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়া হের হিটলার ও তাঁহার ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট পার্টি (National Socialist Party or Nazi) জার্মানীর রাজনীতিক্ষেত্রে আবিভূর্ত হন।

১৩.৩. **হিটলার ও নাৎসী আন্দোলন** (Hitler and the Nazi Movement) **:** ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এ্যাডলফ্ হিটলার অস্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন অস্ট্রিয়ার শুল্ক বিভাগের একজন সাধারণ কর্মচারী। আর্থিক অসচ্ছলতাহেতু অল্প বয়সেই তাঁহাকে স্কুল ত্যাগ করিতে হয়। ভাস্কর-শিল্প শিক্ষালাভের জন্য তিনি ভিয়েনায় গমন করেন, কিন্তু তথায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান নাই। ভিয়েনায় অবস্থানকালে হিটলার ইহুদীবিরোধী ও সাম্যবাদবিরোধী মনোভাবাপন্ন হইয়া উঠেন। বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্বে তিনি মিউনিকে ছবি অঙ্কনের কাজে নিযুক্ত থাকেন। যুদ্ধের সময় তিনি ব্যাভেরিয়ার সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিয়া সৈনিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন ও পুরস্কার লাভ করেন। যুদ্ধের পর তিনি মিউনিকে 'জাতীয় সমাজতন্ত্রী জার্মান শ্রমিক পার্টি' (National Socialist Workers' Party) নামে একটি দল গঠন করেন। মিউনিকে বিভিন্ন জনসভায় হিটলার ধনতন্ত্র, ইহুদী, ফ্রান্স ও ভার্সাই-সন্ধির অপমানজনক শর্তাবলীর তীব্র নিন্দা

করিয়া ভাইমার সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলার চেষ্টা করেন। বস্তুতঃ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার লুডেন ডর্ফের সহযোগিতায় বলপূর্বক দেশের শাসনভার হস্তগত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিফল হইয়া তিনি কারারুদ্ধ হন এবং কারাগারেই তিনি তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'মেই-ক্যাম্ফ' (Mein Kampf) রচনা করেন। এই গ্রন্থটিকে 'নাৎসী বাইবেল' বলা হইয়া থাকে। শীঘ্রই ইহা জনপ্রিয় হইয়া উঠে। এই গ্রন্থে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও নরডিক্ জাতির প্রতিপত্তির কথা প্রচার করা হইয়াছিল। কিছুদিন কারাবাসে থাকার পর ভবিষ্যতে কোন জনসভায় বক্তৃতা করিবেন না এই শর্তে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

হিটলারের 'মেই-ক্যাম্ফ'

অতঃপর হিটলার ইটালীর মুসোলিনীর অনুকরণে তাঁহার ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট দল নূতন আদর্শে পুনর্গঠন করিতে আত্মনিয়োগ করেন। 'স্বোয়াস্তিকা' তাঁহার দলের প্রতীকস্বরূপ গৃহীত হয়। দলের সভ্যগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট হারে চাঁদা দেওয়া ও 'স্বোয়াস্তিক চিহ্নিত' এক বিশিষ্ট ধরনের পোশাক পরিধান করার ব্যবস্থা হয়। সমগ্র জার্মানীতে দলের নেতৃবৃন্দকে পাঠাইয়া জনসাধারণের সম্মুখে হিটলার তাঁহার দলের কর্মসূচী উপস্থাপিত করিতে ও তাহা জনপ্রিয় করিতে সচেষ্ট হন। জার্মানীর যুবসম্প্রদায় বিশেষ করিয়া শিক্ষিত বেকার যুবকগণ হিটলারের কর্মসূচী দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তাঁহার দলে যোগদান করে। জার্মান ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, ইহুদী-বণিক ও শিল্পপতি-গণের একাধিপত্যে বিরক্ত হইয়া তাহারা হিটলারের সহিত যোগদান করে। এমন কি করভারে প্রপীড়িত কৃষক সম্প্রদায়ও হিটলার ও তাঁহার নাৎসীদলকে আন্তরিক সমর্থন জানায়।

নাৎসী দল ও উহার জনপ্রিয়তা

তাঁহার কর্মসূচী জার্মান জনসাধারণের মনে এক নূতন আশার সঞ্চার করে। এই কর্মসূচীতে (১) ভার্সাই সন্ধির তীব্র নিন্দা করা হয়, (২) সমগ্র জার্মান ভাষাভাষী অধিবাসীগণকে লইয়া এক বৃহৎ জার্মান রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়, (৩) জার্মান-ইহুদী সম্প্রদায়কে দেশদ্রোহী বলিয়া অভিহিত করা হয়। এবং (৪) মার্ক্সীয় সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। নাৎসীদলের সভাসমিতি রক্ষা করার জন্য ও অন্যান্য দলের সভাসমিতি ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য হিটলার 'ঝটিকা বাহিনী' নামে এক গুপ্তচর দল গঠন করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার বলপ্রয়োগের দ্বারা সাধারণতন্ত্রের পতন ঘটাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হইয়া তিনি কারারুদ্ধ হন। তাঁহার কারাদণ্ড ও বিচার সমগ্র জার্মানীতে এক গভীর উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল; এবং জনসাধারণ তাঁহার কর্মসূচীতে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। এস্থলে স্মরণ রাখা দরকার যে এই সময় রুঢ় অঞ্চল ফরাসী সৈন্যবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইলে সমগ্র জার্মান

হিটলারের কর্মসূচী

হিটলারের কারাদণ্ড ও নাৎসীবাদের প্রতি জনসাধারণের প্রশ্রয়বৃদ্ধি

জনসাধারণের মনে ভার্সাই-সন্ধি ও মিত্রশক্তিবর্গের বিরুদ্ধে এক গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল। হিটলার ও নাৎসী দলের কর্মসূচীতে জার্মানগণ তাহাদের মুক্তির সন্ধান পায়।

হিটলারের কারাদণ্ডকালে নাৎসীদলকে বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছিল এবং ইহার নেতৃবর্গের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। এই কারণে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে নাৎসীদলের জনপ্রিয়তা বহুলাংশে হ্রাস পায়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসীদলকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা হয় এবং ধীরে ধীরে উহার শক্তি ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ভাইমার শহরে নাৎসীদলের এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসীদলের দুই নেতা গোয়েরিং ও গোয়েবলস্ (Goebbels) নির্বাচনে সাফল্য অর্জন করিয়া রাইকস্ট্যাগে (Reichstag) প্রবেশ করেন।

নাৎসীদলের জনপ্রিয়তা ও শক্তি বৃদ্ধি

১৯২৯ হইতে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নাৎসীদলের জনপ্রিয়তা ও শক্তি অভাবনীয়-ভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে নাৎসীদল রাইকস্ট্যাগের ৬০৮টির মধ্যে ২৩০টি আসন দখল করে। প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবার্গ (Hindenbarg) রাইকস্ট্যাগের অন্যতম দল হিসাবে নাৎসীদলের নেতা হিটলারকে চ্যান্সেলার বা প্রধানমন্ত্রী-পদে নিয়োগ করিতে বাধ্য হন।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে নাৎসীদলের সাফল্য

হিটলার প্রধানমন্ত্রী-পদে নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত তাঁহার ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার সুযোগ আসিল। এই সময় জার্মানীর রাইকস্ট্যাগ বা পার্লামেণ্ট ভবনে কে বা কাহারা অগ্নি-সংযোগ করিয়াছিল। হিটলার কমিউনিস্টগণকে এই অগ্নিসংযোগের জন্য দায়ী করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি প্রদানের প্রস্তাব করিলেন এবং এইরূপ কার্যের জন্য তাঁহাকে ও তাঁহার মন্ত্রিসভাকে অধিক ক্ষমতা প্রদান করিতে রাইকস্ট্যাগকে প্ররোচিত করিলেন। অতঃপর রাইকস্ট্যাগ এক আইন লিপিবদ্ধ করিয়া হিটলারের হস্তে চারি বৎসরের জন্য জার্মানীর সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান করিল। এই ব্যবস্থার ফলে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে হিটলার ও তাঁহার নাৎসীদল জার্মানীর সর্বেসর্বা হইয়া পড়িলেন এবং তথায় সাধারণতন্ত্রের অবসান হইয়া একনায়কতন্ত্র শাসনের প্রতিষ্ঠা হইল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে হিণ্ডেনবার্গ পরলোক গমন করিলে হিটলার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়া প্রেসিডেণ্ট ও চ্যান্সেলার উভয় পদই স্বয়ং গ্রহণ করিলেন।

হিটলার চ্যান্সেলার-পদে নিযুক্ত

হিটলারের সর্বাত্মক ক্ষমতালাভ

১৩.৪. নাৎসী আন্দোলনের সাফল্যের কারণ (Causes of the success of the Nazi Movement): নাৎসী আন্দোলনের সাফল্যের কারণগুলি হইল :—

(১) ভার্সাই-সন্ধি : অনেকের মতে জার্মানীর প্রতি ভার্সাই-সন্ধির কঠোর শর্তাদিই ছিল জার্মানীর নাৎসী আন্দোলনের মূল কারণ। সন্ধির অপমানজনক

শর্তাদি জার্মানজাতির আত্মমর্যাদায় দারুণ আঘাত করিয়াছিল এবং ইহার ফলে উহাদের মধ্যে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধাত্মক মনোভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। জার্মানজাতির মনে এইরূপ প্রতিশোধাত্মক মনোভাব যখন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল সেই সময় হিটলার উহার সুযোগ লইয়া জার্মানজাতিকে জাতীয় মর্যাদা পুনরুদ্ধারের সন্ধান দিয়াছিলেন। আবার অনেকে এই মতবাদ যথার্থ বলিয়া মনে করেন না। ইঁহাদের মতে প্রথমতঃ, ভার্সাই-সন্ধি ও নাৎসীদল কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার মধ্যে চৌদ্দ বৎসরের ব্যবধান ছিল। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বযুদ্ধ অবসানের প্রথম দিকে নাৎসী আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। তৃতীয়তঃ, লোকার্নো-চুক্তি সম্পাদনের পর লীগ-অফ-নেশনস্-এ প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া জার্মানীর লুপ্ত-মর্যাদা পুনরুদ্ধার হইবার প্রায় আট বৎসর পর নাৎসীদল শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। চতুর্থতঃ, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী অপসারিত হইয়াছিল; ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত সমস্যার অবসান হইয়াছিল এবং ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের ব্যাপারে জার্মানী অপরাপর রাষ্ট্রবর্গের সহিত সমান অধিকার লাভ করিয়াছিল। সুতরাং ভার্সাই-সন্ধির শৃঙ্খল হইতে জার্মানী যখন নিজেকে মুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই সময় নাৎসীদল বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করে। ভার্সাই-সন্ধিকে নাৎসীদলের সাফল্যের আংশিক কারণ বলা যাইতে পারে। ভার্সাই-সন্ধিকে উপলক্ষ্য করিয়া নাৎসীগণ নিজেদেরকে দেশপ্রেমিক বলিয়া প্রচার করিবার এবং সরকারকে দেশদ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

(২) **কমিউনিস্ট আদর্শের প্রসার:** নাৎসী আন্দোলনের প্রধান কারণ ছিল জার্মানীতে কমিউনিস্ট আদর্শের প্রসার। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাইকস্ট্যাগে কমিউনিস্টদের সংখ্যা ছিল ৭৭ এবং ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে উহাদের সংখ্যা দাঁড়াল ৮৯। সেই বৎসরের দ্বিতীয় নির্বাচনে নাৎসীদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে, কিন্তু কমিউনিস্টগণ একশত আসন দখল করে। অবশ্য ইহার দ্বারা প্রমাণ করা যায় না যে, বলশেভিক আদর্শের প্রতি জার্মানবাসী অধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। সম্ভবতঃ নাৎসীদলের বিরুদ্ধে একমাত্র কমিউনিস্টগণই সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছিল বলিয়া অনেকে উহাদের সমর্থন করিয়াছিল। জার্মানীর দুর্দিনেও জার্মানজাতি কমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণ করে নাই। উপরন্তু কমিউনিস্টদের সম্পর্কে জার্মানজাতির মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। নাৎসীগণ উহার সুযোগ লইয়া প্রচার করিতে থাকে যে নাৎসীদলের বিপর্যয় ঘটিলে জার্মানীতে কমিউনিস্টদের সংখ্যা দশ মিলিয়ন বৃদ্ধি পাইবে। বলশেভিক রাশিয়ার আদর্শে ভীত হইয়া বহু শিল্পপতি ও বিত্তশালীগণ মুক্তহস্তে নাৎসীদলকে সাহায্য করিয়াছিল। এমন কি শাসনক্ষমতা হস্তগত করার পরেও নাৎসীগণ জার্মানবাসীর কমিউনিস্টভীতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদেরকে বলশেভিক রাশিয়ার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিশ্বের প্রধান রক্ষক বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, রাইকস্ট্যাগের ভিতরে

জার্মানীর নিরপেক্ষ জনমত নাৎসীগণকে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ইওরোপের রক্ষক বলিয়া মনে করিত। সুতরাং জার্মানজাতির কমিউনিস্টভীতি নাৎসীদলের সাফল্যের অন্যতম কারণ বলা যায়।

(৩) **অর্থনৈতিক বিপর্যয়ঃ** বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর অর্থনৈতিক বিপর্যয় নাৎসীবাদী প্রচারকার্যে সহায়তা করিয়াছিল। নিম্ন, মধ্যবিত্ত, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কৃষক সম্প্রদায়ের ধনতন্ত্রবিরোধী মনোভাবে ইন্ধন যোগাইয়া নাৎসীগণ উহাদের মন নাৎসীবাদের প্রতি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিল। নাৎসীগণ কৃষককুলকে সর্বতোভাবে সরকারী সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া উহাদের মধ্যে নাৎসীবাদ জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন নাৎসীগণ জার্মানীর বেকারগণের উপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় জার্মানীতেও বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়া যে প্রবলভাবে দেখা দিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু সমগ্র বিশ্বে যখন অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন শুরু হইতেছিল ঠিক সেই সময় নাৎসীগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

(৪) **অন্যান্য কারণঃ** নাৎসী আন্দোলনের সাফল্যের অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে নাৎসীদের ইহুদী-বিদ্বেষী প্রচারকার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জার্মানগণ ইহুদীগণকে বিজাতী ও বিদেশী বলিয়া মনে করিত। জার্মানীতে ইহুদীগণ ছিল সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও পুঁজিপতি সম্প্রদায় (Capitalists)। জার্মানীর দুরবস্থার জন্য নাৎসীগণ ইহুদী সম্প্রদায়কে দায়ী করিয়া জনসাধারণের মধ্যে এক দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, সমরবাদ (Militarism) ও সামরিক ঐতিহ্যে বিশ্বাসী জার্মানজাতির মনে নাৎসীগণ সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইটালীর ফ্যাসিস্টদের ন্যায় নাৎসীগণও নিজস্ব সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া জার্মানীতে এক অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, নাৎসীদলের বিরোধী সকল রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ঐক্য না থাকায় নাৎসীদলের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না।

(৫) **হিটলারের অবদানঃ** নাৎসী আন্দোলনের সাফল্যে হিটলারের অবদান অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার আদর্শ ও কর্মপন্থায় কোনরূপ মৌলিকতা ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহার সংগঠনী প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তিনি জার্মানবাসীর বিশেষ করিয়া জার্মান যুবক সম্প্রদায়ের মনোভাব সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্মক্ষমতা, সংগঠনী প্রতিভা ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের বিরুদ্ধে তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতা জার্মানবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি জার্মানীর তদানীন্তন পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া নাৎসী আন্দোলনের প্রতি জার্মানবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন।

১৩.৫. নাৎসীদলের আদর্শ ও নীতি ঃ (Ideals and policies of the Nazis) ঃ নাৎসীদলের আদর্শ ও নীতি ছিল নিম্নলিখিত রূপ—

(১) **জাতিতত্ত্ববাদ ঃ** নাৎসীদের কর্মসূচীতে ভিন্নজাতি সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা এবং সমাজতন্ত্রী নীতি ও সাম্যবাদী কর্মপদ্ধতির মধ্যে এক বিস্ময়কর সংমিশ্রণ দেখা যায়। ("Their programme was a strange mixture of racial intolerance, socialist policies and communist politics"—Schapiro)। টিউটন জাতিগোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত জার্মানজাতিকে নাৎসীগণ বিশুদ্ধ জাতি এবং ইংরাজ, ফরাসী ও ইটালীয়গণকে মিশ্রজাতি বলিয়া মনে করিত। সুতরাং নাৎসীদের মতে জার্মানগণ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির দিক দিয়া অপরাপর সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

(২) **ইহুদী-বিদ্বেষ ঃ** বিশেষ মহান্ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নাৎসীগণ জার্মান জাতিকে অ-জার্মান প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিয়া জার্মান জাতির বিশুদ্ধতা রক্ষা করার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিল। টিউটন জাতিগোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত না হওয়ার জন্য নাৎসীগণ জার্মান-ইহুদীগণকে কখনও প্রকৃত জার্মান বলিয়া মনে করিত না। এই কারণে উহারা ইহুদীগণকে জার্মানী হইতে বিতাড়িত করার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল।

(৩) **একদলীয় শাসন ঃ** ইটালীর ফ্যাসিস্টদের ন্যায় জার্মানীর নাৎসীদলও একদলীয় শাসনের পক্ষপাতী ছিল। ফ্যাসিস্টদের ন্যায় নাৎসীগণও পার্লামেণ্টারী ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ঘোর বিরোধী ছিল। উহারা ভাইমার সাধারণতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া একদলীয় একনায়কতন্ত্র (One-party dictatorship) স্থাপনের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিল। একদলীয় শাসন ও উহার নেতার হস্তে রাষ্ট্রের সর্বাত্মক ক্ষমতা সমর্পণ করাই নাৎসীবাদের মূলমন্ত্র ছিল। ইটালীর ফ্যাসিস্টদের ন্যায় নাৎসীগণও রাষ্ট্রে ব্যক্তির স্থান স্বীকার করিত না। নাৎসীগণের মতে রাষ্ট্র হইল জাতি ও সমাজ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সর্বাত্মক সংগঠন।

(৪) **ধনতন্ত্র বিরোধী ঃ** নাৎসীগণ মার্ক্সবাদের ঘোর বিরোধী ছিল। উহারা নিজেদেরকে জাতীয় সমাজতন্ত্রী বলিয়া মনে করিত এবং শ্রেণীসংঘাতের পরিবর্তে ধনী ও শ্রমিকদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া 'শ্রমিকদের সামাজিক মুক্তি, '(Social liberation of workers') সাধন করাই নাৎসীবাদের আদর্শ ছিল। অপরদিকে নাৎসীগণ ধনতন্ত্রবাদেরও ঘোর বিরোধী ছিল।

(৫) **নাৎসীবাদ ও পররাষ্ট্রনীতি ঃ** যে সকল উপায়ে নাৎসীগণ জার্মানীতে একনায়কতন্ত্র স্থাপন করিয়াছিল তাহা পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত করা হইয়াছিল। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সকল প্রকার আপোস মীমাংসার পরিবর্তে শক্তি-প্রয়োগ করাই নাৎসী সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সকল প্রকার আন্তর্জাতিক সন্ধিপত্রগুলি বাতিল করা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করাই নাৎসীদের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল। এককথায় অন্যান্য-রাষ্ট্রের ব্যাপারে নাৎসীগণ বলপ্রয়োগনীতিতেই অধিক আস্থাশীল ছিল। হিটলারের ভাষায়

"Mankind has grown great in entrnal war ; it will decay in eternal peace"। হিটলারের জঙ্গীবাদী নীতির মূল কথাই ছিল বিদ্রোহ, হত্যা, যুদ্ধ ও পররাজ্য গ্রাস। নাৎসীবাদ অনুসারে সকল জাতির মধ্যে শ্বেতকায় জাতিই হইল শ্রেষ্ঠ এবং জার্মাণগণ হইল আর্যজাতি সম্ভূত। সুতরাং জার্মান জাতি সমগ্র বিশ্বে প্রভুত্ব স্থাপনের একমাত্র অধিকারী। নাৎসীদের নিকট স্বাধীনতার অধিকার ও আন্তর্জাতিকতাবাদ ছিল মূল্যহীন।

জার্মানীর চ্যান্সেলার হিসাবে হিটলার

(Hitler as the Chancellor of Germany)

১৩.৬. **হিটলারের অভ্যন্তরীণ নীতি (Hitler's Internal Policy) :** হিটলার তাঁহার 'মেই-ক্যাম্ফ' পুস্তকে তাঁহার দলের কর্মসূচী বিবৃত করিয়াছিলেন। এই কর্মসূচী সংক্ষেপে মোটামুটি এইরূপ, (১) ইওরোপের সমস্ত জার্মান জাতিকে একত্রিত করিয়া এক বৃহত্তর জার্মান রাষ্ট্র গঠন করা, (২) জার্মানী সম্পর্কে ভার্সাই সন্ধির অন্যায়মূলক শর্তাদি ভঙ্গ করা এবং (৩) ক্রমবর্ধমান জার্মানজাতির স্থান সংকুলানের জন্য জার্মানীর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার করা।

হিটলারের লক্ষ্য

হিটলার ক্রমে ক্রমে শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত করিলেন। তিনি জার্মানীর 'ফুহেরার' (Fuhrer) বা প্রধান নেতারূপে স্বীকৃত হইলেন। হিটলার ছিলেন উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং এইরূপ মনোভাব হইতেই তাঁহার প্রচারিত বিশুদ্ধ 'আর্যজাতিত্ব' উদ্ভূত হয়। জার্মানগণ আর্যজাতির শাখা হইতে উদ্ভূত এবং জার্মান রাষ্ট্রে অ-জার্মান জাতির স্থান নাই এই মতবাদ হিটলার ও তাঁহার নাৎসীদলের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া হিটলার ইহুদী-বিতাড়ন নীতি গ্রহণ করিলেন। ইহার পশ্চাতে জাতীয়তা বিশুদ্ধিকরণ অপেক্ষা রাজনৈতিক কারণই মুখ্য ছিল। জার্মানীর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইহুদী সম্প্রদায়ের একাধিপত্য ছিল। ইহুদীগণ জাতীয়তাবাদ অপেক্ষা আন্তর্জাতিকতাবাদে অধিকতর বিশ্বাসী ছিল। সুতরাং জার্মান রাষ্ট্রে ইহারা শত্রু বলিয়া বিবেচিত হইল। উপরন্তু জার্মান কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই ছিলেন এই সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং হিটলার সর্বপ্রথম এই সম্প্রদায়ের উপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। ইহুদীদের ৫০০০ মার্ক মূল্যের অতিরিক্ত ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল। সরকারী চাকুরী হইতে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করা হইল। সরকারের বিনা অনুমতিতে সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তর করা বা নূতন ব্যবসা-বাণিজ্য উন্মুক্ত করা ইহুদীদের পক্ষে নিষিদ্ধ হইল। আইন-ব্যবসা তাহাদের নিকট নিষিদ্ধ করা হইল। হাসপাতাল হইতে ইহুদী চিকিৎসক ও নার্সগণকে বিতাড়িত করা হইল। শিক্ষা-

ইহুদী নির্যাতন

ইহুদীদের উপর বিধি-নিষেধ

প্রতিষ্ঠান হইতেও ইহুদী শিক্ষকগণকে বিতাড়িত করা হইল এবং ঘোষণা করা হইল যে ভবিষ্যতে কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে মোট ছাত্রসংখ্যার শতকরা ৫ জনের অতিরিক্ত ইহুদী ছাত্র ভর্তি করা চলিবে না। ইহার ফলে প্রায় দশ হাজার ইহুদী ব্যবসায়ী, শিক্ষক, লেখক এবং শিল্পী তাঁহাদের জীবিকা হইতে বঞ্চিত হইলেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপকভাবে ইহুদী নিধন আরম্ভ হইল। হাজার হাজার ইহুদীকে গ্রেপ্তার করা হইল, বহু ইহুদীকে হত্যা করা হইল, উহাদের দোকান ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি লুণ্ঠন করা হইল এবং এমন কি উহাদের ধর্মমন্দিরগুলিও ধ্বংস করা হইল। বিশ্ববিদ্যালয় ও সকলপ্রকার শিক্ষায়তনগুলিতে ইহুদীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। ইহার ফলে হাজার হাজার ইহুদী দেশত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনও এইরূপ বর্বরতার হাত হইতে রক্ষা পান নাই এবং তাঁহাকেও জার্মানী পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

মার্কসবাদ প্রচার নিষিদ্ধ হইল

জার্মানীতে মার্কসবাদের প্রচার বন্ধ করা হইল, কমিউনিস্ট প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল এবং উহাদের অর্থ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল।

ইতিমধ্যে জার্মানীতে নাৎসীদলের একনায়কতন্ত্র স্থাপনের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা গৃহীত হইল। কমিউনিস্ট, সোস্যাল-ডেমোক্রাট প্রভৃতি নাৎসীবিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার ঘোষণা করিলেন যে অতঃপর জার্মানীতে নাৎসীদলই একমাত্র আইনসঙ্গত দল এবং অন্য কোন রাজনৈতিক দল গঠিত হইলে তাহা দেশদ্রোহী বলিয়া বিবেচিত হইবে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রাইকস্ট্যাগে এক আইন প্রণয়ন করিয়া হিটলার জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে হস্তান্তরিত করিলেন। প্রদেশগুলির আইন রচনার ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হইল, এবং প্রাদেশিক সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হইল। জার্মান পার্লামেণ্টের ঊর্ধ্বতন পরিষদ রাইকস্ট্যাগ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। এই পরিষদ প্রাদেশিক প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত ছিল। কঠোর দমননীতির সাহায্যে হিটলার নাৎসীবিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলকে বিনষ্ট করিয়া এবং রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিয়া জার্মানীতে একনায়কতন্ত্র স্থাপন করিলেন। সর্বত্র জার্মানজাতিকে একত্রিত করাই ছিল তাহার প্রধান লক্ষ্য। ইহার প্রথম পদক্ষেপ আমরা দেখিতে পাই প্রাদেশিক প্রতিনিধিসভার বিলুপ্তিতে।

হিটলারের একনায়কতন্ত্র স্থাপন

জার্মানীর যুব-সম্প্রদায়ের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা স্থাপন করা হইল। বিভিন্ন যুব-সম্প্রদায়গুলির উপর এই কেন্দ্রীয় সংস্থার কর্তৃত্ব স্থাপন করা হইল। এই কেন্দ্রীয় সংস্থার নেতার অনুমতি ভিন্ন কোন যুব-সম্প্রদায় গঠন করা নিষিদ্ধ হইল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানীর যুব-সম্প্রদায়ের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়া হিটলার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সংস্কার প্রবর্তনে উদ্যোগী হইলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর পূর্বতন ট্রেড ইউনিয়নগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল এবং ধর্মঘট নিষিদ্ধ হইল। নাৎসী নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তিনি শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহ দান করিলেন এবং শ্রমিকসংঘ ও মালিকসংঘ প্রভৃতি সংস্থা ভাঙ্গিয়া দিয়া উহার স্থলে শ্রমিক ও মালিকদের এক যৌথ প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বজায় রহিল এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য মালিকগণের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হইল। যুদ্ধের উপকরণ উৎপাদন এবং স্থল, জল ও বিমান বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেশের বেকারত্ব দূর করা হইল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জার্মানীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার চতুর্থ বার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করিলেন। কৃত্রিম উপায়ে পেট্রল, পশম, রবার এমন কি খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী পর্যন্ত আবিষ্কার করা হইল।

হিটলারের অর্থনৈতিক নীতি

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারেও পরিবর্তন চলিল। নাৎসী দলের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে জার্মানীতে প্রায় ২৯টি বৃহৎ প্রোটেস্ট্যাণ্ট চার্চ ছিল। ইহার ফলে ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে মতদ্বৈধতা লাগিয়া থাকিত এবং সুষ্ঠুভাবে চার্চের কার্যাদি সম্পাদিত হইত না। হিটলারের লক্ষ্য হইল একজন ধর্মযাজকের অধীনে একটি জাতীয় চার্চ গঠন করা এবং উহাকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে রাখা। কিন্তু হিটলারের এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জার্মানীর প্রোটেস্ট্যাণ্ট চার্চগুলি সম্মিলিত হইয়া 'জার্মান-ক্রিশ্চান' নামে একটি দল গঠন করিল। হিটলার দলটিকে আয়ত্তে আনিতে অসমর্থ হইয়া ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে উহা ভাঙ্গিয়া দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত নাৎসী সরকার ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট চার্চগুলির মধ্যে বিবাদ লাগিয়াই ছিল।

ধর্ম-নীতি

১৩.৭. হিটলারের পররাষ্ট্রনীতি (Foreign Policy of Hitler): অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা স্থাপন ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিয়া হিটলার বৈদেশিক নীতির প্রতি অতঃপর মনঃসংযোগ করিলেন। প্রথমে অবশ্য নাৎসী সরকার শান্তির বাণী প্রচার করেন এবং হিটলার এইরূপ ঘোষণাও করেন যে বলপূর্বক ভার্সাই সন্ধি পুনর্বিবেচনা করার ইচ্ছা তাঁহার নাই। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে হিটলার তাঁহার 'মেই ক্যাম্ফ' পুস্তকে (১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত) ফ্রান্সকে জার্মানীর চিরশত্রু বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, ইওরোপের সমগ্র জার্মান অধিবাসীগণকে একত্রিত করিয়া বৃহত্তর 'রাইখ' বা জার্মানসাম্রাজ্য গঠন করার দাবি করিয়াছিলেন এবং পূর্ব ইওরোপকে জার্মানীর সাম্রাজ্যবিস্তারের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সকল প্রকার আপোস মীমাংসার পরিবর্তে শক্তি প্রয়োগ করাই নাৎসী সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সকল প্রকার আন্তর্জাতিক সন্ধিপত্রগুলি বাতিল করা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করাই নাৎসী জার্মানীর পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল। হিটলারের জঙ্গীবাদী নীতির মূল কথাই ছিল বিদ্রোহ, হত্যা ও পররাজ্যগ্রাস। নাৎসীবাদ অনুসারে সকল জাতির মধ্যে শ্বেতকায় জাতি হইল শ্রেষ্ঠ। শ্বেতকায় জাতিগুলির মধ্যে আর্যজাতিই হইল সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ এবং জার্মানগণ হইল আর্যজাতি সম্ভূত। সুতরাং জার্মান জাতিই সমগ্র বিশ্বে প্রভুত্ব স্থাপন করিবার একমাত্র অধিকারী। নাৎসী পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা ছিল এই যে লীগ-অফ-নেশনস্, নিরাপত্তার আদর্শ, নিরস্ত্রীকরণ বা শান্তি নীতি জাতির অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়।

পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য

সংক্ষেপে হিটলারের 'মেই ক্যাম্ফ' অনুসারে নাৎসী জার্মানীর পররাষ্টনীতির তিনটি লক্ষ্য ছিল—(১) আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবিতে বৃহত্তর জার্মান সাম্রাজ্যে জার্মানজাতি-গোষ্ঠীভুক্ত সমগ্র জার্মান অধিবাসীগণকে ঐক্যবদ্ধ করা, (২) ভার্সাই ও সেন্ট জার্মেইন সন্ধি বাতিল করা এবং (৩) উদ্বৃত্ত জার্মান অধিবাসীদের স্থান সংকুলানের জন্য রাজ্যবিস্তার করা।

১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দ হইতে জার্মানীর যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু হইল। লীগ-অফ-নেশনস্-এর আদর্শ ও কার্যপদ্ধতির প্রতি হিটলারের মোটেই আস্থা ছিল না। লীগ-কাউন্সিলের সদস্য-পদ তিনি তাঁহার পররাষ্ট্রনীতির প্রধান অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেন। নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারেও তিনি আদৌ উৎসাহী ছিলেন না। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক পরিত্যাগ করিয়া লীগের সদস্যপদ পরিত্যাগের কথা ঘোষণা করিলেন। হিটলারের ঘোষণা সমগ্র ইওরোপে এক নূতন সংকটের ইঙ্গিত জানাইল। পশ্চিমী রাষ্ট্রবিদ্গণের মধ্যে অনেকেই জার্মানীর সহিত আপোস-মীমাংসার প্রয়োজন অনুভব করিলেন। হিটলার উহাদের এইরূপ মনোভাবের পূর্ণ সুযোগ লইবার ত্রুটি করেন নাই।

জার্মানীর যুদ্ধপ্রস্তুতি

লীগের সদস্যপদ ত্যাগ

জার্মানীর আক্রমণাত্মক নীতির দ্বিতীয় পর্ব হইল পোল্যাণ্ডের সহিত অনাক্রমণ চুক্তি। জার্মানীর বহু অঞ্চল পোল্যাণ্ডকে দেওয়া হইয়াছিল—যেমন ডানজিগ, সাইলেশিয়া, পোসেন ইত্যাদি। হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে পোল্যাণ্ডের আশঙ্কার কারণ হইল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার অভাবনীয় ভাবে পোল্যাণ্ডের সহিত দশ বৎসরের জন্য অনাক্রমণ-চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। ইহার মূলে হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল পোল্যাণ্ডকে ফ্রান্সের মিত্রতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল করা। অপরদিকে জার্মানী ও সোভিয়েট রাশিয়ার আক্রমণাত্মক মনোভাব পোল্যাণ্ডের অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং জার্মানীর সহিত অনাক্রমণ-চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া

পোল-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি

পোল্যাণ্ড রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করিয়া তুলিবার এবং জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে বলসাম্য বজায় রাখিবার সুযোগ পায়।

জার্মানীর আক্রমণাত্মক নীতির তৃতীয় পর্ব হইল, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ডলফাস (Dollfuss)-কে হত্যা করিয়া বলপূর্বক অস্ট্রিয়া দখল করা। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার জাতীয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত গণভোটের মাধ্যমে অস্ট্রিয়ার অধিকাংশ অধিবাসী জার্মানীর সহিত সংযুক্ত হইবার সপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিল। সুতরাং হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সংযুক্তিকরণ সম্পন্ন করিতে যত্নবান হইলেন। তিনি অস্ট্রিয়ায় নাৎসীদল গঠন করিয়া নাৎসী আন্দোলন শক্তিশালী করিয়া তুলিবার এবং সংযুক্তিকরণ নীতির ঘোর বিরোধী অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ডলফাসের পতন ঘটাইবার জন্য জোর প্রচারকার্য শুরু করিলেন। ইহাতে আশঙ্কিত হইয়া ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটালী অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা সর্বতোভাবে রক্ষা করার কথা ঘোষণা করিল। কিন্তু হিটলার কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অস্ট্রিয়-ন্যাৎসীগণকে হিংসাত্মক কার্যকলাপে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন।

অস্ট্রিয়া দখলের প্রথম ব্যর্থতা

অতঃপর ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের দুর্বলতা ও উহাদের পারস্পরিক বিবাদের সুযোগ লইয়া হিটলার তাঁহার ইপ্সিত লক্ষ্যে অগ্রসর হইলেন। এই সময় স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কো (General Franco) ও তাঁহার অনুচরদের সহিত স্পেনের সাধারণতন্ত্রী সরকারের গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইলে হিটলার ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার জাপানের সহিত কমিণ্টার্ন-বিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী, জার্মানী ও জাপানের মধ্যে রোম, বার্লিন, টোকিও মৈত্রীসংঘ (Rome-Berlin-Tokyo-Axis) স্থাপিত হইল।

ফ্রাঙ্কোকে সাহায্যদান
জাপানের সহিত চুক্তি
'রোম-বার্লিন-টোকিও মৈত্রী' গঠন

অস্ট্রিয়-নাৎসীগণ ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ডলফাসকে (Dollfuss) হত্যা করিয়া বলপূর্বক জার্মানীর সহিত অস্ট্রিয়ার সংযুক্তিকরণে উদ্যোগী হইল। কিন্তু অস্ট্রিয়ার অধিবাসী ইহা সমর্থন না করায় এবং মুসোলিনী অস্ট্রিয়া ও ইটালীর সীমান্তে সৈন্য প্রেরণ করায় নাৎসীগণ নিরস্ত হইল এবং এইভাবে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া দখলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সার উপত্যকায় গণভোট অনুষ্ঠিত হইল এবং ইহার সিদ্ধান্ত অনুসারে সার জার্মানীর সহিত সংযুক্ত হইল। সেই বৎসর ডানজিগ ও মেমেল-এ স্থানীয় নাৎসীগণ বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করিল।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার ভার্সাই-সন্ধির শর্তাদি ভঙ্গ করিয়া রাইন অঞ্চল দখল করিয়া লইলেন এবং তাহা সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করিলেন। পরবৎসর তিনি দানিয়ুব, ওডার নদী ও কিয়েল খালের উপর জার্মানীর আধিপত্য স্থাপন করিলেন।

হিটলারের পররাষ্ট্রনীতি জার্মানীকে সামরিক শক্তিতে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল বটে, কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহার ফল মোটেই শুভ হয় নাই। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইটালী, রাশিয়া ও গ্রেটব্রিটেন জার্মানীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। কিন্তু ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে জার্মানীর কমিউনিস্টবিরোধী মনোভাব এবং পূর্ব ইওরোপে জার্মানীর বিস্তারলাভের প্রচেষ্টা রাশিয়াকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিল এবং রাশিয়া ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে বাধ্য হইল।

ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের আশঙ্কা জার্মানীর বিরুদ্ধে একাধিক রাষ্ট্রজোট

অপরদিকে জার্মানীর অস্ট্রিয়া গ্রাসের প্রচেষ্টা ইটালীকে অসন্তুষ্ট করিল এবং ইটালী ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিল। জার্মানীর সামরিক প্রস্তুতি ইংল্যান্ডকেও আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিল এবং ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সহিত জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী ইওরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির নিকট হইতে একরূপ বিচ্ছিন্নই হইয়া পড়িল।

অস্ট্রিয়ার সহিত সন্ধি

কিন্তু শীঘ্রই হিটলার মুসোলিনীর সহিত মনোমালিন্য দূর করার জন্য ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার সহিত সন্ধি করিয়া অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ইহার পর হইতে পররাষ্ট্রক্ষেত্রে হিটলার ও মুসোলিনীর সহযোগিতা আরম্ভ হইল।

অস্ট্রো-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার মাত্র পাঁচ দিন পর হিটলার অস্ট্রিয়ার নাৎসীগণকে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে পুনরায় প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। হিটলারের আদেশে অস্ট্রিয়ার প্রধান শহরগুলিতে নাৎসী আন্দোলন ও বিক্ষোভ শুরু হইল। অস্ট্রিয়ার সরকারও উহা দমন করার জন্য সকল শক্তি নিয়োগ করিলেন। ইহাতে রুষ্ট হইয়া হিটলার অস্ট্রিয়ার নূতন চ্যান্সেলার শুসনিগকে (Schuschnigg) এক বৈঠকে আমন্ত্রণ করিয়া দাবি করিলেন যে (১) অস্ট্রিয়া সরকারকে জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ (National Socialism) স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, (২) সিস্-ইনকোয়ার্টকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিতে হইবে, (৩) সকল নাৎসীগণকে মুক্ত করিতে হইবে এবং (৪) সকল পদচ্যুত নাৎসী কর্মচারীগণকে পুনর্বহাল করিতে হইবে। হিটলারের প্রায় সকল দাবি পূরণ করা হইল। কিন্তু অস্ট্রিয়া সরকার সিস্-ইনকোয়ার্টকে চ্যান্সেলারপদে নিযুক্ত করিতে অসম্মত হইলেন। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত সিস্-ইনকোয়ার্টকে চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত করা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে হিটলার অস্ট্রিয়া আক্রমণের আদেশ দিলেন। জার্মান বাহিনী অস্ট্রিয়া আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে হিটলার স্বয়ং ভিয়েনায় প্রবেশ করিলেন; তিনি অস্ট্রিয়ার পার্লমেন্ট ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং নূতন নির্বাচনের আদেশ দিলেন। অস্ট্রিয়ার শতকরা ৯৯ ভাগ জনগণ হিটলারকে সমর্থন করিল। জার্মানীর সহিত অস্ট্রিয়ার সংযুক্তিকরণ এইভাবে সম্পন্ন হইল।

জার্মানীর সহিত অস্ট্রিয়ার সংযুক্তিকরণ (১৯৩৮)

হিটলারের পররাজ্য-গ্রাস স্পৃহা বৃদ্ধি পাইল। অতঃপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর। চেকোশ্লোভাকিয়ার বিলুপ্তিসাধন করার পশ্চাতে হিটলারের যুক্তি ছিল এইরূপ—প্রথমতঃ, গণতান্ত্রিক চেকোশ্লোভাকিয়া ছিল লীগ-অফ-নেশনস্-এর উগ্র সমর্থক এবং ফ্রান্স ও রাশিয়ার মিত্র। দ্বিতীয়তঃ, চেকোশ্লোভাকিয়ার শক্তিশালী বাহিনী জার্মানীর অস্বস্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, প্রায় ৩½ মিলিয়ান জার্মান (সুদেতান জার্মান নামে পরিচিত) চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুদেতান জার্মানদের উপর চেক্ সরকার অত্যাচার করিতেছেন এই অজুহাতে হিটলার উহাদের রক্ষণাবেক্ষণের দাবি করেন। এই সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার বিলুপ্তিসাধনে ব্রতী হইলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার জার্মানগণ হিটলারের প্ররোচনায় জার্মান সাম্রাজ্যে উক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি দাবি করিল। হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতানল্যাণ্ড দাবি করিয়া বসিলেন। এই অবস্থায় চেক্ সরকার ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্সের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। যুদ্ধ অনিবার্য দেখিয়া ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন (Neville Chamberlin) কালক্ষেপ না করিয়া জার্মানীতে গমন করিলেন ও যুদ্ধ সম্বরণ করিতে হিটলারকে অনুরোধ করিলেন।

চেকোশ্লোভাকিয়ার বিলুপ্তিসাধন

ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধে মুসোলিনী হিটলারকে ইঙ্গ-ফরাসী প্রস্তাবে সম্মত হইবার জন্য অনুরোধ জানাইলে হিটলার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ারের সহিত মিউনিকে এক বৈঠকে মিলিত হইলেন। এই বৈঠকে মিউনিক চুক্তি (Munich Pact) স্বাক্ষরিত হইল। ইহার শর্তগুলি ছিল এইরূপ—(১) ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর হইতে ১০ই অক্টোবরের মধ্যে সুদেতান অঞ্চল হইতে চেক বাহিনীর অপসারণ সম্পন্ন করা হইবে, (২) এই সময়ের মধ্যে জার্মান বাহিনী কর্তৃক সুদেতান অঞ্চল দখল করার পর্ব সম্পন্ন করা হইবে এবং (৩) চারি সপ্তাহের মধ্যে চেক্ সরকার সুদেতান জার্মানগণকে সামরিক ও পুলিশবাহিনী হইতে মুক্ত করিবেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্স চেকোশ্লোভাকিয়ার নূতন সীমানার নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিল। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে (১৯৩৯ খ্রীঃ) হিটলার মিউনিক-চুক্তি ভঙ্গ করিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করিয়া লইলেন। মিউনিক চুক্তি সম্পর্কে এইরূপ বলা হইয়া থাকে, "To the Chechs the Munich Agreement was a tragedy. To Britain it brought time to rearm and a shock to the national honour and dignity which meant the real end of the policy of appeasement." ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য রাষ্ট্রের দুর্বলতা ও উদাসীনতার সুযোগ লইয়া হিটলার লিথুয়ানিয়ার নিকট হইতে মেমেল বন্দর বলপূর্বক আদায় করিলেন এবং বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া প্রদেশ দুটিকে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন।

মিউনিক চুক্তির তাৎপর্য

মেমেল, মোরাভিয়া ও বোহেমিয়া দখল

জার্মানীর সামরিক শক্তিতে বিশ্বাসী হিটলার উপর্যুপরি সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পোলিশ করিডরের উপর জার্মানীর কর্তৃত্ব দাবি করিয়া বসিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এই অঞ্চল জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যুদ্ধাবসানে বাল্টিক সাগরের সহিত পোল্যাণ্ডের যোগাযোগ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে জার্মানীর উক্ত অঞ্চলটি পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু জার্মানী এই ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লয় নাই। প্রথমেই ভার্সাই-সন্ধি অমান্য করিয়া হিটলার পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ডানজিগ শহরটি দখল করিয়া লইলেন। ইহার ফলে ইওরোপে এক গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ড এক আত্মরক্ষামূলক চুক্তি সম্পাদন করিল। অপর দিকে হিটলার রাশিয়ার সহিত এক অনাক্রমণ-চুক্তি (দশ বৎসরের জন্য) সম্পাদন করিয়া জার্মানীর পূর্ব সীমান্ত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইলেন। অতঃপর ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধ করিবার অনিচ্ছা লক্ষ্য করিয়া হিটলার ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলেন। ইংল্যাণ্ড পোল্যাণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯৩৯ খ্রীঃ) জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ফ্রান্স ও ব্রিটিশ উপনিবেশ অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

জার্মানী কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত

১। ভাইমার সাধারণতন্ত্রের কৃতিত্ব আলোচনা কর। [উঃ ১৩.১.]

২। জার্মানীতে নাৎসীদের ক্ষমতালাভের কারণগুলি বিশ্লেষণ কর। [উঃ ১৩.৪.]

৩। হিটলারের পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা কর। [উঃ ১৩.৭.]

৪। নাৎসী আন্দোলনের লক্ষ্য ও আদর্শ বর্ণনা কর। [উঃ ১৩.৫.]

৫। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য হিটলারের দায়িত্বের মূল্যায়ন কর। [উঃ ১৩.৭.]

চতুর্দশ অধ্যায়

ইটালীর ইতিহাস

(History of Italy, 1919-1939)

১৪.১. **ইটালীর ভৌগোলিক অবস্থিতির গুরুত্ব ঃ** ইটালীর ভৌগোলিক অবস্থিতির সহিত উহার অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইটালীর মূল ভূখণ্ড একটি সংকীর্ণ উপদ্বীপ হওয়ায় সমুদ্রোপকূল হইতে ইহার কতক অঞ্চলের দূরত্ব ৭৫ মাইল। আবার কতক অঞ্চল সমুদ্রের সন্নিকটবর্তী হওয়ায় যুদ্ধ-জাহাজ দ্বারা ইটালী আক্রমণ করা ও উহা অবরোধ করিয়া রাখা খুবই সহজ ব্যাপার। এই কারণেই ইটালীকে "ভূমধ্যসাগরের বন্দী" (Italy is a prisoner of the Mediteranean") বলা হইয়া থাকে। ভূমধ্যসাগরের প্রবেশদ্বারগুলি বিপক্ষ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রবর্গের অধিকারে থাকিলে সেই ক্ষেত্রে যুদ্ধ ভিন্ন ইটালীর পক্ষে বহির্বিশ্বে নির্গমনের কোন উপায় নাই। এই কারণেই ফ্যাসিবাদী ইটালীর দাবি ছিল—'Mare Nostrum' ('আমাদের সমুদ্র') অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া আতলান্তিক ও ভারত মহাসাগরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা এবং ব্রিটেনের নিকট হইতে জিব্রাল্টার ও সুয়েজখালের প্রবেশপথ আদায় করিয়া বহির্বিশ্বে নির্গমনের পথ সুরক্ষিত করা। সুতরাং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের রাষ্ট্র হিসাবে ইটালীর যথেষ্ট অসুবিধার কারণ ছিল। ভৌগোলিক অবস্থিতির দিক দিয়া ইটালী ইওরোপ ও ভূমধ্যসাগরের অংশবিশেষ; কারণ আল্পস্ পর্বতমালা উহার উচ্চতা সত্ত্বেও ইটালীকে মধ্য ও পশ্চিম ইওরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে পারে নাই। প্রতিরক্ষার দিক দিয়াও আল্পস্ ইটালীর পক্ষে মোটেই উপযোগী নহে। এই কারণে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে মধ্য ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের অপেক্ষা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের রাষ্ট্রবর্গের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করাই ইটালীর পক্ষে অধিক লাভজনক এবং বাণিজ্যের কারণে ভূমধ্যসাগর আদ্রিয়াটিক সাগরে আধিপত্য স্থাপন করা ইটালীর পক্ষে অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

জনসংখ্যার দিক দিয়া বিচার করিলে ইটালীকে জনবহুল দেশ বলা যায়। জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য বহু ইটালীয়কে স্থান-সংকুলানের জন্য ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করিতে হয়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের পর ইটালীর ফ্যাসিবাদী সরকার দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার মূলে প্রধান ছিল ইটালীর সাম্রাজ্যবাদী নীতির সমর্থন লাভ করা। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ব্রিটেনের স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশগুলিতে বিদেশীদের আগমন নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন রচিত হইলে ইটালীর পক্ষে সাম্রাজ্যবিস্তারের নীতি গ্রহণ করা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রাচুর্য হেতু ইটালীকে অপরাপর দেশগুলির রপ্তানির উপর নির্ভর করিতে হইত। ইটালীর অর্থনৈতিক সংহতি স্থাপন ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি

করার পথে উহার প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রাচুর্য প্রধান অন্তরায় ছিল। আল্পস্ পর্বতমালার বহিরাঞ্চল হইতে প্রয়োজনীয় পণ্য-সামগ্রী আমদানী করা ব্যয়বহুল ছিল। এতদ্ভিন্ন ভূমধ্যসাগরের প্রবেশদ্বারগুলি শত্রুরাষ্ট্র কর্তৃক কোন সময় অবরুদ্ধ হইলে ইটালীর যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং এই সকল কারণেই ইটালীর ফ্যাসিবাদী সরকারকে এক চমকপ্রদ সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করিয়া অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ প্রশমিত করার চেষ্টা করিতে হইয়াছিল।

১৪.২. যুদ্ধোত্তর ইটালীর অবস্থা: যুদ্ধোত্তর ইটালীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ফ্যাসিস্ট আন্দোলন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর নাৎসীদলের ন্যায় ইটালীর ফ্যাসিস্টদলও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারমূলক কার্যসূচী রচনা করিয়া স্বদেশকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের মূলে ছিল যুদ্ধোত্তর ইটালীর অবস্থা।

ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের উৎপত্তি

রাজ্যলাভের আশায় ইটালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। লণ্ডনের গোপন সন্ধি (Treaty of London, 1915) অনুসারে ইটালী মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়াছিল। ইহার দ্বারা মিত্রপক্ষ ইটালীকে ট্রেণ্টিনো, টাইরল, ট্রিয়েস্ট ও ডালমাশিয়া প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। কিন্তু যুদ্ধান্তে ইটালী মিত্রপক্ষের নিকট হইতে আশানুরূপ পুরস্কার লাভ করে নাই। ভার্সাই-সন্ধি ইটালীবাসীদের জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে পারে নাই। প্রথমতঃ আদ্রিয়াটিক উপকূলে 'ফিউম' (Fiume) নামক বন্দরটি লাভের ব্যাপারে ইটালী নিরাশ হইয়াছিল। এই অঞ্চলটি পাইবার পরিবর্তে তদানীন্তন ইটালীর সরকার যুগোশ্লাভিয়ার সহিত এক সন্ধি (Treaty of Rapallo, 1920) স্থাপন করিয়া ফিউম-এর স্বাধীনতা স্বীকার করিলে ইটালীবাসীগণ তাহাদের সরকারের দুর্বলতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, আদ্রিয়াটিকের উত্তর উপকূলে আলবানিয়ার ব্যাপারেও ইটালী নিরাশ হইয়াছিল। যুদ্ধের সময় ইটালীর সৈন্যবাহিনী আলবানিয়ায় প্রবেশ করিয়া তথায় ইটালীর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধান্তে আলবানিয়া হইতে সৈন্য অপসারণ করিয়া উহার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে ইটালীকে বাধ্য করা হইয়াছিল। মিত্রপক্ষের এইরূপ আচরণে ইটালীবাসীগণ তাহাদের জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তারের ব্যাপারেও ইটালীকে নিরাশ হইতে হইয়াছিল। পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ও আফ্রিকায় কিছু ভূখণ্ডলাভের আশা ইটালীর ছিল। কিন্তু সেভার্স-এর সন্ধি দ্বারা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গ্রীসের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে ইটালীকে বাধ্য করা হইয়াছিল। আফ্রিকাতেও জার্মানীর উপনিবেশগুলি ইটালীকে প্রদান করার

যুদ্ধান্তে পুরস্কৃত না হওয়ায় ইটালীর অসন্তুষ্টি

পরিবর্তে গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের মধ্যে সেগুলি বণ্টন করা হইয়াছিল। এইভাবে সাম্রাজ্যবিস্তারের আশা ধূলিসাৎ হইয়া যাওয়ায় যুদ্ধের পরবর্তী কালে ইটালী অসন্তুষ্ট ও অতৃপ্ত রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

রাজ্যলাভে নিরাশা ও বৈদেশিক ব্যাপারে অপমান ইটালীর জনসাধারণকে অত্যন্ত মর্মাহত করিয়াছিল এবং ইহার ফলে নিজেদের সরকারের বিরুদ্ধে তাহাদের তীব্র অসন্তোষ ও মিত্রশক্তিবর্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাহারা উপলব্ধি করে যে তাহাদের প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা ইটালীর জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে বা অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখিতে সক্ষম নহে।

ইটালীর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও শান্তি ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইটালীর অবস্থা সম্পর্কে মতভেদ আছে। ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের সমর্থকদের মতে বিশ্বযুদ্ধের পর ইটালীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক দারুণ বিপর্যয়ের উদ্ভব হইয়াছিল; ইটালীর রাষ্ট্রীয় জীবন ছিল বিচ্ছিন্ন; সর্বত্র অন্তর্বিপ্লব ও দলাদলি উহার রাষ্ট্রীয় জীবনে এক দারুণ অনিশ্চয়তা আনিয়াছিল; প্যারিসের শান্তির শর্তাদি ইটালীবাসীকে মর্মাহত করিয়াছিল; যুদ্ধের জন্য ক্ষতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবহেতু অর্থনৈতিক কাঠামো ভগ্নপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল।

ইটালীর তদানীন্তন অবস্থা সম্পর্কে দুইটি মত

এই মতবাদের বিরুদ্ধে অপরদিকে ইটালীর জনৈক খ্যাতনামা ঐতিহাসিক G. Salvemini-র মতে অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইটালীও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল এবং সর্বত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ধর্মঘট ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো মোটেই ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। বরঞ্চ ১৯১৯ হইতে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইটালীর অর্থনৈতিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল এবং সরকারের আয়ও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এমন কি যুদ্ধের ফলে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়াছিল তাহারও অবসান ঘটিয়াছিল।

কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করিলে ইহাই বলা চলে যে বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেও ইটালীর অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই উন্নত ছিল না।

ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় ইটালীকেও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থা চরমে পৌঁছিয়াছিল। যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে ধর্মঘট ও অরাজকতা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছিল। যুদ্ধ-প্রত্যাগত সৈনিক, কারখানার শ্রমিক, চাকুরিজীবী সকলেরই উপযুক্ত কর্মের অভাব দেশের বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল। সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীরা এই সকল অশান্তিতে ইন্ধন যোগাইয়া দেশকে বিপ্লবমুখী করিয়া তোলার চেষ্টা করে। এই সময় কর্মচ্যুত সৈনিকগণ দলে দলে সমাজতন্ত্রীদলে যোগ দেয়। ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট রাশিয়ার বহুসংখ্যক চর ইটালীর জনসাধারণের মধ্যে ধর্মঘট, বলপূর্বক কলকারখানা দখল ও প্রলেটারিয়েটদের

অর্থনৈতিক সঙ্কট

একনায়কত্বের কথা প্রচার করিতেছিল। রুশ-বিপ্লব দ্বারা প্রভাবিত ইটালীর উগ্র সমাজতন্ত্রীগণ রাশিয়ার অনুকরণে স্বদেশে বিপ্লব ঘটাইবার পরিকল্পনা করে। ১৯১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইটালীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনসাধারণ সাম্যবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পড়ে। গ্রামাঞ্চলে বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং বহু জমিদার নিহত হয়। কারখানা, ডাকবিভাগ এবং রেলবিভাগে ধর্মঘট দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া উঠে এবং ইহার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য একরূপ অচল অবস্থায় আসিয়া পৌঁছায়।

অভ্যন্তরীণ অরাজকতা দূর করিতে সরকারের অক্ষমতা

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এইরূপ সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির কবল হইতে দেশকে রক্ষা করিতে ইটালীর তদানীন্তন সরকার ছিলেন সম্পূর্ণ অক্ষম। ক্ষমতালাভের জন্য বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত, নির্বাচন ব্যাপারে উৎকোচ ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন, বলিষ্ঠ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের অভাব প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্রীয় জীবনে এক ঘোরতর গোলযোগের উদ্ভব হইয়াছিল। পার্লামেণ্টের ভিতরে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত ও পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শাসনব্যবস্থাকে বিকল করিয়া তুলিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন মন্ত্রিসভার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে কোনরূপ স্বল্প-মেয়াদী বা দীর্ঘ-মেয়াদী সংস্কার সাধন করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯১৯ হইতে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইটালীতে ছয়টি মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হইয়াছিল।

মন্ত্রিসভার দ্রুত পরিবর্তন

মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্বেগ

উগ্রপন্থী সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীগণের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে ইটালীর মধ্যবিত্তশ্রেণী আতঙ্কিত হইয়া উঠে। তাহারা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিল এবং বলপ্রয়োগ দ্বারা সাম্যবাদের প্রসার প্রতিহত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। দেশের বিশৃংখল অবস্থার জন্য তাহারা সরকারের নীতির তীব্র নিন্দা করে। যুদ্ধোত্তর ইটালীর শাসনভার প্রথমে ছিল নিটি (Nitti) এবং পরে জিওলিটির (Giolitti) হস্তে। তাঁহারা কেহই অরাজকতা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় হইতে দেশকে রক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই। অব্যবস্থা ও অরাজকতার হাত হইতে দেশকে উদ্ধার করার জন্য এই সময় মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভিতর হইতে নূতন এক রাজনৈতিক দল অগ্রসর হইয়া আসে। এই দলের নেতা ছিলেন বেনিটো মুসোলিনী (Benito Mussolini) এবং ইহার মতবাদ ফ্যাসিজম্ (Fascism) নামে পরিচিত। এই দলের সভ্যগণ কালো পোশাক পরিধান করিত এবং সৈনিকদের ন্যায় অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা ও কুচ্‌কাওয়াজ করিত। ইহারা উগ্র স্বদেশপ্রেমিক এবং আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী বিপ্লবের বিরুদ্ধে ইটালীর জাতীয়তাবাদের পক্ষপাতী ছিল। ইহারা ইটালীর সর্বত্র ক্লাব বা সংঘ স্থাপন করিয়া সমাজতন্ত্রীগণের উপর আক্রমণ চালায়। ফলে এই দুই দলের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হয়। সাম্যবাদী পরিকল্পনার ব্যর্থতা, সরকারের দুর্বলতা, ধনিকশ্রেণী কর্তৃক ফ্যাসিস্ট দলকে অর্থসাহায্য দান, স্বাদেশিকতার প্রসার ও শক্তিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি কারণে ফ্যাসিস্ট

ফ্যাসিস্ট দলের উৎপত্তি

দল অবশেষে সাফল্য অর্জন করে। সাম্যবাদ ও অরাজকতার কবল হইতে দেশকে উদ্ধার করার জন্য ফ্যাসিস্টগণের আবেদনে ইটালীর জনসাধারণ বিশেষ করিয়া প্রাচীনপন্থী সম্প্রদায় সাড়া দেয়। ফ্যাসিস্টগণের প্রভাব প্রতিপত্তি ও সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। অবশেষে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনী রোম আক্রমণ করেন। এই আক্রমণকারীদের সংখ্যা ও শক্তি দেখিয়া ইটালীর সরকার ভয়ে পদত্যাগ করেন। এক অন্তর্বিপ্লব হইতে দেশকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ইটালীরাজ ভিক্টর তৃতীয় ইমানুয়েল মুসোলিনীকে প্রধানমন্ত্রী-পদে নিযুক্ত করেন। অতঃপর মুসোলিনীর নেতৃত্বে ইটালীতে ফ্যাসিস্ট সরকার স্থাপিত হয়।

ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা

§৪৩. **মুসোলিনী ও ফ্যাসিস্ট আন্দোলন ঃ (Mussolini and the Fascist Movement) ঃ** জার্মানীর ন্যায় ইটালীতেও বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান কারণ ছিল সমরনায়কগণের অসন্তুষ্টি ও জনসাধারণের চরম দুঃখ-দুর্দশা। পরাজয়ের গ্লানি যেমন জার্মানবাসীকে মর্মাহত করিয়াছিল তেমনি সাফল্যের ফলাফল ইটালীয়গণকেও বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। যুদ্ধের পর ইটালীতে যে সকল বিপ্লবী সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল সেইগুলির মধ্যে প্রাক্তন সমাজতন্ত্রী বেনিটো মুসোলিনী কর্তৃক স্থাপিত ফ্যাসিস্ট বা ফ্যাসিবাদী দল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনী উত্তর ইটালীর এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা ছিলেন একটি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী এবং আঠারো বৎসর বয়সে মুসোলিনী নিজেই এক স্কুলের অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। কিন্তু উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া তিনি সুইজারল্যাণ্ডের লুসান ও জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থান কালে তাঁহার সংগঠনী কুশলতা ও সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তথায় তিনিই সর্বপ্রথম ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করেন, কিন্তু মালিকগণের বিরুদ্ধে কারখানার শ্রমিকগণকে ধর্মঘট করিতে প্ররোচিত করায় তিনি সুইজারল্যাণ্ড হইতে বিতাড়িত হন।

মুসোলিনীর প্রথম জীবন

ইটালীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মুসোলিনী পুনরায় অধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার করিয়া অরাজকতার সৃষ্টি করিতে থাকেন। এই কারণে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বিপজ্জনক বিপ্লবী' বলিয়া তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মুক্তিলাভ করিয়া তিনি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে-সমাজতান্ত্রিক দলের মুখপাত্র 'আভান্তি' নামক এক পত্রিকার সম্পাদনা আরম্ভ করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথমদিকে মুসোলিনী ইটালীর নিরপেক্ষতা সমর্থন করেন এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা প্রচার করিতে থাকেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তিনি নিরপেক্ষতার নীতি বর্জন করিয়া যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য জনমত সৃষ্টি করিতে যত্নবান হন। ইটালী কর্তৃক বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ মুসোলিনীর মতে জনসাধারণের বিপ্লবী মনোভাবের নিদর্শন। তাঁর ভাষায় "The war is here and

it is a war of the people. The war of today will be the revolution of tomorrow"। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যুদ্ধে যোগদান করেন। যুদ্ধান্তে যুদ্ধে নিযুক্ত কর্মীগণকে এক সভায় আহ্বান করিয়া তিনি ইটালীর যুদ্ধোত্তর সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। "দক্ষিণপন্থীদের প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি ও বামপন্থীদের ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি" হইতে দেশকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মুসোলিনী ইটালীর যুবসমাজের সহযোগিতায় একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন (১৯১৯ খ্রীঃ)। ইহা ফ্যাসিস্ট দল নামে পরিচিত। ইহারা দেশবাসীর নিকট প্রাচীন ইটালীর ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করার জন্য আবেদন জানায়। ইহারা কমিউনিজম্-এর বিরোধী ছিল। ইহাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কার্যসূচী বস্তুতঃ গণতান্ত্রিক ও বিপ্লববাদী হইলেও তাহা ঘোর জাতীয়তাবাদী ছিল। মুসোলিনী ফ্যাসিবাদী আন্দোলনকে "একটি অদলীয় আন্দোলন (Non-party movement) বলিয়া অভিহিত করেন। ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের নীতি বিশ্লেষণ করিয়া মুসোলিনী ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বলেন যে দেশের বৈষয়িক ও নৈতিক শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া ইটালীয়দের বৈষয়িক ও নৈতিক উন্নতিসাধন করাই ফ্যাসীবাদীদের প্রধান লক্ষ্য। তিনি ফ্যাসিস্টগণকে "Solvers of Problems" বলিয়া অভিহিত করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ফ্যাসিস্ট দল উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে থাকে।

মুসোলিনী কর্তৃক ফ্যাসিবাদী দল গঠন

ফ্যাসিবাদী নীতির বিশ্লেষণ

ইতিমধ্যে ইটালীর শাসনব্যবস্থা ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইলে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সর্বত্র ধর্মঘট ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ এক দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করে। কৃষকগণ রাজস্ব প্রদানে অসম্মতি প্রকাশ করে; কর্মচ্যুত সৈনিকগণ বলপূর্বক জমি দখল করিতে থাকে; জমিদার ও পুঁজিপতিগণ একটি বলিষ্ঠ সরকার গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং জাতীয়তাবাদী ও চাকুরিজীবীগণ একটি সংস্কারকামী সরকার গঠনের দাবি করে। ফ্যাসিবাদী আন্দোলন উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা লাভ করিতে থাকে। বেকার যুবক, কর্মচ্যুত সৈনিক, জমিদার ও মালিকশ্রেণী দলে দলে ইহাতে যোগদান করে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মিলান শহরে ফ্যাসিবাদী সঙ্ঘের (Fascio) প্রতিষ্ঠা হইবার পর হইতে অন্যান্য শহর ও গ্রামাঞ্চলেও ফ্যাসিবাদী আন্দোলন প্রসার লাভ করিতে থাকে। ইহার সংগ্রামশীল আদর্শ যুবসম্প্রদায় ও সৈনিকগণের উপর অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে। ফ্যাসিবাদীগণ কালো পোশাক পরিধান করিত এবং সামরিক কুচকাওয়াজ ও নিয়মানুবর্তিতা ফ্যাসিবাদী সংঘর্ষের প্রধান অঙ্গ ছিল। সামরিক কুচকাওয়াজের ফলে ফ্যাসিবাদীগণের মধ্যে সৈনিকসুলভ অভিজ্ঞতা ও যুদ্ধ-মনোভাব বৃদ্ধি পাইতে

ইটালীর সর্বত্র অরাজকতা ও বিভিন্ন শ্রেণীর দাবি

ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের প্রসারতা

ফ্যাসিবাদী ও সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে সংঘর্ষ

থাকে। অল্প সময়ের মধ্যে ফ্যাসিবাদীগণ একদল সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী গঠন করে। ইহার পর শুরু হইল ফ্যাসিবাদী ও সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ। সমাজতন্ত্রীদের সভা-সমিতি ও উহাদের কার্যকলাপের উপর ফ্যাসিবাদীদের আক্রমণ চলে। প্রকাশ্যে সমাজতন্ত্রী নেতাগণকে ভীতি প্রদর্শন ও অনেক ক্ষেত্রে হত্যা করা হইতে থাকে। সরকারপক্ষ নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করিয়া প্রকারান্তরে ফ্যাসিবাদী আন্দোলনে সহায়তা করিতে থাকেন।

ইহা স্বীকার্য যে সমাজতান্ত্রিক দলের বিফলতা, সরকারের দুর্বলতা, ধনীসম্প্রদায়ের সমর্থন ও মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের সক্রিয় সহযোগিতা এবং দেশের জনসাধারণের দুরবস্থার অবসানকল্পে ফ্যাসিস্ট দলের নূতন কর্মসূচী প্রভৃতি কারণে ফ্যাসিস্ট দল উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে থাকে।

বিপ্লবী আন্দোলন ও প্রোলেটারিয়েট শাসন স্থাপনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা (১৯২০)

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর শিল্পাঞ্চলগুলিতে ধর্মঘট ব্যাপক আকার ধারণ করিলে এক দারুণ সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। রাশিয়ার অনুকরণে কারখানার বিপ্লবী শ্রমিকগণ কারখানাগুলি বলপূর্বক দখল করিল এবং নানা স্থানে সোভিয়েট গঠন করিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল এবং ইটালী এক দারুণ সামাজিক বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইল।

মুসোলিনী কর্তৃক ক্ষমতা লাভের উদ্যোগ

কিন্তু ইটালীর প্রাচীনপন্থীদের মন হইতে বিপ্লবের ভীতি দূরীভূত হইল না। পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থায় কাহারও আস্থা রহিল না। মুসোলিনীর সুযোগ আসিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়া তিনি ক্ষমতালাভে উদ্যোগী হইলেন। তিনি ইটালীর তদানীন্তন সরকারের অকর্মণ্যতা ও দুর্বলতা প্রতিপন্ন করিয়া সমাজতন্ত্রীবিরোধী সকল দলগুলিকে ফ্যাসিস্ট আন্দোলনে যোগদানের জন্য আহবান জানাইলেন। অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পপতি ও জমিদারগণ ফ্যাসিস্ট তহবিলে প্রচুর অর্থদান করিল এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকে ফ্যাসিস্ট সেনাবাহিনীতে যোগদান করিল। সরকারপক্ষের অনেকেই ফ্যাসিস্টগণকে নানাভাবে গোপনে সাহায্য করিতে লাগিল। এমন কি সম্রাট তৃতীয় ভিক্টর ইমান্যুয়েলও (Victor Emmanuel III) মুসোলিনীকে সমর্থন করিতে লাগিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্রাট ও চার্চের সহিত এক আপোস-মীমাংসা করিলেন।

ফ্যাসিস্ট দলের রোম অভিযান (১৯২২)

তিনি সম্রাটের নিকট আনুগত্যের ও চার্চের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের ব্যাপারে সৈন্যবাহিনীর নিরপেক্ষতাও লাভ করিলেন। ইহার পর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর

মাসে মুসোলিনী ও তাঁহার ফ্যাসিস্ট দলের রোম অভিযান শুরু হইল। আক্রমণকারীদের সংখ্যা ও শক্তি দেখিয়া ইটালীয় সরকারের মন্ত্রিগণ ভয়ে পদত্যাগ করিলেন। সম্রাট ভিক্টর তৃতীয় ইমানুয়েল একটি নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া মুসোলিনীকে প্রধানমন্ত্রী-পদে নিযুক্ত করিলেন।

প্রধানমন্ত্রী-পদে মুসোলিনীর নিয়োগ

শীঘ্রই ফ্যাসিস্টগণ সকল বিরোধী দলগুলিকে কঠোর হস্তে দমন করিল, সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি বিলুপ্ত করিল, নির্বাচনসংক্রান্ত আইনগুলি ফ্যাসিস্ট দলের অনুকূলে নূতন করিয়া প্রণয়ন করিল; চেম্বার-অফ-ডেপুটিস (Chamber of Deputies) নামক প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্ত করিল এবং ২২টি পৌর প্রতিষ্ঠানের একটি কাউন্সিল গঠন করিল। এক কথায় মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট দলের একনায়কতন্ত্র স্থাপিত হইল।

ফ্যাসিস্ট দলের একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

ফ্যাসিস্ট মতবাদ (Fascism) : মুসোলিনীর বর্ণনা অনুযায়ী ফ্যাসিস্ট মতবাদ হইল একটি স্বতন্ত্র 'বিশ্বাস'। তাঁহার মতে "যদি প্রতিটি যুগের একটি করিয়া স্বতন্ত্র মতবাদ ও বিশ্বাস থাকিতে পারে তাহা হইলে ফ্যাসিস্ট মতবাদও বর্তমান যুগের একটি স্বতন্ত্র বিশ্বাস"। মুসোলিনী এইরূপ দাবি করিয়াছিলেন যে, "ফ্যাসিজম্ বর্তমান ইওরোপীয় সভ্যতার মানদন্ড"। রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়া ফ্যাসিজম্-এর মূলমন্ত্র ছিল "রাষ্ট্রই সকল শক্তির আধার" (Everything in the state nothing outside the state and nothing aginst the state")। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রে ব্যক্তিসত্তার কোন মূল্য নাই এবং রাষ্ট্র জাতি ও সমাজ হইতে অভিন্ন এক সংগঠন। ব্যক্তিগত জীবনের উত্থান-পতনে জাতীয় জীবনের গতি কোনক্রমেই ব্যাহত হয় না। এক কথায় ফ্যাসিবাদীরা গণ-সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী ছিল না।

মুসোলিনী কর্তৃক স্থাপিত এই ফ্যাসিস্ট মতবাদের তিনটি প্রধান লক্ষ্য ছিল—(১) রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করা, (২) ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি রক্ষা করা এবং (৩) ইটালীকে বিশ্বরাষ্ট্রে উন্নীত করার উপযোগী পররাষ্ট্র-নীতি গ্রহণ করা। প্রথমদিকে ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ইটালীর প্রচলিত আইন ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাম্যবাদের প্রভাব হইতে মুক্ত রাখা। ক্রমে ইহা ইটালীর জাতীয়তাবাদের প্রতীক হইয়া উঠে।

ফ্যাসিস্টবাদের লক্ষ্য

১৪.৪. ফ্যাসিস্ট সরকারের অভ্যন্তরীণ নীতি (Internal Policy) :

(১) নিরঙ্কুশ ফ্যাসিস্ট সরকার গঠন : প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভ করার অব্যবহিত পরেই মুসোলিনী ইটালীর পার্লামেন্টের নিকট সর্বাত্মক ক্ষমতা দাবি করিয়া তাহা লাভ করেন। ইহার পর পররাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদী-নীতির

প্রয়োগ শুরু হয়। একটি নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিয়া মুসোলিনী ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মতাবলম্বী সকল সরকারী কর্মচারিগণকে বরখাস্ত করার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। সরকারী চাকুরিতে একমাত্র ফ্যাসিবাদীগণকেই নিয়োগ করার নীতি গৃহীত হয়। ইহার পর পার্লামেণ্টেও ফ্যাসিস্ট দলের একাধিপত্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৯২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে জনসাধারণের সকল প্রকার কর্তৃত্বের বিলুপ্তি ঘটে। সমস্ত পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা রোমে নিযুক্ত 'পোডেস্টাস' (Podestas) নামক সরকারী কর্মচারীদের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। সকল প্রকার আঞ্চলিক বা স্থানীয় নির্বাচন বাতিল করা হয়। সকল শহরের স্থানীয় শাসনভার পোডেস্টাসগণের হস্তে ন্যস্ত করা হয়।

পার্লামেণ্ট ও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের উপরে ফ্যাসিস্টদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা স্থাপন

ইতিমধ্যে মুসোলিনী প্রধানমন্ত্রী হইতে ক্রমশঃ 'ডিক্টেটরে' পরিণত হন। তিনি পার্লামেণ্টের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা হইতে নিজেকে মুক্ত করেন এবং তাঁহার সকল কার্যের জন্য তিনি একমাত্র রাজার নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য রহেন। জাতীয় বাহিনীর উপর তাঁহার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা স্থাপিত হয়। তাঁহার অনুমতি ভিন্ন কোন প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উপস্থাপন করা নিষিদ্ধ হয়। তাঁহাকে "সরকারের প্রধান" (Head of the Government) নামে অভিহিত করা হয় এবং সরকারের সকল মন্ত্রীকে তাঁহার অধস্তনে পরিণত করা হয়।

মুসোলিনীর সর্বাত্মক ক্ষমতা লাভ

এই সকল পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধবাদীগণ আন্দোলন করিয়াছিল বটে, কিন্তু সকল প্রকার আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করা হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করা হয় এবং একমাত্র ফ্যাসিবাদী সংবাদপত্র ছাড়া প্রায় সকল সংবাদপত্রের বিলুপ্তি ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষায়তনগুলিতে একমাত্র ফ্যাসিস্টগণ ছাড়া অন্য কোন মতাবলম্বীগণকে অধ্যাপনার কার্যে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ হয়।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইটালী যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল, ইহার পর মুসোলিনী সেই অবস্থা হইতে দেশকে রক্ষা করার জন্য ব্রতী হন।

(২) **নূতন উদ্দীপনার উন্মেষ**ঃ ফ্যাসীবাদ ইটালীর জনগণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনা ও আত্মসচেতনতার উন্মেষ ঘটায়। জনসভা, পথসভা ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী সরকার ইটালীর যুবসমাজকে সর্বদাই দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত রাখিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। বহুবিধ শারীরিক চর্চা ও সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়া সরকার যুবসমাজকে সর্বদাই বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত রাখিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। নারীদেরকেও স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া জাতির কাজে ও গৃহের কাজে উপযুক্ত করিয়া তোলা হইয়াছিল। ফ্যাসিবাদের আদর্শ ও ফ্যাসিবাদী

প্রশিক্ষণ দ্বারা ইটালীর যুব-সম্প্রদায়কে আক্রমণশীল জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা হইয়াছিল।

(৩) **অর্থনৈতিক ব্যবস্থা**ঃ যুদ্ধের পর ইটালীর জাতীয় ঋণের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল ও ইটালীর মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাইতেছিল। প্রথমেই মুসোলিনী দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে আধুনিক করিয়া তুলিতে যত্নবান হন। সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ সংকুচিত করা হয় এবং বহু সরকারী বিভাগ বিলুপ্ত করা হয়। রেলবিভাগের আয় বৃদ্ধি করিয়া জাতীয় রাজকোষের ঘাটতি পূরণ করা হয়।

অর্থনৈতিক সমস্যার কারণ

দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধান করাই ফ্যাসিস্ট সরকারের সম্মুখে সর্বাধিক গুরুতর সমস্যা ছিল। এই সমস্যার মূলে দুইটি বিশেষ কারণ ছিল, (১) ইটালীর জনসংখ্যার বৃদ্ধিহেতু দেশে স্থানাভাব ও (২) শিল্পোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন কয়লা ও লৌহ প্রভৃতির অভাব। কয়লা ও লোহের জন্য ইটালীকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত। এমন কি কৃষিজাত দ্রব্যের অপ্রাচুর্য হেতু দেশে খাদ্যাভাব বিদ্যমান ছিল। সুতরাং অর্থনৈতিক দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে ইহা বলা চলে যে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ইটালী স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। উপরন্তু ইটালীর বাণিজ্য উদ্বৃত্ত প্রতিকূল ছিল। কাঁচামালের জন্য বিদেশী রাষ্ট্রের উপর নির্ভর না করিয়া মুসোলিনী ইটালীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হন। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষির উন্নতিসাধন করিয়া দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। শিল্পের উন্নতির জন্য কলকারখানায় ধর্মঘট বা লক-আউট নিষিদ্ধ করা হয় এবং শ্রমিকগণের স্বার্থরক্ষার জন্য উপযুক্ত কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। নৌ-বিভাগের উন্নতিসাধন করিয়া ইটালীর উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করার ব্যবস্থা হয় এবং শিল্পোন্নতির জন্য বিদেশী মূলধন গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করা হয়। ইহার ফলে ইটালীর বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত অনুকূল হয়। জনকল্যাণমূলক কার্যসূচী গ্রহণ করিয়া ও সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করিয়া মুসোলিনী বেকার-সমস্যার সমাধান করিতেও সচেষ্ট হন।

কৃষি ও শিল্পের উন্নতিসাধন

(৪) **পোপের সহিত মীমাংসা**ঃ মুসোলিনীর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হইল পোপের সহিত ইটালীর সরকারের যে দ্বন্দ্ব ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চলিয়া আসিতেছিল তাহার নিষ্পত্তি করা। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর সরকার রোম দখল করিলে পোপ তাঁহার রাজ্য (মধ্য ইটালী) হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। তথাপি পোপকে সন্তুষ্ট করার জন্য ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এক আইন রচিত হইয়াছিল। এই আইন দ্বারা (১) পোপ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীগণকে ভ্যাটিক্যান শহর ও কয়েকটি রাজপ্রাসাদ ভোগদখলের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। (২) ভ্যাটিকান শহরে পোপের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত গ্রহণ ও বিদেশে তাহা প্রেরণ করিবার

১৮৭১ সালের আইন

অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। (৩) পোপকে বাৎসরিক অর্থ-সাহায্যদানের ব্যবস্থাও হইয়াছিল।

কিন্তু পরবর্তী পোপ নবম পায়াস (Pius IX) ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের আইন মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হন। ফলে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইটালীর সরকারের সহিত পোপের বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনী পোপের সহিত এক মীমাংসায় উপনীত হইতে সচেষ্ট হন এবং তাঁহার প্রচেষ্টায় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাটেরান সন্ধি (Treaty of Lateran) দ্বারা, (১) পোপের ভ্যাটিকান স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষিত হয় এবং ইহার বিনিময়ে পোপ কর্তৃক ইটালীর সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়। (২) ভ্যাটিকান গভর্নমেণ্টকে নিজস্ব মুদ্রা, ডাকটিকিট, টেলিগ্রাফ ও রেলপথ স্থাপন করিবার অধিকার দেওয়া হয়, (৩) বিদেশী রাষ্ট্রদূত গ্রহণ ও রাষ্ট্রদূত বিদেশে প্রেরণ করিবার অধিকার পোপকে দেওয়া হয়। (৪) স্বাধীন রাজার ন্যায় পোপকে পবিত্র ও আইনের বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

পোপের সহিত মীমাংসা ও ল্যাটেরান সন্ধি (১৯২৯)

ইহা ছাড়াও পোপকে যাজক নিয়োগের অধিকার দেওয়া হয়। ইটালীর সরকার যাজকগণকে বেতন দিতে স্বীকৃত হন। এই সকল ব্যবস্থায় পোপ সন্তুষ্ট হন এবং অপরদিকে চার্চের সমর্থন লাভ করিয়া ফ্যাসিস্ট সরকার অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠেন।

(৫) **শিক্ষাবিস্তার**: জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করার ব্যাপারেও মুসোলিনী বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। তিনি স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন। শিক্ষা খাতে প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁহার শিক্ষা-নীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফ্যাসিবাদের প্রসার করা এবং ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রতি জনসাধারণের আনুগত্য অর্জন করা।

১৪.৫. ইটালীর পররাষ্ট্রনীতি (Foreign Policy of Italy): নীতি ও উদ্দেশ্য (Principles and objectives): প্রথমদিকে মুসোলিনী ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, পররাষ্ট্রক্ষেত্রে তিনি ফ্যাসিবাদ-নীতির প্রয়োগ করিবেন না। কিন্তু শীঘ্রই তিনি তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়া সকল কূটনৈতিক ব্যাপারে উহার প্রয়োগ করিতে শুরু করিলেন।

যদিও শান্তির শর্তাদি (Peace Treaties) অনুসারে ইটালী অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের এক বৃহদংশ লাভ করিয়াছিল, তথাপি সমগ্রভাবে শান্তির শর্তাদি রাজ্যলাভের ব্যাপারে ইটালীকে হতাশ ও অসন্তুষ্ট করিয়াছিল। প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে গৃহীত আত্ম-নিয়ন্ত্রণ নীতির যথার্থ প্রয়োগ হইলে ব্রেনার (Brenner) সীমান্ত ইটালীর হস্তচ্যুত হইবার সম্ভাবনা ছিল। ব্রেনার সীমান্তে বহু জার্মান অধিবাসীদের বসবাস ছিল এবং 'এই সংখ্যালঘু জার্মানদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা ও অর্থনৈতিক স্বার্থ ইটালী রক্ষা

ইটালী ও শান্তির শর্তাদি

করিয়া চলিবে"—এইরূপ শর্তেই ইটালীকে ব্রেনার সীমান্ত প্রদান করা হইয়াছিল। ইটালীর মন্ত্রীদের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই মিত্রপক্ষ ইটালীকে কোনরূপ সংখ্যালঘু-সম্পর্কিত চুক্তি (Minorities Treaties)-তে আবদ্ধ করে নাই যাহা অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত করা হইয়াছিল। কিন্তু অন্যত্র উইলসনের নীতি প্রয়োগ করা হইলে ইটালীকে উহার দাবি সম্পর্কে হতাশ হইতে হইয়াছিল।

সুতরাং মুসোলিনী তথা ইটালীর পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য হইল উহার সম্প্রসারণ। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সকল সুযোগ লইয়া ইটালীর রাষ্ট্রীয় গৌরব বৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি স্থাপন করাই মুসোলিনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনী ঘোষণা করেন যে "ফ্যাসিস্ট ইটালীর প্রধানতম কর্তব্য হইল উহার পদাতিক, নৌ ও বিমানবাহিনীকে সকল সময়ের জন্য প্রস্তুত রাখা। এক মুহূর্তের মধ্যে আমরা যাহাতে পঞ্চাশ লক্ষ সৈন্যকে সামরিক সজ্জায় সজ্জিত করিতে পারি সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে···তাহা হইলেই আমাদের অধিকার ও দাবি স্বীকৃতি লাভ করিবে।"

সাম্রাজ্যবিস্তার-নীতি গ্রহণ ইহার কারণ

সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ নীতি অনুসরণ করিয়া সাম্রাজ্য-বিস্তার করাই ইটালীর পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য হইল। "I am all for motion" মুসোলিনীর এই স্বীকারোক্তির মধ্যেই মুসোলিনীর পররাষ্ট্রনীতির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যবিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপনের পশ্চাতে ইটালীর যুক্তি ছিল ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার স্থান সংকুলান। এতদ্ভিন্ন শিল্পোন্নয়নের জন্য ইটালীর কাঁচামালের প্রয়োজন ছিল। বিশ্বযুদ্ধের পর বহু রাষ্ট্রে বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশীদের আগমন নিষিদ্ধ হইলে ইটালীর জনসংখ্যার স্থান সংকুলানের সমস্যা জটিল হইয়া উঠে। মুসোলিনীর কথায় "We are hungry for land, because we are prolific and intend to remain so" (১৯২৬ খ্রীঃ)। বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় সকল রাষ্ট্র অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের জন্য শুল্ক-প্রাচীরের সৃষ্টি করিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মন্দীভূত হইয়া পড়ে এবং কাঁচামাল সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়ে। এই কারণে ইটালী নূতন করিয়া উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজন উপলব্ধি করে। ইটালীর উপনিবেশের সংখ্যা ছিল নিতান্তই অল্প এবং সেইগুলি উহার চাহিদা মিটাইবার পক্ষে মোটেই উপযোগী ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত ইটালী উহার জাতীয় রাষ্ট্র গঠনেই অধিক ব্যাপৃত ছিল। এই কারণে ইটালী অনেক বিলম্বেই ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগদান করিয়াছিল এবং অতি সামান্যই উহার ভাগ্যে জুটিয়াছিল। তথাপি লোহিত সাগরে অবস্থিত এরিত্রিয়া ও ভারত মহাসাগরে অবস্থিত সোমালিয়া এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সহিত যুদ্ধ করিয়া উত্তর-আফ্রিকার অন্তর্গত লাইবিয়া ইটালীর অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর উপনিবেশগুলি বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে বণ্টিত হইয়া গেলে ইটালীর ভাগে সামান্যই পড়িয়াছিল। এই কারণে ইটালী যুদ্ধের পুরস্কারস্বরূপ যাহা

পাইয়াছিল তাহা উহার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। এই সকল কারণে ইটালী শান্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া সাম্রাজ্যবিস্তারের নীতি গ্রহণ করে। সাম্রাজ্যবিস্তারের ব্যাপারে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ব্রিটেন ও ফ্রান্স। এতদ্ভিন্ন জার্মানী ও সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট হইতেও ইটালীর আশঙ্কার কারণ ছিল। এই কারণে ব্রিটেন ও ফ্রান্স উভয়কে পরস্পরের সহিত বিবাদে লিপ্ত করিয়া, ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে জার্মানীর বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিয়া এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীকে সম্মিলিতভাবে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিয়া ইটালী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য স্থাপন করার ও সাম্রাজ্যবিস্তার করার নীতি গ্রহণ করে।

ইটালীর পররাষ্ট্র-সম্পর্ক (Foreign Relations, 1922-1945): ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে পররাষ্ট্রক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ট সরকারের পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োগ শুরু হইল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্যারিস শান্তি-সম্মেলনের ব্যবস্থাদি ইটালীকে অসন্তুষ্ট করিয়াছিল। উইলসনের আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতি গ্রহণ করিয়া মিত্রপক্ষ ইটালীর সকল দাবি উপেক্ষা করিয়াছিল। ভূমধ্যসাগরে ইটালীর কর্তৃত্ব স্থাপনের দাবিতে ব্রিটেন ও ফ্রান্স আপত্তি করিয়াছিল এবং অছি-রাষ্ট্র লাভের ব্যাপারেও ইটালীকে বঞ্চিত করা হইয়াছিল। প্যারিসের চুক্তি অনুসারে ইটালীকে ব্রেনার গিরিপথের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল, ডালমাশিয়ার উপকূলে অবস্থিত ইস্ট্রিয়া, ট্রিয়েস্ট ও জারা এবং আদ্রিয়াটিক উপকূলের কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু আদ্রিয়াটিক উপকূলে অবস্থিত ফিউম (Fiume) নামক বন্দর লাভের ব্যাপারে ইটালীকে নিরাশ হইতে হইয়াছিল। এই বন্দরটি পাইবার পরিবর্তে ইটালীর তদানীন্তন সরকার যুগোশ্লাভিয়ার সহিত এক সন্ধি (Treaty of Rapallo, 1920) অনুসারে ফিউমের স্বাধীনতা স্বীকার করিলে ইটালীর জনগণ উহাদের সরকারের দুর্বলতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিল। আদ্রিয়াটিকের উত্তর উপকূলে অবস্থিত আলবানিয়ার ব্যাপারেও ইটালীকে নিরাশ হইতে হইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইটালীর সৈন্যবাহিনী আলবানিয়ায় প্রবেশ করিয়া তথায় ইটালীর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধশেষে আলবানিয়া হইতে সৈন্য অপসারণ করিয়া উহার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে ইটালীকে বাধ্য করা হইয়াছিল।

প্যারিসের চুক্তি ও ইটালীর অসন্তুষ্টি

একথা অনস্বীকার্য যে মুসোলিনীর একনায়কতন্ত্র শাসনের প্রথম দশকে ইটালীর আন্তর্জাতিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইটালীর পূর্বতন সরকারের অক্ষমতাহেতু ইটালী যে সকল ভূখণ্ড হারাইয়াছিল মুসোলিনী তাহা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(১) **ইটালী ও গ্রীস**: ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী ও গ্রীসের মধ্যে সম্পাদিত সন্ধি দ্বারা ইটালী ডাভিক্যানিজ দ্বীপপুঞ্জ গ্রীসকে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে লুসান-এর সন্ধি দ্বারা এই দ্বীপপুঞ্জের উপর ইটালীর কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইল। এই অঞ্চলে একটি শক্তিশালী নৌ-ঘাঁটি স্থাপিত হওয়ায় পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে ইটালীর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু সেই বৎসর গ্রীস ও আলবানিয়ার মধ্যে সীমানা নির্ধারণের তদন্তকার্যে নিযুক্ত কমিশনের কয়েকজন ইটালীয় সদস্য আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে ইটালী গ্রীসকে ইহার জন্য দায়ী করিল এবং ক্ষতিপূরণের জন্য গ্রীক সরকারের নিকট একটি চরমপত্র প্রেরণ করিল।

ইটালী ও গ্রীসের মধ্যে লুসানের সন্ধি (১৯২৩)

কিন্তু গ্রীক সরকার ক্ষতিপূরণ প্রদানে অসম্মত হইলে একদল ইটালীয় বাহিনী কর্ফু (Corfu) নামে গ্রীসের একটি দ্বীপ বোমা দ্বারা বিধ্বস্ত করিয়া তাহা দখল করিল। গ্রীস ইটালীর বিরুদ্ধে লীগ-অফ-নেশনস্-এ প্রতিবাদ জানাইল। লীগ-কাউন্সিলের ইটালীয় প্রতিনিধি গ্রীসের দাবি অগ্রাহ্য করিয়া এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, সীমান্ত সম্পর্কিত তদন্ত কমিশনই একমাত্র এই হত্যার ব্যাপারে তদন্ত করার অধিকারী। ইহার পর তদন্ত কমিশন হত্যার তদন্ত সম্পন্ন করিয়া গ্রীসের দেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত করিলেন। গ্রীস ইটালীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিলে ইটালীয় বাহিনী কর্ফু পরিত্যাগ করিল। এই সাফল্যের ফলে ইটালীর জাতীয়তাবাদীগণের নিকট মুসোলিনীর মর্যাদা অভাবনীয় ভাবে বৃদ্ধি পাইল।

কর্ফু ঘটনা

ইটালীর সাফল্য

(২) **ইটালী ও ফ্রান্স ঃ** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথম কয়েক বৎসর ইটালী ও ফ্রান্সের পরস্পর সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ল্যাংসাম (Langsam)-এর কথায় "The most threatening of Italy's foreign relations in the early post-war years were with France."

ইটালীতে মুসোলিনী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে ইটালী ও ফ্রান্স পরস্পরবিরোধী দলে যোগদান করে। ফ্রান্সের সহিত ইটালীর বিরোধের কারণ ছিল নিম্নরূপ ঃ প্রথমতঃ, ফ্রান্স ও ইটালীর রাষ্ট্রীয় আদর্শ ছিল পরস্পরবিরোধী। ফ্রান্স ছিল গণতন্ত্রের উগ্র সমর্থক ও ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের প্রতি অনুগত। অপরদিকে ফ্যাসিবাদী ইটালী ছিল রাষ্ট্রের সর্বাত্মক ক্ষমতার উগ্র সমর্থক ও গণতান্ত্রিক আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্স ফ্যাসিবাদ-বিরোধী বহু ইটালীয়কে ফ্রান্সে আশ্রয় দান করিয়া এবং উহাদিগকে ফরাসী নাগরিকত্ব গ্রহণে উৎসাহিত করা স্বভাবতঃই ফ্রান্সের সহিত ফ্যাসিবাদী ইটালীর সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। তৃতীয়তঃ, ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত কর্সিকা, স্যাভয় ও নীস ফ্যাসিস্ট সরকার আইনতঃ ইটালীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবি করিতেছিলেন। চতুর্থতঃ, ইটালী ভূমধ্যসাগরে ফ্রান্সের প্রতিপত্তির বিরোধিতা করিয়া সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর তাঞ্জিয়ার দাবি করিতেছিল। পঞ্চমতঃ, প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে ইটালীর 'ন্যায্য

ইটালী ও ফ্রান্সের মধ্যে বিবাদের কারণ

অধিকার' উপেক্ষিত হইবার জন্য ইটালী ফ্রান্সকে দায়ী করিয়াছিল। ষষ্ঠতঃ, পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের কর্তৃত্ব ও নৌ-বাহিনী গঠন করার ব্যাপারে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্ভব হইয়াছিল। ওয়াশিংটন বৈঠক (১৯২১-২২ খ্রীঃ), জেনিভা-বৈঠক (১৯২৭ খ্রীঃ) ও লণ্ডন বৈঠকে (১৯৩০ খ্রীঃ) উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধের উদ্ভব হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে লণ্ডন বৈঠকে ইটালী নৌ-শক্তির ব্যাপারে ফ্রান্সের সমপরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সাজসরঞ্জামের দাবি করিলে বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সপ্তমতঃ, টিউনিসিয়ায় ফরাসীদের তুলনায় ইটালীয় অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল বেশী। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠতার যুক্তিতে ফ্যাসিস্ট সরকার টিউনিসিয়ার উপর ইটালীর কর্তৃত্বের দাবি করিয়াছিলেন। অষ্টমতঃ, ১৯২২ হইতে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইটালী ক্রমাগত শান্তির শর্তাদি পুনর্বিবেচনার দাবি করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্স এই দাবির বিরোধিতা করিতে থাকিলে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপের কর্তৃত্ব লইয়া ইটালী ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ইটালী ও ফ্রান্সের পরস্পরবিরোধের উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপের কর্তৃত্ব লইয়া ইটালী ও ফ্রান্সের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্ভব হইয়াছিল। এই কারণে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ইটালী ও ফ্রান্স পরস্পরবিরোধী মৈত্রীজোট গঠনে যত্নবান হয়। দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি ফ্রান্স কিংবা ইটালীর সহিত মিত্রতা স্থাপনে আগ্রহী ছিল বটে, কিন্তু ফ্রান্স কিংবা ইটালীর প্রভুত্ব গ্রহণে উহারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। যাহা হউক, প্রথমদিকে মৈত্রীজোট গঠনের প্রতিযোগিতায় ইটালী ফ্রান্সের তুলনায় অধিক সাফল্য লাভ করে।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের প্রতি ইটালীর সমর্থন

ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিবাদে ইটালী ব্রিটেনের পক্ষ অবলম্বন করিল। ব্রিটেনের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যও ইটালীর প্রয়োজন ছিল। সুতরাং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত সমস্যার আলোচনায় ইটালী ব্রিটেনকে সমর্থন করিয়া যাইতে লাগিল।

হিটলারের অভ্যুত্থানে ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন

কিন্তু ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে ফ্রাংকো-ইটালীয় সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিল। নাৎসীবাদের আক্রমণাত্মক মনোভাব ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত করিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও ইটালী একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। ইহার শর্তানুসারে উভয়ের মধ্যে উপনিবেশ সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের অবসান হইল এবং নাৎসী জার্মানী অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা বিপন্ন করিলে উভয়ে পরস্পরের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে প্রতিশ্রুত রহিল। ইহা ভিন্ন ফ্রান্স উহার আফ্রিকাস্থ সাম্রাজ্যের কিছু অংশ ইটালীকে সমর্পণ করিল এবং টিউনিসিয়ায় ইটালীয়দের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে মীমাংসা হইল।

কিন্তু ইটালীর ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া) অভিযান ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত করিয়া তুলিল। কারণ (১) লীগ-কাউন্সিল ইটালীকে 'আক্রমণকারী' বলিয়া অভিযুক্ত করিলে ফ্রান্স তাহাতে বাধা প্রদান করে নাই এবং (২) লীগ-কাউন্সিল ইটালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করিলে ফ্রান্স তাহা সমর্থন করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাৎসী জার্মানীর ভয়ে ফ্রান্স ও ব্রিটেন ইটালীর প্রতি তোষণনীতি গ্রহণ করিল এবং এমন কি ইথিওপিয়ার এক-তৃতীয়াংশ ইটালীকে উপহার দেওয়ার পরিকল্পনাও গৃহীত হইল।

ইটালীর প্রতি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের তোষণনীতি

ইতিমধ্যে জার্মানী ও ইটালীর মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইলে ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে পরস্পর সম্পর্কের অবনতি ঘটিল। কারণ জার্মানী ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিপন্ন করিয়া তুলিতে লাগিল এবং ইটালী ভার্সাই-সন্ধি লঙ্ঘন করার জন্য জার্মানীকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। ইহা ভিন্ন ইটালী পুনরায় কর্সিকা, স্যাভয় ও নীসের উপর উহার দাবি উপস্থাপিত করিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স জার্মানীর দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইটালী জার্মানীর সহিত যোগদান করিল।

ফ্রান্কো ইটালীর সম্পর্কের অবনতি

(৩) **ইটালী ও যুগোশ্লাভিয়া :** ইটালী ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে বিবাদের কারণ হইল প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে ইটালী কর্তৃক অধিক পরিমাণে রাজ্যাংশ লাভের দাবি। লণ্ডনের গোপনচুক্তি (১৯১৫ খ্রীঃ) অনুসারে আদ্রিয়াটিক অঞ্চলের এক বৃহৎ অংশ ইটালীকে সমর্পণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই অঞ্চলের দক্ষিণ টাইরল, ট্রিয়েস্ট ও ইস্ট্রিয়া প্রভৃতি স্থানে অ-ইটালীয় অধিবাসীগণ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং উইলসনের আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতি অনুসারে এই সকল স্থান ইটালীকে সমর্পণ করার পক্ষে অসুবিধা ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ঘোষণা করিল যে লণ্ডনের গোপন-চুক্তি অনুসারে মিত্রপক্ষ আদ্রিয়াটিকের এক বৃহৎ অংশ ইটালীকে সমর্পণ করিতে বাধ্য।

ইটালী উইলসনের আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির ভিত্তির উপর ফিউম বন্দরটি দাবি করিল। কিন্তু ফিউম ইটালীকে সমর্পণ করিলে যুগোশ্লাভিয়ার জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। ইহা ভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক দিয়া যুগোশ্লাভিয়ার নিকট ফিউম ছিল অপরিহার্য। প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে ইটালী ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে ফিউম সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা সম্ভব না হইলে মিত্রপক্ষ উহার মীমাংসার দায়িত্ব ইটালী ও যুগোশ্লাভিয়ার হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছিল।

ইটালী লীগ-চুক্তিপত্রের শর্তাদি অমান্য করিয়া যুগোশ্লাভিয়ার প্রতি বলপ্রয়োগের নীতি গ্রহণ করিল এবং ইহার ফলে লীগের অন্যতম সদস্য-শক্তির সহিত

লীগের প্রথম সংঘর্ষ বাধিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইটালী ফিউম আক্রমণ করিয়া তাহা দখল করিল। কিন্তু পরবৎসর ইটালী ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে সম্পাদিত র‍্যাপালো-সন্ধি (Treaty of Rapallo) অনুসারে ফিউম উন্মুক্তনগর (Free city) হিসাবে স্বীকৃত হইল।

র‍্যাপালো সন্ধি (১৯২০)

কিন্তু ইটালী ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে মিত্রতা স্থায়ী হইল না। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে যুগোশ্লাভিয়া ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলে মুসোলিনী ইহার প্রত্যুত্তরে আলবানিয়ার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলেন। মুসোলিনীর উদ্দেশ্য ছিল আলবানিয়ার উপর ইটালীর পূর্বতন কর্তৃত্ব পুনঃস্থাপন করা। ইতিমধ্যে নেটিউনো-চুক্তির (১৯২৫) বিরুদ্ধে যুগোশ্লাভিয়ায় এক দারুণ বিক্ষোভের উদ্ভব হইল এবং ইটালী-বিরোধী দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হইল। যুগোশ্লাভদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইল যে ইটালী যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিবেশী দেশ-গুলির সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যুগোশ্লাভিয়াকে পরিবেষ্টিত করার চেষ্টা করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে যুগোশ্লাভিয়ার সন্দেহের কারণও ছিল। সুতরাং আলবানিয়ার উপর ইটালীর প্রভাব বিস্তৃত হইলে ইটালী-যুগোশ্লাভ সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠিল। এই কারণে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে (১৯২৯ খ্রীঃ) উহা নূতন করিয়া আর স্বাক্ষরিত হইল না। যাহা হউক, যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে ইটালীর কূটনৈতিক সাফল্য ঘটিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত নেটিউনো-চুক্তির অন্তর্গত ফিউম, জারা ও ডালমাশিয়া সম্পর্কিত শর্তাদি এযাবৎ যুগোশ্লাভিয়া অনুমোদন করার ক্ষেত্রে বিরোধিতা করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু অধিক দিন পর্যন্ত ইটালীর দাবি উপেক্ষা করিয়া চলিবার মত ক্ষমতা যুগোশ্লাভিয়ার ছিল না। ইটালী ও তুরস্কের মধ্যে চুক্তি এবং ইটালী ও গ্রীসের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হইলে যুগোশ্লাভিয়ার পক্ষে ইটালীর দাবি উপেক্ষা করা সম্ভব হইল না। অবশেষে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর সহিত সালোনিকা অঞ্চল (Salonika zone) সম্পর্কিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া যুগোশ্লাভিয়া উহার দাবি পরিত্যাগ করিল।

পুনরায় ইটালী-যুগোশ্লাভ সম্পর্কের অবনতি

ইটালীর বিরুদ্ধে যুগোশ্লাভিয়ার অভিযোগ

যুগোশ্লাভিয়া কর্তৃক ইটালীর দাবি স্বীকৃত

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে যুগোশ্লাভিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার ও ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বার্থো (Barthou) মার্শাই (Marseilles) বন্দরে জনৈক আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে ইটালী ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে শত্রুতা পুনরায় চরমে আসিয়া পৌঁছিল। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য যুগোশ্লাভিয়া ইটালীকে দায়ী করিল। যুগোশ্লাভ সরকার এই ব্যাপারটি লীগ-অফ্-নেশন্‌-এ উপস্থাপিত করার জন্য মনস্থ করিলে ফরাসী

মার্শাই হত্যাকাণ্ড

সরকারের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তাহা করা হইল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি ইটালী ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে সম্পর্কের কোনরূপ উন্নতি হয় নাই।

(৪) **ইটালী ও আবিসিনিয়া** (Italy and Abyssinia): পূর্বে ফ্রান্স ও ব্রিটেন আবিসিনিয়ায় ইটালীর স্বার্থ স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত ত্রি-শক্তি চুক্তি (Tripartite Agreement) অনুসারে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটালী আবিসিনিয়ার রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত ছিল। সুতরাং দক্ষিণপূর্ব ইওরোপ ও আফ্রিকায় ইটালীর সম্প্রসারণের পথে ফ্রান্স ছিল প্রধান অন্তরায়। অপরদিকে হিটলারের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা দানিয়ুব অঞ্চলে ইটালীর আধিপত্য স্থাপনের পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। সুতরাং ফ্রান্সের মনে জার্মানী সম্পর্কে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া আবিসিনিয়ার ব্যাপারে উহার সমর্থনলাভ করার প্রয়োজন দেখা দিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইটালী ও ফ্রান্সের মধ্যে বহুবিধ কারণে বিবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পর হইতে হিটলারের অস্ট্রিয়া-গ্রাস নীতি ইটালী ও ফ্রান্সের উদ্বেগের কারণ হইল। এতদ্ভিন্ন বল্কান ও আলবানিয়ায় ইটালীর ও জার্মানীর স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী ছিল। জার্মানীকে বাধা দেওয়ার জন্য ইটালীর পক্ষে ফ্রান্সের মিত্রতা অর্জন করা প্রয়োজন হইল। অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতার ব্যাপারে ইটালী ও ফ্রান্সের স্বার্থ সমানভাবে জড়িত ছিল। সুতরাং, জার্মানীর রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন এবং হিটলারের অস্ট্রিয়া-গ্রাস নীতি এবং ফ্রান্সের নাৎসী-জার্মানভীতি ইটালী ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লাভাল-মুসোলিনী চুক্তি (Laval-Mussolini Pact) স্বাক্ষরিত হইল। ইহার শর্তানুসারে (১) উভয় রাষ্ট্র জার্মানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা করার ব্যাপারে পরস্পরের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে সম্মত হইল; (২) ফ্রান্স ইটালীকে লাইবিয়ার সহিত সংলগ্ন প্রায় ৪৫ হাজার স্কোয়ার মাইল ভূখণ্ড এবং এরিত্রিয়ার সহিত সংলগ্ন ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের কিছু অংশ সমর্পণ করিল; (৩) ফ্রান্স ইটালীকে আদ্দিস-আবাবা (আবিসিনিয়ার রাজধানী) রেলপথের কিছু অংশ সমর্পণ করিল; (৪) ফ্রান্স টিউনিসিয়ার ইটালীয়গণকে বিশেষ নাগরিক অধিকার ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা মঞ্জুর করিল। এতদ্ভিন্ন লাভাল গোপনে মুসোলিনীর আবিসিনিয়া অভিযানে সমর্থন জানাইলেন। এযাবৎ ফ্রান্স ইটালীর অগ্রসরনীতির প্রধান অন্তরায় ছিল। কিন্তু হিটলারের সমরবাদী নীতি ফ্রান্সকে ইটালীর সহিত এক আপোস-মীমাংসায় আসিতে বাধ্য করিল। ইতিমধ্যে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ গণভোটের দ্বারা সার (Saar) জার্মানীর সহিত সংযুক্ত হইল এবং ১৬ই মার্চ হিটলার ভার্সাই-সন্ধির সামরিক শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনী গঠনের নীতি গ্রহণ করিলেন। হিটলারের

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত ত্রি-শক্তি চুক্তি

লাভাল-মুসোলিনী চুক্তি (১৯৩৫)

স্ট্রেসা-সম্মেলন

এই সকল কার্যকলাপ রোম, প্যারিস ও লণ্ডনে উদ্বেগের সৃষ্টি করিল। স্ট্রেসা-সম্মেলনে (Stressa Conference) হিটলারের কার্যাদির তীব্র সমালোচনা করা হইল এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে সাহায্য করার বিনিময়ে ইটালীকে আবিসিনিয়া দখল করার আশ্বাস দেওয়া হইল। সেই বৎসর মে মাসে ফ্রান্স ও চেকোশ্লোভাকিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত সন্ধি করিল এবং এইভাবে পূর্ব লোকার্নো সন্ধি (Eastern Locarno) সম্পাদিত হইল। সুতরাং ইওরোপে জার্মানী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং ইটালী জার্মান-বিরোধী দলে যোগদান করিল।

এইস্থলে স্মরণ রাখা দরকার যে, বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ইটালী শান্তিপূর্ণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে আবিসিনিয়ায় স্বীয় প্রভাব স্থাপন করিতে যত্নবান হইয়াছিল। ব্রিটেনের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইটালীর অনুমোদনক্রমেই আবিসিনিয়া লীগ-অফ-নেশনস্-এর সদস্যপদ লাভ করিয়াছিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী ও ব্রিটেন আবিসিনিয়ায় উহাদের স্ব স্ব 'প্রভাবিত অঞ্চল' (sphere of influence) সৃষ্টি করার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু আবিসিনিয়া লীগ-অফ-নেশনস্-এ আবেদন জানাইয়া ইটালী ও ব্রিটেনের চেষ্টা ব্যর্থ করিতে সক্ষম হয়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী শান্তিপূর্ণভাবে উহার স্বার্থরক্ষার্থে আবিসিনিয়ার সহিত সন্ধি করিল। ইহার দ্বারা উভয় রাষ্ট্র পরস্পরের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইল এবং সকল বিবাদ সালিসির মাধ্যমে মীমাংসা করিতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে জার্মানী আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করিলে ইটালীর উদ্বেগের কারণ হইল। অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বিপর্যয়, জার্মানীর আক্রমণাত্মক নীতি প্রভৃতি কারণে ইটালী আবিসিনিয়া সম্পর্কে নীতির পরিবর্তন করিয়া উহা দখল করিতে উদ্যোগী হইল।

আবিসিনিয়ার উপর ইটালীর প্রতিপত্তি স্থাপনের পূর্ববর্তী চেষ্টা

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর ওয়াল ওয়াল (Wal Wal) নামক স্থানে ইটালী ও আবিসিনিয়ার সেনাবাহিনীর মধ্যে এক সংঘর্ষ ঘটিলে ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণের অজুহাত পাইল। আবিসিনিয়া ওয়াল ওয়াল ঘটনাটি লীগ-কাউন্সিলে উপস্থাপিত করিয়া সালিসির জন্য আবেদন জানাইল এবং কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্মত রহিল। কিছুদিন অনমনীয়ভাব অবলম্বন করার পর ইটালী আবিসিনিয়ার প্রস্তাবে সম্মত হইল। লীগ-কাউন্সিল ঘোষণা করিল যে প্রস্তাবিত সালিসি-কমিশন (Arbitration Commission) ওয়াল ওয়াল ঘটনার দায়িত্ব নির্ণয় করিবে, কিন্তু ওয়াল ওয়াল বস্তুতঃ পক্ষে বিবদমান রাষ্ট্রদ্বয়ের কাহার অন্তর্ভুক্ত সেই বিষয়ে তদন্তের কোন অধিকার কমিশনকে দেওয়া হইল না। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া কমিশন ঘোষণা করিল যে, যেহেতু বিবদমান রাষ্ট্রদ্বয় ওয়াল ওয়াল অঞ্চলটিকে স্ব স্ব রাজ্যভুক্ত বলিয়া মনে করিত, সুতরাং সেইক্ষেত্রে উক্ত ঘটনার জন্য কোন পক্ষকে দায়ী করা যায় না। ইতিমধ্যে লীগ

ইটালীর আবিসিনিয়া অভিযান

কভেনেণ্টের ১০,১১ ও ১৫নং বিধি অনুসারে আবিসিনিয়া লীগ-কাউন্সিলের নিকট কয়েকবার আবেদন করিল এবং ইটালীও যুদ্ধের জন্য সামরিক প্রস্তুতি শুরু করিল।

ইতিমধ্যে লীগ-কাউন্সিলের প্রস্তাবানুসারে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটালীর প্রতিনিধিগণ প্যারিসে এক বৈঠকে মিলিত হইয়া আবিসিনিয়া সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করিতে যত্নবান হইলেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্স আবিসিনিয়ার সম্রাট হেইল-সেলেসি-র (Hail Salassie) অনুমোদন সাপেক্ষে আবিসিনিয়ায় ইটালীকে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানে সম্মত হইল। মুসোলিনী এই প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া আবিসিনিয়ার পূর্বাংশ ইটালীর অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

লীগ-কাউন্সিলের মধ্যস্থতায় প্যারিস বৈঠক

সুতরাং লীগ-কাউন্সিল মুসোলিনীর মনোভাব উপলব্ধি করিয়া পুনরায় ফ্রান্স, ব্রিটেন, পোল্যাণ্ড, স্পেন ও তুরস্কের প্রতিনিধিগণকে লইয়া অপর একটি কমিটি নিযুক্ত করিল। ইটালী আবিসিনিয়ার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ বন্ধ করিতে অসম্মত হইল। অপরদিকে হেইল সেলেসি নিরপেক্ষ দর্শক নিযুক্ত করার যে প্রস্তাব করেন তাহা লীগ-কাউন্সিল কার্যকর করিতে মোটেই উৎসাহী হইল না। ইটালীর বিরুদ্ধে ব্রিটেন অনমনীয় মনোভাব অবলম্বন করিল। ব্রিটেন এইরূপ আশংকা করিল যে ইটালীর আবিসিনিয় অভিযান সফল হইলে (১) লোহিত সাগরের উপকূলে ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় ব্রিটেনের আধিপত্য বিনষ্ট হইবে, (২) সমগ্র ব্রিটিশ অধিকৃত আফ্রিকায় ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিবে এবং (৩) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইটালী সাম্রাজ্যবিস্তারে অধিকতর উৎসাহী হইবে।

লীগ-কাউন্সিল কর্তৃক কমিশন নিয়োগ

ইটালীর সাম্রাজ্যবাদী নীতি সম্পর্কে ব্রিটেনের আশঙ্কা

অপরদিকে ফ্রান্স আবিসিনিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উৎসাহিত ছিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে জার্মানীর বিরুদ্ধে ব্রিটেন ও ইটালীর সহযোগিতালাভেও অধিকতর উৎসুক ছিল। এতদ্ভিন্ন ফ্রান্স লীগ-অফ-নেশনস্-এর মর্যাদা রক্ষা করিতে এবং উহার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ভূমধ্যসাগরে ব্রিটেনের নৌ-শক্তিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতেও আগ্রহী ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোর এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদানে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলে ফ্রান্স লণ্ডন ও রোম সরকারকে সন্তুষ্ট করিতে পারে এমন একটি পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়া যাইতে লাগিল।

ফ্রান্সের মনোভাব

ইতিমধ্যে লীগ-কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি আন্তর্জাতিকভাবে আবিসিনিয়ার উন্নয়ন সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিল এবং তথায় ইটালীর 'বিশেষ-স্বার্থ' স্বীকার করিয়া লইল হেইল সেলিসী এই পরিকল্পনায় সম্মত হইলেন, কিন্তু মুসোলিনী তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। এই অবস্থায় লীগ-কাউন্সিল ১৫ জন

ইটালী কর্তৃক লীগ-কাউন্সিলের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যাত

সদস্যকে লইয়া (ইটালীকে বাদ দিয়া) অপর একটি কমিটি গঠন করা স্থির করিল। কাউন্সিলের বৈঠক শুরু হইলে ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করিল (১৯৩৫ খ্রীঃ)। কাউন্সিল ইটালীকে যুদ্ধাপরাধী বলিয়া ঘোষণা করিল। কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত লীগের সাধারণ এ্যাসেমব্লির নিকট উপস্থাপিত করা হইলে এ্যাসেমব্লি ইটালীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করিল। এই সুপারিশগুলির মধ্যে ছিল ইটালীর সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিন্ন করা; ইটালীকে ঋণদান বন্ধ করা এবং প্রয়োজনবোধে উহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা। এই সুপারিশগুলি লীগ-কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্য কর্তৃক গৃহীত হইলে সেইগুলি ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর হইতে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল।

ইটালী কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণ (১৯৩৫)

ইটালীর বিরুদ্ধে লীগ-কাউন্সিলের সুপারিশ

লীগ-এ্যাসেমব্লির সুপারিশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ইটালী লীগের সদস্যগণকে সতর্ক করিয়া দিল। এইভাবে শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লীগের বলপ্রয়োগ ক্ষমতার প্রথম পরীক্ষা শুরু হইল। কিন্তু বস্তুতঃ ইটালীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব হইল না। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনের নূতন পররাষ্ট্র-সচিব ইডেন ইটালীতে তৈল রপ্তানি বন্ধ করার প্রস্তাব করিলে ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্লাঁদি (Flandin) ইহার বিরোধিতা করিলেন এবং ইটালীর সহিত আপোস-মীমাংসার জন্য চাপ দিলেন। ইতিমধ্যে হিটলার রাইন অঞ্চলে সামরিক প্রস্তুতি শুরু করিলে ইটালীর বিরুদ্ধে তৈল অবরোধ সম্পর্কিত আলোচনা বন্ধ হইল।

ইওরোপে যখন এই সকল ঘটনা ঘটিতেছিল সেই সময় ধীর গতিতে ইটালীর আবিসিনিয়া অভিযানও চলিতেছিল। আবিসিনিয়গণ সম্মুখযুদ্ধের পরিবর্তে ইটালীয় বাহিনীর অগ্রগতিতে বাধাপ্রদান করিতে লাগিল। অবশেষে সাত মাস যুদ্ধ চলিবার পর ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ইটালীয় বাহিনী আবিসিনিয়ার রাজধানী আদ্দিস-আবাবায় প্রবেশ করিল। হেইল-সেলিসি একটি ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজে ইওরোপের পথে পলায়ন করিলেন এবং ইটালী আবিসিনিয়া স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইল। সম্রাট ভিক্টর ইমানুয়েল 'আবিসিনিয়ার সম্রাট' উপাধি গ্রহণ করিলেন।

ইটালীর বাহিনী কর্তৃক আবিসিনিয়া দখল (১৯৩৬)

এইভাবে ফ্যাসিস্ট ইটালীর গৌরব ও সামরিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য মুসোলিনী যে যুদ্ধের সূত্রপাত করিয়াছিলেন তাহার অবসান ঘটিল। অবশ্য আবিসিনীয়গণ বিচ্ছিন্নভাবে ইটালীকে বাধাপ্রদান করিয়া যাইতে লাগিল। ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রবর্গ ইটালীর এই নূতন সাম্রাজ্যকে ক্রমশঃ স্বীকার করিয়া লইল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের পরোক্ষ সমর্থনে উৎসাহিত হইয়া লীগ-অফ-নেশনস্-এর সদস্যপদ পরিত্যাগ করিল।

ইটালীর প্রতি ইওরোপের সমর্থন

(৫) **ইটালী ও আলবানিয়া** (Italy and Albania): ১৯১২ ও ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত দুইটি বল্কান যুদ্ধের ফলে নূতন আলবানিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। জনৈক জার্মান প্রিন্স উইলিয়াম ওয়াইড (William Wied) আলবানিয়ার অধিনায়কপদে নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনি আলবানিয়ার দুর্ধর্ষ অধিবাসীগণকে দমন করিয়া সুষ্ঠুভাবে রাজ্যশাসন করিতে সক্ষম হন নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে তিনি জার্মানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধের সময় সরকারীভাবে আলবানিয়া নিরপেক্ষ থাকিলেও অস্ট্রিয়া, ইটালী ও সার্বিয়া আলবানিয়াকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিল। প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে ইটালী আলবানিয়ার উপর অছি-শাসনের (mandate) অধিকার দাবি করিয়াছিল, কিন্তু উইলসন উহার বিরোধিতা করিয়া আলবানিয়ার অধিবাসীগণকে উহাদের মনোনীত সরকার গঠন করার অধিকার দান করেন।

আলবানিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি
প্যারিস শান্তি-সম্মেলন ও আলবানিয়া

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আলবানিয়ায় একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়। সেই বৎসর আলবানিয়া লীগ-অফ-নেশনস্-এর সদস্যপদ লাভ করে। কিন্তু আলবানিয়ার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতে থাকিলে সেই সুযোগে আহম্মদ জগু (Ahmed Zogu) নামক জনৈক মুসলমান যুবক ক্ষমতা দখল করেন (১৯২২ খ্রীঃ)। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশপ নোলি (Bishop Noli) আহম্মদ জগুকে দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। কিন্তু নোলি শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে অসমর্থ হইলে আহম্মদ জগু পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নোলি ইটালীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একমাস পর আলবানিয়ায় প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা করা হয় এবং জগু জাতীয় পরিষদ কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের সভাপতি নির্বাচিত হন।

আলবানিয়ার শাসন পরিবর্তন

জগু স্বীয় ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হন। কিন্তু শীঘ্রই অর্থের জন্য তাঁহাকে ইটালীর শ্বারস্থ হইতে হয়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর চেষ্টায় আলবানিয়ার জাতীয় ব্যাংক স্থাপিত হয়। অনতিকাল মধ্যেই আলবানিয়ার বাণিজ্য-শুল্কের বিনিময়ে ইটালী প্রচুর ঋণ সরবরাহ করে। এইভাবে ইটালী আলবানিয়ার উপর আধিপত্যের সুযোগ পায় এবং অট্রান্টো (Otranto) প্রণালীটি ইটালীর কর্তৃত্বাধীনে আসে। ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইতে পারে এই আশঙ্কায় যুগোশ্লাভিয়া ইটালীর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

আলবানিয়ায় ইটালীর প্রভাব বিস্তার

১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইটালীর সহযোগিতায় আলবানিয়ায় বহুবিধ অভ্যন্তরীণ উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা কার্যকর হয় এবং ইটালীর সামরিক কর্মচারীগণ আলবানিয়ার সৈন্যবাহিনী নূতনভাবে গঠন করেন। ইতিমধ্যে আলবানিয়ায় এক বিদ্রোহের সূচনা হইলে জগু পুনরায় ইটালীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফলে দুই

ইটালী ও আলবানিয়ার মধ্যে টিরানার সন্ধি (১৯২৬)

রাষ্ট্রের মধ্যে টিরানার সন্ধি (Treaty of Tirana) স্বাক্ষরিত হয়। ইহার শর্তানুসারে স্থির হয় যে আলবানিয়ার উপর কোন বিদেশী আক্রমণ ইটালী ও আলবানিয়া তাহা যুগ্মভাবে প্রতিহত করিবে এবং আলবানিয়ার সম্মতিক্রমে ইটালী আলবানিয়ার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে।

টিরানার সন্ধি যুগোশ্লাভিয়ার আশংকার কারণ হয়। আলবানিয়ার উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া ইটালী যুগোশ্লাভিয়ার স্বার্থ বিপন্ন করিয়া তুলিবে —যুগোশ্লাভ সরকার এইরূপ আশংকায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। ইটালী আলবানিয়ার পক্ষ সমর্থন করিলে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে। যাহা হউক, কয়েকটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় বিবাদের অবসান হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে যুগোশ্লাভিয়া নিজের শক্তিবৃদ্ধির জন্য ফ্রান্সের মিত্রতালাভে যত্নবান হয়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে যুগোশ্লাভিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। ইহার প্রত্যুত্তরে বিশ বৎসরের জন্য ইটালী ও আলবানিয়ার মধ্যে পরস্পর আত্মরক্ষামূলক সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

যুগোশ্লাভিয়ার আশংকা

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে জগ্ নিজেকে আলবানিয়ার সম্রাট-পদে অধিষ্ঠিত করিয়া প্রথম 'জগ্' (Jog I) উপাধি ধারণ করেন। ইহার পর হইতে আলবানিয়ার ইটালী-বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই অবস্থায় ইটালী ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আলবানিয়া আক্রমণ করিয়া টিরানায় প্রবেশ করে। সম্রাট জগ্ সপরিবারে পলায়ন করেন এবং ইটালীর সহিত আলবানিয়ার সংযুক্তি সম্পন্ন হয়। ভিক্টর তৃতীয় ইমানুয়েল ইটালীর রাজা এবং আবিসিনিয়া ও আলবানিয়ার সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হন।

ইটালীর আলবানিয়া অভিযান, ইটালী-আলবানিয়া সংযুক্তি

(৬) স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে ইটালীর হস্তক্ষেপ (Italy's intervention in the Spanish Civil War): ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে অন্তর্বিপ্লব শুরু হয়। জার্মানী ও ইটালী উপলব্ধি করে যে, স্পেনে ফ্যাসিস্ট শক্তি সাফল্য লাভ করিলে তাহা প্রত্যক্ষভাবে জার্মানী ও ইটালীকে সাহায্য করিবে, কিন্তু তথায় বিপ্লববাদী আদর্শের সাফল্য ঘটিলে তাহা ফ্রান্স ও সোভিয়েট রাশিয়ার অনুকূল হইবে। ইহা ছাড়া, ইটালীর প্রতি মিত্রভাবাপন্ন স্পেনের ফ্যাসিস্ট দলের সাফল্য ঘটিলে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে ইটালীর প্রতিপত্তি স্থাপনের যথেষ্ট সম্ভাবনাও ছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে স্পেনের বামপন্থী দলগুলি নির্বাচনে সাফল্য লাভ করিলে মুসোলিনী হিটলারের নিকট স্পেনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মুসোলিনী ও হিটলার ফ্রাঙ্কোকে সামরিক সাহায্য দান করেন। ইতিমধ্যে ইওরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গসহ ২৭টি ইওরোপীয় রাষ্ট্র স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে না-হস্তক্ষেপ নীতি (Policy of non-intervention) গ্রহণ করে। কিন্তু এই নীতি ইটালী ও জার্মানী কার্যতঃ পালন করিল না। যাহা হউক, অন্তর্বিপ্লবের অবসানের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইটালী ও জার্মানী স্পেন হইতে উহাদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রত্যাহার করিয়া লয়।

১৪.৬. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : ইটালী ও জার্মানী (World War II : Italy and Germany) : জার্মানীর সহিত সামরিক-সন্ধি স্বাক্ষরিত হইলেও পোল্যাণ্ডের প্রশ্ন মুসোলিনীকে উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে। তিনি জানিতেন যে, চারি বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা ইটালীর ছিল না এবং পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে পশ্চিম-ইওরোপ কোনমতেই জার্মানীর দাবিতে স্বীকৃত হইবে না। তিনি পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে হিটলারকে সংযত রাখিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। ইতিমধ্যে ২৪শে আগস্ট (১৯৩৯ খ্রীঃ) রুশ-জার্মান চুক্তি (Russo-German Pact) স্বাক্ষরিত হয়। ২৫শে আগস্ট হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই দিন ইঙ্গ-পোল (Anglo-Polish) সন্ধিও স্বাক্ষরিত হয়। এই অবস্থায় মুসোলিনী হিটলারকে জানাইলেন যে যদি জার্মানীর পোল্যাণ্ড অভিযান আঞ্চলিকভাবে সীমাবদ্ধ রাখা হয় তাহা হইলে ইটালী জার্মানীকে সাহায্য করিবে; কিন্তু পোল্যাণ্ডের মিত্রবর্গ জার্মানীর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালাইলে ইটালী নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবে। এতদ্ভিন্ন মুসোলিনী পোল্যাণ্ড অভিযানের পূর্বে জার্মানীর নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে তৈল, কয়লা, ইস্পাত, রবার ও অন্যান্য বহুবিধ কাঁচামাল দাবি করেন। ২৬শে আগস্ট মুসোলিনী পুনরায় হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণ নিবারণ করার চেষ্টা করেন। ইহাতে হিটলার অসন্তুষ্ট হন, তথাপি তিনি ইটালীর না-হস্তক্ষেপ নীতিতে সম্মত হইয়া ইটালীর নিকট হইতে কিছুসংখ্যক শিল্পী ও কৃষি শ্রমিক সাহায্য চাহিলেন। ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৩৯ খ্রীঃ) জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিল। ২রা সেপ্টেম্বর মুসোলিনী হিটলারকে জানাইলেন যে জার্মানবাহিনীর অগ্রগতি বন্ধ করিলে পশ্চিম-ইওরোপ জার্মানীর সহিত আলাপ-আলোচনায় যোগদান করিবে। ব্রিটিশ ও ফরাসী কর্তৃপক্ষ জার্মান তোষণ-নীতিতে ব্যর্থ হইয়া অবশেষে ঘোষণা করেন যে পোল্যাণ্ডের সীমান্ত হইতে জার্মানবাহিনী অপসারণ করা হইলে ইটালীর মধ্যস্থতা গ্রহণে তাঁহারা সম্মত হইবেন। হিটলার এই প্রস্তাবে অসম্মত হন। ফলে ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

হিটলারের আক্রমণাত্মক নীতিতে মুসোলিনীর উদ্বেগ

মুসোলিনী কর্তৃক হিটলারকে সংযত করার চেষ্টা

হিটলারের নিকট ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃপক্ষের প্রস্তাব

মুসোলিনী হিটলারের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। হিটলারের পোল্যাণ্ড অভিযানের সাফল্য, রাশিয়ার সহিত তাঁহার চুক্তি স্থাপন এবং রাশিয়ার ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ প্রভৃতি ঘটনা মুসোলিনীকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। অপরদিকে ইটালী সহযোগিতা না করায় জার্মানীও ইটালীর উপর অসন্তুষ্ট হইল। দক্ষিণ টাইরলের প্রশ্ন লইয়া ইটালী ও জার্মানীর মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হইল, কারণ টাইরলের জার্মান অধিবাসীগণ জার্মানীর সহিত সংযুক্ত হইবার পক্ষপাতী ছিল। পোল্যাণ্ডে জার্মানদের অত্যাচার ইটালীবাসীর মনে এক দারুন ঘৃণার সঞ্চার করিল এবং অপরদিকে ইটালীতে

মুসোলিনী ও হিটলারের মধ্যে বিবাদ

পোলিশ দূতাবাস বন্ধ না করায় হিটলার ইটালীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। এতদ্ভিন্ন মুসোলিনী পোল্যাণ্ডের জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করিলে হিটলার অধিকতর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। সুতরাং জার্মানীর সহিত সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেও যুদ্ধের প্রথমদিকে ইটালী ও জার্মানীর মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিমধ্যে জার্মানীর উত্তরোত্তর সাফল্য, ফ্রান্সের পতন ও স্বীয় কন্যা এড্ডা (Edda))-র প্ররোচনা প্রভৃতি কারণে মুসোলিনী মত পরিবর্তন করিয়া জার্মানীর সহিত প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধে যোগদান করিতে সম্মত হইলেন। ১৯শে জুন (১৯৪০ খৃঃ) হিটলার ও মুসোলিনী মিউনিক-এর এক বৈঠকে মিলিত হইলেন। মুসোলিনী নীস, কর্সিকা, ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড, টিউনিশিয়া ও মাল্টা দাবি করিলেন। ২২শে ও ২৫শে জুন যথাক্রমে ফ্রান্স ও জার্মানী এবং ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে যুদ্ধবিরতির শর্তাদি স্বাক্ষরিত হইল।

মিউনিক বৈঠক (১৯৪০)

১৯৪১ খৃীষ্টাব্দের ২২শে জুন হিটলার রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে মুসোলিনীও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সেই বৎসর ডিসেম্বর মাসে জাপান পার্ল-বন্দর আক্রমণ করিলে ইটালীও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কিন্তু ১৯৪২ খৃীষ্টাব্দ হইতে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হইতে লাগিল। ব্রিটেন ও আমেরিকার যুগ্মবাহিনী আলজেরিয়া, মরক্কো ও উত্তর আফ্রিকা দখল করিল। ইটালীর অভ্যন্তরে জনসাধারণের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইটালীবাহিনীর ক্রমাগত পরাজয়, জনসাধারণের যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব, নাৎসী-জার্মানীর প্রতি ইটালীবাসীর ঘৃণা, অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংকট, বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিকশ্রেণীর অসন্তোষ প্রভৃতি কারণে মুসোলিনী ও ইটালীর পতন আসন্ন হইয়া উঠিল। ১০ই জুলাই (১৯৪৩ খৃঃ) মিত্রপক্ষ সিসিলি আক্রমণ করিয়া বোম দ্বারা রোম বিধ্বস্ত করিল। ফ্যাসিস্ট গ্র্যাণ্ড-কাউন্সিল (Fascist Grand Council) মুসোলিনী ও তাঁহার সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করিল এবং মুসোলিনীকে বন্দী করা হইল। জার্মানী মুসোলিনীর সাহায্যে অগ্রসর হইল। মুসোলিনীকে মুক্ত করিয়া জার্মানবাহিনী ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলন নির্মমভাবে দমন করিতে উদ্যোগী হইল। কিন্তু ১৯৪৫ খৃীষ্টাব্দে মিত্রপক্ষ উত্তর-ইটালী আক্রমণ করিলে ইটালীবাসী পুনরায় মুসোলিনীর উপর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং মুসোলিনীকে নির্মমভাবে হত্যা করিল। ইটালী মিত্রপক্ষের নিকট বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করিল। এইভাবে ফ্যাসিবাদী ইটালীর পতন ঘটিল।

জার্মানী ও জাপানের সহিত ইটালীর সহযোগিতা

বিশ্বযুদ্ধের পরিবর্তিত গতি ও ইটালীর অভ্যন্তরীণ গোলযোগ

মুসোলিনীর পতন ও মৃত্যু

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত

১। ইটালীতে ফ্যাসিবাদের উৎপত্তি ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ ১৪.৩.]

২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইটালীর অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [উঃ ১৪.২.]

৩। মুসোলিনীর অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ ১৪.৪, ১৪.৫.]

৪। ১৯১৯ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইটালীর পররাষ্ট্রনীতি বর্ণনা কর। এই নীতি কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছিল? [উঃ ১৪.৫.]

৫। ফ্যাসিবাদী ইটালীর সহিত নাৎসীবাদী জার্মানীর সম্পর্কের বিবরণ দাও। [উঃ ১৪.৫,১৪ ৬.]

৬। ফ্যাসিবাদী সরকারের অভ্যন্তরীণ নীতির পর্যালোচনা কর। [উঃ ১৪.৪.]

পঞ্চদশ অধ্যায়

ফ্রান্সের ইতিহাস (১৯১৯-১৯৩৯)
(History of France 1919-1939)

ভূমিকা ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করার পর ফ্রান্সে নানাপ্রকার জটিলতার উদ্ভব হয়। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিবাদ ও মতানৈক্য এক সময় ফ্রান্সের জাতীয় জীবন অচল করিয়া তুলিয়াছিল। যদিও ফ্রান্সের অধিকাংশ জনসাধারণের ফরাসী সাধারণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য ছিল, তথাপি যুদ্ধোত্তর সমস্যা-গুলি ফরাসী জনগণের জীবন এমনভাবে পর্যুদস্ত করিয়া তুলিয়াছিল যে উহাদের অনেকে বামপন্থী কমিউনিস্ট ও দক্ষিণ-পন্থী ফ্যাসিস্টদের প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় সহানুভূতিশীল হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯১৯ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কালে ফ্রান্সের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের পতনের কারণগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

১৫.১. ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ সমস্যা (Internal Problems of France) ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ফ্রান্সের যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও রাষ্ট্রীয় অসংহতি দেখা দেয় তাহার মূলে ছিল তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় গঠন। আইন রচনার সকল ক্ষমতা ছিল দুইটি কক্ষযুক্ত পার্লামেন্টের হস্তে—একটি চেম্বার অফ ডেপুটিস (Chamber of Deputies) ও অপরটি সেনেট (Senate)। এই দুইটি কক্ষের মধ্যে চেম্বার অফ ডেপুটিস ছিল সর্বাত্মক ক্ষমতার অধিকারী। মন্ত্রিসভার গঠন ও তাহা বরখাস্ত করার একমাত্র অধিকারী ছিল চেম্বার অফ ডেপুটিস। চেম্বার অফ ডেপুটিস ও সেনেটের মিলিত অধিবেশন ন্যাশনাল এসেমব্লী (National Assembly) নামে অভিহিত হইত। ন্যাশনাল এসেমব্লী কর্তৃক সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ৭ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইতেন।

(১) প্রশাসনী সমস্যা

প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। পার্লামেন্ট কর্তৃক রচিত কোন আইনের উপর তাঁহার 'ভিটো' (Veto) ক্ষমতার প্রয়োগ চলিত না। ব্রিটেনের রাজার ন্যায় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট রাজত্ব করিতে পারিতেন না এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ন্যায় তিনি শাসনও করিতে পারিতেন না। ফ্রান্সের কার্যনির্বাহক ক্ষমতা (executive power) একমাত্র মন্ত্রীদের হস্তেই নিবদ্ধ ছিল। পার্লামেন্টের মনোনীত প্রার্থীগণকে প্রেসিডেন্ট মন্ত্রিপদে নিয়োগ করিতেন এবং মন্ত্রিসভা একমাত্র পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকিত। ফ্রান্সে পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু ব্রিটেনের পার্লামেন্টর সহিত ইহার সাদৃশ্য খুব কমই ছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই একমাত্র আধিপত্য লাভ করিত। কিন্তু ফ্রান্সের মন্ত্রিসভাকে ফরাসী পার্লামেন্টের বিভিন্ন দল ও উপদলের উপর নির্ভর করিতে হইত। এই কারণে ফরাসী মন্ত্রিসভা ও পার্লামেন্টে সংহতি ও ঐক্যের একান্ত অভাব

ছিল। ১৮৭০ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্সে ৫০টি মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটিয়াছিল।

বিশ্বযুদ্ধের সময় জর্জ ক্লিমেনশো (George Clemenceau) প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যুদ্ধ অবসানেও তিনি এই পদে বহাল থাকেন। ভার্সাই-সন্ধির পর ফ্রান্সে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিছুসংখ্যক দক্ষিণপন্থী দলগুলিকে লইয়া আলেকজাণ্ডার মিলেরাঁ (Alexander Millerand) একটি জাতীয় রাজনৈতিক জোট গঠন করেন। ইহা 'ন্যাশনাল-ব্লক' (National Block) নামে পরিচিত ছিল। সাধারণ নির্বাচনে এই ন্যাশনাল-ব্লক সাফল্য লাভ করে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ক্লিমেনশো ও পল্ দেশানেল (Paul Deschanel) এই পদের জন্য প্রার্থী ছিলেন। ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও ক্লিমেনশো পরাজিত হন এবং তিনি প্রধান-মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। মিলেরাঁ প্রধানমন্ত্রী-পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেও তাঁহাকেও পদত্যাগ করিতে হয়। ইতিমধ্যে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শারীরিক কারণে দেশানেল প্রেসিডেণ্টের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এরিস্টাইড ব্রিয়াঁ (Aristide Briand) প্রধান মন্ত্রী-পদে নিযুক্ত হন। যুদ্ধোত্তর ইওরোপের রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্রিয়াঁ এক গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর উত্তর ফ্রান্সের এক বৃহত্তর অংশে অরাজকতা ও বিশৃংখলা বিরাজ করিতেছিল। যুদ্ধের পূর্বে এই অঞ্চলে ফ্রান্সের এক-অষ্টমাংশ জনসংখ্যা বসবাস করিত। এই অঞ্চলই ছিল ফ্রান্সের শিল্প ও খনিজপ্রধান অঞ্চল। কিন্তু যুদ্ধের ফলে এই অঞ্চলের শহর, গ্রাম, কলকারখানা ও খনিগুলি একরূপ ধ্বংস হইয়া যায়। অগণিত গৃহ ও রাস্তাঘাট ধূলিসাৎ হইয়া যায়। হাজার হাজার কলকারখানা লুণ্ঠিত হয় এবং খনিগুলিকে জলপূর্ণ করিয়া সেগুলি অকেজো করিয়া রাখা হয়। যুদ্ধের কারণে বহু কৃষিজমিও বিনষ্ট হইয়া যায়।

(২) পুনর্গঠন সমস্যা

এই অঞ্চলের পুনর্গঠন ফ্রান্সের নিকট এক বিরাট সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। যুদ্ধের সময় ফরাসী সরকার নাগরিকগণের সকলপ্রকার ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। যুদ্ধের পর ফরাসী মুদ্রা ফ্রাঙ্কের মূল্য অভাবনীয় বৃদ্ধি পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ ক্ষতিপূরণ সমস্যা বিরাট আকার ধারণ করে। ফ্রান্সের নেতৃবর্গ এইরূপ আশা করেন যে ভার্সাই-সন্ধির শর্তানুসারে জার্মানীর নিকট হইতে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের দ্বারা অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনকার্য সহজ হইবে। জার্মানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তির সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ফরাসী সরকার পুনর্গঠনকার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের অপর প্রধান সমস্যা ছিল জাতীয় আর্থিক পুনর্গঠন। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ সমস্যা ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সহিত

ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু জার্মানীর নিকট হইতে আশানুরূপ ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় ফরাসীগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। প্রধানমন্ত্রী ব্রিয়াঁর বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। প'য়কার (Poincare) ব্রিয়াঁর স্থলে প্রধানমন্ত্রী-পদে নিযুক্ত হন। প'য়কারের প্ররোচনায় ফরাসী সরকার জার্মানীর রুঢ় অঞ্চল বলপূর্বক দখল করেন। ইহার মূলে প'য়কারের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের আর্থিক সমস্যার সমাধান করা।

(৩) জাতীয় আর্থিক সমস্যা

ইতিমধ্যে ফরাসী মুদ্রার মান অভাবনীয় ভাবে হ্রাস পাওয়ায়, জাতীয় ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং জার্মানীর নিকট হইতে আশানুরূপ ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় প'য়কারেরও বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়। ফলে প্রধানমন্ত্রী প'য়কার ও প্রেসিডেণ্ট মিলেরাঁ-এর পতন ঘটে। ইহার পর গাস্তো দুমার্গ (Gaston Doumrgue) ও হ্যারিয়ট (Herriot) যথাক্রমে প্রেসিডেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন।

জাতীয় আর্থিক সমস্যাই হ্যারিয়টের সম্মুখে প্রধান সমস্যা ছিল। ফরাসী ঋণদাতাগণ অতিরিক্ত ঋণ প্রদানের পরিবর্তে সরকারকে ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ দিতে থাকে। রাজস্ব-নীতি সম্পর্কে পার্লামেণ্টে দারুণ মতবিরোধের উদ্ভব হওয়ায় সরকার জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে অসমর্থ হন। বামপন্থীগণ ধনী সম্প্রদায়ের উপর অতিরিক্ত কর স্থাপন ও সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করার দাবি করে। অপরদিকে দক্ষিণপন্থীগণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপর অতিরিক্ত কর স্থাপনের ও সরকারী কর্মচারীদের বেতনের হার হ্রাস করার দাবি করে। পার্লামেণ্ট এই সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করিতে না পারায় কাগজী মুদ্রার প্রচলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। ফলে জিনিসপত্রের দাম অভাবনীয় ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং সর্বত্র ফরাসী জনগণের মধ্যে বিক্ষোভের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে হ্যারিয়ট পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের আর্থিক সংকট দারুণ আকার ধারণ করে। প'য়কার পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন এবং অর্থনীতি-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষে ডিক্টেটরের ক্ষমতা দেওয়া হয়। অর্থসংকট হইতে দেশকে রক্ষা করার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হয়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপর নূতন কর ধার্য করা হয় এবং শাসনবিভাগে কিছু সংস্কার প্রবর্তন করিয়া সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ সংকুচিত করা হয়। ফলে ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনকার্য অনেকটা সহজ হয়। ইতিমধ্যে ডাওয়েজ পরিকল্পনা (Dawes plan) অনুসারে জার্মানীর নিকট হইতে কিছু ক্ষতিপূরণ লাভ করায় ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটে। কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে প'য়কার পদত্যাগ করিলে ফ্রান্সে পুনরায় মন্ত্রিসভার দ্রুত পরিবর্তনের যুগ শুরু হয়। রাজনৈতিক দলাদলি ও মন্ত্রিসভার দ্রুত পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় সংহতি পুনরায় ব্যাহত হয় এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এইরূপ অবস্থা অপরিবর্তিত রহে।

যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের অপর সমস্যা ছিল আলসাস্-লোরেনের শাসন-সংক্রান্ত সমস্যা। আলসাস্-লোরেন ছিল ফ্রান্সের একটি প্রদেশ। কিন্তু ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে আলসাস্-লোরেনের শাসনব্যবস্থা স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়া উঠিতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই-সন্ধির শর্তানুসারে আলসাস্-লোরেন ফ্রান্সকে প্রত্যর্পণ করা হয়। রাজনৈতিক পরিবর্তন হেতু ফরাসী সরকারের সহিত আলসাস-লোরেনের অধিবাসীগণের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। জার্মানীর শাসনাধীনে আলসাস্-লোরেনকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল এবং তথায় স্বতন্ত্র বিধানসভাও (legislature) স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্সের সংবিধানে প্রাদেশিক বিধানসভার স্থান ছিল না। সুতরাং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থার অনুকরণে আলসাস-লোরেনকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হয় এবং উহার বিধানসভা বিলুপ্ত করা হয়। কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের অধিকার বিলুপ্ত হওয়ায় আলসাস্-লোরেনের অধিবাসীগণ বিক্ষুব্ধ হয় এবং প্যারিস হইতে প্রেরিত কর্মচারীগণ জার্মান ভাষার সহিত পরিচিত না থাকায় আলসাস্-লোরেনের অধিবাসীগণ সেই কারণে অভিযোগ করে।

(৪) আলসাস্-লোরেন সম্পর্কিত সমস্যা

শাসন-সংক্রান্ত বিরোধ

ভাষার ব্যাপারেও ফরাসী সরকারের সহিত আলসাস্-লোরেনের অধিবাসীদের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। এই প্রদেশ দুইটির অধিকাংশ অধিবাসীদের ভাষা ছিল জার্মান এবং এইখানে জার্মান শাসনাধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে জার্মান ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু ফ্রান্সের সহিত এই প্রদেশের পুনরায় সংযুক্তিকরণ হইলে তথায় ফরাসী ভাষা সরকারী ভাষারূপে প্রবর্তিত হয়। আলসাস্-লোরেনের অধিবাসীগণ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

ভাষা-সংক্রান্ত বিরোধ

ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারেও ফরাসী সরকারের সহিত আলসাস-লোরেনের অধিবাসীদের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রদেশ দুইটি ফ্রান্সের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ও পোপের মধ্যে যে ধর্ম-সংক্রান্ত মীমাংসা হইয়াছিল তাহার বিধি অনুসারে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আলসাস্-লোরেনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি পরিচালিত হইতে থাকে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত ধর্ম-সংক্রান্ত মীমাংসার বিধি অনুসারে সরকারের নিকট হইতে যাজকগণ বেতন পাইতেন এবং শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে চার্চের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। এই প্রদেশ দুইটি জার্মানীর সহিত সংযুক্ত হইবার সময় হইতে জার্মান সরকার এই সকল ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের ধর্ম-সংক্রান্ত বিধি ছিল ভিন্ন রূপ। রাষ্ট্র হইতে চার্চ সম্পূর্ণভাবে পৃথক ছিল, শিক্ষায়তনে ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল এবং প্রত্যেকের ধর্ম অনুসারে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও নিষিদ্ধ ছিল। ফলে আলসাস্-লোরেন

ধর্ম-সংক্রান্ত বিরোধ

ফ্রান্সের সহিত পুনরায় সংযুক্ত হইলে ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিবাদ-বিসম্বাদের উদ্ভব হয়।

ফরাসী সরকারের সহিত আলসাস্-লোরেনের অধিবাসীদের বিবাদ-বিসম্বাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এক সময় উহারা ফ্রান্স হইতে বিচ্ছিন্ন হইবারও উদ্যোগ করে। কিন্তু ইতিমধ্যে জার্মানীতে নাৎসীগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে আলসাস্-লোরেনের এই আন্দোলন প্রশমিত হয়।

১৫.২. ফ্রান্সের পররাষ্ট্রনীতি—১৯১৯-১৯৩৯ (Foreign Policy of France): প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে ফ্রান্সের যোগদানের মূল উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা এবং জার্মানীর ভবিষ্যৎ আক্রমণের বিরুদ্ধে সমবেত নিরাপত্তার (Collective Security) বিধান করা। কিন্তু শান্তির সন্ধি ফ্রান্সের উদ্বিগ্নের অবসান করিতে পারে নাই। কারণ আমেরিকা শান্তির সন্ধি স্বাক্ষর করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হয়।

ফ্রান্সের নিরাপত্তার সমস্যা

দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে ফ্রান্সের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল জার্মানীর বিরুদ্ধে নিরাপত্তার বিধান করা। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মানীর প্রতিশোধাত্মক মনোভাব, ফ্রান্সের তুলনায় জার্মানীর অধিক জনবল ও আর্থিক সচ্ছলতা ফ্রান্সের আশঙ্কার কারণ ছিল। জার্মানী শক্তিশালী হইয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে এই আশঙ্কায় ফ্রান্স ব্রিটেন ও আমেরিকার সহিত একটি ত্রি-শক্তি-মৈত্রী (Tripple Alliance) গঠনের প্রস্তাব করে। কিন্তু এই ব্যাপারে ব্রিটেন ও আমেরিকার নিকট হইতে সমর্থন লাভ না করায় ফ্রান্সকে স্বীয় নিরাপত্তার জন্য অন্যত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হয়। যুদ্ধের পূর্বে রাশিয়া ফ্রান্সের মিত্র ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর রাশিয়ায় বলশেভিকগণের ক্ষমতা লাভ এবং জার্মানীর সহিত রাশিয়ার সন্ধি (Treaty of Rapallo) স্বাক্ষরিত হইলে ফ্রান্স নিজের কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতা অনুভব করে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইওরোপে ফ্রান্সই ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জার্মানীর বিরুদ্ধে স্বীয় নিরাপত্তার জন্য ফ্রান্স যারপরনাই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে।

পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে ফ্রান্সের কতকগুলি দাবি মিত্রপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল। জার্মানীর ভবিষ্যৎ আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা হিসাবে রাইন অঞ্চলে ফ্রান্সের সামরিক কর্তৃত্বের পরিবর্তে তথায় পনেরো বৎসরের জন্য মিত্রপক্ষের একটি সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখা স্থির হইয়াছিল, এবং জার্মানী আক্রমণ করিলে ব্রিটেন ও আমেরিকা ফ্রান্সকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। কিন্তু জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্সের এই

ইঙ্গ-আমেরিকা প্রতিশ্রুতি

আমেরিকা কর্তৃক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শীঘ্রই দুর্বল হইয়া পড়ে। কারণ এই প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত চুক্তি আমেরিকা শেষ পর্যন্ত সমর্থন না করায় সমগ্র পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই অবস্থায় ফ্রান্স লীগ-অফ-নেশনস্-এর বাহিরে এবং লীগের মাধ্যমে স্বীয় নিরাপত্তার জন্য যত্নবান হয়।

লীগের বাহিরে ও লীগের মাধ্যমে নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা

পশ্চিম-ইওরোপে জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্সের ন্যায় বেলজিয়ামও স্বীয় নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। জার্মানীর আক্রমণ ও অত্যাচার বেলজিয়াম বিস্মৃত হইতে পারে নাই। ভার্সাই-সন্ধির দ্বারা বেলজিয়ামের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হইলেও বেলজিয়ামের আশংকা দূর হয় নাই। সুতরাং ফ্রান্সের আমন্ত্রণে বেলজিয়াম সাড়া দেয় এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে একটি পারস্পরিক আত্মরক্ষামূলক সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের মধ্যে সন্ধি (১৯২০)

কিন্তু ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের যুগ্মশক্তি জার্মানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ছিল না। এই কারণে ফ্রান্স অতঃপর পোল্যাণ্ডের সহিত মৈত্রী স্থাপনে যত্নবান হয়। বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে পোল্যাণ্ড ইওরোপের রাজনীতির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। বিশ্বযুদ্ধের পর নবগঠিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আয়তনের দিক দিয়া পোল্যাণ্ড ছিল সর্বাধিক বৃহৎ রাষ্ট্র এবং উহার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ভার্সাই-সন্ধিকৃত ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল। পোল্যাণ্ডের প্রধান দুই শত্রু ছিল—পশ্চিম সীমান্তে জার্মানী এবং পূর্ব সীমান্তে রাশিয়া। ভার্সাই-সন্ধি অনুসারে জার্মানীর ভিতর দিয়া যে 'পোলিশ-করিডর'-এর (Polish Corridor) সৃষ্টি করা হইয়াছিল তাহা জার্মানী কখনই স্বীকার করিয়া লয় নাই। কারণ এই 'করিডর' জার্মানীকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিল। জার্মানীর এই মনোভাব পোল্যাণ্ডের অবিদিত ছিল না। অপরদিকে কমিউনিস্ট রাশিয়াও পোল্যাণ্ডের নিরাপত্তার পক্ষে সর্বদাই বিপজ্জনক ছিল। জার্মানী ও রাশিয়ার ন্যায় শত্রু-প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের পক্ষে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের মিত্রতার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে মৈত্রী-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ফ্রান্স যাহা চাহিয়াছিল এই সন্ধি দ্বারা ফ্রান্স তাহাই লাভ করিল। অর্থাৎ জার্মানীর বিরুদ্ধে পশ্চিম সীমান্তে বেলজিয়ামের এবং পূর্ব সীমান্তে পোল্যাণ্ডের সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ফ্রান্স লাভ করিল। কিন্তু ফ্রান্স ইহাতেও নিশ্চিন্ত হইল না। পরবৎসর ফ্রান্স বিটেনের সহিত প্রতিরক্ষামূলক মিত্রতা স্থাপনে উদ্যোগী হইল। কিন্তু উভয় রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ও পঁয়কারের মধ্যে মতানৈক্যের ফলে ফ্রান্সের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। অতঃপর ফ্রান্স চেকোশ্লোভাকিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনে যত্নবান হইল। অস্ট্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার সংযোগে চেকোশ্লোভাকিয়া নামক

ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি (১৯২১)

ফ্রান্সে ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে মৈত্রী-চুক্তি (১৯২৪)

রাষ্ট্রটি গঠিত হইয়াছিল। অস্ট্রিয়া ও জার্মানী যাহাতে কখনও সংযুক্ত না হয় এবং অস্ট্রিয়া ও জার্মানীতে যাহাতে কখনও হ্যাপসবার্গ অথবা হোহেনজলার্ণ (Hohen-Zollern) বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হয় চেকোশ্লোভাকিয়ার নেতৃবর্গ তাহাই কামনা করিতেছিলেন এবং সেই বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতাও অবলম্বন করিতেছিলেন। সুতরাং ফ্রান্সের আমন্ত্রণে চেকোশ্লোভাকিয়া সাড়া দেয় এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে মৈত্রী-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ফ্রান্স ও রুমানিয়া এবং ফ্রান্স ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে সন্ধি (১৯২৬ ও ১৯২৭)

ইহার পর ফ্রান্স ১৯২৬ ও ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে রুমানিয়া ও যুগোশ্লোভিয়ার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইল। এই সন্ধিগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল নিরাপত্তা-সংক্রান্ত ব্যাপারে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা, জার্মানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ইওরোপের তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কোনরূপ পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সমবেত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ফলাফল

এই সকল মৈত্রীস্থাপনের মূলে ফ্রান্সের প্রধান লক্ষ্য ছিল জার্মানীর চতুর্দিকে শত্রু-বেষ্টনীর সৃষ্টি করা। পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, বেলজিয়াম, রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার সহিত মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ফ্রান্স জার্মানীর ভবিষ্যৎ আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হইল। লীগ-অফ-নেশনস্-এর নীতি অনুসারেই উপরোক্ত মৈত্রী-চুক্তিগুলি সম্পাদিত হইয়াছিল।

লীগ-অফ-নেশনস্-এর মাধ্যমেও ফ্রান্স স্বীয় নিরাপত্তা বিধানে যত্নবান হইয়াছিল। এস্থলে স্মরণ রাখা দরকার যে জার্মানীকে দুর্বল করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই ফ্রান্স লীগ-অফ-নেশনস্‌কে সর্বতোভাবে সমর্থন করিয়াছিল।

লোকার্নো-সন্ধি

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স জার্মানী, ব্রিটেন, বেলজিয়াম ও ইটালীর সহিত লোকার্নো-সন্ধি (Locarno Treaty) স্বাক্ষর করে এবং ইহার শর্তানুসারে ফ্রান্স সন্ধিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির সহিত পশ্চিম-ইওরোপের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সকল বিবাদ-বিসম্বাদ আপোস-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করিতে স্বীকৃত হয়। এই সর্বপ্রথম বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গ যুদ্ধ করার অধিকার স্বেচ্ছায় বর্জন করে।

কেলগ্-ব্রিয়াঁ চুক্তি (১৯২৮)

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রসচিব কেলগ্ (Kellogg)-এর আমন্ত্রণে ও ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রিয়াঁর উদ্যোগে কেলগ্-ব্রিয়াঁ-চুক্তি (Kellogg-Briand Pact) স্বাক্ষরিত হয়। ইহাতে বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রই যোগদান করে। ইহাতে যুদ্ধনীতির নিন্দা করা হয় এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করার কথা ঘোষিত হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ফ্রান্সের পূর্বতন মিত্র রাশিয়ার বলশেভিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং সোভিয়েট রাশিয়া জার্মানীর সহিত র‍্যাপালো-সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলে রাশিয়ার সহিত ফ্রান্সের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ফ্রান্স প্রথমদিকে সোভিয়েট সরকারকে স্বীকার করে নাই। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে নাৎসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং হিটলার ভার্সাই-সন্ধির কঠোর সমালোচনা করিতে শুরু করিলে স্বভাবতঃই ফ্রান্সের আশংকার কারণ হয়। অপরদিকে নাৎসী-জার্মানী পোল্যাণ্ডের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্বভাবতঃই রাশিয়াও অস্বস্তিবোধ করে। ফলে রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটিতে থাকে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পারস্পরিক নিরাপত্তা ও সামরিক সাহায্য দান সম্পর্কে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু যথার্থভাবে বলিতে গেলে এই চুক্তি ফ্রান্সের নিরাপত্তার দিক দিয়া মোটেই কার্যকর ছিল না।

রাশিয়ার সহিত ফ্রান্সের মিত্রতা স্থাপন

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও জার্মানীর মধ্যে মিউনিক-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে রাশিয়া সন্দিহান হইয়া উঠে। জার্মানীর প্রতি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের তোষণ-নীতি রাশিয়াকে আশঙ্কিত করে। এই অবস্থায় রাশিয়া নিজের নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার জন্য জার্মানীর সহিত অনাক্রমণ-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ইহার ফলে জার্মানীর শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিপজ্জনক হইয়া উঠে।

মিউনিক চুক্তি (১৯৩৮) ফ্রান্সের রুশ-মৈত্রির অবাস্তবতা

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সের সমস্যাগুলি কি ছিল? এই সমস্যাগুলির সমাধানে ফ্রান্স কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছিল? [উঃ ১৫.১.]

২। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে ফ্রান্সের পররাষ্ট্রনীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ ১৫.২.]

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সের নিরাপত্তার সমস্যা কি ছিল? এই সমস্যার সমাধানে ফ্রান্স কতদূর সাফল্যলাভ করিয়াছিল? [উঃ ১৫.২.]

ষোড়শ অধ্যায়

স্পেনের ইতিহাস (১৯১৯-১৯৩৯)
(History of Spain : 1919-1939)

: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী প্রায় দুই দশক কাল স্পেনের রাষ্ট্রীয় জীবনে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল যাহা পশ্চিম-ইওরোপের অন্য কোন রাষ্ট্রে ঘটে নাই। এই সময়ের মধ্যে স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, সামরিক একনায়কতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং তীব্র খণ্ডবিপ্লব একের পর এক সংঘটিত হয়। ১৯৩৬ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফ্যাসিস্ট ইটালী ও নাৎসী জার্মানী স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে হস্তক্ষেপ করিয়া স্পেনবাসীর রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যুদস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। স্পেন ইটালী ও জার্মানীর কূটনৈতিক ও সমর ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। অন্তর্বিপ্লব ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ফলে শেষ পর্যন্ত স্পেনে যে শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়া স্থায়িত্ব লাভ করে তাহা অধিকাংশ স্পেনবাসীর মনঃপূত হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্পেনে যে অন্তর্বিপ্লবের সূত্রপাত হয় তাহা প্রধানতঃ উদারপন্থী (Liberals) ও গোঁড়াপন্থীদের (Conservatives) পারস্পরিক বিবাদ ও সংঘর্ষকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইতেছিল এবং ফরাসী বিপ্লবের সময় হইতেই এই সংঘর্ষের সূত্র

১৬.১. সামরিক একনায়কতন্ত্র (Military Dictatorship) : যুদ্ধোত্তর স্পেনের প্রথম উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী পরিবর্তন হইল সামরিক একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, যাহা ইটালীতে মুসোলিনীর পরিচালনাধীনে ঘটিয়াছিল। যুদ্ধোত্তর স্পেনে শ্রমিকদের ধর্মঘট দৈনন্দিন ব্যাপারে পরিণত হয় ও সমাজতন্ত্রীদের জোর প্রচারকার্য শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। শিল্পাঞ্চলের কলকারখানাগুলি একরূপ অচল অবস্থায় আসিয়া পেঁছায়। ১৯১৯ হইতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্পেনের শহরগুলিতে সাধারণ ধর্মঘট ও বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ একরূপ দৈনন্দিন ব্যাপারে পরিণত হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করা হয় এবং পরবর্তী দুই বৎসরের মধ্যে শিল্পাঞ্চলগুলিতে বহুলোক হতাহত হয়।

শ্রমিক অসন্তোষ ও ধর্মঘট ছাড়াও যুদ্ধোত্তর স্পেনের বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক মনোভাব ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রবল আকার ধারণ করে এবং ইহার ফলে এক দারুণ অশান্তির উদ্ভব হয়। ক্যাটালোনিয়া (Catalonia) ও বার্সিলোনায় (Barcelona) এইরূপ আন্দোলন বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। চতুর্দশ শতাব্দীতে ক্যাটালোনিয়া স্পেনীয় সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হইলেও উহার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ইহার নিজস্ব পার্লামেণ্ট ও স্বতন্ত্র ভাষা ছিল। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ক্যাটালোনিয়ার স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয় তথাপি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত উহার জাতীয়তাবাদ অক্ষুণ্ণ থাকে।

উগ্র প্রাদেশিকতা

ক্যাটালোনিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

যুদ্ধের সময় ক্যাটালোনিয়ার অটোনমিস্ট (Atonomist) নামে জাতীয়তাবাদীগণ ক্যাটালোনিয়ার জন্য পৃথক পার্লামেণ্ট, স্বতন্ত্র সংবিধান ও স্বতন্ত্র বিচার-ব্যবস্থার দাবি করে। ক্যাটালোনিয়ার অপর উগ্র জাতীয়তাবাদীগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করে। যুদ্ধের সময় ক্যাটালোনিয়ার এই স্বাধীনতার দাবি স্পেনে যথেষ্ট অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রাদেশিক আন্দোলন ও শ্রমিক ধর্মঘট প্রভৃতি কারণে মন্ত্রিসভার দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতে থাকে এবং স্বদেশের রাজনীতিতে সমরনায়কগণের অবিরত হস্তক্ষেপ জাতীয় জীবন পর্যুদস্ত করিয়া তোলে।

যুদ্ধোত্তর যুগে স্পেনের-শাসনভুক্ত মরক্কোর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং তাহা দমন করিতে স্পেন সরকারের সকল ব্যর্থ প্রচেষ্টা স্পেনের ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মরক্কোর জাতীয়তাবাদী নেতা আব্দুল ক্রিম (Abdul Krim) স্পেনের সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে থাকেন। স্পেনের রাজা আলফন্সো (Alfanso) এই সংগ্রামের অবসানকল্পে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মরক্কোর জাতীয়তাবাদীগণের নিকট কুড়ি হাজার স্পেনীয় সৈন্য পরাজিত হইয়া উহাদের হস্তে বন্দী হয়। স্পেনের ইতিহাসে ইহা এক অন্যতম বিপর্যয়। স্পেনে এই বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়া প্রবলভাবে দেখা দেয় এবং ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য তদন্তের দাবি সর্বত্র উপস্থাপিত হয়। তদন্তের জন্য একটি কমিটিও গঠিত হয় কিন্তু কমিটির রিপোর্ট অপ্রকাশিত রহে। স্পেনের নেতৃবর্গের অনেকে এই বিপর্যয়ের জন্য স্পেনের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও এমন কি রাজা আলফন্সোকে দায়ী সাব্যস্ত করে। স্পেনের পার্লামেণ্ট, সংবাদপত্র ও জনগণ যখন কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত করার জন্য প্রবলভাবে দাবি করতে থাকে সেই সময় রাজা আলফন্সো স্পেনে সামরিক একনায়কতন্ত্র স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন।

মরক্কোর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

রাজা আলফন্সোর হস্তক্ষেপ ও স্পেনীয় বাহিনীর চরম পরাজয়

স্পেনে প্রতিক্রিয়া, রাজা আলফন্সো কর্তৃক সামরিক একনায়কতন্ত্র স্থাপনের ঘোষণা

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জেনারেল মিগুয়েল প্রাইমো ডি রিভেরা (General Miguel Primo de Rivera) বলপূর্বক স্পেনের মন্ত্রিসভার ও শাসনতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটাইয়া দেশব্যাপী সামরিক আইন (Martial Law) জারী করেন এবং তাঁহার একনায়কতন্ত্র (Dictatorship) স্থাপন করেন। রিভেরা ছিলেন অভিজ্ঞ সমরনায়ক। স্পেনীয় আমেরিকার (Spanish American War) যুদ্ধে তিনি কিউবা ও ফিলিপাইনে স্পেনীয় বাহিনীর পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর তিনি স্পেনের বিভিন্ন প্রদেশের সামরিক শাসনকর্তা-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। স্পেনে বলপূর্বক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার সময় তিনি বার্সিলোনার সামরিক শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। একনায়ক-তন্ত্র স্থাপনের পর তিনি

রিভেরা কর্তৃক সামরিক একনায়কতন্ত্র স্থাপন (১৯২৩)

রিভেরার পূর্ব-অভিজ্ঞতা

রিভেরার দমনমূলক নীতি

স্পেনের পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেন এবং সর্বত্র বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কঠোর হস্তে দমন করেন।

পরবর্তী দুই বৎসর রিভেরার সামরিক শাসন নির্বিবাদে চলে। প্রাদেশিক আইন-পরিষদগুলি ভাঙিয়া ফেলা হইল, প্রজাতান্ত্রিক দলের নেতৃবর্গকে যথেচ্ছভাবে বন্দী করা হইল, সামান্য অপরাধে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা গৃহীত হইল এবং সংবাদপত্রের উপর বিধিনিষেধগুলি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হইতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ দমনমূলক নীতির প্রয়োগ সত্ত্বেও রিভেরার একনায়কতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের বিক্ষোভের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের পর গণ-বিক্ষোভ প্রবল আকার ধারণ করে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে সৈন্যবাহিনী বিক্ষোভ প্রদর্শন করিল এবং ছাত্রসমাজ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ রিভেরার শাসনের বিরুদ্ধে স্পেনের প্রায় সকল শ্রেণী বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে লাগিল। রিভেরার একনায়কতন্ত্র ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। এবং তাঁহার প্রতি স্পেনের রাজার ও সৈন্যবাহিনীর আস্থা ও সমর্থন বিনষ্ট হইল। এই অবস্থায় তিনি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পদত্যাগ করিয়া দেশত্যাগী হইলেন। ইহার কয়েক মাসের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রিভেরার দমনমূলক শাসন

রিভেরার বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ

রিভেরার পদত্যাগ ও দেশত্যাগ (১৯৩০)

রিভেরা পদত্যাগ করিলে রাজা আলফন্সো এই মর্মে ঘোষণা করেন যে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তিত করা হইবে, ছাত্রসমাজের দাবি স্বীকার করা হইবে, রিভেরার আমলে পদচ্যুত ও বন্দী কর্মচারীগণকে মুক্তিদান করা হইবে এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই জাতীয় পার্লামেণ্টের নির্বাচন সম্পন্ন করা হইবে। কিন্তু সমাজতন্ত্রীগণ রাজতন্ত্রের অবসান ও নূতন সংবিধান রচনার জন্য জাতীয় পরিষদের আহ্বানের দাবি জানাইল।

রাজা আলফন্সোর ঘোষণা

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজা আলফন্সো পূর্বতন শাসনতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন করিয়া পার্লামেণ্টের নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু সর্বত্র নূতন সংবিধানসভার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন এইরূপ ব্যাপক আকার ধারণ করিল যে পার্লামেণ্টের নির্বাচন আপাততঃ স্থগিত রহিল। এই অবস্থায় রাজা আলফন্সো ও প্রধান মন্ত্রী আজনার (Aznar) প্রাদেশিক নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রজাতন্ত্রীগণ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিলে আজনার মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন এবং প্রজাতন্ত্রীদলের নেতা আলকালা জামোরা (Alcala Zamora) ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে একটি চরম পত্র প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করেন যে রাজা আলফন্সো সিংহাসন ত্যাগ করিতে অসম্মত হইলে সমগ্র দেশব্যাপী বিদ্রোহ

নূতন শাসনতন্ত্র ও সংবিধান সভার জন্য ব্যাপক আন্দোলন

প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রজাতন্ত্রীদের জয়লাভ ও রাজার সিংহাসন ত্যাগের দাবি

সংঘটিত করা হইবে। এই অবস্থায় রাজা আলফন্সো স্পেন ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১২.২. প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (Establishment of Republic) : রাজা আলফন্সো পলায়ন করিলে জামোরা সঙ্গে সঙ্গে স্পেনে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং নিজেকে উহার সাময়িক সভাপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী দলের উপযুক্ত নেতৃবর্গকে লইয়া একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হইল এবং শীঘ্রই স্পেনের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রকে বৃহৎ বৈদেশিক শক্তিগুলি স্বীকার করিল। প্রজাতন্ত্রের সম্মুখে সমস্যাগুলি ছিল জটিল, কারণ স্পেনের বিভিন্ন দলগুলি বিভিন্ন ধরনের সরকার গঠনের দাবি উত্থাপন করিয়াছিল। স্পেনের শিক্ষিত সম্প্রদায় চার্চের ঘোরতর বিরোধী ছিল এবং স্পেনের ব্যাপারে উহারা মধ্যযুগীয় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টার তীব্র নিন্দা করিত; প্রজাতন্ত্রীগণ নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিল এবং শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে সমরবিভাগের হস্তক্ষেপের ঘোর বিরোধী ছিল। সমাজতন্ত্রীগণের লক্ষ্য ছিল স্পেনে একটি নূতন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।

জামোরা কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা ও বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক উহার স্বীকৃতি

প্রাথমিক সমস্যা

বিভিন্ন দলগুলির দাবি

প্রজাতন্ত্রী সরকার ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করেন, রাজনৈতিক বন্দীগণকে মুক্ত করেন, অভিজাতদের সকল প্রকার উপাধি বাতিল করেন, জাতীয় সংবিধানসভার নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন এবং সরকারী শিক্ষায়তনে ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ করেন। ইহা ছাড়া প্রজাতন্ত্রী সরকার কৃষি ও রাজস্ব সংস্কারের কথাও ঘোষণা করেন।

প্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রাথমিক কার্যাদি

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় সংবিধান সভার নির্বাচন সম্পন্ন হইল এবং ইহাতে বামপন্থী প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীগণ সাফল্য লাভ করিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইল এবং স্পেনকে "সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের প্রজাতন্ত্র" ("Republic of the workers of all classes") বলিয়া ঘোষণা করা হইল। তেইশ বৎসরের ঊর্ধ্বে সকল নর-নারীকে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হইল। এক কক্ষের একটি পার্লামেণ্ট (cortes) গঠিত হইল এবং চারি বৎসরের জন্য সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ইহার সদস্যগণকে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা হইল। পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যগণ ও ভোটদাতাদের নির্বাচিত সমসংখ্যক সদস্যগণকে লইয়া গঠিত একটি নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের সভাপতিকে ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থা হইল। কোন সামরিক কর্মচারী ও যাজক সভাপতির পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবে না বলিয়া ঘোষণা করা হইল। পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল একটি মন্ত্রিসভার হস্তে কার্যনির্বাহক (executive) ক্ষমতা অর্পিত হইল।

নূতন শাসনতন্ত্র (১৯৩১)

নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে কোন অঞ্চল স্বায়ত্তশাসনের দাবি করিলে উহা পার্লামেন্টের অনুমোদনের জন্য একটি আঞ্চলিক সনদ রচনা করিবে এবং পার্লামেন্ট ইচ্ছা করিলে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করিবে।

স্পেনের নূতন শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থা উহার পূর্বতন রাষ্ট্রব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। স্পেনের ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল এবং রাষ্ট্র হইতে চার্চকে পৃথক করা হইল। শিক্ষার ক্ষেত্রেও ধর্মের প্রভাব বিলুপ্ত করা হইল। রাষ্ট্রকে ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে সকল প্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল করার, জনসাধারণের প্রয়োজনীয় সকল কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত করার এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার অধিকার দেওয়া হইল। এক কথায় সমাজতন্ত্রের ভিত্তির উপর আধুনিক স্পেনের প্রতিষ্ঠা হইল।

রাষ্ট্রের ক্ষমতা

আধুনিক স্পেনের জন্ম

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জামোরা স্পেনের প্রজাতন্ত্রের প্রথম সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন। সামরিক সরকার পদত্যাগ করেন এবং আজনা (Azna)-র নেতৃত্বে একটি নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। জাতীয় সংবিধানসভা (Constituent Assembly) জাতীয় পার্লামেন্টে রূপান্তরিত হইল। ইহার পর প্রজাতান্ত্রিক সরকার সংস্কারকার্যে ব্রতী হন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জেসুইট সম্প্রদায়কে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং উহাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে "এ্যাসোশিয়েসন ল" (Association Law) নামে এক আইন পাস করিয়া বলা হইল যে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণকে অতঃপর স্পেনের নাগরিকগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত করিতে হইবে এবং স্পেনের আইন মানিয়া চলিতে হইবে। ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হইল। চার্চের সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইল। রাষ্ট্র কর্তৃক চার্চকে অর্থসাহায্য দান অতঃপর নিষিদ্ধ করা হইল।

ইহার পর প্রজাতান্ত্রিক সরকার কৃষি ও শ্রমিক সংস্কারে ব্রতী হন। স্পেনের অভিজাতদের ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল এবং এই সকল জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হইল। কলকারখানার শ্রমিকদের সুবিধার জন্য কারখানা আইন রচিত হইল, শ্রমিকদের কার্যের সময় নির্দিষ্ট করা হইল এবং উহাদের বেতনের হারও নির্দিষ্ট করা হইল।

ক্যাটালোনিয়ার (Catalonia) অধিবাসীদের দাবি অনুসারে উহার স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার স্বীকার করা হইল। নূতন সনদ অনুসারে ক্যাটালোনিয়ায় একটি রাজ্য সরকার গঠনের এবং ঐ সরকারকে আঞ্চলিক আইনকানুন রচনা করার অধিকার দেওয়া হইল। এইভাবে দীর্ঘকালব্যাপী অশান্তির পর ক্যাটালোনিয়ার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা হইল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ক্যাটালোনিয়ায় স্বতন্ত্র পার্লামেন্টের অধিবেশন বসিল।

১৬.৩. স্পেনে অন্তর্বিপ্লব (Civil War in Spain) : স্পেনের প্রজাতন্ত্র স্পেনের সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। দক্ষিণপন্থীগণ (Rightists) যেমন

যাজকগণ, রাজতন্ত্রীগণ ও অভিজাতগণ যাহাদের স্বার্থ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল প্রজাতন্ত্রের অবসান ও রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কামনা করিতেছিল। উগ্র বামপন্থীগণ (Extreme leftists) যেমন সিণ্ডিক্যালিস্ট ও কমিউনিস্টগণ সোভিয়েট রাশিয়ার অনুকরণে রাষ্ট্র গঠনের পক্ষপাতী ছিল। ১৯৩২ ও ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে রাজতন্ত্র ও কমিউনিস্টগণ প্রজাতন্ত্রী সরকারের পতন ঘটাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়।

ক্যাটালোনিয়া, মধ্য ও উত্তর স্পেনে বিদ্রোহ

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পার্লামেণ্টের নির্বাচনে নরম বামপন্থীগণের (যাহারা স্পেনের রাজতন্ত্রের অবসানের পর শাসনভার লাভ করিয়াছিল) পরাজয় ঘটিল এবং শিল্পপতিদের নেতা গিল্ রবলস্ (Gil Robles)-এর নেতৃত্বে ক্যাথলিক এবং ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সংযুক্ত দল জয়লাভ করিল। এই সংযুক্ত দলটি 'Catholic Popular Action Party' নামে পরিচিত ছিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে নূতন মন্ত্রিসভায় Popular Action দলের তিনজন সদস্য স্থান লাভ করিলেন। ইতিমধ্যে ক্যাটালোনিয়া বিদ্রোহী হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। মধ্য ও উত্তর স্পেনে বিদ্রোহ সংঘটিত হইল এবং ইহার ফলে বহু প্রাণনাশ ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইল।

কিন্তু বিপ্লবীদের মধ্যে সংহতি ও ঐক্য না থাকায় সর্বত্র তাহা সহজেই দমন করা হইল, হাজার হাজার বিপ্লবী বন্দী হইল এবং ক্যাটালোনিয়ার বিদ্রোহ দমন করা হইল। সর্বত্র সমাজতন্ত্রবাদী গভর্নর ও পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলির কাউন্সিলারগণকে পদচ্যুত করা হইল এবং মাদ্রিদ সরকারের প্রতি অনুগত এইরূপ ব্যক্তিগণকে তৎস্থলে নিযুক্ত করা হইল।

মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ও ১৯৩৬ সালের নির্বাচন

কিন্তু স্পেনে মন্ত্রিসভার দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। এক একটি মন্ত্রিসভা এক এক ধরনের আইনকানুন ও সংস্কার প্রবর্তন করিতে লাগিল। ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক দারুণ অনিশ্চয়তার উদ্ভব হইল। এই অবস্থায় প্রেসিডেণ্ট জামোরা পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ জারি করিলেন (জানুয়ারী ১৯৩৬ খ্রীঃ)। আসন্ন নির্বাচনে স্পেনের রাজনৈতিক দলগুলি মোটামুটিভাবে দুইটি বৃহৎ দলে বিভক্ত হইল। একদিকে রহিল বামপন্থীগণ—যেমন সিণ্ডিক্যালিস্ট, কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী ও বামপন্থী প্রজাতন্ত্রী। ইহাদের লক্ষ্য ছিল পার্লামেণ্টে দক্ষিণপন্থীদের প্রবেশে বাধা দেওয়া। কারণ দক্ষিণপন্থীগণ ছিল প্রজাতন্ত্রের ঘোর বিরোধী। অপরদিকে রহিল উগ্র দক্ষিণপন্থী, যাজক ও রাজতন্ত্রীগণ। নির্বাচনে বামপন্থীদের জয়লাভ হইল। সংযুক্ত বামপন্থীদের মধ্যে সমাজতন্ত্রীগণই অধিক সংখ্যক আসন লাভ করিল।

ম্যানুয়েল আজনা (Manual Azna) মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন। এই মন্ত্রিসভায় অধিকাংশই বামপন্থী প্রজাতন্ত্রী ও কিছু সমাজতন্ত্রী যোগদান করেন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পার্লামেণ্ট জামোরাকে পদচ্যুত করিয়া ম্যানুয়েল আজনাকে প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত করিল।

সংযুক্ত বামপন্থী সরকার আনুগত্যের সন্দেহে বহু সামরিক কর্মচারীকে পদচ্যুত করিলেন এবং অনেককে পেনশন লইয়া অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। যে সকল সামরিক কর্মচারীগণ রাজতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন তাঁহাদের দূরবর্তী স্পেনীয় উপনিবেশে স্থানান্তরিত করা হইল। জেনারেল ফ্রান্সিসকো-ফ্রাংকো (General Francisco-Franco)-কে কানারি দ্বীপপুঞ্জে (Canary Islands) প্রেরণ করা হইল। এই সকল ব্যবস্থার ফলে সামরিক বিভাগে এক দারুণ বিক্ষোভের উদ্ভব হইল এবং সমরনায়কগণ বর্তমান সরকারের পতন ঘটাইতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহারা বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যাজকসম্প্রদায়, উগ্রপ্রজাতন্ত্রী ও অভিজাতগণের সমর্থনলাভের আশা করিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা ইটালী ও জার্মানীর ফ্যাসিস্ট ও নাৎসীগণের সমর্থনেরও আশ্বাস সম্ভবতঃ লাভ করিয়াছিলেন।

সংযুক্ত সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে মরক্কোতে স্পেনীয় সৈন্যবাহিনী সর্বপ্রথম বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইল। বিদ্রোহীদের নেতা জেনারেল ফ্রাংকো মরক্কোয় আগমন করিয়া বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। স্পেনের অধিকাংশ সৈনিক ও সমরনায়কগণ বিদ্রোহীগণকে সমর্থন করিতেছিল। এতদ্ভিন্ন বিদ্রোহীগণ ইটালী ও জার্মানী হইতেও গোপন সাহায্য ও সমর্থন পাইতেছিল।

ফ্রাংকো কর্তৃক বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ

স্পেনের অতি সামান্যই সৈনিক ও সামরিক কর্মচারীগণ সরকারের পক্ষে ছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বামপন্থী সমাজতন্ত্রী ফ্রান্সিসকো-লার্গো-ক্যাবালেরো (Francisco Lergo Caballero) প্রধানমন্ত্রী-পদে নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহার মন্ত্রিসভায় সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টগণ মন্ত্রী হিসাবে যোগদান করিলেন। শ্রমিকগণকে লইয়া একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করা হইল এবং এই সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে মাদ্রিদ ও ক্যাটালোনিয়া রক্ষা পাইল। কিন্তু সরকার বাহিনী জেনারেল ফ্রাংকোর সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনীর গতিরোধ করিতে অসমর্থ হইল। স্পেন সরকারের রাজধানী ভেলেনশিয়ায় (Velencia) স্থানান্তরিত করা হইল। জার্মানী ও ইটালী বার্গোতে (Burgos) জেনারেল ফ্রাংকো কর্তৃক স্থাপিত সামরিক সরকারকে স্বীকার করিল। যদিও বিদ্রোহী বা 'জাতীয়তাবাদীগণ' (বিদ্রোহীগণ নিজেদের Nationalists—জাতীয়তাবাদী বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল) মাদ্রিদ দখল করিতে অসমর্থ হইল তথাপি জার্মানী ও ইটালীর নিকট হইতে প্রাপ্ত সৈন্যবাহিনী ও যুদ্ধাস্ত্রের সাহায্যে উহারা বিলবাও (Bilbao) নগরটি দখল করিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের মধ্যে জাতীয়তাবাদীগণ উত্তর-পশ্চিম স্পেনে অভিযান সম্পন্ন করিল এবং পূর্ব স্পেনে স্পেনীয় সরকারের বিরুদ্ধে সকল শক্তি নিয়োগ করিল। এইভাবে স্পেনে অন্তর্বিপ্লব চলিতে লাগিল।

১৬.৪. স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ (Foreign intervention in the Spanish Civil War) : স্পেনের অন্তর্বিপ্লব শীঘ্রই ইওরোপের অন্যান্য দেশগুলির উদ্বেগের কারণ হইল। ইওরোপে অপর একটি বলশেভিক রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইতে পারে এই আশঙ্কায় পর্তুগাল জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করিতে মনস্থ করিল। বৈদেশিক হস্তক্ষেপের মূলে সামরিক ও অর্থনৈতিক কারণের সহিত আদর্শবাদের প্রশ্নও জড়িত ছিল। জার্মানী ও ইটালী উপলব্ধি করিল যে স্পেনে ফ্যাসিস্ট শক্তি সাফল্য অর্জন করিলে তাহা প্রত্যক্ষভাবে জার্মানী ও ইটালীকে সাহায্য করিবে, কিন্তু তথায় বিপ্লববাদী আদর্শের সাফল্য ঘটিলে তাহা ফ্রান্স ও সোভিয়েট রাশিয়ার অনুকূল হইবে। এতদ্ভিন্ন জার্মানী ও ইটালী ইহাও উপলব্ধি করিল যে ফ্রাঙ্কোর জয়লাভ ঘটিলে স্পেনের অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন ব্যাপারে জার্মানী ও ইটালী কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবে। ইটালীর প্রতি মিত্রভাবাপন্ন স্পেনের ফ্যাসিস্ট দলের সাফল্য ঘটিলে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে ইটালীর প্রতিপত্তি স্থাপনের যথেষ্ট সম্ভাবনাও ছিল।

ইটালী, জার্মানী ও রাশিয়ার হস্তক্ষেপ

মুসোলিনী ও হিটলারের অভিসন্ধি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েট রাশিয়া স্পেনের প্রচলিত সরকারকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। ফ্রান্স ও ব্রিটেন প্রথমদিকে স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে মধ্যপন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিল। স্পেনের বহু অঞ্চলে ব্রিটেনের স্বার্থ যথেষ্ট ছিল। সুতরাং সেই সকল অঞ্চলে ফ্রাঙ্কো আধিপত্য বিস্তার করিয়া ব্রিটেনের স্বার্থ বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারেন এই আশঙ্কার বশবর্তী হইয়া ব্রিটেনের একদল জনসাধারণ ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু ব্রিটেনের শ্রমিকদল ও ট্রেড-ইউনিয়নগুলি স্পেনের প্রচলিত সরকারকে সাহায্য করার পক্ষপাতী ছিল। অপরদিকে ফ্রান্স মনে করিল যে স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করিলে ইটালী ও জার্মানী হয়ত স্পেনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইতে বিরত হইবে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স স্পেনের বিবদমান কোন পক্ষকেই যুদ্ধাস্ত্র দিয়া সাহায্য না করার নীতি প্রস্তাব করিল।

ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মনোভাব

স্পেনের অন্তর্বিপ্লব সমগ্র ইওরোপে বিস্তার লাভ করিবে এইরূপ আশঙ্কা শীঘ্রই দেখা দিল। এই অবস্থায় স্পেনের অন্তর্বিপ্লব স্পেনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গসহ ২৭টি ইওরোপীয় রাষ্ট্র স্পেনের ব্যাপারে 'না-হস্তক্ষেপ-নীতি' (Policy of Non-Intervention) গ্রহণ করিল। ইহার শর্তানুসারে স্পেনের বিবদমান কোন পক্ষকেই কোনরূপ সাহায্য না করিতে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রবর্গ সম্মত হইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইটালী, জার্মানী ও রাশিয়া গোপনে ও প্রকাশ্যভাবে স্পেনের বিবদমান দুই পক্ষকেই সাহায্য করিয়া যাইতে লাগিল। এই অবস্থায় 'না-হস্তক্ষেপ কমিটি' (Non-Intervention Committee)

ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে 'না-হস্তক্ষেপ চুক্তি' (Non-Intervention Agreement)

স্পেনে ব্রিটেনে, ফ্রান্স, ইটালী ও জার্মানীর যুদ্ধজাহাজের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিল এবং স্পেন হইতে বিদেশী স্বেচ্ছাসেবকগণকে অপসারণ করার নির্দেশ দিল। কিন্তু কার্যতঃ কমিটির নির্দেশ ইটালী ও জার্মানী অগ্রাহ্য করিল। জেনারেল ফ্রাংকোও 'না-হস্তক্ষেপ কমিটি'র নির্দেশ পালনে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং তিনি ইটালী ও জার্মানীর নিকট হইতে সাহায্য পাইতে লাগিলেন।

চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া ইটালী জার্মানী ও রাশিয়া কর্তৃক স্পেনের দুই পক্ষকে সাহায্য দান

১৬.৫. জাতীয়তাবাদীগণের সাফল্য (Victory of the Nationalists) : ইতিমধ্যে স্পেনের প্রচলিত সরকার ও ফ্রান্সের জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে সংঘর্ষ চলিতে লাগিল। জাতীয়তাবাদীগণ মাদ্রিদ, ভ্যালেন্‌শিয়া ও ক্যাটালোনিয়া বিপন্ন করিয়া তুলিলে স্পেন সরকারের রাজধানী ভ্যালেন্‌শিয়া হইতে বার্সিলোনায় (Barcelona) স্থানান্তরিত করা হইল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে স্পেনের প্রেসিডেণ্ট আজনা প্যারিসে পলায়ন করিলেন এবং বার্সিলোনার সরকারী সৈন্য-বাহিনী বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করিল। হাজার হাজার স্পেনবাসী ও স্পেন সরকারের অনুগত সৈনিকগণ ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই অবস্থায় স্পেনের প্রচলিত মন্ত্রিসভা জেনারেল ফ্রাংকো ও তাঁহার জাতীয়তাবাদীগণকে বাধা প্রদান করার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। স্পেন সরকারের সৈন্যবাহিনীর সর্বোচ্চ সেনাপতি জেনারেল মিয়াজা (Miaza) শান্তির জন্য আবেদন করিলেন। ইহার ফলে মাদ্রিদে কমিউনিস্টগণ বিদ্রোহী হইল এবং যথেচ্ছভাবে এক সপ্তাহ ধরিয়া হত্যাকাণ্ড ও গোলযোগ চলিল। এই অবস্থায় সেনাপতি মিয়াজা মাদ্রিদ ত্যাগ করিলেন এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে জেনারেল ফ্রাংকো সসৈন্যে মাদ্রিদে বিনা বাধায় প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ফ্রাংকো কর্তৃক স্থাপিত জাতীয়তাবাদী সরকারকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। এইভাবে স্পেনের অন্তর্বিপ্লবের অবসান ঘটিল এবং ফ্রাংকো ও জাতীয়তাবাদীগণ সাফল্য লাভ করিল।

জাতীয়তাবাদীগণের অগ্রগতি

প্রেসিডেণ্ট আজনার পলায়ন ও বার্সিলোনার পতন

জাতীয়তাবাদীগণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অবসান

মাদ্রিদে ফ্রাংকোর প্রবেশ ও অন্তর্বিপ্লবের অবসান (১৯৩৯)

১৬.৬. স্পেনে ফ্যাসিস্ট সরকার গঠন (Establishment of Fascist Government in Spain) : অন্তর্বিপ্লব চলিতে থাকাকালীন জেনারেল ফ্রাংকো স্পেনের রাজতন্ত্রী, অভিজাত, যাজক, সমরনায়ক প্রভৃতি বিভিন্ন দলগুলির সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি ভবিষ্যৎ কর্মসূচী রচনা করিয়াছিলেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয়তাবাদীগণ একটি শ্রমিক সনদ (labour charter) রচনা করিয়া অহা সমগ্র স্পেনে চালু করার কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। অন্তর্বিপ্লবের অবসানে

নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থা

স্পেনে সকল প্রকার শ্রমিকসংঘ বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা হইল। সকল শ্রমিক ও শিল্পমালিকগণকে লইয়া সিন্ডিকেট (Syndicate) বা সমবায় সংস্থা গঠন করা হইল এবং সকল শিল্পের উপর এই সংস্থার কর্তৃত্ব স্থাপন করা হইল। সামরিক কর্মচারী ও সরকারী কর্মচারীগণকে লইয়া একটি সমবায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইল। এই ব্যবস্থার সর্বোচ্চে রহিলেন 'নেতা' বা 'কডিলো' (Caudillo)। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে জেনারেল ফ্রাংকো 'কডিলো' পদে নির্বাচিত হইলেন। তাঁহাকে শাসনকার্যে সাহায্য করার জন্য একটি জাতীয় কাউন্সিল (National Council) গঠিত হইল।

প্রতিক্রিয়াশীল বিধিব্যবস্থা

স্পেনের নূতন সরকার একাধিক প্রতিক্রিয়াশীল আইন জারী করিলেন। অভিজাতগণকে উহাদের সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হইল, ক্যাথলিক চার্চের বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি পুনরায় মঞ্জুর করা হইল এবং ক্যাথলিক ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম রূপে স্বীকৃত হইল। যাজকগণকে উহাদের সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হইল এবং সকল শিক্ষায়তনে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইল।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ট মনোভাব

অভ্যন্তরীণ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই যে শুধু ফ্যাসিস্ট মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এমন নহে, স্পেনের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও এই মনোভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অন্তর্বিপ্লবের অবসানের পর জেনারেল ফ্রাংকো হিটলারের সহিত কমিণ্টার্ন-বিরোধী চুক্তিতে (Anti-Comintern Pact) স্বাক্ষর করেন এবং স্পেন লীগ-অফ-নেশনস্-এর সদস্যপদ ত্যাগ করে। জিব্রাল্টারের ব্যাপারে স্পেনের আক্রমণাত্মক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্পেন নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করিলেও ইটালী ও জার্মানীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল।

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত

১। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের অন্তর্বিপ্লবের পটভূমিকা বর্ণনা কর। [উঃ ১৬.২.]

২। স্পেনের অন্তর্বিপ্লবের কারণ কি ? [উঃ ১৬.৩.]

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও স্পেনীয় অন্তর্বিপ্লবের অন্তর্বর্তী কালে স্পেনের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [উঃ ১৬.১., ১৬.২.]

৪। স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। স্পেনের জাতীয়তাবাদীদের সাফল্যের কারণ কি ? [উঃ ১৬.৪., ১৬.৫.]

৫। স্পেনের প্রজাতন্ত্রের সংস্কারগুলি বর্ণনা কর। [উঃ ১৬.২.]

সপ্তদশ অধ্যায়

(নিকট ও মধ্য-প্রাচ্য)
(The Near and Middle East)

১৭.১. নিকট ও মধ্য-প্রাচ্য জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর সর্বত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রসার লাভ করে। অপরিপুষ্ট জাতীয়তাবাদ ছিল প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের অন্যতম কারণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আফ্রিকা, পশ্চিম ও মধ্য-এশিয়া, ভারত, চীন, জাপান প্রভৃতি বৈদেশিক প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন ও বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। ইহার ফলে ইওরোপের কয়েকটি রাষ্ট্রকে উহাদের বিজিত রাজ্যগুলির অধিবাসীদের জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সম্মুখীন হইতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সাফল্য অর্জন করে এবং বৈদেশিক শাসক-রাষ্ট্র বিজিত রাজ্যের অধিবাসীগণকে পূর্ণ-স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করিতে বাধ্য হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শাসক-রাষ্ট্র অস্ত্র প্রয়োগ করার পরিবর্তে শাসিত রাজ্যের অধিবাসীগণকে কিছু সুযোগ-সুবিধা মঞ্জুর করিয়া সাম্রাজ্যবাদী শাসন চালাইয়া যাইতে থাকে। সেই সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করা যায় যে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রাচ্যের অধিবাসীগণ সংগ্রাম করিতেছিল বটে, কিন্তু তথাপি উহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনেক কিছু গ্রহণ করিয়া আধুনিকতার পথে অগ্রসরও হইতেছিল। নিকট ও মধ্য-প্রাচ্যের উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্র হইল তুরস্ক, মিশর, পারস্য, প্যালেস্টাইন, আরব রাষ্ট্রগুলি ও ভারত।

১৭.২. তুরস্ক (Turkey) : মধ্য-প্রাচ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও এই অঞ্চলের দেশগুলির সহিত নানাবিষয়ে তুরস্কের পার্থক্য রহিয়াছে। ইওরোপের সংলগ্ন হওয়ায় বহুকাল পর্যন্ত তুরস্ক অন্যতম ইওরোপীয় রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত ছিল। ইওরোপের নানা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত আজিও তুরস্ক সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং তুরস্ককে আংশিক ইওরোপীয় ও আংশিক মধ্য-প্রাচ্যের রাষ্ট্র বলিলে ভুল হইবে না। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংহতি এবং সামরিক শক্তির দিক দিয়া তুরস্ক আজিও মধ্য-প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি।

জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে তুরস্কের ইতিহাস শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সর্বপ্রথম তুরস্কেই ইওরোপীয় প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংগঠিত হয়। সেভ্রের সন্ধি (Treaty of Sevres) দ্বারা তুরস্ক সাম্রাজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি করা হইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করায় মিত্রশক্তি তুরস্ককে কঠোরভাবে শাস্তিদান করিয়াছিল। এই সন্ধির দ্বারা তুরস্কের ভৌমিক অধিকার বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছিল। গ্রীসের হস্তে থ্রেস প্রদেশ, স্মার্না ও এশিয়া মাইনর অঞ্চল সমর্পণ করা হইয়াছিল, ইজমির-এ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে তুরস্কের দুরবস্থা

(Izmir) গ্রীক সৈন্য মোতায়েন করা হইয়াছিল ; আর্মেনিয়াকে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করা হইয়াছিল এবং দার্দানেলিস ও কৃষ্ণসাগরকে নিরপেক্ষ অঞ্চলে পরিণত করা হইয়াছিল। এইভাবে একদা সুবিস্তৃত তুরস্ক সাম্রাজ্যকে কনস্টান্টিনোপল ও আনাটোলিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। ভীতি প্রদর্শন করিয়া মিত্রশক্তি তুরস্কের সুলতানকে উক্ত সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু তুরস্কের জাতীয়তাবাদীগণ তাহা স্বীকার করে নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্কের তরুণ নেতা সেনাপতি মুস্তাফা কামাল-এর নেতৃত্বে তুরস্কের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে এবং সেভ্রের সন্ধির অপমান অস্ত্রের সাহায্যে মুছিয়া ফেলিয়া তুরস্ক নূতন শক্তি লইয়া পুনরায় বিশ্বের দরবারে উপস্থিত হয়। সুতরাং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শুরু হয় তুরস্কের নবজাগরণ।

মুস্তাফা কামাল, ১৮৮০-১৯৩৯ (Mustapha Kemal) : ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মুস্তাফা কামাল সালোনিকায় জন্মগ্রহণ করেন। গণিতশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি 'কামাল' বা 'সফল' (Successful) উপাধি লাভ করেন। অল্পবয়সে তিনি কনস্টান্টিনোপল-এর সামরিক শিবিরে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি সুলতানের স্বৈরাচারী শাসনের তীব্র নিন্দা করেন এবং কিছুদিনের জন্য তরুণ তুর্কী (Young Turks) দলে যোগদান করেন। কিন্তু এই দলের কার্যকলাপ ও নীতি তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায় তিনি 'বতন' (বা 'পিতৃভূমি') নামে একটি গোপন সমিতি গঠন করেন। কামালের উদ্দেশ্য ছিল তুর্কী শাসনের অব্যবস্থা ও অকর্মণ্যতা দূর করিয়া দেশকে নূতনভাবে গড়িয়া তোলা। অতঃপর তিনি উচ্চতর সামরিক শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে গমন করেন। ১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী ও বল্কান রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে তুরস্কের যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়া কামাল তাঁহার সামরিক দক্ষতার পরিচয় দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরাজবাহিনী গ্যালিপলি আক্রমণ করিলে (১৯১৫ খ্রীঃ) কামাল ইংরাজবাহিনীকে বাধা দিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। যুদ্ধের পর মিত্রশক্তি তুর্কী-সুলতানকে সেভ্রের সন্ধি নামক এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিলে কামাল অত্যন্ত বেদনা অনুভব করেন। তিনি চতুর্থ সুলতান মোহম্মদকে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্ররোচিত করেন। কিন্তু দুর্বলচিত্ত সুলতান ইহাতে অসম্মত হন। ইহার প্রতিবাদস্বরূপ কামাল পদত্যাগ করেন।

অতঃপর কামাল আনাটোলিয়ায় গমন করিয়া এক সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। ইহার পর তিনি এক জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী পার্লামেন্টের নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দল জয়লাভ করিয়া পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

কামালের জাতীয়তাবাদী দল

পার্লামেন্টে এই দলের দাবি ছিল : (১) সেভ্রের সন্ধি-দ্বারা বিলুপ্ত তুরস্কের সকল ভূখণ্ডের প্রত্যর্পণ, (২) পূর্ব থ্রেস-এ গণভোট গ্রহণ, (৩) কনস্টান্টিনোপল-এর নিরাপত্তা এবং (৪) তুরস্ক হইতে বিদেশী সৈন্যবাহিনী অপসারণ। কিন্তু মিত্রশক্তির চাপে পড়িয়া তুর্কী-সুলতান

পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দেন ও জাতীয়তাবাদীগণকে নিন্দা করেন। এই অবস্থায় জাতীয়তাবাদীগণ আনকারায় (Ankara) এক জাতীয়-পরিষদ আহ্বান করিয়া এক সাধারণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করে। কামাল ইহার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন এবং জাতির পরিচালনার দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হয়।

জাতীয়-পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াই কামালের প্রথম কাজ হইল তুরস্ক হইতে বিদেশী সৈন্যবাহিনীর অপসারণ করা। তিনি ইটালীর সৈন্যবাহিনীকে আনাটলিয়া ও ফরাসীবাহিনীকে সিলিসিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত এক বন্দোবস্তের ফলে কার্স ও আর্দাহান প্রদেশ দুইটি রাশিয়া তুরস্ককে প্রত্যর্পণ করে। সমগ্র তুর্কীজাতি কামাল পাশাকে জাতির জনক বা 'আতাতুর্ক" বলিয়া অভিনন্দিত করে।

গ্রীকদের সহিত যুদ্ধ

ইহার পর কামাল পাশা গ্রীকদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। সেভ্রের সন্ধি দ্বারা গ্রীস যথেষ্ট লাভবান হইয়াছিল। এই সন্ধির ফলে গ্রীক থ্রেস হইতে তুর্কীগণকে বিতাড়িত করিয়া স্মার্না (Smyrna) দখল করিয়াছিল। গ্রেটব্রিটেন কর্তৃক সমর্থনপুষ্ট হইয়া গ্রীস তুরস্ক আক্রমণ করে এবং জাতীয়তাবাদীগণকে পরাজিত করিয়া আনাটলিয়ার এক বৃহৎ অংশ দখল করিয়া লয়। কামালের নেতৃত্বে তুরস্কের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গ্রীকগণ ভীতির চোক্ষেই দেখিয়াছিল। সুতরাং এই আন্দোলনকে সমূলে বিনষ্ট করার অভিপ্রায়ে গ্রীকগণ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক আক্রমণ করিয়া সাধারণতান্ত্রিক সরকারের রাজধানী আনকারা দখল করার উপক্রম করে। কিন্তু কামালের পরিচালনাধীনে জাতীয়তাবাদী সৈন্যবাহিনী তাহা প্রতিরোধ করিয়া স্মার্না দখল করিয়া লয় এবং এশিয়া মাইনর হইতে সমস্ত গ্রীক সৈন্য ও অধিবাসীগণকে বিতাড়িত করে।

তুরস্কের প্রজাতন্ত্র স্থাপন (১৯২৩)

এইরূপে সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া কামাল অতঃপর থ্রেস হইতে গ্রীকগণকে বিতাড়িত করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি প্রদর্শন করিলে কামাল নিরস্ত হন এবং সন্ধি করিতে সম্মত হন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের জাতীয়-পরিষদ তুরস্কের সুলতানের পদ বিলুপ্ত করে এবং তুরস্কে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। কামাল পাশা এই প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি নির্বাচিত হন। সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদ পলায়ন করিয়া লণ্ডনে আশ্রয় লন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে খিলাফতের বিলুপ্তি ঘটে এবং উহার পরিবর্তে সুলতানি প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশেষে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সুলতানির বিলুপ্তি ঘটে এবং তুরস্কে পুনরায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

কামাল পাশা প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট ঃ খিলাফতের অবসান

গ্রীকগণের বিরুদ্ধে কামাল সাফল্যলাভ করিলে মিত্রশক্তি সেভ্রের সন্ধি পুনর্বিবেচনা করিতে বাধ্য হয় এবং এই উদ্দেশ্যে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে লুসান বৈঠকে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, জাপান, আমেরিকা, রাশিয়া, গ্রীস, রুমানিয়া,

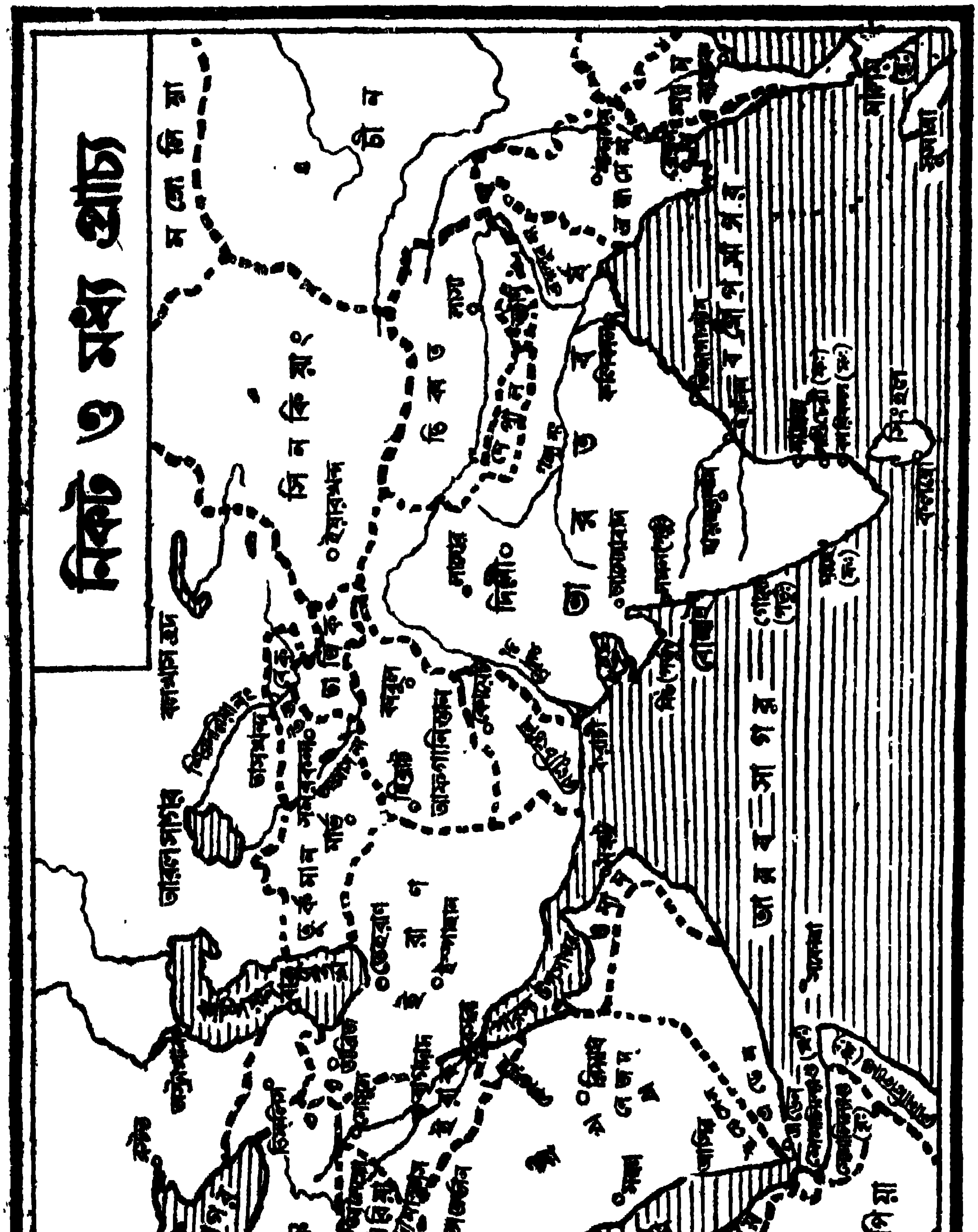
নিকট ও মধ্য প্রাচ্য

যুগোশ্লাভিয়া ও তুরস্কের প্রতিনিধিবর্গ মিলিত হন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নূতন সন্ধির খসড়া রচিত হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুরস্কের প্রতিনিধিগণ উহা স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হওয়ায় বৈঠকের কাজ কিছুদিনের জন্য মুলতুবি রহে। ২৪শে এপ্রিল পুনরায় বৈঠকের অধিবেশন বসে এবং বহুলাংশে তুরস্কের দাবি মিত্রশক্তি কর্তৃক স্বীকৃত হইলে ২৪শে জুলাই (১৯২৩ খ্রীঃ) লুসানের সন্ধি (Treaty of Lousanne) স্বাক্ষরিত হয়।

লুসানের সন্ধি (১৯২৩)

এই সন্ধি অনুযায়ী তুরস্ক থ্রেস ও আদ্রিয়ানোপল ফিরিয়া পায়, কিন্তু মেসোপটেমিয়া, আরাবিয়া, সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইন তুরস্কের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হয়। (২) লিবিয়া, মিশর এবং সুদানের উপর সকল কর্তৃত্ব ও অধিকার তুরস্ক পরিত্যাগ করে এবং ইংল্যান্ড কর্তৃক সাইপ্রাস অধিকার স্বীকার করিয়া লয়, (৩) তুরস্ক সংখ্যালঘু অধিবাসীগণকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হয়, (৪) তুরস্ক হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারিত হয় এবং তুরস্কের সামরিক, নৌ ও বিমান বাহিনীর উপর হইতে সকল বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হয়।

লুসানের সন্ধির পর কামাল পাশা তুরস্কের 'ডিক্টেটর' বা সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। তিনি একটি লিখিত সংবিধান রচনা করেন এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি জাতীয়-পরিষদ গঠন করেন। সকল ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কামালকে হত্যা করিবার জন্য একটি বিরোধী দল প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। ১৯২৬ ও ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে দুইবার তাঁহাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় এবং ষড়যন্ত্রকারীগণকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। শেষ পর্যন্ত তুরস্কের অধিকাংশ নরনারী কামালের সর্বাত্মক ক্ষমতা স্বীকার করিয়া লয়।

কামাল তুরস্কের সর্বাধিনায়ক

কামাল সকল ক্ষমতা হস্তগত করিয়া ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয়-পরিষদের সকল প্রার্থীকে স্বয়ং মনোনীত করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফতী-বে (Fethe bey) নামে জনৈক উদারপন্থী নেতাকে বিরোধী দল গঠনের অনুমতি দান করেন। ফতী-বে উদারপন্থী প্রজাতন্ত্রী দল (Liberal Republic Party) গঠন করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন।

পর পর চারিবার কামাল আতাতুর্ক সর্বসম্মতিক্রমে প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। জাতীয়-পরিষদ তুরস্কের সমরনায়ক ইসমেত্ ইননু (Ismet Inonu)-কে প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত করে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ইননু সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি ও সম্প্রীতি স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তিনি তুরস্কের স্বার্থ রক্ষা করার ব্যাপারেই অধিক যত্নবান ছিলেন।

কামালের অভ্যন্তরীণ সংস্কার (Internal Reforms of Kemal) : কামাল বহুবিধ সংস্কার প্রবর্তন করিয়া তুরস্ককে নূতন করিয়া আধুনিক ভাবে গড়িয়া তোলেন। পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণে তিনি তুরস্ককে নবরূপে রূপান্তরিত করেন।

তুরস্ককে বৈদেশিক প্রভাব হইতে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে কামাল প্রথমেই তুর্কী-শহরগুলির নাম পরিবর্তন করেন যেমন কনস্টান্টিনোপল-এর নূতন নামকরণ হইল ইস্তানবুল (Istanbul), অঙ্গোরার নামকরণ হইল আনকারা (Ankara), স্মার্নার নামকরণ হইল ইজমির (Izmir) ইত্যাদি। তুরস্কের রাজধানী বসফোরাস হইতে আনকারায় স্থানান্তরিত করা হইল। আরবীভাষা রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃত হইল।

শহরগুলির নূতন নামকরণ

ধর্মের ক্ষেত্রেও সংস্কার প্রবর্তিত হয়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয়-পরিষদ তুর্কী খিলাফতের অবসান ঘোষণা করিয়া পূর্বতন ওসমান রাজবংশের পরিবারবর্গকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিল। মুসলমানজগতে খিলাফতের অবসান এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহার ফলে মুসলমানদের এক বৃহদংশ উহাদের ধর্মগুরুকে হারাইল। ইহা সত্য যে বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই অতুর্কী মুসলমান যথা পারস্যের সিয়া মতাবলম্বীগণ তুর্কীর খলিফাকে স্বীকার করিত না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও খলিফার প্রতি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি অধিকাংশ মুসলমানেরই ছিল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণার পরেও খলিফাপদের জন্য প্রার্থীর অভাব দেখা দেয় নাই। হেজাজের রাজা, মিশরের রাজা, মরক্কোর সুলতান ও বোম্বাই-এর আগা খাঁ প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ খলিফাপদ লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যদিও ইসলাম তুর্কীদের প্রধান ধর্ম রহিল তথাপি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সকল ধর্মের সম-অধিকার স্বীকৃত হইল। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ইসলাম, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হইল।

ধর্মসংস্কার

সামাজিক জীবনে বহুবিধ সংস্কার প্রবর্তিত হইল। বহুবিবাহ-প্রথা নিষিদ্ধ হইল এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ স্বীকৃত হইল। পাশ্চাত্য পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবহার প্রচলিত হইল এবং ফেজ্-টুপীর ব্যবহার নিষিদ্ধ হইল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে নারীগণ ভোটাধিকার লাভ করিল এবং সরকারী চাকুরি উহাদের নিকট উন্মুক্ত করা হইল।

সামাজিক সংস্কার

শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারেও কামাল উৎসাহী ছিলেন। প্রথমদিকে অর্থ ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব থাকিলেও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল এবং সতেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হইল। চল্লিশ বৎসরের নিম্নে তুরস্কের সকল নাগরিককে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইল।

শিক্ষাসংস্কার

পাশ্চাত্যের অনুকরণে কামাল তুরস্কের অর্থনৈতিক জীবন উন্নততর করিতেও যত্নবান হন। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে কয়েকটি বিশেষ বিভাগের প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুল্কপ্রাচীরের সৃষ্টি করিয়া তুরস্কের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা হয়। বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থসাহায্য করার উদ্দেশ্যে একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করা হয়। অল্প সময়ের

অর্থনৈতিক সংস্কার

মধ্যে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ও ডাক বিভাগ স্থাপিত হয় এবং ডক ও পোতাশ্রয় নির্মিত হয়। শিল্পের প্রসারকল্পে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

কামালের পররাষ্ট্র-সম্পর্ক (Kemal's foreign Relations) : প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর তুরস্কের প্রতি কঠোর ব্যবহার হেতু পশ্চিমী দেশগুলির সম্পর্কে মুস্তাফা কামাল সন্দিহান ছিলেন। সুতরাং তুরস্কের নিরাপত্তার জন্য তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনে ব্রতী হন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাশিয়ার সহিত পারস্পরিক নিরাপত্তা ও নিরপেক্ষতামূলক সন্ধি সম্পন্ন করেন। কিন্তু রুশ-কমিউনিস্টদের সাম্যবাদী আদর্শের প্রচার ও অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হইয়া কামাল পশ্চিমী দেশগুলির সান্নিধ্যে আসেন ও লীগ-অফ-নেশনস্-এ যোগদান করেন। ইহার পর তিনি মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলির সহিত মিত্রতা সুদৃঢ় করেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীস, রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে সম্পাদিত বল্কান-চুক্তিতে কামাল যোগ দেন। ইহার অনতিকাল মধ্যেই তুরস্ক, ইরাক, ইরান ও আফগানিস্থানের মধ্যে প্রাচ্য-চুক্তি (Eastern Pact) সম্পাদিত হয়। ইহার শর্তানুসারে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করার ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারে পরস্পরের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে সম্মত হয়। তুরস্কের শান্তি-নীতিতে পশ্চিমী দেশগুলি সন্তুষ্ট হয় এবং তুরস্ক প্রণালী পুনরায় সুরক্ষিত করার অধিকার তুরস্ককে দেওয়া হয় যাহা লুসানের সন্ধি দ্বারা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল।

১৭.৩. মিশর (Egypt)

মধ্য-প্রাচ্যের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্র হইল মিশর। ইহা পশ্চিমে লাইবিয়া, দক্ষিণে সুদান, উত্তরে ভূমধ্যসাগর ও পূর্বে লোহিত সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। নীল নদ ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে যথা, পশ্চিম মরুভূমি ও পূর্ব মরুভূমি। ইহার অধিবাসীদের শতকরা ৯৫ ভাগ নীল নদের উপত্যকায় বসবাস করে। মিশরের রাষ্ট্রধর্ম হইল ইসলাম এবং রাষ্ট্রভাষা হইল আরবীয়। ইহার অধিবাসীদের শতকরা ৯৮ ভাগ হইল ইসলামধর্মী এবং অবশিষ্টাংশ খ্রীষ্টধর্মী ও ইহুদী। দুইটি জলধারা মিশরের ইতিহাসকে বিশেষ গুরুত্ব দান করিয়াছে (নীল নদ ও সুয়েজ খাল)। মিশরকে 'নীল নদের দান' (Gift of the Nile) বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে নীল নদকে কেন্দ্র করিয়াই মিশরের ইতিহাস, সভ্যতা ও সম্পদ গড়িয়া উঠিয়াছে। যেমন টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস জলধারাকে কেন্দ্র করিয়া সুমেরীয় সভ্যতা এবং সিন্ধু নদকে কেন্দ্র করিয়া সিন্ধু-সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল তেমনই নীল নদকে কেন্দ্র করিয়া মিশরীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত মিশরের অধিবাসীদের শতকরা ৬০ ভাগ ছিল কৃষিজীবী এবং অবশিষ্টাংশ ভূমিহীন শ্রমজীবী।

পরিচয়

ব্রিটেনের নিকট মিশরের সামরিক গুরুত্ব অত্যধিক। কারণ প্রাচ্যের সহিত ব্রিটেনের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হইল মিশর। মিশরের ভিতর দিয়া প্রবাহিত সুয়েজ খাল ব্রিটেনের পরিবহণ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের নিকটও মিশরের সামরিক গুরুত্ব কম নয়। এই কারণে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ মিশর পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেও মিশর হইতে সৈন্যবাহিনী অপসারণ করিতে প্রথমে অসম্মত হইয়াছিল। পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের এইরূপ মনোভাব প্যালেস্টাইনের সমস্যা অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছিল এবং সুয়েজ খালের ভবিষ্যৎ লইয়াই জাতীয়তাবাদী মিশরীয়দের সহিত পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের বিরোধের উদ্ভব হইয়াছিল।

ব্রিটেনের নিকট মিশরের সামরিক গুরুত্ব

ষোড়শ শতাব্দী হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মিশর তুরস্কের শাসনাধীন ছিল। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মিশরের তুর্কী-শাসনকর্তা মহম্মদ আলি 'খেদিভ' (Khedive) উপাধি ধারণ করিয়া একরূপ স্বাধীন হইয়াছিলেন তথাপি আইনত তিনি ছিলেন তুর্কী-সুলতানের অধীনে। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন মিশর আক্রমণ করিয়া ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্যে মিশরে সৈন্যশিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। তুর্কী ও ব্রিটেনের যুগ্ম প্রচেষ্টার ফলে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে মিশরে ফরাসী প্রভুত্বের অবসান ঘটে। ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের প্রয়োজনে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজ খালের খননকার্য শেষ হয় এবং ফলে আন্তর্জাতিক নীতির ক্ষেত্রে মিশরের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মিশরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করিলে ব্রিটেন মিশরে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করে এবং সেই সময় হইতে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মিশর ব্রিটেনের রক্ষণাধীনে রহে। অতঃপর মিশরে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিয়া ব্রিটেন উহা দখল করে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যোগদান করিলে জার্মানীর প্রতি সহানুভূতিশীল মিশরে ব্রিটেনের শাসন ঘোষিত হয়। ব্রিটেনের সমর্থনপুষ্ট প্রিন্স হুসেন কামিলকে মিশরের সুলতান-পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা প্রথম ফাউদ (Fuad 1) মিশরের রাজা বলিয়া স্বীকৃত হন।

মিশরে ব্রিটেনের প্রভুত্ব স্থাপন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ইংরাজ সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের অত্যাচারে এবং দারুণ খাদ্যাভাবে অতিষ্ঠ হইয়া মিশরীয়গণ উহাদের জনপ্রিয় নেতা সাদ্ জগলুল-এর (Saad Zaghlul) নেতৃত্বে মিশরের স্বাধীনতা দাবি করে। জগলুল পাশা মিশরে ব্রিটিশ হাই-কমিশনার (High Commissioner) উইনগেটের (Wingate) সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিশরের স্বাধীনতা দাবি করেন এবং প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে একদল মিশরীয় প্রতিনিধির যোগদানের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। সিরিয়া, হেজাজ (অধুনা সৌদি-আরাবিয়া) ও এমন কি সাইপ্রাসকেও প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজ

সরকার জগলুল পাশার আবেদন অগ্রাহ্য করিলে জগলুল পাশা প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মিশরে ইংরাজদের বিরুদ্ধে এক দারুণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। এই অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার মিশরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তদন্তের জন্য লর্ড মিলনার (Milner)-এর সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। মিলনার কমিশন মিশরে ইংরাজ শাসনের অবসান, মিশরের স্বাধীনতা এবং মিশরে ব্রিটিশ ও অপরাপর ইওরোপীয় দেশগুলির স্বার্থ-সংরক্ষণের সুপারিশ করেন। মিলনার কমিশনের এই সুপারিশগুলি ব্রিটিশ সরকার বা মিশরীয়দের মনঃপুত হইল না।

মিলনার কমিশন (১৯১৯)

কিছুদিন উভয় পক্ষে আলাপ-আলোচনা চলিবার পর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কতকগুলি শর্তে মিশরের স্বাধীনতা ও মিশরে ইংরাজ শাসনের অবসানের কথা ঘোষণা করেন। মিশরের সুলতানকে 'রাজা' বলিয়া স্বীকার করা হয়, মিশরকে বৈদেশিক রাষ্ট্রে কূটনৈতিক প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও ঘোষণা করা হয় যে ভবিষ্যতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত মিশরে ব্রিটেনের কতকগুলি বিশেষ অধিকার বজায় থাকিবে; যথা, (১) মিশরে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন, (২) বৈদেশিক আক্রমণ ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মিশরের প্রতিরক্ষা, (৩) মিশরে বৈদেশিক দেশগুলির স্বার্থ-সংরক্ষণ এবং (৪) সুদান। ব্রিটিশ সরকারের এই সিদ্ধান্ত একতরফা হওয়ায় মিশরীয় সরকার ইহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। যাহা হউক, মিশরে ইংরাজ শাসনের অবসান ঘটিল বটে, কিন্তু তথায় ইংরাজদের সামরিক প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রহে। মিশরের প্রতিরক্ষার ও তথায় বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ-সংরক্ষণের দায়িত্ব ইংরাজ সরকারের হস্তেই ন্যস্ত রহে। ইংরাজ সরকারের মিশরীয়-নীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে ইংরাজ ঐতিহাসিক টয়েনবী (Toynbee) মন্তব্য করিয়াছেন, "The granting of independence to Egypt was so limited by these reservations that it amounted in fact to less than Dominion Status."

মিশরের স্বাধীনতা স্বীকার (১৯২২)

১৯২৪ হইতে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মিশরীয় সমস্যার সমাধানের জন্য উভয় পক্ষে কয়েকবার চেষ্টা হয়। কিন্তু প্রতিটি চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে জগলুল পাশা সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে তিনি মিশরের পূর্ণ-স্বাধীনতা, মিশর হইতে ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর অপসারণ এবং মিশরের সহিত সুদানের সংযুক্তিকরণের জন্য আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু তাহা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইতিমধ্যে সুদানের ইংরাজ গভর্নর-জেনারেল ও কায়রোতে মিশরীয় বাহিনীর অধিনায়ক সার লী স্টক (Sir Lee Stack) আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে মিশরে নূতন করিয়া গোলযোগের উদ্ভব হয়। ব্রিটেন ও মিশরের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে। রাজা ও প্রধানমন্ত্রী

ইঙ্গ-মিশরীয় সংঘর্ষ

জগলুল এই দুর্ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া আততায়ীগণকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ব্রিটেন ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ২২শে নভেম্বর মিশরীয় সরকারের নিকট এক চরম পত্র প্রেরণ করিয়া (১) আততায়ীগণের শাস্তি, (২) সকল প্রকার রাজনৈতিক মিছিলের নিষেধাজ্ঞা, (৩) ক্ষতিপূরণ ও (৪) সুদান হইতে মিশরীয় সৈন্য বাহিনীর অপসারণ দাবি করে। জগলুল পাশা একমাত্র সুদান সম্পর্কিত দাবি ছাড়া আর সকল দাবিই মানিয়া লইতে সম্মত হন। কিন্তু ব্রিটেন ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া মিশরীয় সরকারের উপর চাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আলেকজান্দ্রিয়া শহর দখল করে। ইহার প্রতিবাদে জগলুল ও ওয়াফদ্ দল (Wafd Party) পদত্যাগ করিলে রাজা ফুয়াদ স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন।

লী-স্টকের হত্যা ও মিশরের নিকট ব্রিটেনের দাবি

জগলুলের পদত্যাগ

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া উদার-পন্থীদলের নেতা আব্দুল খালিক সারওয়াৎ (Abdul Khalik Sarwat) ওয়াফদ্ দলের সহিত যুগ্মভাবে সরকার গঠন করিলে সারওয়াৎ পাশা লণ্ডনে আগমন করিয়া পররাষ্ট্রসচিব চেম্বারলেন-এর সহিত আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত ইহা স্থির হয় যে মিশরের প্রতিরক্ষার জন্য তথায় ইংরাজ সৈন্যবাহিনী মোতায়েন থাকিবে, ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণে মিশরীয় পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হইবে এবং লীগ-অফ-নেশনস্-এর সদস্যপদের জন্য ব্রিটেন মিশরকে সমর্থন করিবে। কিন্তু নাহাশ পাশার নেতৃত্বে মিশরীয়গণ এই চুক্তির বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ শুরু করে এবং ইহার ফলে সারওয়াৎ পদত্যাগ করেন এবং নাহাশ ওয়াফদ্ দলের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু শীঘ্রই মিশরের রাজা ও ব্রিটিশ হাই-কমিশনারের সহিত তাঁহার মতান্তর ঘটিলে তিনি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে পদচ্যুত হন।

পরবৎসর নাহাশ পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের সহিত আপোস করার চেষ্টা করিলে মিশরীয়গণ তাঁহাকে দেশদ্রোহী বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ শুরু করে। ফলে নাহাশ প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন এবং ইসমাইল সিদ্কি (Ismail Sidqi) সেই পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মিশরীয় ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে পুনরায় আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। সেই বৎসরের আগস্ট মাসে ইঙ্গ-মিশরীয় সন্ধি (Anglo-Egyptian Treaty, 1936) স্বাক্ষরিত হয়। ইহার শর্তানুসারে (১) এই সন্ধির মেয়াদ কুড়ি বৎসরের জন্য স্থির হয়, (২) ব্রিটেন মিশর হইতে উহার সৈন্যবাহিনী অপসারণ করিতে স্বীকৃত হয়। তবে স্থির হয় যে কুড়ি বৎসরের জন্য ইংরাজবাহিনী সুয়েজখালে মোতায়েন থাকিবে, (৩) যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষ পরস্পরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে এবং (৪) ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি (Anglo-Egyptian Condominium) অনুসারে সুদানের উপর ব্রিটেন ও মিশরের যুগ্ম শাসন অব্যাহত থাকিবে স্থির হয়। যদিও এই সন্ধি মিশরের জাতীয় স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে

ইঙ্গ-মিশরীয় সন্ধি (১৯৩৬)

চরিতার্থ করিতে পারে নাই তথাপি তৎকালীন পরিস্থিতিতে এই সন্ধি মিশরীর সমস্যার কিছুটা সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে মিশর জার্মানীর সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে—যদিও মিশর ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এক্সিস (Axis) পক্ষের বিরুদ্ধে সরকারীভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই। ১৯৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দে মিশরে জার্মানী ও ইটালীর আক্রমণের দ্রুত সম্ভাবনা দেখা দিলে মিশর ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হয়। কিন্তু ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজগণ এল-এলামিন (El-Alamein)-এর যুদ্ধে জয়লাভ করিলে মিশরে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। মিশরের স্বার্থের দিক দিয়া মিশরীয়গণ এই যুদ্ধকে অনর্থক মনে করে এবং মিশরে ফ্যাসিস্টদের প্রতি সহানুভূতি উত্তরোত্তর প্রকাশ পাইতে থাকে। এমন কি ইটালী জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিলেও মিশরীয়গণ ইটালীর সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিতে অসম্মত হয়। এই অবস্থায় ব্রিটেনের চাপে রাজা ফারুক (Farouk) নাহাশ পাশাকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। নাহাশ পাশা যুদ্ধের অবশিষ্টকাল পর্যন্ত ব্রিটেনের প্রতি অনুগত ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মিশরের সর্বত্র ব্রিটেনের বিরুদ্ধে এক দারুণ বিক্ষোভের উদ্ভব হয়। ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর অত্যাচারে মিশরীয়গণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে থাকে। এই অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে জেনারেল নেগুইব (General Neguib) তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "During the War we suffered countless humiliations at the hands of the British who failed and still, fail to understand that our national interests are not and can never be the same as theirs......They molested our women, assulted our men and committed acts of vandalism in public places."—(Egypt's Destiny—P. 84)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মিশর

১৯১৯ হইতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মিশর সম্পূর্ণরূপে ব্রিটেনের পরিচালনাধীন ছিল। ব্রিটিশ সরকারের খেয়াল-খুশির উপর মিশরের মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল। যুদ্ধশেষে মিশরে পুনরায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে এবং মিশর ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি বাতিল করার দাবি করে। কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ায় গণ-বিক্ষোভ সংঘটিত হয় এবং নোকরাশি পাশার (Nuqrashi Pasha) মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী সিদ্কী পাশা (Sidqi Pasha) ব্রিটেনের সহিত আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু এই আলাপ-আলোচনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মিশর নিরাপত্তা-পরিষদ-এর (Security Council) নিকট মিশর হইতে বৈদেশিক সৈন্যবাহিনীর অপসারণ ও সুদানে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের দাবি জানায়। কিন্তু নিরাপত্তা-পরিষদ শেষ পর্যন্ত কোন মীমাংসামূলক প্রস্তাব গ্রহণে অসমর্থ হয়।

মিশরে পুনরায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে মিশরীয় পার্লামেণ্ট ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ইঙ্গ-মিশরীয় সন্ধি বাতিল করার কথা ঘোষণা করে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে মিশরীয় সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল নাগুইব (General Naguib) বলপূর্বক রাজা ফারুককে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া সামরিক একনায়কতন্ত্র (Military Dictatorship) প্রতিষ্ঠা করেন।

নাগুইব-এর সামরিক একনায়কতন্ত্র স্থাপন (১৯৫২)

১৭.৪. প্যালেস্টাইন (Palestine)

পশ্চিম এশিয়ায় ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত প্যালেস্টাইন বা ইজরাইল (Israeil) হইল একটি প্রজাতন্ত্র। ইহার রাজধানী হইল জেরুজালেম। বহুকাল যাবৎ প্যালেস্টাইনের সীমানা সুনির্দিষ্ট ছিল না। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে লেবানন, সিরিয়া, মিশর ও জোরডানের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে প্যালেস্টাইনের সীমানা মোটামুটিভাবে স্থির করা হইয়াছে। প্রায় দুই হাজার বৎসর ধরিয়া প্যালেস্টাইন মধ্য-প্রাচ্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্যালেস্টাইন হইল তিনটি ধর্মের উৎপত্তিস্থল। মোজেস (Moses) ইহুদীগণকে মিশরীয়দের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া প্যালেস্টাইনে আগমন করার সময় হইতে প্যালেস্টাইনের ইতিহাস শুরু হইয়াছে। ক্রমশঃ ইহা খ্রীষ্টানজগতের পবিত্র ভূমিতে পরিণত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৬৫ অব্দ হইতে ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্যালেস্টাইন রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ইহার পর একশত বৎসর (১০৯৮-১১৮৭ খ্রীঃ) খ্রীষ্টানদের দখলে থাকিবার পর ইহা তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং বিভিন্ন সময়ে প্যালেস্টাইন বৈদেশিক সাম্রাজ্যের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে প্যালেস্টাইনে স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের জন্য আন্দোলন শুরু হয় এবং এই আন্দোলন 'জিওনিজম' (Zionism) নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল প্যালেস্টাইনে ইহুদীগণকে পুনঃস্থাপন করা এবং ইহুদীগণের জন্য একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা। এই আদর্শের উদ্যোক্তা ছিলেন রাশিয়ার জনৈক ইহুদী-চিকিৎসক লিওন পিয়ান্সকার (Leon Piansker)। তিনিই সর্বপ্রথম ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই আদর্শের প্রচার করেন। ইহার পর অস্ট্রিয়ার জনৈক ইহুদী সাংবাদিক, থিওডোর-হারজল (Theodor Herzl) ইহুদীদের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা করেন।

পরিচয়

প্যালেস্টাইনের সমস্যা ঃ বিভিন্ন কারণে প্যালেস্টাইন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল। প্রথমতঃ, মধ্য-প্রাচ্যের ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র প্যালেস্টাইনে দুইটি পরস্পর-বিরোধী উগ্র জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়—একটি হইল আরব জাতীয়তাবাদ এবং অপরটি হইল ইহুদী জাতীয়তাবাদ। দ্বিতীয়তঃ, মধ্য-প্রাচ্যে ও সুয়েজ-খালে ইংরাজদের

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ এবং মিশরে উগ্র জাতীয়তাবাদের উদ্ভব প্রভৃতি কারণে ব্রিটেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যালেস্টাইন নিজের অধিকারে রাখিতে যত্নবান হইলে সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠে। তৃতীয়তঃ, প্যালেস্টাইন হইল তিনটি ধর্মের পবিত্র-ভূমি। যথা, খ্রীষ্টান, ইহুদী ও ইসলাম। প্যালেস্টাইনের কর্তৃত্বের প্রশ্ন লইয়া এই তিনটি ধর্মের অনুগামীদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ ও সংঘর্ষ প্যালেস্টাইন সমস্যার অপর প্রধান কারণ। চতুর্থতঃ, প্যালেস্টাইনের সহিত আমেরিকার ও ব্রিটেনের স্বার্থও জড়িত ছিল। আমেরিকার প্রায় পাঁচ মিলিয়ান ইহুদীদের বসবাস ছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি নির্বাচনে এই পাঁচ মিলিয়ান ইহুদীদের ভোট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সুতরাং আমেরিকার প্রায় সকল রাজনৈতিক দলগুলি ইহুদীদের সমর্থন লাভের জন্য উহাদের জাতীয়তাবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। অপরদিকে ব্রিটেন যে শুধু ইহুদীদের প্রতিই সহানুভূতিশীল ছিল এমন নহে, আরবদের প্রতিও ব্রিটেনের যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। ইহার প্রধান কারণ ছিল মধ্য-প্রাচ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ আরবদের এবং ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের সমর্থন লাভ করা। সুতরাং ইহুদীদের প্রতি ব্রিটেনের স্বাভাবিক সহানুভূতি এবং অপরদিকে রাজনৈতিক কারণে আরবদের প্রতি সমর্থন প্যালেস্টাইন সমস্যাকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। পঞ্চমতঃ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্যালেস্টাইনের সামরিক গুরুত্ব বৃদ্ধি এবং আমেরিকার সামরিক ও আর্থিক সাহায্যলাভের আশায় ব্রিটেনের পররাষ্ট্র-সচিব আর্থার বেলফোর (Arthur Belfour) প্যালেস্টাইন সম্পর্কিত নীতি প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করেন যে, "প্যালেস্টাইনে ইহুদী সম্প্রদায়ের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা হইবে।" সেই সঙ্গে প্যালেস্টাইনের অ-ইহুদী অধিবাসীদের নিকট এইরূপ আশ্বাস দেওয়া হয় যে, ইহুদী রাষ্ট্র গঠিত হইলেও উহাদের ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে। অপরদিকে ব্রিটেন জার্মানীর মিত্র তুরস্কের নিকট হইতে আরবগণকে বিচ্ছিন্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে ইহুদীদের ন্যায় আরবদের নিকটও নানাপ্রকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে থাকে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন মক্কার হুসেনকেও এই বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে আরবগণ মিত্রপক্ষে সাহায্য করিলে যুদ্ধশেষে আরব উপদ্বীপের স্বাধীনতা স্বীকার করা হইবে। ব্রিটেনের এই আশ্বাসবাণী আরবদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করিল যে প্যালেস্টাইনে একটি স্বাধীন আরব-রাষ্ট্র গঠন করা হইবে। কিন্তু ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে আরবগণকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের 'বেলফোর-ঘোষণা' আরব ও ইহুদীগণের স্বার্থের পরস্পর-বিরোধী হওয়ায় প্যালেস্টাইনে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। ষষ্ঠতঃ, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্যালেস্টাইনে আরবগণই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু ভার্সাই-সন্ধির শর্তানুসারে প্যালেস্টাইনে ব্রিটেনের অছি-শাসন স্থাপিত হইলে তথায় পৃথিবীর নানাস্থান হইতে ইহুদীদের আগমন

সমস্যার কারণসমূহ :—
(১) দুইটি পরস্পর-বিরোধী জাতীয়তাবাদ
(২) প্যালেস্টাইনে ব্রিটেনের স্বার্থ-সংরক্ষণের প্রচেষ্টা,
(৩) বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত
(৪) আমেরিকা ও ব্রিটেনের স্বার্থ

শুরু হইল। প্রথম কয়েক বৎসর ইহুদীদের আগমন সীমাবদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু ইওরোপে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিলে উহারা দলে দলে প্যালেস্টাইনে আসিতে লাগিল। ইতিমধ্যে জার্মানীতে হিটলারের ইহুদীনিধন যজ্ঞের ফলে বহু ইহুদী প্যালেস্টাইনে আগমন করিয়াছিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের সংখ্যা দাঁড়াইল প্রায় তিন লক্ষ। প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের আগমন আরবগণকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল এবং উহারা অভিযোগ করিল যে বেলফোর-ঘোষণা ব্রিটেন কর্তৃক আরবগণের স্বাধীনতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ও উইলসনের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতির (Principle of selfdetermination) সম্পূর্ণ পরিপন্থী। প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের প্রবেশ আরবগণ সহ্য করিতে পারিল না। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হইল। রাজনৈতিক কারণ ছাড়া অর্থনৈতিক কারণেও আরবগণ ইহুদী-আগমনের বিরোধিতা করিয়াছিল। জমি-সংক্রান্ত আইনের দ্বারা বহু আরব উহাদের জীবিকা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল এবং উহাদের বহু জমি ইহুদীদের হস্তগত হইয়াছিল। অশিক্ষিত ও দরিদ্র আরব চাষী, বিত্তশালী ইহুদীদের সহিত অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া বেকারত্বে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপ অর্থনৈতিক বিপর্যয় আরব-জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ইন্ধন যোগাইল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল এবং ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উভয়ের মধ্যে কয়েকটি মারাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হইল যাহার ফলে বহু ইহুদী প্রাণ হারাইল।

প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের আগমণ এবং ইহুদী-আরব সংঘর্ষ

প্যালেস্টাইন সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা (Attempts to solve the Palestine Problems) : প্যালেস্টাইন সম্পর্কে ও আরব-ইহুদী সংঘর্ষের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য ব্রিটেন যে আগ্রহী ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ সংঘাত এই সমস্যাকে অত্যন্ত জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। প্রথমতঃ, প্যালেস্টাইনের সহিত আরব ও ইহুদী জাতীয়তাবাদ জড়িত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, তথায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থও কম ছিল না। সামরিক ঘাঁটি হিসাবে প্যালেস্টাইন ইংরাজদের নিকট অপরিহার্য ছিল। ইহুদীদের দাবি ছিল সমগ্র প্যালেস্টাইনে স্বাধীন ইহুদী-রাষ্ট্র গঠন করা এবং তথায় ইহুদীদের আগমনের সকল বাধা-নিষেধ অপসারিত করা। অপরদিকে আরবগণ সমগ্র প্যালেস্টাইন উহাদের অধিকারভুক্ত করিতে এবং তথায় ইহুদীদের আগমন নিষিদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর ছিল।

সমস্যার সমাধানের পথে অন্তরায়

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো-উইলসনের চাপে ব্রিটেন প্যালেস্টাইন সম্পর্কে তদন্তের জন্য 'কিং-ক্রেন-কমিশন' নামে ইঙ্গ-আমেরিকার একটি কমিশন গঠন করিল (১৯১৯ খ্রীঃ)। কমিশনের সুপারিশ ইহুদী-বিরোধী হওয়ায় তাহা প্রকাশ করা হইল না এবং প্যালেস্টাইনকে ব্রিটেনের অছি-শাসনাধীন করা হইল। প্যালেস্টাইনকে ব্রিটেনের অছি-শাসনাধীন

কিং-ক্রেন-কমিশন (১৯১৯)

করায় তথায় দারুণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হইল। ইহার জন্য ইহুদীগণই সর্বাংশে দায়ী ছিল। প্রতিশোধ গ্রহণার্থে আরবগণও ইহুদীদের উপর আক্রমণ চালাইল। দাঙ্গা-হাঙ্গামার তদন্তের জন্য ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন 'হে-ক্রাফট-কমিশন' (Haycraft Commission) নিযুক্ত করিল। এই কমিশন আরবদের তীব্র ইহুদী-বিরোধী মনোভাবের কথা প্রকাশ করিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 'চার্চিল-হোয়াইট-পেপার' (Churchill White Paper) নামে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হইল। ইহাতে বলা হইল যে (১) সমগ্র প্যালেস্টাইনে ইহুদীরাষ্ট্র গঠন করার অথবা আরবদের সংস্কৃতি ও ভাষা ক্ষুণ্ণ করা ব্রিটেনের অভিপ্রেত নহে এবং (২) আইনের ভিত্তির উপর ইহুদীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। ইহুদীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন প্যালেস্টাইনে কিছুদিনের জন্য ইহুদী আগমন নিষিদ্ধ করিল। ইহাতে আরবগণ সন্তুষ্ট হইয়া আইনসভার (Legislative Council) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে সম্মত হইল। কিন্তু ইহুদীগণ দাবি করিল যে আইন-সভায় উহাদিগকে আরবদের সহিত সম-সংখ্যক আসন প্রদান না করিলে উহারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবে না। ইহার ফলে আইনসভা গঠনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।

হে-ক্রাফ্ট-কমিশন (১৯২১)

'চার্চিল-হোয়াইট-পেপার' (১৯২২)

ইহুদীদের বিরোধিতার ফলে আরব-ইহুদী সংঘর্ষ পুনরায় শুরু হইল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ-হাই-কমিশনার ইহুদী আগমন নিষিদ্ধ করিতে ও ইহুদীদের নিকট আরবদের জমি বিক্রয় করার পথে বাধা সৃষ্টি করিতে অসম্মত হইলে আরবগণ ব্রিটিশ সরকারের সহিত কোন প্রকার সহযোগিতা করিতে অসম্মত হইল। ইহার তিন বৎসর পর আরবগণ ইহুদীগণের উপর আক্রমণ চালাইয়া বহু ইহুদীকে হতাহত করিল। প্যালেস্টাইনের সর্বত্র উহারা ধর্মঘট ও অসহযোগ-আন্দোলন চালাইতে লাগিল।

আরব-ইহুদী সংঘর্ষের পুনরাবৃত্তি

এই অবস্থায় ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইন সম্পর্কে তদন্তের জন্য পীলের নেতৃত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত করিলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পীল-কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। কমিশন এইরূপ মন্তব্য করিল যে আরব-ইহুদী সমস্যা এতই জটিল ও উহাদের স্বার্থ এতই পরস্পর-বিরোধী যে উহার সুষ্ঠু সমাধান অসম্ভব। কমিশন আরব ও ইহুদীদের মধ্যে প্যালেস্টাইন বিভাগ করিবার ও জেরুজালেম হইতে জাফা (Jaffa) পর্যন্ত একটি করিডর (Corridor) ইংরাজ শাসনাধীনে রাখিবার সুপারিশ করিল। ইহা ছাড়া আরব ও ইহুদী রাষ্ট্রদ্বয়ের সহিত ব্রিটেনের সামরিক সন্ধি স্থাপন ও হাইফার (Haifa) নৌ-বন্দর ব্রিটেনের কর্তৃত্বাধীনে রাখিবার সুপারিশও পীল-কমিশন করিল। কিন্তু আরব ও ইহুদীগণ কমিশনের এই সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল।

পীল-কমিশন (১৯৩৬)

কমিশন প্রস্তাব

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পীল-কমিশনের রিপোর্ট গৃহীত হইলেও পার্লামেণ্টের এক প্রস্তাব অনুযায়ী প্যালেস্টাইন বিভাগ করার সম্পর্কে পুনরায় তদন্তের জন্য উডহেড্ (Woodhead)-এর নেতৃত্বে আর একটি কমিশন নিযুক্ত করা হইল। তদন্তকার্য চলিতে থাকাকালীন প্যালেস্টাইনের সর্বত্র পুনরায় গোলযোগ উপস্থিত হইল। খণ্ডযুদ্ধ, হত্যাকাণ্ড ও লুঠতরাজ দৈনন্দিন ব্যাপারে পরিণত হইল। শান্তিরক্ষার্থে প্যালেস্টাইনে একদল ব্রিটিশ সৈন্য প্রেরিত হইল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বেথলেহেম ও জেরুজালেম আরবগণ কর্তৃক অধিকৃত হইল। আরবনেতা অল-হুসেনি ঘোষণা করিলেন যে, ব্রিটেন কর্তৃক আরবগণের দাবি স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত আরবগণ যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে উডহেড্-কমিশন প্যালেস্টাইন বিভাগের বিপক্ষে মত প্রকাশ করিয়া সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিল।

উডহেড্-কমিশন (১৯৩৮)

ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইন বিভাগ করার পরিকল্পনা বাতিল করিয়া আরব ও ইহুদীদের মধ্যে এক শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য যত্নবান হইলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে এক গোলটেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু প্যালেস্টাইনের আরবগণ ইহুদীদের সহিত একত্রে বসিয়া প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান করিতে অসম্মত হওয়ায় লণ্ডন বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল।

লণ্ডন বৈঠক (১৯৩৯)

অতঃপর ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ব্রিটেন দশ বৎসরের মধ্যে এক স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রগঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়া এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিল। ইহাতে বলা হইল যে (১) নূতন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র ব্রিটেনের সহিত এক চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হইবে, (২) আরব ও ইহুদী উভয় সম্প্রদায়ই এই নূতন রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিবে, (৩) অন্তর্বর্তী কালের মধ্যে প্যালেস্টাইনে ইহুদী আগমন সীমাবদ্ধ করা হইবে এবং (৪) প্যালেস্টাইনে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হইলে স্বাধীন প্যালেস্টাইনের জন্য এক শাসনতন্ত্র রচিত হইবে।

ব্রিটেনের নূতন পরিকল্পনা

কিন্তু উপরি-উক্ত প্রস্তাব আরব বা ইহুদী কাহারও মনঃপূত হইল না। ইতিমধ্যে প্যালেস্টাইনে পুনরায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ শুরু হইলে ব্রিটেন ছয় মাসের জন্য তথায় ইহুদী আগমন নিষিদ্ধ করিল। অতঃপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে আরব-ইহুদী সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা কিছুদিনের জন্য স্থগিত রহিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদীগণ মিত্রপক্ষকে সাহায্য করিল। আরবগণের অধিকাংশই এক্সিস রাষ্ট্র-জোটের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। আরবগণকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া প্যালেস্টাইনের ইহুদীগণ কর্তৃক জমি ক্রয় নিষিদ্ধ করা হইল।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সমৃদ্ধ ও প্রভাবশালী ইহুদী সম্প্রদায় ব্রিটিশ সরকারের অনমনীয় মনোভাবে বিরক্ত হইয়া ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্ক শহরে ইহুদীদের

একটি সম্মেলন আহ্বান করিল। এই সম্মেলনে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ব্রিটিশ পরিকল্পনার নিন্দা করিয়া প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র সমবায়ের (Jewish Commonwealth) প্রতিষ্ঠা, ইহুদী বাহিনী গঠন ও প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের অবাধ প্রবেশাধিকারের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল। এই সময় হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও ইহুদীদের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। আমেরিকার জনমত ইহুদীদের অনুকূলে প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে চাপ দিতে লাগিল। আমেরিকার অনেক রাষ্ট্রে ইহুদীদের সমর্থন প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সামরিক কারণে এই সকল প্রস্তাব কার্যকর করিতে অসমর্থ হইল। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ইহুদীদের দাবির সমর্থন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

নিউইয়র্কে ইহুদী-সম্মেলন (১৯৪২)

আরব জাতীয়তাবাদ (Arab Nationalism) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মধ্য-প্রাচ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অপর কেন্দ্র হইল আরব ভূখণ্ড। আরবজাতির বাসভূমি আরাবিয়া, ইরাক, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন বহুদিন পর্যন্ত তুরস্কের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু আরবগণ বরাবরই তুর্কী শাসনের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছিল। উহারা তুর্কীদের মনেপ্রাণে ঘৃণা করিত। তুর্কী-সুলতান কর্তৃক 'খলিফা' উপাধি গ্রহণ আরবগণ কখনই স্বীকার করিয়া লয় নাই এবং উহারা মক্কার প্রধান 'শরিফ' হুসেনকেই এই গৌরবময় ও ঐতিহ্যময় পদের একমাত্র অধিকারী বলিয়া মনে করিত।

আরবদের তুর্কী-বিরোধী মনোভাব

১৭.৫. **জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত:** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সুয়েজ খাল হইতে তুর্কীগণ ইংরাজবাহিনী কর্তৃক বিতাড়িত হইলে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। আরবগণ তুর্কী শাসনের অবসান করিয়া স্বাধীনতা অর্জনে যত্নবান হয়। ভূমধ্যসাগর হইতে পারস্য হ্রদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একটি স্বাধীন আরব রাষ্ট্র গঠনকল্পে হুসেন এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। নিকট-প্রাচ্যে নিজ স্বার্থ-সংরক্ষণকল্পে ইংল্যাণ্ড তুরস্কের বিরুদ্ধে আরবগণকে উত্তেজিত করিতে থাকে। ইংরাজ সরকার অর্থ ও যুদ্ধাস্ত্র দিয়া হুসেনকে সাহায্য করিতে সম্মত হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন হাব্জাজে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন এবং আরবজাতির স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইহার ফলে সমগ্র মধ্য-প্রাচ্যে আরব জাতীয়তাবাদ উগ্র রূপ ধারণ করে। হুসেনের পুত্র ফাইজাল ও ইংরাজ সেনাপতি লরেন্সের অধিনায়কত্বে আরববাহিনী সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস দখল করে (১৯১৮ খ্রীঃ)। আরব জাতীয়তাবাদের প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি হয়। কিন্তু ভার্সাই-সন্ধি দ্বারা

আরবগণ কর্তৃক ইংল্যাণ্ডের সমর্থনলাভ

আরবদের প্রথম সাফল্য

আরব জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়।* ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে আরব প্রদেশগুলির বণ্টন স্বাধীনতাকামী আরবগণকে মর্মাহত করে।

প্যালেস্টাইন, ইরাক ও ট্রান্সজোরডানের শাসনভার গ্রহণ করিয়া ব্রিটেন আরবগণকে সন্তুষ্ট করিতে যত্নবান হইল। এই উদ্দেশ্যে হাজাজের শাসনকর্তা হুসেনের পুত্রদ্বয় ফাইজাল ও আবদুল্লাহ্কে যথাক্রমে ইরাক ও ট্রান্সজোরডানের রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুগ্মভাবে ইরাকের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল। কিন্তু তাহা পালন করার পরিবর্তে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ইরাকে ব্রিটেনের অছি-শাসন স্থাপিত হইল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইরাকী জাতীয়তাবাদীগণ পার্লামেণ্টারী শাসনে সন্তুষ্ট না থাকিয়া পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন শুরু করিল। ফলে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত ইংগ-ইরাকী সন্ধি অনুসারে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইরাকের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল এবং ইরাক লীগ-অফ-নেশনস্-এর সদস্যপদ লাভ করিল।

ব্রিটেন কর্তৃক ইরাকের স্বাধীনতার স্বীকৃতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ব্রিটেন ও ইরাকের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হইলে ইটালী ও জার্মানীর প্ররোচনায় ইরাকী জাতীয়তাবাদীগণ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইরাক জার্মানীর সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিল এবং ব্রিটেনের সমর্থনে তথায় একটি নূতন সরকার গঠিত হইল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইরাক জার্মানী ও ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইরাক আরব-লীগ চুক্তি স্বাক্ষর করিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইরাকী সরকার ইরাকে ব্রিটেনের প্রতিপত্তির অবসান ঘটাইতে উদ্যোগী হইলে ব্রিটেনের সহিত পুনরায় বিবাদের সূত্রপাত হইল। কিন্তু কমিউনিস্ট প্রভাবের প্রসারের আশঙ্কায় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইরাক পুনরায় ব্রিটেনের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইল।

হাজাজের রাজা হুসেন ছিলেন আরব জাতীয়তাবাদের জনক। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিল। ব্রিটেনের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এবং 'খলিফা' উপাধি গ্রহণ করায় আরবগণ তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠিল। এই সুযোগে 'ওহাবি' (Wahabi) দলের নেতা ইবনু সাউদ একদল সৈন্য লইয়া হুসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। হুসেন পরাজিত হইয়া জেরুজালেমে পলায়ন করেন।

হাজাজ

*আরব অঞ্চল সম্পর্কে ভার্সাই-এর বন্দোবস্ত: ভার্সাই-সন্ধি অনুসারে আরব অঞ্চলকে চারি ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং পৃথক শাসনাধীনে রাখিবার ব্যবস্থা হয়। আরব অঞ্চলগুলির শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'ম্যাণ্ডেটরী' বা 'অছি' প্রথার ব্যবস্থা হয়। এই নীতি অনুসারে (১) ফ্রান্সের হস্তে সিরিয়ার শাসনভার অর্পিত হয়, (২) ইংল্যাণ্ডের হস্তে ইরাক, প্যালেস্টাইন ও ট্রান্সজোরডানের শাসনভার অর্পিত হয়, (৩) লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত হাজাজ হুসেনের অধীনে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃত হয় এবং (৪) অবশিষ্ট আরব দেশগুলিকে তুরস্কের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

সাউদি আরাবিয়া রাজ্যটি উত্তরে জোরডান ও ইরাক, পূর্বে পারস্য উপসাগর, পশ্চিমে লোহিত সাগর ও দক্ষিণে মরুভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। সাউদি আরাবিয়া কৃষি-প্রধান দেশ হইলেও ইহা তৈলসম্পদে সমৃদ্ধ। সাউদি আরাবিয়ার বর্তমান রাজা সাউদির পিতা ইবন্ সাউদ ছিলেন এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত এক সন্ধি অনুসারে ব্রিটেন সাউদি আরাবিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছিল এবং ইবন্ সাউদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু ইবন্ সাউদ ও হেজাজের রাজা হুসেনের মধ্যে শত্রুতার ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। যুদ্ধের সময় ব্রিটেন যুদ্ধ-অবসানে হুসেনের অধীনে আরবদের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ব্রিটেন এই প্রতিশ্রুতি পালনে শৈথিল্য প্রকাশ করিলে হুসেন ভার্সাই-সন্ধি সমর্থন করিতে অসম্মত হন। ইতিমধ্যে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন 'খলিফা' উপাধি ধারণ করিলে ইবন্ সাউদের সহিত তাঁহার পুনরায় যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। হুসেন পরাজিত হইয়া ইরাকে পলায়ন করেন। ফলে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইবন্ সাউদ হেজাজ দখল করিয়া তাহা সাউদি আরাবিয়ার সহিত সংযুক্ত করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন সাউদি আরাবিয়া ও হাজাজের উপর ইবন্ সাউদের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে সাউদি আরাবিয়া মিত্রপক্ষের অনুকূলে নিরপেক্ষ রহে। যুদ্ধের সময় আমেরিকা সাউদি আরাবিয়াকে প্রচুর অর্থসাহায্য দান করে। যুদ্ধ-অবসানে সাউদি আরাবিয়ায় আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হয়।

সিরিয়া

অপরাপর অঞ্চলের ন্যায় সিরিয়ায় আরব জাতীয়তাবাদ উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। ভার্সাই-এর বন্দোবস্ত অনুসারে সিরিয়ার শাসনভার ফ্রান্সের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছিল। সুতরাং ফ্রান্স সিরিয়াকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়া সিরিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিনষ্ট করিতে উদ্যোগী হয়। স্বদেশ খণ্ডিত হওয়ায় সিরিয়ার আরবগণ বিদ্রোহী হয়। ফরাসী সরকার দমননীতি দ্বারা গোলাবর্ষণ করিয়া সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস বিধ্বস্ত করে (১৯২৫ খ্রীঃ)। অবশেষে ফরাসী সরকার ও আরব নেতাদের মধ্যে এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় (১৯৩৬ খ্রীঃ)। ইহার শর্তানুসারে তিন বৎসরের মধ্যে সিরিয়াকে স্বাধীনতা প্রদানে ফ্রান্স সম্মত হয়। সেই বৎসর ফ্রান্স ও লেবাননের মধ্যেও অনুরূপ একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু ফ্রান্স এই সন্ধির শর্তাদি পালন না করায় দামাস্কাসে পুনরায় বিদ্রোহ সংঘটিত হয় (১৯৩৯ খ্রীঃ)। ইহার ফলে সিরিয়ার পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং উহার শাসনভার পাঁচজন ডাইরেক্টরের হস্তে ন্যস্ত হয়। শান্তি ও নিরাপত্তার দায়িত্ব ফ্রান্স স্বহস্তে গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে সিরিয়া ফ্রান্সের সহিত সহযোগিতা করে। কিন্তু ফ্রান্সের পতন হইলে সিরিয়া ও লেবানন জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। ইহাতে আশঙ্কিত হইয়া ব্রিটেন ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়া আক্রমণ করিয়া সিরিয়া ও লেবানন দখল করে। যুদ্ধের শেষের দিকে ফ্রান্স জার্মানীর কবল হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায়

সিরিয়া ও লেবাননে সাম্রাজ্যবাদী শাসন স্থাপনে উদ্যোগী হয়। ফলে পুনরায় সিরিয়ায় গোলযোগের উদ্ভব হইল। ব্রিটেন এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও ব্রিটেন সিরিয়া ও লেবানন হইতে উহাদের সৈন্যবাহিনী অপসারণ করে এবং সেই বৎসরের মধ্যভাগে সিরিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর সংকেত

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে তুরস্কের অবস্থা বর্ণনা কর। [উঃ ১৭.২.]
২। তুরস্কের উন্নতিসাধনে কামাল আতাতুর্কের অবদান আলোচনা কর। [উঃ ১৭.২.]
৩। কামাল আতাতুর্কের পররাষ্ট্রনীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ ১৭.২.]
৪। আরব জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা কর। [উঃ ১৭.৫.]
৫। প্যালেস্টাইন সমস্যা বলিতে কি বোঝায় ? এই সমস্যার সমাধান কিভাবে হয় ? [উঃ ১৭.৪.]
৬। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে প্যালেস্টাইন সমস্যা সংক্ষেপে আলোচনা কর। [উঃ ১৭.৪.]

অষ্টাদশ অধ্যায় সুদূর-প্রাচ্য,—১৯১৯-১৯৩৯
(The Far East)

১৮.১. সুদূর-প্রাচ্যের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব : সাইবেরিয়া মরুভূমির উত্তর প্রান্ত হইতে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এই ভূখণ্ড ইতিহাসে সুদূর-প্রাচ্য নামে পরিচিত। বহু ভাষাভাষী ও জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত এই অঞ্চল পর্বত, উপত্যকা, সমতল ভূমি ও মরুভূমিতে পরিপূর্ণ। এই ভূখণ্ডে এক সময় এক উন্নত ধরনের সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। চীনকে কেন্দ্র করিয়া সেই সংস্কৃতি সমগ্র সুদূর-প্রাচ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এক সময় বৌদ্ধধর্ম চীন, কোরিয়া, জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই অঞ্চলের অফুরন্ত কাঁচা মাল, বৃহত্তর বাজার ও সামরিক গুরুত্ব ঊনবিংশ শতাব্দী হইতেই বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে কাঁচা মাল ও বৃহত্তর বাজারের সন্ধানে ইওরোপের শিল্পোন্নত শক্তিশালী দেশগুলি এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সুদূর-প্রাচ্যে আগমন করার সময় হইতে ইহার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিশ্বের ঝটিকা কেন্দ্র ইওরোপ হইতে চীনে স্থানান্তরিত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসচিব জন হে (John Hay)-র কথায় "Whoever understands that mighty Empire (China) has a key to world politics for the next five centuries"। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইওরোপের কূটনীতি হইতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। জেনারেল স্মাটস্ (General Smuts)-এর কথায় "The problems of the Pacific are to my mind the world problems of the next fifty years or more"। প্রকৃতপক্ষে ১৯২১ হইতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কালে সুদূর-প্রাচ্যের ইতিহাস ছিল বিবাদ-বিসম্বাদ, সংঘর্ষ ও সংকটে পরিপূর্ণ। এই অঞ্চলের প্রধান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি—যথা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও জাপান শুধু যে পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল এমন নহে, সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার সহিতও ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এশিয়ার জনগণের জাতীয়তাবাদী ও মুক্তি আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল সুদূর-প্রাচ্য। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম সুদূর-প্রাচ্যের ইতিহাসকে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব দান করিয়াছে। আফ্রিকার পর এশিয়া মহাদেশ ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের লীলাকেন্দ্রে পরিণত হয়। ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া ইংল্যাণ্ডও এই অঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপন করে। অপরদিকে রাশিয়া উরাল পর্বতমালা হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করে। এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাশিয়াই সর্বপ্রথম সুদূর-প্রাচ্যে স্বীয়

প্রতিপত্তি স্থাপনে যত্নবান হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে আমেরিকাও সুদূর-প্রাচ্যে ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়।

১৮.২. **১৯১৯ হইতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদূর-প্রাচ্যের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য (Features of the history of the Far East from 1919 to 1945) :** ১৯১৯ হইতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদূর-প্রাচ্যের ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল প্রথমতঃ, জাপানের অভূতপূর্ব অভ্যুত্থান, জাপান সাম্রাজ্যের দ্রুত বিস্তার এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে উহার পতন। দ্বিতীয়তঃ, এই সময়ে চীনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তীব্রতা ও প্রসারতা এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির নিকট হইতে চীন সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর চীনে সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদীগণের মধ্যে অন্তর্বিপ্লবের সূত্রপাত হয় এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পর জাতীয়তাবাদীগণের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা বিনষ্ট হইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সাম্যবাদীগণ জয়লাভ করিয়া চীনে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে (১৯৪৯ খ্রীঃ)। সাম্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী-গণের প্রতি যথাক্রমে রাশিয়া ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সমর্থন ও সহযোগিতা সুদূর-প্রাচ্যের ইতিহাসে এক দারুণ জটিলতার সৃষ্টি করে। তৃতীয়তঃ, এই সময়ে সুদূর-প্রাচ্যের ইতিহাসের অপর বৈশিষ্ট্য হইল ভারত, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশে জাতীয়তাবাদী ও মুক্তি আন্দোলন এবং তাহা দমন করিতে ব্রিটেন ফ্রান্স, ওলন্দাজ প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সকল শক্তি প্রয়োগ। চতুর্থতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতি হইতে অপসারিত হইলে রাশিয়া, ব্রিটেন, জাপান ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থসংঘাতের ফলে সুদূর-প্রাচ্যে এক দারুণ জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সুদূর-প্রাচ্য রাশিয়া ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের কূটনীতির লীলাকেন্দ্রে পরিণত হয়। জার্মানীর সমর্থনপুষ্ট হইয়া জাপান "এশিয়া-এশিয়াবাসীদের জন্য"—এই নূতন প্রচারকার্য শুরু করিলে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সহিত জাপানের বিবাদ-বিসম্বাদ তীব্র আকার ধারণ করে।

দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে চীনের ইতিহাস

(History of China between the two world wars)

১৮.৩. **শান্তি-সম্মেলনে চীন (China at Peace Conference) :** পূর্বে বলা হইয়াছে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চীন জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়াছিল এবং চীন আশা করিয়াছিল যে যুদ্ধে যোগদানের পুরস্কারস্বরূপ চীন মিত্রপক্ষের সাহায্যে অসম-সন্ধিসমূহ (unequal treaties) বাতিল করিয়া বিদেশীগণের নিকট হইতে উহার রাজ্যাংশ ফেরৎ পাইবে, বিদেশীগণের 'অতিরাষ্ট্রীয় ক্ষমতার' (extraterritorial rights) বিলুপ্তি ঘটিবে, জাপানের আক্রমণাত্মক কার্যাদির অবসান ঘটিবে এবং মিত্রপক্ষের নিকট হইতে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য লাভ করিবে। বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করিয়া চীনের কিছু লাভও হইয়াছিল

মিত্রপক্ষে যোগদান করার পুরস্কার হিসাবে প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে চীন প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার পাইয়াছিল। যদিও সমগ্র চীন তখনও পর্যন্ত সাধারণতন্ত্রের অধিকারভুক্ত ছিল না, তথাপি চীনের প্রতিনিধিগণ সমগ্র চীনের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সম্মেলনে যোগদান করার পশ্চাতে চীনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চীনের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করা। সেই সময় চীনের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। কারণ ইতিপূর্বেই ব্রিটেন ও ফ্রান্স জাপানকে চীনের সাণ্টুং প্রদেশ দখল করার অনুমতি দিয়াছিল এবং 'লানসিং-ইসি-চুক্তি' অনুসারে আমেরিকাও চীনে জাপানের 'বিশেষ স্বার্থ' স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

সম্মেলনে যোগদানে চীনের উদ্দেশ্য

চীনের দাবি

শান্তি-সম্মেলনে চীনের প্রতিনিধিগণ সাণ্টুং প্রত্যর্পণের দাবি ও চীনের সহিত পূর্বসম্পাদিত অসম-সন্ধিসমূহ পুনর্বিবেচনা করার দাবি উত্থাপন করেন। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসন সাণ্টুং প্রদেশের উপর জাপানের অধিকারের বিরোধিতা করিলে জাপান সম্মেলন পরিত্যাগ করার হুমকি দেখায়। ফলে উইলসনকে ক্ষান্ত হইতে হয় এবং মিত্রপক্ষ চীনের ন্যায়সংগত দাবির প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন। এমন কি মিত্রপক্ষ সাণ্টুং প্রদেশের উপর জাপানের অধিকার স্বীকার করিয়া চীনের সকল দাবি "আলোচনার বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিতে দ্বিধা করে নাই। ফলে চীনের প্রতিনিধিগণ শূন্য হস্তে ও গভীর হতাশা লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।"

চীনের নৈরাশ্য

ভার্সাই-সন্ধির শর্তাদি চীনে এক দারুণ প্রতিক্রিয়া ও গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত করে যাহা পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে এক বিরাট ছাত্রমিছিল জাপানের প্রতি সহানুভূতিশীল চীনা মন্ত্রীদের বাসভবন অবরোধ করে। এক সপ্তাহ ধরিয়া রাজধানী পিকিং-এ এক ঘোরতর বিশৃংখলা চলিতে থাকে এবং জাপানী দ্রব্য-সামগ্রী বর্জন করার দাবি সর্বত্র উত্থিত হয়। বস্তুত জাপান-বিরোধী এই আন্দোলন সরকারের হস্ত হইতে জনগণের হস্তে চলিয়া যায়।

চীনে ভার্সাই-সন্ধির প্রতিক্রিয়া

ওয়াশিংটন বৈঠকে চীন (China at the Washington Conference) : প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে চীনের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় নাই বটে, কিন্তু উহার আন্তর্জাতিক মর্যাদা স্বীকৃত হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভার্সাই-সন্ধিতে মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। উপরন্তু চীন ও সাইবেরিয়ার জাপানের সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপে আমেরিকা অস্বস্তিবোধ করিতেছিল। সুদূর-প্রাচ্যে জাপানের সাম্রাজ্যলিপ্সার মূলে ছিল ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত ইঙ্গ-জাপানী মৈত্রী (Anglo-Japanese Alliance, 1902)। সুতরাং ইঙ্গ-জাপানী মৈত্রীর অবসান ঘটাইয়া জাপানকে নিরস্ত করার অভিপ্রায়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটনে এক বৈঠক আহবান করে। এই বৈঠকে ব্রিটেন, জাপান, ফ্রান্স, ইটালী,

বৈঠকের উদ্দেশ্য

নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম ও পর্তুগালের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। এই বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ছিল নিরস্ত্রীকরণ (disarmament) ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমস্যার সমাধান করা এবং চীন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এই বৈঠকে উত্তর-চীনের সমর নেতাগণকে প্রতিনিধিত্বের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল এবং সাধারণতঃ অপর কোন নেতাকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। সোভিয়েট রাশিয়াকেও আমন্ত্রিত করা হয় নাই। বৈঠকে আলাপ-আলোচনার পর কয়েকটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। দুইটি নৌ-শক্তি সম্পর্কে এবং অবশিষ্টগুলি প্রশান্ত মহাসাগর ও সুদূর-প্রাচ্য সম্পর্কে। আমেরিকার চাপে এবং চীনা প্রতিনিধিদের বারংবার অনুরোধে চীনের দাবি শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হয় এবং একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে প্রচুর ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে জাপান সাণ্টুং প্রদেশ চীনকে প্রত্যর্পণ করে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে জাপান সাণ্টুং ত্যাগ করে। চীনের কূটনীতি সফল হয় এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদ নীতির প্রথম পরাজয় ঘটে। সাণ্টুং প্রদেশ ছাড়াও চীনের প্রতিনিধিগণ চীনে বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির 'বিশেষ স্বার্থ" ও উহাদের অতি-রাষ্ট্রীক ক্ষমতার অবসান করিয়া চীনের সার্বভৌমত্ব পুনঃ-স্থাপন করার দাবিও জানান। ওয়াশিংটন বৈঠকে চীনই সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিকে অভিযুক্ত করার সুযোগ পাইয়াছিল। চীন সম্পর্কে ওয়াশিংটন বৈঠকে এক নবম-শক্তি চুক্তি (Nine-power Treaty) সম্পাদিত হয়। ইহার শর্তানুসারে চুক্তিবদ্ধ নয়টি রাষ্ট্র (১) চীনের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা স্বীকার করিয়া লয়, (২) এক শক্তিশালী সরকার গঠন করার ব্যাপারে চীনকে সাহায্য করিতে সম্মত হয় এবং (৩) চীনের সকল রাষ্ট্রের সমান বাণিজ্যিক অধিকারও চীনের নিকট হইতে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আদায় না করিতে সম্মত হইল।

সমালোচনা (Criticism) : ওয়াশিংটন বৈঠকে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ চীনের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার পরিবর্তে বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলি উহাদের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখিতেই অধিক আগ্রহী ছিল। নীতির দিক দিয়া পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ চীনের শুল্ক-স্বাধীনতার (Tariff-autonomy) দাবি স্বীকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। তথাপি ওয়াশিংটন বৈঠক পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের তথা জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতির সর্বপ্রথম পরাজয়ের সাক্ষ্য বহন করে। যদিও চীনের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত দাবি সর্বাংশে পূরণ করা হয় নাই এবং মাঞ্চুরিয়া ও পূর্ব-মঙ্গোলিয়ায় জাপানের আধিপত্য বজায় থাকে, তথাপি চীনের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য চীনের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অবদান কম নহে। আমেরিকার চেষ্টার ফলেই ইঙ্গ-জাপানী মৈত্রীর অবসান হয় এবং ইহার ফলে চীনে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতি প্রতিহত হয়। ওয়াশিংটন বৈঠক বিশ্বের দরবারে চীনের অভিযোগগুলি প্রচার করে এবং চীন বিশ্বের সহানুভূতি অর্জন করে।

১৮.৪. চীনের অভ্যন্তরীণ ইতিহাস (Internal history of China) : ১৯২১ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চীনের ইতিহাসের প্রধান বিষয়বস্তু হইল জাতীয়তাবাদীগণ কর্তৃক চীনের রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধন করা এবং চীন হইতে বিদেশী প্রভাব-প্রতিপত্তির বিলোপ সাধন করা।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কুয়ো-মিং-তাং* নামে চীনের জাতীয়তাবাদীগণ ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন (Sun-Yet-Sen)-এর নেতৃত্বে চীনের রাজতন্ত্রের অবসান করিয়া সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। শুধু যে চীনের রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধন করাই ছিল জাতীয়তাবাদীগণের উদ্দেশ্যে এমন নহে, চীন হইতে সকল প্রকার বিদেশী প্রভাব ও প্রতিপত্তির অবসান করাও উহাদের লক্ষ্য ছিল। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার ও চীনের রাষ্ট্রীয় সংহতি লাভের উদ্দেশ্যে সান-ইয়াৎ-সেন ইউয়ান-সি-কাই নামে এক সুদক্ষ সেনাপতি ও রাজনীতিজ্ঞের অনুকূলে সাধারণতন্ত্রের সভাপতির পদে ইস্তফা দেন। কিন্তু ইউয়ান-সি-কাই-এর জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপ চীনের জাতীয়তাবাদীগণের মনে এক দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

চীনে অশান্তি ও বিশৃংখলা (১৯১৭-২১)

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউয়ান-সি-কাই-এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চীনে ঘোরতর বিশৃংখলা দেখা দেয়। চীনের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হয়। কেন্দ্রীয় সরকার নামেমাত্র বজায় রহে এবং রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা সামরিক শাসনকর্তাদের (Tuchans) হস্তগত হয়। ইহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইয়া উঠে এবং রাষ্ট্রীয় রাজস্ব নির্বিচারে আত্মসাৎ করিতে থাকে। জনসাধারণের দুর্গতি চরমে উঠে।

কুয়ো-মিং-তাং দলের পুনরাবির্ভাব

দেশের এই দুরবস্থার সময় কুয়ো-মিং-তাং দলের পুনরাবির্ভাব হয়। ইহার নেতৃবৃন্দ উত্তর-চীনের সমরনায়কগণের (War Lords) সহিত কোনরূপ আপোস-মীমাংসায় আসিতে অসম্মত হইয়া ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-চীনের ক্যাণ্টন শহরে এক শাসনতান্ত্রিক সরকার গঠন করে। পিকিং-এর পূর্বতন পার্লামেণ্টের সভ্যগণ ক্যাণ্টনে আগমন করিয়া ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনকে চীন সাধারণতন্ত্রের সভাপতি নির্বাচিত করেন। ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন-এর নেতৃত্বে কুয়ো-মিং-তাং দল উত্তর-চীনের সমরনায়কগণের সহিত আপোস-মীমাংসা করিয়া দেশকে ঐক্যবদ্ধ করিতে যত্নবান হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সভাপতি-পদে সান-ইয়াৎ-সেনের নির্বাচন

দক্ষিণ-চীনের সমরনায়কগণই ছিলেন সান-ইয়াৎ-সেন তথা চীন সাধারণ-তন্ত্রের ক্ষমতার উৎস। কিন্তু এই সমরনায়কদের প্রভাব-প্রতিপত্তি চীনের

*কুয়ো-মিং-তাং-এর অর্থ হইল জাতীয়তাবাদ, সাম্যবাদ ও গণতন্ত্রবাদ।

রাষ্ট্রীয় সংহতির পথে প্রবল অন্তরায় ছিল। সুতরাং সামরিক কর্তাদের প্রভাব হইতে সাধারণতন্ত্রকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন বিদেশী শক্তির সাহায্যগ্রহণে উদ্যোগী হন। কিন্তু এই ব্যাপারে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির সাহায্য গ্রহণ না করিয়া তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণ করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে রাশিয়ার বলশেভিক সরকার প্রথম হইতেই চীনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে রাশিয়া চীনের ব্যাপারে আগ্রহ প্রদর্শন করিতে থাকে ; ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন ও তাঁহার কুয়ো-মিং-তাং দলের উপর পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে নাই। বরঞ্চ উহারা চীনের সমরনায়কগণের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছিল যে চীনে জাতীয় আন্দোলনের চাপে সমরনায়কগণের ধ্বংস সুনিশ্চিত। এই কারণে সোভিয়েট রাশিয়া প্রথম হইতেই চীনে পশ্চিমী ধনতন্ত্রবাদের ও সমরনায়কগণের প্রতিপত্তির অবসানকল্পে জাতীয়তাবাদীগণকে সাহায্য করিতে আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছিল। ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের আমন্ত্রণে সোভিয়েট সরকার মাইকেল বরোডিন (Borodin) নামে এক কূটনীতিজ্ঞের নেতৃত্বে একটি কূটনৈতিক মিশন চীনে প্রেরণ করেন। বরোডিনের প্রচেষ্টায় কুয়ো-মিং-তাং দল নূতন জীবনীশক্তি লাভ করে। রুশ সামরিক কর্মচারীদের চেষ্টায় চীনে এক নূতন সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী গড়িয়া উঠে এবং চিয়াং-কাই-শেক (Chaing-Kai-Shek) ওয়ামপোয়া (Wampoa) নামক স্থানে স্থাপিত সামরিক শিক্ষায়তনের প্রথম ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে রাশিয়া ও চীনের মধ্যে একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার শর্তানুসারে রাশিয়া চীনে অতিরাষ্ট্রীক অধিকার পরিত্যাগ করে, বক্সার-বিদ্রোহের ক্ষতিপূরণ বাবদ চীনের নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থ বাতিল করে এবং চীন সাম্রাজ্যে কমিউনিস্ট প্রচারকার্য বন্ধ রাখিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।

রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি আনয়নের উদ্দেশ্যে ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন কর্তৃক রাশিয়ার সাহায্যগ্রহণ

চীনে রুশ কূটনৈতিক মিশনের আগমন

চীন ও রাশিয়ার মধ্যে সন্ধি

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন পরলোক গমন করেন। তিনি ছিলেন চীন-বিপ্লবের জনক। মাঞ্চু রাজবংশের বিরোধী আন্দোলনকে দক্ষতার সহিত সাধারণতান্ত্রিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করিয়া তিনি চীনে রাজতন্ত্রের অবসান করেন। তাঁহার 'তিন দফা কর্মসূচী' (Three-Point Programme) চীনের জনসাধারণের নিকট আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল। এই তিন দফা কর্মসূচীর প্রথমটি হইল জাতীয়তাবাদ। এই সময় পর্যন্ত চীনাদের আনুগত্য বলিতে বুঝাইত নিজের পরিবার, গোষ্ঠী ও গ্রামের প্রতি আনুগত্য। জাতি বা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের আদর্শ উহাদের নিকট ছিল অজ্ঞাত। ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন-এর জাতীয়তাবাদের আদর্শ ছিল রাষ্ট্রের প্রতি

সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু (১৯২৫)

তিন দফা কর্মসূচী

আনুগত্য। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের অর্থ হইল রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি বিনাশকারীদের বিরোধিতা করা। এই কারণে সান-ইয়াৎ-সেন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে চীনা জনগণের নিকট ঐক্যের আহ্বান জানাইয়াছিলেন। তাঁহার জাতীয়তাবাদের মূল আদর্শ ছিল সবল রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ভিত্তির উপর জাতীয় দেশপ্রেমের বুনিয়াদ গড়িয়া তোলা। সান-ইয়াৎ-সেন-এর দ্বিতীয় আদর্শ বা কর্মসূচী ছিল গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। যেহেতু সেই সময় জনগণের সার্বভৌমত্ব স্থাপন করার মত উপযুক্ত শিক্ষা ও ক্ষমতা চীনাদের ছিল না, সেই হেতু তিনি তিনটি পর্যায়ে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী গ্রহণ করেন; যথা—সামরিক সরকার গঠন; দলের নিয়ন্ত্রণে জনগণকে গণতন্ত্রের শিক্ষা দেওয়া এবং শেষে নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠন করা। সান-ইয়াৎ-সেন-এর তৃতীয় আদর্শ বা কর্মসূচী ছিল জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং তাহা কার্যকর করার জন্য তিনি সামাজিক সংস্কারের কথা প্রচার করেন। চীনের সমগ্র আবাদী জমির সম-বণ্টন করিয়া দরিদ্র কৃষকদের অবস্থার উন্নয়ন করার উপর তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব অর্পণ করেন। এই দিক দিয়া বিচার করিলে সান-ইয়াৎ-সেন-কে সমাজ-সংস্কারক বলা যায়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে চিয়াং-কাই-শেক-এর নেতৃত্বাধীন কুয়ো-মিং-তাং সরকার এবং চীনের কমিউনিস্টগণ উভয়েই চীনের সংগঠনের ব্যাপারে সান-ইয়াৎ-সেন-এর তিন দফা কর্মসূচী কার্যকর করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সান-ইয়াৎ-সেন-এর আদর্শ কার্যকর করিতে চিয়াং-কাই-শেক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। অপরদিকে চীনের কমিউনিস্টগণও সান-ইয়াৎ-সেন-এর তিন দফা কর্মসূচীর যথার্থ নির্বাহক বলিয়া মনে করিত। এই কারণেই বলা হয়, Whatever path China may take in future, she will do so in the name of Sunyat Sen"। প্রকৃতপক্ষে সান-ইয়াৎ-সেন-এর আদর্শের ভিত্তির উপর চীনের পুনর্গঠন শুরু হয়। চীনের একতা, জাতীয়তা ও স্বাধীনতার সহিত তাঁহার নাম আজিও জড়িত রহিয়াছে।

ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর চিয়াং-কাই-শেক কুয়োং-মিং-তাং দলের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। চীনের ঐক্যবন্ধন তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। দক্ষিণ ও মধ্যচীনে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উত্তর-চীনে সমর-নায়কগণের শাসন তখনও পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ইতিমধ্যে জাতীয়তাবাদীগণের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয় (১৯২৬ খ্রীঃ)। জাতীয়তাবাদীগণ দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। বামপন্থীগণ ছিল কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন। অবশ্য প্রথমদিকে বামপন্থীগণের সংখ্যা ছিল কম। দক্ষিণপন্থীগণ ছিল কমিউনিজমৃ বা সাম্যবাদের ঘোর বিরোধী। চিয়াং-কাই-শেক ছিলেন দক্ষিণপন্থীদের সমর্থক। যাহা হউক, প্রথমদিকে জাতীয়তাবাদীগণের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হইলেও উহারা উত্তর-চীনের সমরনায়কগণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হয়।

জাতীয়তাবাদীগণের মধ্যে বামপন্থীদের উদ্ভব

ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের ন্যায় চিয়াং-কাই-শেকও উত্তরাঞ্চলের সমরনায়কগণকে দমন করিয়া সমগ্র চীনকে ঐক্যবদ্ধ করিতে যত্নবান হন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে চিয়াং তাঁহার বিখ্যাত উত্তর-চীন অভিযান (Northern Drive) শুরু করেন। সেই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয়তাবাদীগণ হ্যাংকাও (Hankow) ও ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে সাংহাই ও নানকিন দখল করে। কিন্তু এই সময় কুয়োং-মিং-তাং দলভুক্ত দক্ষিণ-পন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে বিবাদের মাত্রা প্রবল হইয়া উঠিলে জাতীয়বাহিনীর অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। জাতীয়বাহিনীর মধ্যে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন একদল সৈন্যবাহিনী নানকিনে একটি পৃথক সরকার স্থাপন করিয়া বিদেশীগণের উপর অত্যাচার শুরু করে। ইহা 'নানকিন ঘটনা' নামে খ্যাত (১৯২৭ খ্রীঃ)। কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন চীনা সৈন্যবাহিনীর এইরূপ কার্যকলাপে বিরক্ত হইয়া বিদেশী রাষ্ট্রবর্গ ও জাপান চীনে উহাদের সৈন্যবাহিনী আমদানি করে। চিয়াং-কাই-শেক ইহাতে ভীত হইয়া কুয়ো-মিং-তাং দলকে কমিউনিস্ট প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে সচেষ্ট হন। কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন সদস্যগণকে কুয়ো-মিং-তাং দল হইতে বহিষ্কৃত করা হয় এবং সর্বত্র কমিউনিস্টদের উপর অত্যাচার শুরু হয়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে চিয়াং সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

চিয়াং-এর উত্তর-চীন অভিযান

জাতীয়তাবাদীগণ কর্তৃক হ্যাংকাও, সাংহাই ও নানকিন দখল ঃ বামপন্থীদের কার্যকলাপ ও জাতীয়তাবাদী বাহিনীর অগ্রগতি ব্যাহত ঃ কমিউনিস্ট দমন ও রাশিয়ার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন

অতঃপর চিয়াং তাঁহার উত্তর-চীন অভিযান পুনরায় শুরু করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনের জাতীয়বাহিনী পিকিং দখল করিয়া উত্তর-চীনের সরকারকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করেন। এইভাবে জাতীয় সরকারের নেতৃত্বে সমগ্র চীন ঐক্যবদ্ধ হয় এবং ঐক্যবদ্ধ চীনের রাজধানী পিকিং হইতে নানকিনে স্থানান্তরিত করা হয়।

চীনের ঐক্যবন্ধন সম্পূর্ণ (১৯২৮)

চীনের অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন সাধনেও চিয়াং-কাই-শেক কৃতিত্বের পরিচয় দেন। রাজপথ ও রেলপথ নির্মাণ, শিল্পের প্রসার, শিক্ষার উন্নতিসাধন প্রভৃতি গঠনমূলক কার্যাদির দ্বারা তিনি চীনকে অগ্রগতির পথে চালিত করেন। তিনি বহুবিধ আইন লিপিবদ্ধ করেন এবং জেলখানার সংস্কারসাধনও করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয়তাবাদী দলের একটি কার্যনির্বাহক কমিটি (Executive Committee) গঠন করা হয় এবং চীনের প্রশাসনী ক্ষমতা একটি রাষ্ট্রীয় পরিষদের (Council of State) হস্তে ন্যস্ত করা হয়। কার্যনির্বাহক কমিটি চিয়াং-কাই-শেক-কে উহার সভাপতি নির্বাচিত করে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষের

জাতীয় সরকারের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ

চিয়াং-এর কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি-পদে নির্বাচন (১৯২৮)

দিকে জাপান ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের অধিকাংশ নানকিন সরকারকে সরকারী ভাবে স্বীকার করিয়া লয়।

জাতীয় সরকারের শুল্ক নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ

অভ্যন্তরীণ গঠনমূলক কার্যাদির সঙ্গে সঙ্গে চীনের জাতীয় সরকার চীনকে বিদেশীদের প্রতিপত্তি হইতে মুক্ত করিতে যত্নবান হন। প্রথমেই জাতীয় সরকার সকল 'অসম-চুক্তি' বাতিল করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র চীনের সহিত একটি সন্ধি সম্পাদন করিয়া চীনের জাতীয় শুল্ক নিয়ন্ত্রণের অধিকার চীনের সরকারকে প্রত্যর্পণ করে। জাতীয় সরকারের শুল্ক নিয়ন্ত্রণের অধিকার অন্যান্য পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ স্বীকার করিয়া লয়। এতদ্ভিন্ন চীনের জাতীয় সরকারের চাপে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ চীনে উহাদের অতিরাষ্ট্রীক ক্ষমতা প্রত্যাহার করে। রাশিয়া ও জার্মানী উহাদের অতিরাষ্ট্রীক ক্ষমতা পূর্বেই প্রত্যাহার করিয়াছিল এবং ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ইটালী ও পর্তুগালও তাহাই করিল।

চীনে বিদেশীয়গণের অতিরাষ্ট্রীক ক্ষমতার বিলুপ্তি

কমিউনিস্টদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি

যদিও চিয়াং-কাই-শেক সর্বতোভাবে চীনের জাতীয় সরকারকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার কোন চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, তথাপি চীনের ইয়াংসি, কিয়াংসি, হুনান ও উত্তর-ফুকিয়েন প্রভৃতি প্রদেশগুলিতে কমিউনিস্টগণ উহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া যাইতেছিল। উত্তরোত্তর কমিউনিস্টদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং উহারা সোভিয়েট গঠনেও যত্নবান হইতেছিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে চিয়াং-এর একনায়কতন্ত্রে বিরক্ত হইয়া কোয়াং-তুং ও কোয়াংসি প্রদেশ দুইটিও কমিউনিস্টদের সহিত যোগদান করে এবং ক্যান্টনে একটি স্বতন্ত্র সরকার গঠন করে। সুতরাং পুনরায় চীনে জাতীয় সংকটের সূচনা হয়।

ক্যান্টনে স্বতন্ত্র সরকার গঠন

১৮.৫. চীনের পররাষ্ট্রনীতি, ১৯২২-১৯৩৯ (Foreign Policy of China) : ১৯২২ হইতে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চীনের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান ঘটনা সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা, বিদেশী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে চীনের কূটনৈতিক সাফল্য এবং জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ।

চীন-রুশ সহযোগিতার যুগ (১৯২১-২৬)

ওয়াশিংটন বৈঠকের পর হইতে চীনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে এবং চীন ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে থাকে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে রাশিয়ার বলশেভিক সরকার প্রথম হইতেই চীনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে বলশেভিক সরকার চীনে রাশিয়ার সকল বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বলশেভিক বিদ্রোহের প্রতি চীনও যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিল। রাশিয়া ও চীনের অভ্যন্তরীণ অবস্থার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। রুশ-বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য

ছিল রাশিয়ার তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামোর ধ্বংস সাধন করিয়া নূতন রাষ্ট্র ও সমাজজীবন গঠন করা। সেই সময় চীনের নির্যাতিত জনগণও চীনের তদানীন্তন বহু দোষে দুষ্ট রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের অবসান ঘটাইয়া এবং বিদেশী প্রভাব হইতে দেশকে মুক্ত করিয়া এক শক্তিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং জাতীয় মর্যাদা ও সংহতি স্থাপনে উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। স্বভাবতঃই রুশ-বিপ্লব তথা সাম্যবাদের আদর্শ চীনের জনগণের মনে এক দিকে নূতন পথের সন্ধান দিয়াছিল। অপরদিকে সাম্যবাদের প্রভাব ও উহার বিস্তাপনের জন্য রাশিয়ার নিকট চীনের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং উভয় রাষ্ট্রই পরস্পরের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করিতেছিল।

চীন-রুশ সহযোগিতার কারণ

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে চীনের নৈরাশ্য, চীনের সামরিক পুনর্গঠন করার ব্যাপারে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির অসহযোগিতা প্রভৃতি কারণে চীনের জাতীয় সরকার (কুয়ো-মিং-তাং) স্বভাবতঃই সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে ঝুঁকিলেন। এস্থলে স্মরণ রাখা দরকার যে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ চীনের জাতীয়তাবাদী নেতা ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন (Dr. Sun-yet-Sen) ও তাঁহার দল কুয়োং-মিং-তাং-এর উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করে নাই। উহারা চীনের সমরনায়কগণের (war-lords) উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছিল যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাপে চীনের সমরনায়কগণের ধ্বংস সুনিশ্চিত। এই কারণেই সোভিয়েট রাশিয়া প্রথম হইতেই কুয়োং-মিং-তাং-এর সহিত সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতেছিল।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কুয়ো-মিং-তাং সরকারের পরামর্শদাতা হিসাবে বরোডিন (Borodin) মস্কো হইতে চীনে আগমন করেন। চারি বৎসর ধরিয়া সোভিয়েট-কুয়ো-মিং-তাং সহযোগিতা চলিল। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির অনুকরণে চীমে কুয়ো-মিং-তাং দলের পুনর্গঠন করা হইল। কমিউনিস্ট সৈন্যবাহিনীর অনুকরণে চীনের সৈন্যবাহিনীও পুনর্গঠিত হইল। এতদ্ভিন্ন কুয়ো-মিং-তাং সরকার কমিউনিস্টগণকে কুয়ো-মিং-তাং দলের সদস্যপদে গ্রহণ করিলেন যদিও কমিউনিস্ট পার্টির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা হইল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে একটি নূতন সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল।

চীনে রাশিয়ার কূটনৈতিক মিশন (১৯২৩)
রুশ-চীন সন্ধি (১৯২৪)

ইতিমধ্যে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সাংহাই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া (সাংহাই-এ একটি ছাত্রমিছিলের উপর বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী গুলিবর্ষণ করিলে এক দারুণ গোলযোগের সৃষ্টি হয়) চীনের জাতীয়তাবাদীগণ ব্রিটেনের অধিকারভুক্ত হংকং অবরোধ করিল এবং ব্রিটেনজাত সামগ্রীর বিরুদ্ধে বয়কট নীতি গ্রহণ করা হইল। এই অবস্থায় ব্রিটেন চীনের সহিত এক আপোস-মীমাংসায় আসিতে বাধ্য হইল। সাংহাই-এ আহূত এক

সাংহাই ঘটনা, শুল্ক পুনরুদ্ধার

সম্মেলনে ইওরোপীয়গণ কর্তৃক চীনের শুল্ক-নীতি পুনর্বিবেচিত হইল। ব্রিটেন শুল্কের শতকরা পাঁচ ভাগ চীনকে প্রদান করিতে সম্মত হইল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনে শুল্ক ধার্য করা ও তাহা আদায় করার অধিকার চীনকে দেওয়া হইল। ইটালী, স্পেন, পর্তুগাল চীন সরকারকে শুল্ক প্রদানে সম্মত হইল।

অতঃপর চীনের জাতীয়তাবাদী সরকার বিদেশী প্রভাব ও কর্তৃত্ব হইতে চীনকে মুক্ত করিতে বদ্ধপরিকর হন। নানকিন, হ্যাংকাও ও অন্যান্য শহরে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত চীনের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নিকট নোট পাঠাইয়া চীনে বিদেশী রাষ্ট্রের অতিরাষ্ট্রীক ক্ষমতা বিলুপ্ত করার দাবি করিলেন। চীন সরকার ইহাতেও সন্তুষ্ট না থাকিয়া লীগ-অফ-নেশনস্-এও এই প্রশ্নটি উত্থাপন করিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ চীনের দাবি স্বীকার করিয়া লইল এবং চীনে অবস্থানরত বিদেশীদের উপর চীন সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইল। এই সময়ের মধ্যে ব্রিটেন হ্যাংকাও, সিন-কিয়াং, এ্যাময় প্রভৃতি অঞ্চলে স্বীয় সুযোগ-সুবিধা ও 'বিশেষ স্বার্থ' প্রত্যাহার করিল। সুতরাং এইভাবে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের বিরুদ্ধে চীনের কূটনৈতিক সাফল্য লাভ ঘটিল। কিন্তু ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিলে কুয়ো-মিং-তাং সরকারকে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের শরণাপন্ন হইতে হইল। সুতরাং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চীনের পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তন ঘটিল। চীন ইওরোপের সহিত সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করিল।

বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে চীনের কূটনৈতিক সাফল্য

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ এবং ইওরোপের সহিত সহযোগিতার নীতি

ইতিমধ্যে চীনের অভ্যন্তরে জাতীয় সরকারের সহিত কমিউনিস্টদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে রাশিয়ার প্রতি চীনের এযাবৎ অনুসৃত নীতির পরিবর্তন ঘটিল। চিয়াং-কাই-শেক ও রুশ-কূটনীতিক বরোডিনের মধ্যে মতান্তর ঘটিলে বরোডিনকে চীন হইতে বহিষ্কার করা হইল এবং কুয়ো-মিং-তাং সরকার কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলেন।

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জেহাদ ও রাশিয়ার সহিত সম্পর্কের অবনতি

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে সাংহাই ও ক্যান্টনে বহু রুশ ও কমিউনিস্টকে বন্দী করা হইল। কমিউনিস্টগণকে কুয়ো-মিং-তাং হইতে বহিষ্কার করা হইল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কুয়ো-মিং-তাং সরকার সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন এবং ক্রমশঃ ব্রিটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকিলেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনের পূর্ব-রেলপথের ব্যাপার লইয়া চীন ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হইল। এই বিবাদ এক সময় সংঘর্ষের আকার ধারণ করিল এবং উভয় পক্ষ সীমান্তে সৈন্য সমাবেশও করিতে লাগিল। ফ্রান্স ও জার্মানী চীন ও সোভিয়েট রাশিয়ার এই বিবাদের মীমাংসার জন্য মধ্যস্থতা

চীন ও রাশিয়ার মধ্যে বিরোধ

করিতে প্রস্তুত হইল। জার্মানী ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত চীন-রুশ সন্ধির শর্তানুসারে চীন ও সোভিয়েট বিবাদের মীমাংসার প্রস্তাব করিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারী স্টিমসন্ শান্তিপূর্ণভাবে এই বিবাদের মীমাংসার প্রস্তাব করিলেন। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে উভয় পক্ষ যথাপূর্বং ব্যবস্থায় সম্মত হইয়া আপাততঃ যুদ্ধ হইতে বিরত হইল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে চীন ও রাশিয়ার প্রতিনিধিগণ একটি বৈঠকে (Khabarovsk Convention) মিলিত হইলেন। কিন্তু কোনরূপ মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব হইল না। ইতিমধ্যে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মুকদেন ঘটনার (Mukden incident) ফলে রাশিয়া এই বৈঠক মুলতুবি রাখিল। জাপান রাশিয়ার নিকট একটি অনাক্রমণ-চুক্তির প্রস্তাব করিল। কিন্তু রাশিয়া উহাতে অসম্মত হইল। মাঞ্চুরিয়ার প্রশ্ন লইয়া চীন ও জাপানের মধ্যে স্থিতাবস্থার উদ্ভব হইল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কুয়ো-মিং-তাং সরকার রাশিয়ার সহিত পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে যত্নবান হইলেন। সেই বৎসরের ডিসেম্বর মাসে উভয়ের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হইল।

চীন-রুশ মৈত্রী পুনঃ স্থাপিত (১৯৩২)

চীনে জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিস্টগণের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ লইয়া জাপান মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী মুকদেন দখল করিয়া বসিল এবং তথায় জাপানের একটি তাঁবেদার সরকার গঠন করিল। ইহা 'মাঞ্চুকুয়ো' (Manchukuo) নামে পরিচিত। প্রথমে অন্যান্য রাষ্ট্র মাঞ্চুকুয়োর সরকারকে স্বীকার করিতে অসম্মত হইলেও পরে তাহা করিল। মাঞ্চুরিয়ার প্রশ্নটি লীগ-অফ-নেশনস্-এ উপস্থাপিত করা হইল এবং লীগ জাপানকে আক্রমণকারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। কিন্তু জাপান লীগ-অফ্-নেশনস্-এর সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিল। চীন জাপানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট গ্রহণ করিল, কিন্তু তাহাও জাপান সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিল। রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিট্ভিনভ (Litvinov) জাপানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা ইহাতে অসম্মত হইল। পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের অনমনীয় মনোভাব জাপানকে উৎসাহিত করিল এবং জাপান মাঞ্চুরিয়ায় নিজের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত নবম-শক্তি সন্ধি (Nine-Power Treaty) চীনের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষা করিতে পারে নাই।

চীনের অন্তর্বিপ্লবের সুযোগে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল ও মাঞ্চুকুয়োর প্রতিষ্ঠা (১৯৩২)

চিয়াং-কাই-শেক সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধ করার পরিবর্তে কমিউনিস্টগণকে দমন করিতেই অধিক তৎপর ছিলেন। এমন কি এক সময় চীন-সরকার জাপানের সহিত সরাসরি আলাপ-আলোচনা চালাইতেও উদ্যোগী হইয়াছিলেন। জাপানের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গ্রহণে ব্রিটেন ও আমেরিকার অনিচ্ছা জানিয়া চীন সরকার জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার

জাপানের সহিত টংকু-যুদ্ধ-বিরতি-চুক্তি (১৯৩২)

পরিবর্তে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সহিত টংকু-যুদ্ধবিরতি-চুক্তি (Tangku Truce) স্বাক্ষর করিলেন।

জাপানের প্রতি চীন সরকারের এই তোষণনীতির বিরুদ্ধে কমিউনিস্টগণ জোর প্রচারকার্য চালাইতে লাগিল। স্বদেশের শত্রু জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার জন্য কমিউনিস্টগণ কুয়ো-মিং-তাং সরকারের নিকট আবেদন করিল। কিন্তু চীন সরকার উহার পরিবর্তে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করিলেন। ফলে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্টগণ সশস্ত্র বিদ্রোহ করিয়া উত্তর-পশ্চিম চীনে আঞ্চলিক সোভিয়েট স্থাপন করিল। ইয়েনান (Yenan) উহাদের নূতন রাজধানী হইল।

চীন সরকারের তোষণনীতির বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের বিদ্রোহ ও সোভিয়েট স্থাপন (১৯৩৪)'

১৯৩৭-১৯৩৯ঃ ১৯৩৭ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কুয়ো-মিং-তাং ও কমিউনিস্টদের মধ্যে সাময়িক একতা স্থাপিত হয়। জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিস্টদের মধ্যে বিবাদ ও বিরোধের সুযোগ লইয়া জাপান চীন আক্রমণ করিল। স্বদেশের এই সংকটকালে চীনের সকল রাজনৈতিক দল সাময়িকভাবে সংঘবদ্ধ হইয়া জাপানকে প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইল। ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাপান উত্তর-চীনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'মার্কো-পোলো-সেতু ঘটনা'-কে (Marco-Polo-Bridge Incident) উপেক্ষা করিয়া জাপান চীন আক্রমণ করিল। চিয়াং সরকার ও কমিউনিস্টদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হইল। 'জাতীয়-মুক্তি-সংঘের' (National Salvation Association) নেতৃবৃন্দকে ও অন্যান্য শ্রমিকসংঘের নেতৃবৃন্দকে মুক্তিদান করা হইল। কমিউনিস্টপার্টি ঘোষণা করিল যে "শুধু জাপানকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্য লইয়া যে উহারা কুয়ো-মিং-তাং সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছে এমন নহে—যুদ্ধ অবসানে কুয়ো-মিং-তাং সরকারের সহযোগিতায় উহারা দেশের জাতীয় পুনর্গঠন করিতেও বদ্ধপরিকর।" কমিউনিস্ট ও কুয়ো-মিং-তাং উভয় দলকে লইয়া 'জনগণের রাজনৈতিক সমিতি' (Peoples' Political Council) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইল। এই সমিতির প্রধান কর্তব্য ছিল যুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যাপারে জাতীয় সরকারকে পরামর্শ দান করা। জাপানের বিরুদ্ধে কুয়ো-মিং-তাং ও কমিউনিস্টদের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইলে চীনের সহিত রাশিয়ার সম্পর্কেরও উন্নতি হইল। ইতিমধ্যে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জাপান ও জার্মানীর মধ্যে 'কমিউনিস্ট বিরোধী-চুক্তি' (Anti-Communist Pact) স্বাক্ষরিত হইলে জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে প্রায় সংঘর্ষের উপক্রম হইল। সুতরাং

জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণ (১৯৩৭)

চিয়াং সরকারের সহিত কমিউনিস্টদের সহযোগিতা

'Peoples' Political Council

জাপানের বিরুদ্ধে রুশ-চীন সহযোগিতা ও রুশ-চীন অনাক্রমণ-চুক্তি (১৯৩৭)

স্বীয় স্বার্থরক্ষার্থে রাশিয়া চীনকে জাপানের বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতে লাগিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে 'অনাক্রমণ-চুক্তি' স্বাক্ষরিত হইল। সেই বৎসর অস্ট্রেলিয়া সুদূর-প্রাচ্যের সহিত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রবর্গের একটি সম্মেলন আহ্বানের যে প্রস্তাব দিয়াছিল রাশিয়া তাহা সমর্থন করিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ব্রাসেলস্-সম্মেলনে (Brussels Conference) রাশিয়া জাপানের আক্রমণের তীব্র নিন্দা করিয়া চীনকে সমর্থন করিল। এতদ্ভিন্ন রাশিয়া চীনকে প্রচুর অর্থনৈতিক সাহায্যও করিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে 'সিনোসোভিয়েট বাণিজ্য-চুক্তি' (Sino-Soviet Commercial Agreement) সম্পাদিত হইল।

১৮.৬ চীনে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যুত্থান (Rise of the Communist Party) ঃ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-বিপ্লবের সাফল্য ঘটিলে চীনের বুদ্ধিজীবীগণ মার্ক্সীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। চীনের বুদ্ধিজীবীগণ মনে করেন যে চীনের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আধুনিক যুগের ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাঁহারা ক্লাব বা সংস্থা গঠন করিয়া মার্ক্সীয় আদর্শ ও দর্শন অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা শুরু করেন এবং এই ব্যাপারে কমিউনিস্টগণ-এর কিছু সদস্য চীনের বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য করেন। ক্রমে সাম্যবাদ চীনে জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে থাকে এবং পিকিং ও সাংহাই-এ কয়েকটি সংগঠন গড়িয়া উঠে। বুদ্ধিজীবীদের এই গোষ্ঠীই প্রকৃতপক্ষে চীনে কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি রচনা করে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সাংহাই-এ কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের বৈঠক বসে। এই সময় কমিউনিস্টদের উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন লি-লি-সান ও মাও-সে-তুং। এই কংগ্রেসে তিনটি কর্মসূচী প্রস্তাব করা হয়—যথা চীনের সমরনায়কদের উচ্ছেদ, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং চীনের রাষ্ট্রীয় ঐক্য।

কুয়ো-মিং-তাং দলের উপর প্রভাব বিস্তার করার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্টগণ কুয়ো-মিং-তাং দলে যোগ দেয়। রাশিয়ার কূটনীতিক মাইকেল বরোডিনের পরামর্শক্রমে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির অনুকরণে কুয়ো-মিং-তাং দল পুনর্গঠন করা হইলে চীনা কমিউনিস্টদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কিন্তু কুয়ো-মিং-তাং-এর দক্ষিণপন্থীগণ বামপন্থী কমিউনিস্টদের প্রতি মোটেই সহানুভূতিশীল ছিল না এবং উহারা রাশিয়ার সহিত সম্পর্ক ছেদ করার পক্ষপাতী ছিল। ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন কুয়ো-মিং-তাং-এর দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখিতে সমর্থ হন। কিন্তু জাতীয়তাবাদী দলের নেতা চিয়াং-কাই-শেক ছিলেন দক্ষিণপন্থীদের সমর্থক এবং এই কারণে তিনি কমিউনিস্টদের প্রভাব খর্ব করিতে প্রয়াসী হন এবং দলের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি হইতে বামপন্থীদের বিতাড়িত করেন। ইহার পর তিনি কমিউনিস্টদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

কুয়ো-মিং-তাং তথা চিয়াং সরকারের সহিত কমিউনিস্টদের সম্পর্ক ক্রমেই অবনতির দিকে যাইতে থাকে। চিয়াং সরকারকে হেয় করার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্টগণ

গোলযোগের সূচনা করে। এই গোলযোগগুলির মধ্যে নানকিং-এর ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনার ফলে চিয়াং সরকারের সহিত বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সংঘর্ষের সূচনা হয় এবং জাপান কয়েক হাজার সৈন্য চীনে আমদানি করে। অপ্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তির প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে চিয়াং-কাই-শেক কমিউনিস্টগণকে কুয়োমিং-তাং দল হইতে বহিষ্কার করেন এবং উহাদের দখল হইতে হ্যাংকাও উদ্ধার করেন। সেই বৎসর তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং নানকিং-এ জাতীয়তাবাদী সরকার গঠন করেন। ইহার পর শুরু হয় চিয়াং-কাই-শেকের কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান। তিনি সাংহাই-এ কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ দমন করেন এবং দেশের বহু স্থানে কমিউনিস্টদের তাড়া করিয়া হত্যা করেন। ইহার ফলে কমিউনিস্টদের সহিত জাতীয়তাবাদীদের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়।

এই অবস্থায় কমিউনিস্টগণ শহরের পরিবর্তে গ্রামাঞ্চলে নিজেদের তৎপরতা বৃদ্ধি করে। গ্রামাঞ্চলে চাষীদের সমর্থন লাভ করিয়া কমিউনিস্টগণ সরকারী বাহিনীর সহিত সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে থাকে। মাও-সে-তুং ও চু-তে কিং-য়াং-সি ও ফুকিয়েন প্রদেশে সোভিয়েট গঠন করেন। মাও-সে-তুং ও চু-তে যথাক্রমে এই সোভিয়েট সংগঠনের চেয়ারম্যান ও সমর-অধিনায়ক নিযুক্ত হন।

সোভিয়েট সংগঠনের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে জমিদারি উচ্ছেদ করা হয় এবং চাষীদের মধ্যে জমি বিলি করা হয়। সেই সঙ্গে চাষের উন্নয়নের জন্য সেচ, খাল ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সোভিয়েট সংগঠনের নিয়ন্ত্রণাধীন শহরগুলিতে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি করা হয় এবং শ্রমিকদের কাজের সময় হ্রাস করা হয়। এই সকল উন্নয়নমূলক সংস্কারের ফলে কমিউনিস্ট পার্টি ক্রমেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং চিয়াং-কাই-শেকের জাতীয়তাবাদী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার হইয়া উঠে।

চীনে কমিউনিস্টদের উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা ও শক্তিবৃদ্ধিতে জাতীয়তাবাদী সরকার উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। সুতরাং কমিউনিস্টদের ধ্বংস করার জন্য ও উহাদের প্রভাবিত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কমিউনিস্টদের উৎখাত করার জন্য কয়েকটি সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়, কিন্তু সেগুলি বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। ইহার পর চিয়াং-কাই-শেক এক বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং কমিউনিস্টদের লাল ফৌজকে পরাস্ত করেন। বিপদের আশঙ্কা করিয়া মাও-সে-তুং ও চু-তে সমগ্র কমিউনিস্টগণকে একত্রিত করিয়া প্রায় ছয় হাজার মাইল দীর্ঘপথ ধরিয়া চীনের উত্তর-পশ্চিমে যাত্রা শুরু করেন। পথে বহু কমিউনিস্টের মৃত্যু হয়। শেষে উহারা ইয়েনান প্রদেশে আগমন করে। এই দীর্ঘ পথযাত্রা ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা।

এই সময় জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া জিহোল (Jehol) পর্যন্ত অগ্রসর হইলে চীনের সম্মুখে এক দারুণ জাতীয় বিপর্যয় নামিয়া আসে। এই অবস্থায় এক গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রণ্টের ভিত্তির উপর কমিউনিস্টগণ জাতীয়তাবাদী সরকারের সহিত সহযোগিতার প্রস্তাব করে। কিন্তু চিয়াং-কাই-শেক জাপানকে প্রতিরোধ করার পরিবর্তে কমিউনিস্টগণকে উচ্ছেদ করিতেই অধিক আগ্রহী ছিলেন। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে যাইয়া চিয়াং নিজেই কমিউনিস্টদের হস্তে বন্দী হন। অবশ্য কয়েক দিনের মধ্যেই চিয়াংকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং চিয়াং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার দমনমূলক নীতি স্থগিত রাখিতে সম্মত হন। কুয়োং-মিং-তাং ও কমিউনিস্টদের মধ্যে এই আপোস-মীমাংসা খুবই সময়োপযোগী হয়, কারণ ঠিক এই সময় (১৯৩৭) শুরু হয় জাপানের চীন আক্রমণ। কুয়ো-মিং-তাং ও কমিউনিস্ট পার্টি সম্মিলিতভাবে জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে।

১৮.৭. দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে জাপানের ইতিহাস (History of Japan between two World Wars): জাপান ও ভার্সাই-সন্ধি: প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে যোগদান করার মূলে জাপানের উদ্দেশ্য ছিল চীনে জাপানের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং জার্মানীর উপনিবেশগুলি অধিকার করার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করা। চীনে বিদেশীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং জাপানের লাভ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার জন্য চীনের দাবি অস্বীকৃত হয়। প্রেসিডেণ্ট উইলসন ও চীনের ঘোর আপত্তির বিরুদ্ধেই সাণ্টুং প্রদেশের উপর জাপানের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়। তথাপি শান্তি-সম্মেলন জাপানকে হতাশ করে। প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে জাপানকে শুধু যে চীনের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এমন নহে, উহাকে আমেরিকার তীব্র বিরোধিতারও সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত জার্মানীর উপনিবেশগুলি সরাসরি আত্মসাৎ করার ব্যাপারেও জাপানকে হতাশ হইতে হইয়াছিল। অপরদিকে আমেরিকাও ভার্সাই-এর বন্দোবস্তের দ্বারা সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। কারণ সুদূর-প্রাচ্যে জাপানের অভূতপূর্ব লাভ আমেরিকার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সুদূর-প্রাচ্যে রাশিয়ার প্রতিপত্তি বিনাশ ও চীনের রাষ্ট্রীয় অনৈক্যই যে জাপানের অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণ আমেরিকা তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি করে। সুতরাং ভার্সাই-সন্ধির পুনর্বিবেচনা ও সুদূর-প্রাচ্যে জাপানের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান করার উদ্দেশ্যে আমেরিকা ওয়াশিংটন সম্মেলন আহবান করে।

১৮.৮. ওয়াশিংটন সম্মেলনের পটভূমিকা (Background of Washington Conference): ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কমোডোর পেরীর জাপানে আগমনের সময় হইতে জাপানের সহিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ভালই ছিল। সুদূর-প্রাচ্যে বিশেষ কোন স্বার্থ না থাকায়, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' (open door policy) বজায় রাখিতে অধিক যত্নবান ছিল। সুতরাং আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে কোনরূপ

সুদূর-প্রাচ্যে আমেরিকার নীতি

তিক্ততা ছিল না। বরং পারস্পরিক ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা উভয়েই লাভবান হইয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু রুশ-জাপান যুদ্ধের পর (১৯০৪-৫) বিভিন্ন ঘটনার ফলে আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হইতে থাকে। এই যুদ্ধের ফলে সুদূর-প্রাচ্যে রাশিয়ার শক্তির বিপর্যয় ঘটে এবং সেই সুযোগে জাপান মাঞ্চুরিয়ায় নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে। জাপানের মিত্র হিসাবে ইংল্যাণ্ড জাপানের সামরিক পরিকল্পনার ব্যাপারে নিরপেক্ষ রহে। ফলে মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের কার্যকলাপ প্রতিরোধ করার দায়িত্ব আমেরিকার উপর আসিয়া পড়ে। আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলিতে শ্রমিক ও মজুর আমদানি করার প্রয়োজন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল।

আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে বিবাদের কারণ

আমেরিকার কংগ্রেসের এক আইন অনুসারে এই সকল দেশে অদক্ষ চীনা শ্রমিকদের আগমন নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। ফলে উচ্চহারে মজুরি পাইবার আশায় দলে দলে জাপানী শ্রমিক ও মজুর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে আগমন করিতে শুরু করে। জাপানী মজুরদের আগমন আমেরিকার মজুরদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করে। কারণ আমেরিকার শ্বেতকায় মজুরদের অপেক্ষা জাপানী মজুরদের মজুরির হার ছিল অনেক কম। জাপানী মজুরদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে সানফ্রান্সিসকে সরকারী স্কুলে জাপানী ছেলেমেয়েদের ভর্তি করা নিষিদ্ধ করা হয়। জাপান ইহার তীব্র প্রতিবাদ করে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট একটি আদেশ জারী করিয়া হাওয়াই, মেক্সিকো ও কানাডা হইতে জাপানীদের গমনাগমন নিষিদ্ধ করেন। সেই বৎসর আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে একটি 'ভদ্রলোকের-চুক্তি' (Gentlemen's Agreement) সম্পাদিত হয়। ইহার শর্তানুসারে জাপান উহার শ্রমিকগণকে আমেরিকায় না যাইতে দিতে প্রতিশ্রুত হয়।

জাপান ও আমেরিকার মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের অন্যান্য আরও কারণ ছিল। স্পেনের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিলে হাওয়াই ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার দখলে আসে। ফলে প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার স্বার্থ গড়িয়া উঠিতে থাকে। অপরদিকে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের শক্তিবৃদ্ধি আমেরিকার উদ্বেগের কারণ হয়। আমেরিকা উপলব্ধি করে যে সুদূর-প্রাচ্যে জাপানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এককভাবে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নহে। আমেরিকা দাবি করে যে চীনের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াই আমেরিকা চীনে মূলধন নিয়োগ করার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু জাপান মনে করিল যে মাঞ্চুরিয়াতে উহার স্বার্থ বিপন্ন করিতেই আমেরিকা অধিক তৎপর। ইহা ভিন্ন সুদূর-প্রাচ্যে জার্মানীর প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হইলে ব্রিটেনেও ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী-বিরোধী মনোভাব দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এই মৈত্রী পূর্বাঞ্চলে ব্রিটেনের অসুবিধার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

১৮.৯. ওয়াশিংটন সম্মেলন (Washington Conference) : ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান মিত্রশক্তির সহিত সমান মর্যাদালাভ করিয়া ওয়াশিংটন সম্মেলনে

যোগদান করিয়াছিল। আমেরিকা ইহা উপলব্ধি করে যে "সুদূর-প্রাচ্যে জাপানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা একক ভাবে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব নহে।"

সম্মেলন আহ্বানের কারণ জাপান সম্পর্কে ব্রিটেন ও আমেরিকার উদ্বেগ

সুদূর-প্রাচ্যে রুশ সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি এবং চীনের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা জাপানকে এইরূপ শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল যে এই অঞ্চলে আমেরিকার "উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব ছিল না। ইঙ্গ-জাপান মৈত্রীই (Anglo-Japanese Alliance) যে জাপানের শক্তিবৃদ্ধির অপর কারণ, আমেরিকা তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি করে। সুদূর-প্রাচ্যে জার্মানীর প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হইলে ব্রিটেনেও ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী-বিরোধী মনোভাব দেখা দিল। বস্তুতঃ এই মৈত্রী পূর্বাঞ্চলে ব্রিটেনের অসুবিধার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। অপরদিকে সুদূর-প্রাচ্যে জাপানের অগ্রগতি আমেরিকার উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল কারণে আমেরিকা ও ব্রিটেন উভয়েই সুদূর-প্রাচ্যে জাপানের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইল এবং এই উদ্দেশ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আমন্ত্রণে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটনে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের এক সম্মেলন বসিল, যদিও প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা হইল যে ভার্সাই-সন্ধির পুনর্বিবেচনা ও নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার আলোচনা করাই সম্মেলনের উদ্দেশ্য।

ওয়াশিংটন সম্মেলন: সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রবর্গ

এই সম্মেলনে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, চীন, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, ইটালী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পর্তুগাল যোগদান করিল। সুদূর-প্রাচ্যে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার স্বার্থ বিলুপ্ত হওয়ায় উহারা আমন্ত্রিত হয় নাই। সোভিয়েট রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত না হওয়ায় রাশিয়াও আমন্ত্রিত হয় নাই।

সম্মেলনে সম্পাদিত সন্ধিসমূহ

ওয়াশিংটন সম্মেলনে তিনটি পৃথক সন্ধি সম্পাদিত হইল—চতুঃশক্তি সন্ধি (Four-Power Treaty), পঞ্চশক্তি সন্ধি (Five-Power Treaty) ও নবমশক্তি সন্ধি (Nine-Power Treaty)।

চতুঃশক্তি সন্ধি (১৯২৩)

চতুঃশক্তি সন্ধি অনুসারে স্থির হইল যে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জাপান প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পরস্পরের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করিয়া চলিবে এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবে। এই সন্ধি দ্বারা ইঙ্গ-জাপান মৈত্রীর অবসান হইল এবং আমেরিকা চরম কূটনৈতিক সাফল্য লাভ করিল।

পঞ্চশক্তি সন্ধি (১৯২৩)

পঞ্চশক্তি সন্ধি ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালী ও জাপানের মধ্যে সম্পাদিত হয়। ইহার শর্তানুসারে ব্রিটেন, আমেরিকা ও জাপানের নৌ-শক্তি নির্দিষ্ট করা হইল এবং ইহাও স্থির হইল যে একমাত্র পানামা খাল ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরের কোন অঞ্চলে নৌ-ঘাঁটি স্থাপন করা চলিবে না।

ব্রিটেন, আমেরিকা, বেলজিয়াম, চীন, ফ্রান্স, ইটালী, জাপান, হল্যাণ্ড ও পর্তুগালের মধ্যে নবমশক্তি সন্ধি সম্পাদিত হয়। ইহার শর্তানুসারে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ চীনের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে, চীনে শক্তিশালী সরকার গঠনে সাহায্য করিতে এবং চীনে কোন প্রকার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ না করিতে সম্মত হইল। ইহা ছাড়া চীনে সকল রাষ্ট্রের সমান বাণিজ্যাধিকার স্বীকৃত হইল।

নবমশক্তি সন্ধি (১৯২২)

ওয়াশিংটন সম্মেলনে চীন সাণ্টুং প্রদেশ প্রত্যর্পণের দাবি তুলিয়াছিল; অবশেষে ব্রিটেন ও আমেরিকার চেষ্টায় চীন ও জাপানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল (১৯২২ খ্রীঃ)। এই চুক্তি অনুসারে প্রচুর ক্ষতি-পূরণের বিনিময়ে জাপান সাণ্টুং প্রদেশ চীনকে প্রত্যর্পণ করিল। কিন্তু সিংতাও রেলওয়ে জাপানের অধিকারে রহিল। এই চুক্তির ফলে ব্রিটেন ও আমেরিকার তুলনায় জাপানের নৌ-শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িল। এতদ্ভিন্ন জাপান আমেরিকার 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রতিশ্রুত হইল।

চীন-জাপান চুক্তি (১৯২২)

১৮.১০. ওয়াশিংটন সম্মেলনের গুরুত্ব (Importance of Washington Conference): একদিক দিয়া ওয়াশিংটন সম্মেলন প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুদূর-প্রাচ্য নীতির জয়লাভ হইল। কিন্তু অপরদিকে আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠিল এবং ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে মতানৈক্যের উদ্ভব হইল। নৌ-শক্তির দিক দিয়া জাপান সাময়িকভাবে শক্তিশালী হইয়া উঠিল এবং চীনের উপকূলে উহার কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হইল। কূটনীতির দিক দিয়া আমেরিকার জয়লাভ হইল। কারণ ইঙ্গ-জাপান মৈত্রীর অবসান হওয়ায় সুদূর-প্রাচ্যে আমেরিকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইল। চীনেরও কিছু সুবিধা হইল। যদিও চীনে আপাততঃ বিদেশী রাষ্ট্রগুলির অতিরাষ্ট্রীক ক্ষমতার অবসান হইল না, তথাপি চীনের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও বাণিজ্যশুল্কের উপর উহার কর্তৃত্ব পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক স্বীকৃত হইল।

সমালোচনা

কিন্তু যথার্থ ফলাফলের দিক দিয়া বিচার করিলে ওয়াশিংটন সম্মেলনের ব্যর্থতা লক্ষ্য করা যায়। জাপানের সমরবাদীগণ ইহাকে 'জাপানের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত' বলিয়া অভিহিত করিল। জাপানের শান্তিকামীগণ নিন্দিত ও সমালোচিত হইল এবং সমরবাদীগণ ইহাতে আক্রমণাত্মক নীতি প্রচারের সুযোগ পাইল। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে জাপান ও আমেরিকার মধ্যে বিবাদের মূল কারণগুলি দূর করিতে সম্মেলন ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়। জাপান ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কিছুদিনের মধ্যে তীব্র নৌ-শক্তির প্রতিযোগিতা পুনরায় শুরু হইল। চীনের অর্থনৈতিক অবস্থাও পর্যুদস্ত হইল। সুতরাং ফলাফলের দিক দিয়া ওয়াশিংটন সম্মেলন সামান্যই সাফল্য অর্জন করিয়াছিল।

ফলাফলের দিক দিয়া ব্যর্থতা

যোগদান করিয়াছিল। আমেরিকা ইহা উপলব্ধি করে যে "সুদূর-প্রাচ্যে জাপানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা একক ভাবে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব নহে।"

সম্মেলন আহ্বানের কারণ জাপান সম্পর্কে ব্রিটেন ও আমেরিকার উদ্বেগ

সুদূর-প্রাচ্যে রুশ সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি এবং চীনের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা জাপানকে এইরূপ শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল যে এই অঞ্চলে আমেরিকার "উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব ছিল না। ইঙ্গ-জাপান মৈত্রীই (Anglo-Japanese Alliance) যে জাপানের শক্তিবৃদ্ধির অপর কারণ, আমেরিকা তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি করে। সুদূর-প্রাচ্যে জার্মানীর প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হইলে ব্রিটেনেও ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী-বিরোধী মনোভাব দেখা দিল। বস্তুতঃ এই মৈত্রী পূর্বাঞ্চলে ব্রিটেনের অসুবিধার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। অপরদিকে সুদূর-প্রাচ্যে জাপানের অগ্রগতি আমেরিকার উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল কারণে আমেরিকা ও ব্রিটেন উভয়েই সুদূর-প্রাচ্যে জাপানের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইল এবং এই উদ্দেশ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আমন্ত্রণে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটনে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের এক সম্মেলন বসিল, যদিও প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা হইল যে ভার্সাই-সন্ধির পুনর্বিবেচনা ও নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার আলোচনা করাই সম্মেলনের উদ্দেশ্য।

ওয়াশিংটন সম্মেলন : সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রবর্গ

এই সম্মেলনে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, চীন, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, ইটালী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পর্তুগাল যোগদান করিল। সুদূর-প্রাচ্যে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার স্বার্থ বিলুপ্ত হওয়ায় উহারা আমন্ত্রিত হয় নাই। সোভিয়েট রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত না হওয়ায় রাশিয়াও আমন্ত্রিত হয় নাই।

সম্মেলনে সম্পাদিত সন্ধিসমূহ

ওয়াশিংটন সম্মেলনে তিনটি পৃথক সন্ধি সম্পাদিত হইল—চতুঃশক্তি সন্ধি (Four-Power Treaty), পঞ্চশক্তি সন্ধি (Five-Power Treaty) ও নবমশক্তি সন্ধি (Nine-Power Treaty)।

চতুঃশক্তি সন্ধি (১৯২৩)

চতুঃশক্তি সন্ধি অনুসারে স্থির হইল যে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জাপান প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পরস্পরের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করিয়া চলিবে এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবে। এই সন্ধি দ্বারা ইঙ্গ-জাপান মৈত্রীর অবসান হইল এবং আমেরিকা চরম কূটনৈতিক সাফল্য লাভ করিল।

পঞ্চশক্তি সন্ধি (১৯২৩)

পঞ্চশক্তি সন্ধি ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালী ও জাপানের মধ্যে সম্পাদিত হয়। ইহার শর্তানুসারে ব্রিটেন, আমেরিকা ও জাপানের নৌ-শক্তি নির্দিষ্ট করা হইল এবং ইহাও স্থির হইল যে একমাত্র পানামা খাল ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরের কোন অঞ্চলে নৌ-ঘাঁটি স্থাপন করা চলিবে না।

ব্রিটেন, আমেরিকা, বেলজিয়াম, চীন, ফ্রান্স, ইটালী, জাপান, হল্যাণ্ড ও পর্তুগালের মধ্যে নবমশক্তি সন্ধি সম্পাদিত হয়। ইহার শর্তানুসারে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ চীনের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে, চীনে শক্তিশালী সরকার গঠনে সাহায্য করিতে এবং চীনে কোন প্রকার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ না করিতে সম্মত হইল। ইহা ছাড়া চীনে সকল রাষ্ট্রের সমান বাণিজ্যাধিকার স্বীকৃত হইল।

নবমশক্তি সন্ধি (১৯২২)

ওয়াশিংটন সম্মেলনে চীন সাণ্টুং প্রদেশ প্রত্যর্পণের দাবি তুলিয়াছিল; অবশেষে ব্রিটেন ও আমেরিকার চেষ্টায় চীন ও জাপানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল (১৯২২ খ্রীঃ)। এই চুক্তি অনুসারে প্রচুর ক্ষতি-পূরণের বিনিময়ে জাপান সাণ্টুং প্রদেশ চীনকে প্রত্যর্পণ করিল। কিন্তু সিংতাও রেলওয়ে জাপানের অধিকারে রহিল। এই চুক্তির ফলে ব্রিটেন ও আমেরিকার তুলনায় জাপানের নৌ-শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িল। এতদ্ভিন্ন জাপান আমেরিকার 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রতিশ্রুত হইল।

চীন-জাপান চুক্তি (১৯২২)

১৮.১০. ওয়াশিংটন সম্মেলনের গুরুত্ব (Importance of Washington Conference): একদিক দিয়া ওয়াশিংটন সম্মেলন প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুদূর-প্রাচ্য নীতির জয়লাভ হইল। কিন্তু অপরদিকে আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠিল এবং ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে মতানৈক্যের উদ্ভব হইল। নৌ-শক্তির দিক দিয়া জাপান সাময়িকভাবে শক্তিশালী হইয়া উঠিল এবং চীনের উপকূলে উহার কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হইল। কূটনীতির দিক দিয়া আমেরিকার জয়লাভ হইল। কারণ ইঙ্গ-জাপান মৈত্রীর অবসান হওয়ায় সুদূর-প্রাচ্যে আমেরিকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইল। চীনেরও কিছু সুবিধা হইল। যদিও চীনে আপাততঃ বিদেশী রাষ্ট্রগুলির অতিরাষ্ট্রীক ক্ষমতার অবসান হইল না, তথাপি চীনের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও বাণিজ্যশুল্কের উপর উহার কর্তৃত্ব পাশ্চমী রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক স্বীকৃত হইল।

সমালোচনা

কিন্তু যথার্থ ফলাফলের দিক দিয়া বিচার করিলে ওয়াশিংটন সম্মেলনের ব্যর্থতা লক্ষ্য করা যায়। জাপানের সমরবাদীগণ ইহাকে 'জাপানের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত' বলিয়া অভিহিত করিল। জাপানের শান্তিকামীগণ নিন্দিত ও সমালোচিত হইল এবং সমরবাদীগণ ইহাতে আক্রমণাত্মক নীতি প্রচারের সুযোগ পাইল। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে জাপান ও আমেরিকার মধ্যে বিবাদের মূল কারণগুলি দূর করিতে সম্মেলন ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়। জাপান ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কিছুদিনের মধ্যে তীব্র নৌ-শক্তির প্রতিযোগিতা পুনরায় শুরু হইল। চীনের অর্থনৈতিক অবস্থাও পর্যুদস্ত হইল। সুতরাং ফলাফলের দিক দিয়া ওয়াশিংটন সম্মেলন সামান্যই সাফল্য অর্জন করিয়াছিল।

ফলাফলের দিক দিয়া ব্যর্থতা

১৮.১১. জাপানের পররাষ্ট্রনীতি ১৯২২-১৯৩৯ (Japan's Foreign Policy) ঃ জাপানের সমরবাদীগণ (militarists) খুশী মনে ওয়াশিংটন-সম্মেলনের ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহারা সম্মেলনের ব্যবস্থাদি জাপানের পক্ষে পরাজয় ও উহার জাতীয় অবমাননা বলিয়া মনে করিল। উপরন্তু আমেরিকায় জাপানী মজুরদের আগমন মার্কিন সরকার নিষিদ্ধ করিলে এবং চীন ও প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের উপনিবেশ বিস্তারের প্রচেষ্টায় আমেরিকা বাধা প্রদান করিতে থাকিলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে এক দারুণ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপানের আক্রোশ ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে থাকে।

চীন, আমেরিকা ও রাশিয়ার সহিত সহযোগিতার নীতি

কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইওরোপের অন্যান্য দেশগুলির ন্যায় জাপানেও এক দারুণ অর্থনৈতিক মন্দার (economic depression) যুগ দেখা দিলে জাপান ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের প্রতি অধিক মনঃসংযোগ করিল। চীন ও আমেরিকা ছিল জাপানী পণ্য-সামগ্রীর প্রধান বাজার। সুতরাং চীন ও আমেরিকার বাজার হস্তগত করার উদ্দেশ্যে এই দুই রাষ্ট্রের প্রতি জাপান সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ১৯২২ হইতে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাপান ওয়াশিংটন সম্মেলনের নির্দেশ পালন করিতে যত্নবান হইয়াছিল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিদেহারা (Sidehara) ঘোষণা করেন যে অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বার্থ হানি না করিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়ন করাই জাপানের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য। রাষ্ট্রীয় জোট গঠন করার পরিবর্তে অর্থনৈতিক সহযোগিতাই জাপানের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হইল। চীনকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে জাপান চীনকে সাণ্টুং প্রত্যর্পণ করিল এবং চীনে জাপানের ডাকঘরগুলি বন্ধ করিয়া দিল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন ও আমেরিকা বোমাবর্ষণের দ্বারা নানকিন বিধ্বস্ত করিতে অগ্রসর হইলে জাপান কোনরূপ সহযোগিতা করিতে অস্বীকৃত হইল।

আমেরিকার সহিত মনোমালিন্য বৃদ্ধি, চীনের জাতীয়তাবাদীদের সহিত সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতা বৃদ্ধি, ইঙ্গ-জাপান মৈত্রীর অবসান প্রভৃতি কারণে জাপান নিজের পরিস্থিতি সংকটপূর্ণ বলিয়া মনে করিল। সুতরাং জাপান সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত সদ্ভাব স্থাপনে যত্নবান হইল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সাইবেরিয়া হইতে জাপান উহার সৈন্যবাহিনী অপসারণ করিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান রাশিয়ার সহিত একটি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপান লীগ-অফ-নেশনস্ ও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সহিত সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে জাপান 'কেলগ্-ব্রিয়াঁ' চুক্তিতেও স্বাক্ষর করিল।

লীগ-অফ-নেশনস্-এর সহিত সহযোগিতা

কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিদেহারা'র "সকলের প্রতি সন্তুষ্টি বিধানের নীতি" প্রধান-

মন্ত্রী টানাকার মনঃপূত হয় নাই। টানাকা ছিলেন উগ্র সাম্রাজ্যবাদী এবং পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তিনি ছিলেন অগ্রসরনীতির উগ্র সমর্থক। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে টানাকা জাপানের সম্রাটের নিকট একটি স্মারকপত্রে (memorial) জাপানের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেন। এই স্মারকপত্রে টানাকা এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে পূর্ব-এশিয়ার সমস্যার সমাধানকল্পে যুদ্ধনীতি (policy of 'blood and iron') একান্ত অপরিহার্য; চীনের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে হইলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে সর্বপ্রথম ধ্বংস করা প্রয়োজন; চীন দখল করার পূর্বে মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়া দখল করা প্রয়োজন এবং চীন দখল করিতে সমর্থ হইলেই জাপানের পক্ষে ভারত, এশিয়া-মাইনর, মধ্য-এশিয়া ও এমন কি ইওরোপ জয় করা সম্ভব হইবে। 'টানাকা-মেমোরিয়াল'কে (Tanaka Memorial) জাপানী সাম্রাজ্যবাদ নীতির চরম কথা বলা যাইতে পারে।

টানাকা মেমোরিয়াল ১৯২৭ ও জাপানী পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন

ইহা স্বীকার্য যে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপান সাম্রাজ্যবিস্তারের ব্যাপারে উদ্যোগী হয় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া জাপান যে উহার এযাবৎ অনুসৃত সাম্রাজ্যবাদ নীতি পরিত্যাগ করিয়াছিল এমন কথাও বলা যায় না। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর জাপান পুনরায় সাম্রাজ্যবাদ নীতি গ্রহণ করিল। ইহার মূলে চারিটি প্রধান কারণ ছিল—যথা, চীন সাম্রাজ্যের দৃঢ়ীকরণের সম্ভাবনা, সুদূর-প্রাচ্যে রাশিয়ার ক্রমবিস্তার, ১৯২৯-'৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং জাপানে সমরবাদীগণের ক্ষমতা লাভ। ইটালী ও জার্মানীর ন্যায় জাপানের সমরবাদীগণও এই সময় স্বদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করিয়া জাপান প্রথমেই মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিল। ফলে চীন-জাপান যুদ্ধ নূতন করিয়া আরম্ভ হইল। চীনের অন্তর্ভুক্ত হইলেও মাঞ্চুরিয়ার উপর চীন সাধারণতন্ত্রের কর্তৃত্ব ছিল না বলিলেই চলে। মাঞ্চুরিয়া অধিক পরিমাণেই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করিত। মাঞ্চুরিয়ার স্থানীয় সমরনায়ক (war-lord) ও শাসনকর্তা চ্যাং-সো-লিন (Chang-Tso-lin) চীনের কেন্দ্রীয় শাসনকে সর্বদাই উপেক্ষা করিয়া চলিতেন এবং সময় সময় মাঞ্চুরিয়ার স্বাধীনতা প্রকাশ্য ভাবেই ঘোষণা করিতেন। অবশ্য ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের পর চ্যাং-সো-লিন-এর পুত্র ও উত্তরাধিকারী চ্যাং-সিয়াও-লিয়াং (Chang-Hsiao-liang) চীন সাধারণতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন।

প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ মাঞ্চুরিয়া বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। মাঞ্চুরিয়ার কর্তৃত্ব লইয়া পূর্বেই জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। মাঞ্চুরিয়ার প্রতি জার্মানী ও ফ্রান্সেরও লোলুপ দৃষ্টি ছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপান ও রাশিয়া নিজেদের মধ্যে মাঞ্চুরিয়া ভাগ করিয়া লয়। উত্তর-মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ার ও দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের কর্তৃত্ব স্থাপিত

হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের এক বিরাট স্বার্থ গড়িয়া উঠে। মাঞ্চুরিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য ও রেলপথের উপর জাপানের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে জাপান মাঞ্চুরিয়ার উপর চীনের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করিয়া স্বীয় সার্বভৌমত্বের অধিকার দাবি করিতে থাকে।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিলে চীন লীগ-অফ-নেশনস্-এর নিকট জাপানের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইল। লর্ড লিটনের সভাপতিত্বে লীগ-অফ-নেশনস্ একটি কমিশন নিযুক্ত করিলেন। কেলগ্-চুক্তির শর্তানুসারে "বিনাযুদ্ধে জাতীয় উন্নতিসাধনের নীতি"-র শর্তটির প্রতি জাপানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল। লিটন-কমিশন মাঞ্চুরিয়াকে চীনের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশে পরিণত করার সুপারিশ করিল। জাপান এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া লীগ-অফ্-নেশসন্-এর সদস্যপদ পরিত্যাগ করিল। জাপান মাঞ্চুরিয়ায় 'মাঞ্চুকুয়ো' (Marchu-Kuo) নামে এক তাঁবেদার সরকার স্থাপন করিল। চীন জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া জেহোল (Jehol) নামক স্থানটি ত্যাগ করিল।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র চীন ও জাপানের বিবাদে হস্তক্ষেপ করিল। আমেরিকার রাষ্ট্রসচিব স্টিমসন্ জাপান ও চীনের নিকট একটি নোট পাঠাইয়া উভয়কে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে "১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত প্যারিসের চুক্তির বিরোধী কোনরূপ সন্ধি বা চুক্তি" আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র স্বীকার করিবে না। এই প্রস্তাবের সমর্থনের জন্য আমেরিকা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নিকট আবেদন করিল। কিন্তু সুদূর-প্রাচ্যের সহিত ব্রিটেনের স্বার্থ জড়িত থাকায় ব্রিটেন আমেরিকার প্রস্তাবে সম্মত হইল না। এমন কি ব্রিটেন জাপানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট-নীতি প্রয়োগ করিতেও অসম্মতি জ্ঞাপন করিল। সুতরাং মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারে ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে মতানৈক্য থাকায় লীগ-অফ-নেশনস্ জাপানের বিরুদ্ধে কোনরূপ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়।

জাপান ও চীনের মধ্যে টাংকু সন্ধি (১৯৩৩)

ইতিমধ্যে জাপান জেহোল দখল করিয়া পিকিং অভিমুখে অগ্রসর হইলে চীন জাপানের সহিত টাংকু (Tangku)-র সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইল। ইহার শর্তানুসারে জাপান চীনের প্রাচীরের উত্তরদিকে উহার সৈন্যবাহিনী সরাইয়া লইল এবং চীন উক্ত প্রাচীরের সংলগ্ন একখণ্ড ভূমি নিরপেক্ষ অঞ্চল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে এই নিরপেক্ষ অঞ্চলের শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে জাপান, চীন ও মাঞ্চুকুয়োর প্রতিনিধিগণের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। প্রকৃতপক্ষে মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারে চীন জাপানের নিকট পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইল। অপরদিকে জাপান মাঞ্চুরিয়ার উপর স্বীয় প্রভুত্ব সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে মাঞ্চুকুয়োর সরকারের সহিত একটি নূতন চুক্তি সম্পাদন করিল। ইহার

শর্তানুসারে জাপান মাঞ্চুকুয়োকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করিল এবং ইহার বিনিময়ে জাপান মাঞ্চুরিয়ায় সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখিবার অধিকার লাভ করিল। ইহা ছাড়া মাঞ্চুকুয়ো সরকার মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের সকল প্রকার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন।

মাঞ্চুকুয়ো সরকারের সহিত জাপানের নূতন চুক্তি

মাঞ্চুরিয়া অভিযানের অভূতপূর্ব সাফল্য জাপানী সমরনায়কগণকে অধিকতর উৎসাহিত করিল এবং জাপানের সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইল। মাঞ্চুরিয়া দখলের পর হইতে (১৯৩৩ খ্রীঃ) জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিল। সুদূর-প্রাচ্য তথা এশিয়া হইতে ইওরোপীয় শাসন ও শোষণের অবসান ঘটাইয়া এই অঞ্চলে জাপান স্বীয় রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব স্থাপনে উদ্যোগী হইল। এই উদ্দেশ্য সফলের জন্য সর্বপ্রথম ইওরোপীয়দের নিকট চীনদেশের দ্বার রুদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপান এই সম্পর্কে যে নীতি ঘোষণা করিল তাহা "জাপানের মনরো নীতি (Japanese Monroe Doctrine) নামে অভিহিত। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই নীতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে জাপানের পররাষ্ট্র-দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইল যে চীন তথা সমগ্র পূর্ব-এশিয়ায় জাপানের বিশেষ স্বার্থ থাকায় চীন তথা সমগ্র পূর্ব-এশিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার বিশেষ দায়িত্ব জাপানের রহিয়াছে। সুতরাং চীন কোন বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে জাপানকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করিলে অথবা কোন বৈদেশিক শক্তি বা শক্তিসমূহ এশিয়ার দেশগুলির সহিত কোনপ্রকার সহযোগিতা করিতে থাকিলে জাপান তাহা স্বীয় স্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপ বলিয়া গণ্য করিবে। অর্থাৎ এককথায় জাপান চীন তথা পূর্ব-এশিয়ার ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ সহ্য করিবে না বলিয়া ঘোষণা করিল। ব্রিটেন ও আমেরিকা চীন তথা পূর্ব-এশিয়ায় জাপানের বিশেষ দাবি ও দায়িত্ব স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হইল।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদের নূতন বিশ্লেষণ

জাপানী মনরো নীতি

ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরোধিতা

জাপানী সাম্রাজ্যবাদের নূতন বিশ্লেষণ স্বভাবতঃই চীনের উদ্বেগের কারণ হইল। জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করিতে চীনের জাতীয়তাবাদীগণ (কুয়ো-মিং-তাং) ও কমিউনিস্টগণ ঐক্যবদ্ধ হইবে এইরূপ বিবেচনা করিয়া জাপান জার্মানীর সহিত কমিণ্টার্ন-বিরোধী এক চুক্তিতে (Anti-Commintern Pact) আবদ্ধ হইল। এইভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়া জাপান অতঃপর চীন গ্রাস করিতে উদ্যোগী হইল।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পিপিং-এর সন্নিকটে 'মার্কো-পোলো সেতু' (Marco-Polo Bridge)-এর নিকট জাপানী ও চীনা সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এক খণ্ডযুদ্ধ ঘটিলে (যাহা 'মার্কো-পোলো সেতু ঘটনা' নামে খ্যাত) সেই অজুহাতে

জাপান চীন আক্রমণ করিল। এইভাবে চীন-জাপানের যুদ্ধ শুরু হইল। স্বদেশের এই সংকটকালে চীনের কুয়ো-মিং-তাং ও কমিউনিস্ট দল সংঘবদ্ধভাবে জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। কমিউনিস্টগণ জাপানের বিরুদ্ধে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে লাগিল। কিন্তু চিয়াং-কাই-শেক চীনা কমিউনিস্টগণকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলে কুয়ো-মিং-তাং ও কমিউনিস্টদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হইল। চিয়াং সরকার জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করার পরিবর্তে চীনা কমিউনিস্টগণকে দমন করিতে অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ফলে জাপানের বিরুদ্ধে চীনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়িল।

'মার্কো-পোলো সেতু' ঘটনা ও চীন-জাপানের যুদ্ধ (১৯৩৭)

ইতিমধ্যে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইল। ইওরোপে জার্মানীর উত্তরোত্তর সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া জাপান জার্মানী ও ইটালীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া ত্রিশক্তিমৈত্রী গঠন করিল (Rome-Berlin-Tokyo Axis)। জাপান সুদূর-প্রাচ্যে ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করিল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত পার্ল বন্দরের উপর গোলাবর্ষণ করিলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এইভাবে চীন জাপানের যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল।

ইওরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির যুদ্ধ ঘোষণা

১৮.১২. জাপানের পররাষ্ট্রনীতির সাফল্যের কারণ (Causes of the success of Japan's Foreign Policy) : ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপানের পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্যের কয়েকটি কারণ ছিল, যথা—প্রথমতঃ, পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধভাবে জাপানকে প্রতিহত করার চেষ্টা করিলে জাপান মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইত এবং পূর্ববর্তী সন্ধিগুলির শর্তাদি পালন করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে এইরূপ সংগ্রাম পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের নিকট ছিল ব্যয়বহুল এবং সেই সময় কোনরূপ ব্যয়বহুল সংগ্রামে লিপ্ত হইবার ইচ্ছাও উহাদের ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, ১৯৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র বিশ্ব এক দারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল এবং এই কারণে বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের রাজনীতিবিদ্‌গণ কোনরূপ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া নিজেদের রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি করার পক্ষপাতী ছিলেন না। ফলে জাপান নির্বিবাদে উহার নূতন সাম্রাজ্যবাদের (Neo-Imperialism) পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র লীগ-অফ-নেশনস্‌-এর সদস্য না থাকায় লীগ-অফ-নেশনস্‌ প্রথম হইতেই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল এবং বৃহৎ

(১) জাপানের বিরুদ্ধে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সম্মিলিত প্রতিরোধের অভাব

(২) বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট

(৩) লীগ-অফ-নেশনস্‌-এর দুর্বলতা

রাষ্ট্রবর্গও আমেরিকার বিনা সহযোগিতায় নিজেদের দায়িত্বে জাপানের বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে সাহসী হয় নাই। চতুর্থতঃ, প্রথমদিকে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের কেহই জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখলের নিন্দা করে নাই বা জাপানের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করে নাই। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের এই নির্লিপ্ততা জাপানকে উৎসাহিত করিয়াছিল। এমন কি সোভিয়েট রাশিয়াও জাপানকে প্রতিরোধ করার পরিবর্তে উহাকে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়াছিল। পঞ্চমতঃ, চীনের তদানীন্তন অভ্যন্তরীণ অন্তর্বিপ্লব জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতির সাফল্যের অন্যতম কারণ।

(৪) প্রথমদিকে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের নির্লিপ্ততা

(৫) চীনের অন্তর্বিপ্লব

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর সংকেত

১। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে চীনের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ ১৮.৩., ১৮.৪., ১৮.৫., ১৮ ৬.]

২। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যুত্থান সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। [উঃ ১৮.৬.]

৩। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ ১৮.৬.]

৪। চীনে ওয়াশিংটন সম্মেলনের ফলাফল কিরূপ হইয়াছিল? [উঃ ১৮.৩.]

৫। সান-ইয়াৎ-সেন-এর 'তিন-দফা কর্মসূচী' কি ছিল? তাঁহার মৃত্যুর পর এই কর্মসূচী চীনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল? [উঃ ১৮.৪.]

৬। ওয়াশিংটন সম্মেলন আহূত হইবার কারণগুলি বিশ্লেষণ কর। সুদূর-প্রাচ্য সমস্যার সমাধানে এই সম্মেলন কতদূর সফল হইয়াছিল? [উঃ ১৮.৮., ১৮.৯., ১৮ ১০.]

৭। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে জাপানের পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা কর। উহার পররাষ্ট্রনীতির সাফল্যের কারণ কি? [উঃ ১৮.১১., ১৮.১২.]

ঊনবিংশ অধ্যায় । লীগ-অফ-নেশনস্
(League of Nations)

আন্তর্জাতিকতাবাদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া উঠিয়াছে। বিংশশতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে লীগ-অফ-নেশনস্-এর উল্লেখ করা যায়।

লীগ-অফ-নেশনস্ (League of Nations)

১৯.১. উৎপত্তি (Origin) : ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বহু যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছিল এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে সমগ্র মানবসভ্যতা ধ্বংস করার উপযোগী মরণাস্ত্রও তৈয়ারী হইয়াছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে যুদ্ধ পরিহার করিয়া ইওরোপ তথা সমগ্র বিশ্বের জাতিবর্গকে একসূত্রে গ্রথিত করার চেষ্টাও হইয়াছিল। এই যুগের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই লীগ-অফ-নেশনস্-এর সৃষ্টি হয় ("The Organisation of the League of Nations comes therefore of the logical result of this period."—Grant and Temperley)। শান্তিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তি করার প্রচেষ্টা হইতেই বিংশ শতাব্দীতে লীগ-অফ-নেশনস্ নামক আন্তর্জাতিক সংস্থার উৎপত্তি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশ্বের বিভিন্ন অংশের বিশেষতঃ ইওরোপের অসংখ্য নরনারীর চরম দুর্দশা দেখা দিয়াছিল। ভয়াবহ হত্যালীলা, ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পত্তির বিনাশ ও বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের ভয়ংকর প্রভাব সর্বত্র মানুষের মনে আতংকের সৃষ্টি করিয়াছিল। সর্বত্র শান্তির জন্য ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতার জন্য এক গভীর ব্যাকুলতা দেখা দিয়াছিল। ইংল্যান্ড, জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের চিন্তাশীলগণ আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির আলোচনার জন্য উপযুক্ত সংস্থা স্থাপনের কথা প্রচার করিতেছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারিত তাঁর এক নোটে "বিশ্বের সর্বত্র শান্তি বজায় রাখিবার" জন্য এক রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব করেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পোপ পঞ্চদশ বেনেডিক্ট (Benedict XV) যুদ্ধের পরিবর্তে সালিসির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তির কথা প্রচার করেন। জার্মানীতেও এই ধরনের আন্দোলনের উদ্ভব হইয়াছিল বটে, কিন্তু তদানীন্তন জার্মান সরকার তাহা কঠোর হস্তে দমন করেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সে গভীরভাবে দেখা দেয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে আমেরিকায় এই ধরনের এক সংস্থা (League to Enforce Peace) স্থাপিত হয়। ইংল্যান্ডের ফিলিমোর (Philimore) ও স্মাটস্ (Smutts) আন্তর্জাতিক লীগ স্থাপনের উগ্র সমর্থক ছিলেন। যাহা হউক, যুদ্ধাবসানে ইওরোপের রাষ্ট্রবিদ্‌গণ ভবিষ্যতে যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করিয়া যুদ্ধোত্তর বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে ও সহযোগিতার মাধ্যমে সমাধানকল্পে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান

গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ইঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন। তাঁহার বিখ্যাত 'চৌদ্দ-দফা' শর্ত (Fourteen Points)-এর সর্বশেষ শর্তটির অবলম্বনে লীগ-অফ-নেশনস্ গঠিত হয়। বিশ্বশান্তি অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে উইলসন লীগ-অফ নেশনস্ গঠনের পরিকল্পনা প্যারিস-সম্মেলনে উপস্থাপন করেন। এই পরিকল্পনাটি বিবেচনা করার জন্য প্যারিস-সম্মেলন উইলসনের সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সদস্যসংখ্যা ছিল ১৯। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কমিশন লীগ-অফ-নেশনস্-এর শর্তাদি (covenant) ও উহার একটি গঠনতন্ত্র প্রস্তুত করে। জাপান 'সকল জাতির সম-অধিকার' শর্তটি লীগ কভেনাণ্টের সহিত সন্নিবিষ্ট করার প্রস্তাব করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মীমাংসার পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করিবে এই যুক্তিতে জাপানের প্রস্তাব ব্রিটেন ও আমেরিকা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। সামান্য সংশোধনের পর প্যারিস-সম্মেলন কর্তৃক লীগ কভেনাণ্ট গৃহীত হয় এবং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ভার্সাই-সন্ধির প্রথম খণ্ড (Part I) হিসাবে স্বাক্ষরিত হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লীগ-অফ-নেশনস্-এর প্রতিষ্ঠা হয়। লীগ কভেনাণ্টে ২৬টি দফা (article) ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক কাউন্সিলের সদস্যপদ ত্যাগ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট লীগ-অফ নেশনস্ গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। কিন্তু মার্কিন কংগ্রেস লীগ কভেনাণ্ট অনুমোদন না করায় আমেরিকা লীগ কাউন্সিলের সদস্যপদ ত্যাগ করে।

১৯.২ লীগ-অফ-নেশনস্-এর উদ্দেশ্য (Aims of the League) : যুদ্ধের পরিবর্তে আপোস-মীমাংসার দ্বারা আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করা এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সন্ধির শর্তাদি সম্পূর্ণভাবে পালন করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখা লীগ-অফ-নেশনস্-এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।* বিশ্বের সমসাময়িক জনগণ এইরূপ আশাও করিয়াছিল যে লীগ-অফ-নেশনস্ শুধু আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদের সমাধানই করিবে না, সকল রাষ্ট্রের সমরোপকরণ হ্রাস করিয়া ভবিষ্যতে যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে দূর করিবে।

লীগ-অফ-নেশনস্-এর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ স্বীকার করে যে যুদ্ধের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দ্বারা উহারা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করিবে, ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং আন্তর্জাতিক আইনকানুন মানিয়া চলিবে। লীগ কভেনাণ্টের দশম শর্তে বলা হইয়াছিল যে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে উহারা লীগের মধ্যস্থতা গ্রহণ করিবে এবং মধ্যস্থতার তিন মাসের মধ্যে কোন প্রকার যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইবে না। লীগ কভেনাণ্টের ষোড়শ শর্তে

* "To promote international cooperation and to achieve international peace and security by the acceptance of obligations not to resort to war."

বলা হইয়াছিল যে কোন সদস্যরাষ্ট্র লীগ কভেনাণ্ট অমান্য করিলে সদস্যবৃন্দ সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করিবে এবং প্রয়োজনবোধে সামরিক শক্তিও প্রয়োগ করিবে।

১৯.৩. **লীগ-অফ-নেশনস্-এর সংগঠন (Organisation of the League) :** পঞ্চশক্তির (ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালী ও জাপান) প্রতিনিধিবর্গের একটি কাউন্সিল (Council), লীগে যোগদানকারী সকল সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের একটি এ্যাসেমব্লী (Assembly) ও একটি স্থায়ী কার্যসংসদ (Secretariate)—এই তিনটি সংস্থাকে লইয়া লীগ-অফ-নেশনস্ গঠিত হয়। ইহা ছাড়া আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court) স্থাপিত হয়। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দপ্তর (I. L. O.) নামে একটি সংস্থা জেনিভা শহরে স্থাপিত হয়।

এ্যাসেমব্লী প্রতিনিধিমূলক সংস্থা হইলেও ইহার কার্যকর ক্ষমতা ও আইন রচনার ক্ষমতা ছিল না। ইহাতে যোগদানকারী প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্রের একটি করিয়া ভোট ছিল। লীগের আওতার অন্তর্গত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা এবং পরামর্শ দেওয়াই ইহার একমাত্র ক্ষমতা ছিল।

লীগ কভেনাণ্ট অনুযায়ী কাউন্সিল মূলতঃ পাঁচটি স্থায়ী ও চারিটি অস্থায়ী সদস্য লইয়া গঠিত হইবার ব্যবস্থা হইলেও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ইহাতে যোগদান না করায় প্রকৃতপক্ষে চারিটি সদস্য লইয়াই ইহা গঠিত হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাউন্সিলের মোট সদস্যসংখ্যা ছিল আট। কিন্তু পরে জার্মানী লীগ-অফ-নেশনস্-এ যোগদান করায় (১৯২৬) কাউন্সিলের স্থায়ী ও অস্থায়ী সদস্যসংখ্যা দাঁড়াইল যথাক্রমে পাঁচ এবং নয়। কাউন্সিল ও এ্যাসেমব্লীর ক্ষমতা প্রায় এক রকমের হইলেও কাউন্সিলের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা ছিল, যথা—নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা, বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে সদস্যরাষ্ট্রকে রক্ষা করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং বিবদমান রাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যস্থতা করা।

স্থায়ী কার্যসংসদ একজন সচিব বা সেক্রেটারী ও আন্তর্জাতিক কর্মচারীগণকে লইয়া গঠিত হয়। এ্যাসেমব্লী ও কাউন্সিলের কর্মসূচী প্রস্তুত করা এবং ইহাদের নির্দেশ কার্যকর করার দায়িত্বও সংসদের উপর অর্পিত হয়।

ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে লীগে যোগদানকারী কোন সদস্যরাষ্ট্রই উহার সার্বভৌমত্ব বা স্বাধীনতা লীগের নিকট সমর্পণ করে নাই এবং ভবিষ্যতে ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকারও বিসর্জন দেয় নাই।

১৯.৪. **লীগ-অফ-নেশনস্-এর প্রকৃতি (Nature of the League) :** লীগ-অফ-নেশনস্-এর গঠনতন্ত্র বিশ্লেষণ করিলে ইহাকে অতি-রাষ্ট্র (Superstate) বা যুক্তরাষ্ট্র (Federation) বলা যায় না, কারণ সার্বভৌম আইন রচনার ক্ষমতা ইহার ছিল না। ইহার সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করার ব্যাপারে ইহা সদস্যরাষ্ট্রবর্গের সদিচ্ছার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল। সদস্যরাষ্ট্রবর্গের সম্মতির ভিত্তি

উপর লীগ-অফ-নেশনস্‌-এর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কাউন্সিল বা এ্যাসেমব্লীর সদস্যবর্গের মতৈক্যের প্রয়োজনে লীগ কভেনাণ্টে সদস্যরাষ্ট্রবর্গের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছিল। কোন সদস্যরাষ্ট্রই উহার সার্বভৌমত্ব বা স্বাধীনতা লীগের নিকট সমর্পণ করে নাই এবং প্রয়োজনবোধে লীগের সদস্যপদ পরিত্যাগ করার অধিকারও বিসর্জন দেয় নাই।

প্রকৃতপক্ষে লীগ-অফ-নেশনস্‌ ছিল কতকগুলি রাষ্ট্রের একটি সংঘ। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে লীগের সদস্যরাষ্ট্রবর্গ কতকগুলি ব্যাপারে নিজেদের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল মাত্র। লীগ-অফ-নেশনস্‌কে কোন মতেই যুক্তরাষ্ট্রীয় সংস্থা বলা যায় না, কারণ সদস্যরাষ্ট্রবর্গের বৈদেশিক নীতির পরিচালনার ব্যাপারে ইহার কোনরূপ কর্তৃত্ব ছিল না। লীগ-অফ-নেশনস্‌কে রাষ্ট্র নামেও অভিহিত করা যায় না। কারণ ইহার নিজস্ব রাজ্য বা নিজস্ব সামরিক বাহিনীও ছিল না। ওপেনহেম (Oppenheim) ইহাকে "ইওরোপীয় জাতিগুলির একটি পারিবারিক সংগঠন" (Organised family of nations) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

১৯.৫. লীগ-অফ নেশনস্‌-এর কার্যাবলী (Activities of the League): লীগ-অফ-নেশনস্‌ প্রায় কুড়ি বৎসর স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল। লীগের কার্যাবলী নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায়—

রাজনৈতিক (Political): লীগের স্থায়িত্বকালের মধ্যে ছোট-বড় প্রায় ৪০টি রাজনৈতিক বিরোধ উহার সম্মুখে উপস্থাপিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক বিরোধের সমাধান লীগ অতি সহজেই করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির ব্যাপারে লীগ অনেক ক্ষেত্রে অসহায় দর্শকের ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছিল।

ইউপেন ও মেলমেডি

ইউপেন ও মেলমেডি ছিল প্রাশিয়া ও বেলজিয়ামের সীমান্তের দুইটি প্রদেশ। ভার্সাই-সন্ধি দ্বারা এই দুইটি সীমান্ত প্রদেশ বেলজিয়ামকে দেওয়া হইয়াছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে লীগ-অফ-নেশনস্‌-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত গণভোটের দ্বারা উক্ত দুইটি প্রদেশের হস্তান্তরকরণ আইনসিদ্ধ করা হয়। জার্মানী এই হস্তান্তরকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিল বটে, কিন্তু লীগ-অফ-নেশনস্‌ উহার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করে নাই।

আল্যাণ্ডের দ্বীপপুঞ্জ-সংক্রান্ত বিরোধ

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে আল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের আধিপত্য লইয়া বিবাদের উদ্ভব হইলে ইংল্যাণ্ডের মধ্যস্থতায় সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড উহাদের বিবাদের মীমাংসার জন্য লীগ-কাউন্সিলের শরণাপন্ন হয়। সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড লীগের সদস্য ছিল না। লীগ কভেনাণ্ট অনুসারে লীগের সদস্য ভিন্ন অন্যান্য রাষ্ট্রের পারস্পরিক বিবাদে হস্তক্ষেপ করার অধিকার লীগের ছিল না। যাহা হউক, লীগ-কাউন্সিল ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে এই বিবাদের মীমাংসা করিয়া দেয়। কাউন্সিলের

সিদ্ধান্ত অনুসারে আল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ ফিনল্যান্ডকে দেওয়া হয়, তবে উহার সুইডিশ নাগরিকদের ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তির নিরাপত্তার দায়িত্ব লীগ-কাউন্সিল গ্রহণ করে। ইহা ভিন্ন এই দ্বীপপুঞ্জকে নিরপেক্ষ অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হয়। লীগ-কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত সুইডেন ও ফিনল্যান্ড মানিয়া লয়।

উচ্চ-সাইলেশিয়ার প্রশ্ন লইয়া জার্মানী ও পোল্যান্ডের মধ্যে বিরোধের উদ্ভব হয়। ভার্সাই-সন্ধি দ্বারা উচ্চ-সাইলেশিয়ার কিছু অংশ চেকোশ্লোভাকিয়াকে দেওয়া হইয়াছিল। উচ্চ-সাইলেশিয়ার অবশিষ্ট অংশে গণভোট গ্রহণ করা হয় (১৯২১)। গণভোটের সিদ্ধান্ত জার্মানীর অনুকূলে যায়। কিন্তু উচ্চ-সাইলেশিয়ার যে সকল অঞ্চলে পোলদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, সেই সকল অঞ্চল পোল্যান্ড দাবি করে। জার্মানী পোল্যান্ডের এই দাবির বিরোধিতা করিলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এই অবস্থায় লীগ-কাউন্সিল উচ্চ-সাইলেশিয়ার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য বেলজিয়াম, ব্রেজিল, চীন ও স্পেনের প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটি কমিশন গঠন করে। কমিশনের সুপারিশ অনুসারে উচ্চ--সাইলেশিয়ার অবিভক্ত অঞ্চল জার্মানী ও পোল্যান্ডের মধ্যে বণ্টন করা হয়। জার্মানী ও পোল্যান্ড এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে উভয়ের মধ্যে শান্তি পুনঃ স্থাপিত হয়।

উচ্চ-সাইলেশিয়া-সংক্রান্ত বিরোধ

১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভিল্‌না লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ছিল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া ভিল্‌না দখল করিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভিল্‌না লিথুয়ানিয়াকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছিল, কিন্তু ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যান্ড ইহা দখল করিয়া লয়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে লীগ-কাউন্সিলে ভিল্‌না-সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এক গণভোটের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভিল্‌না পোল্যান্ডের সহিত সংযুক্ত হয়। লীগ-কাউন্সিল পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়ার মধ্যে সীমানা নির্দিষ্ট করিয়া দেয় এবং পোল্যান্ডের সহিত ভিল্‌নার সংযুক্তিকরণ সমর্থন করিয়া উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘকালের জন্য শান্তি বজায় রাখিতে সমর্থ হয়।

ভিল্‌না (Vilna)-সংক্রান্ত বিরোধ

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী ও গ্রীসের মধ্যে করফু-সংক্রান্ত বিরোধের উদ্ভব হয়। গ্রীসে কিছু ইটালীয় সরকারী কর্মচারীকে হত্যা করা হইলে উহার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ইটালী গ্রীসের করফু নামক দ্বীপটি গোলাবর্ষণের দ্বারা বিধ্বস্ত করিয়া তাহা দখল করিয়া লয়। লীগ কভেনান্টের শর্তানুসারে গ্রীস এই ব্যাপারটি লীগ-কাউন্সিলের নিকট উপস্থাপিত করে। "করফু-ঘটনা ইটালীর অভ্যন্তরীণ ব্যাপার"—এই যুক্তিতে ইটালী লীগের হস্তক্ষেপের অধিকার অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত প্যারিসে সম্মিলিত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণের সভা করফু বিরোধের মীমাংসা করে। এই সভার আবেদনে ইটালী করফু পরিত্যাগ করিলে এবং গ্রীস ক্ষতিপূরণ প্রদান করিলে করফু বিরোধের নিষ্পত্তি হয়। তুরস্ক ও ইরাকের মধ্যে

মীমাংসা সংক্রান্ত বিবাদ উপস্থিত হইলে লীগ একটি সীমানা-নির্ধারণ কমিশন নিযুক্ত করে। এই কমিশন যখন তদন্তকার্যে রত সেই সময় তুরস্কের অধিকারভুক্ত কুর্দ (Kurd) জাতি বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তুর্কী সরকার নির্মমভাবে এই বিদ্রোহ দমন করিলে বহুসংখ্যক কুর্দ তুরস্ক ও ইরাকের সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ করিয়া গোলযোগের সৃষ্টি করে। এই ব্যাপার লইয়া তুরস্ক ও ইরাকের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে। কিন্তু লীগ-অফ-নেশনস্‌-এর মধ্যস্থতায় এইরূপ সম্ভাবনা দূর হয় এবং লীগ কমিশনের সিদ্ধান্ত উভয়পক্ষ স্বীকার করিয়া লয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুরস্ক কমিশনের এই সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারে নাই।

করফু-ঘটনা (১৯২৩): তুরস্ক ও ইরাকের সীমানা-সংক্রান্ত বিরোধ (১৯২৬)

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে যুগোশ্লাভিয়ার আক্রমণ হইতে লীগ-অফ-নেশনস্‌ আলবানিয়াকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

যুগোশ্লাভিয়া ও আলবানিয়ার মধ্যে বিরোধ (১৯২১)

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীস ও বুলগেরিয়ার মধ্যে সীমানা-সংক্রান্ত বিরোধ উপস্থিত হয়। বুলগেরিয়ার সৈন্য কর্তৃক একজন গ্রীক জেনারেল ও একজন গ্রীক সৈনিক নিহত হইলে গ্রীক বুলগেরিয়া আক্রমণ করে। লীগ-অফ-নেশনস্‌-এর হস্তক্ষেপের ফলে বুলগেরিয়ার সীমানা লঙ্ঘন করার অপরাধে গ্রীস ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য হয়। এই ব্যাপারে লীগ সততা ও অপক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিতে পারে নাই।

গ্রীস ও বুলগেরিয়ার মধ্যে বিরোধ (১৯২৫)

জাপান ও চীন উভয়েই ছিল লীগ-অফ-নেশনস্‌-এর সদস্যরাষ্ট্র। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদী জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া তথায় 'মাঞ্চুকুয়ো' নামে জাপানের এক তাঁবেদার-রাষ্ট্র গঠন করে এবং এই রাষ্ট্রের সহিত জাপান আত্মরক্ষামূলক-চুক্তি সম্পাদন করে। চীন জাপানের আচরণের বিরুদ্ধে লীগ-কাউন্সিলে অভিযোগ করে। লীগ-কাউন্সিল জাপানকে মাঞ্চুরিয়া হইতে সৈন্য অপসারণ করার নির্দেশ দেয়। জাপান অসম্মত হইলে লীগ লর্ড লিটনের নেতৃত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত করে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে জাপান সাংহাই দখল করে। চীন পুনরায় লীগের নিকট অভিযোগ করে এবং লীগ পুনরায় জাপানকে সাংহাই হইতে সৈন্য অপসারণের নির্দেশ দেয়। জাপান পুনরায় লীগের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে লিটন-কমিশন এক দীর্ঘ রিপোর্ট দাখিল করে। লীগ-সভা জাপানকে অভিযুক্ত করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। জাপান এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। লীগ-কাউন্সিল জাপানকে শুধু অভিযুক্ত করিয়াই ক্ষান্ত রহে। লীগ-চুক্তিপত্রের ষোড়শ শর্তানুসারে জাপানের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল না। জাপান লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করে।

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল (১৯৩১)

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর সোমালিল্যাণ্ড ও ইথিওপীয়ার সীমান্তে ওয়াল ওয়াল

(Wal Wal) নামক স্থানে ইটালীয় ও ইথিওপিয় সৈন্যদের সংঘর্ষ হইতে ইটালী ও ইথিওপিয়ার মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী ইথিওপিয়া আক্রমণ করে। ইথিওপিয়া লীগের নিকট আবেদন করে। লীগ-কাউন্সিলের সদস্য-রাষ্ট্রগুলি স্বতন্ত্রভাবে ইটালীকে লীগ-চুক্তিপত্রের শর্ত ভঙ্গ করার অপরাধে অভিযুক্ত করে। লীগ-কাউন্সিল এই অভিযোগ সমর্থন করে। লীগ-কাউন্সিল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ইটালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ মঞ্জুর করে মাত্র, কিন্তু কোন প্রকার সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিল না। ইটালী লীগের চরম দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ইথিওপিয়া আক্রমণ করিয়া তাহা দখল করে। বিশ্বের নিকট লীগ-অফ-নেশনস্-এর অকর্মণ্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই লীগ-অফ-নেশনস্-এর প্রতি বিশ্বের জনসমাজের আস্থা নষ্ট হয়।

ইটালী কর্তৃক ইথিওপিয়া দখল (১৯৩৪)

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আর্মেনিয়ার প্রজাতন্ত্র ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিলে লীগ-অফ-নেশনস্-এর মাধ্যমে তাহা বন্ধ করার চেষ্টা হয়। কিন্তু এই সম্পর্কে লীগ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার পূর্বেই তুরস্ক আর্মেনিয়া দখল করিয়া লয়।

তুরস্ক-আর্মেনিয়ান বিবাদ

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স টিউনিসিয়ার একশ্রেণীর অধিবাসীগণকে ফ্রান্সের নাগরিক হিসাবে দাবি করিয়া তাহাদিগকে ফরাসী সৈন্যবাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করিলে ব্রিটেন উহার তীব্র প্রতিবাদ করে। কারণ ব্রিটেন টিউনিসিয়ার উপরোক্ত শ্রেণীর অধিবাসীগণকে ব্রিটিশ নাগরিক বলিয়া মনে করিত। এই বিবাদ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে উপস্থাপিত করা হয়। কিন্তু বিচারালয় কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে বিবাদ মিটিয়া যায়।

ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধ

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রগুলি যাহাতে কার্যকর হয়, সেই বিষয়েও লীগ-অফ-নেশনস্ বিশেষ যত্নবান ছিল। লীগ-পরিষদের তিনজন সদস্যকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং সংখ্যালঘুদের অভিযোগগুলি এই কমিটিতে পেশ করার ব্যবস্থা হয়।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কিত ব্যবস্থা

ভার্সাই-সন্ধির শর্তানুসারে ১৯২০ হইতে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লীগ-অফ-নেশনস্ জার্মানীর সার অঞ্চলের শাসনকার্য দক্ষতার সহিত পরিচালনা করে এবং উহার মাধ্যমে তথায় গণভোট গৃহীত হয়।

সার অঞ্চলের শাসন পরিচালনা

লীগ-অফ-নেশনস্ ও বিশ্ব-শান্তি (League and the World Peace) : শান্তিপূর্ণভাবে বিবাদ-বিসম্বাদের সমাধান করিয়া যুদ্ধ বর্জন করার উদ্দেশ্য লইয়াই লীগ-অফ-নেশনস্ গঠিত হইয়াছিল। এই মহান উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত লীগ-চুক্তিপত্রে কতকগুলি বিশেষ শর্ত সন্নিবিষ্ট ছিল। প্রথম বিশ্ব-

যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে সকলেই ইহাই উপলব্ধি করিয়াছিল যে অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্যই বিশ্বের নিরাপত্তা ও শান্তির পরিপন্থী। সুতরাং লীগ-চুক্তিপত্রের অষ্টম শর্তে বলা হইয়াছিল যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থরক্ষার্থে যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন তাহা রাখিয়া অস্ত্রশস্ত্রের পরিমান হ্রাস করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে লীগ-কাউন্সিল উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবে। দশম শর্তে বলা হইয়াছিল লীগের সদস্যরাষ্ট্রবর্গ পরস্পরের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবে এবং কোন সদস্যরাষ্ট্র বৈদেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হইলে অপরাপর সদস্যরাষ্ট্র উহার সাহায্যে অগ্রসর হইবে। কি উপায়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তি করা হইবে তাহা একাদশ হইতে সপ্তদশ শর্তে উল্লিখিত ছিল। দ্বাদশ শর্তে বলা হইয়াছিল যে সদস্যরাষ্ট্রবর্গ উহাদের পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ অস্ত্রের দ্বারা সমাধানের চেষ্টা না করিয়া তাহার তদন্তের বা নিষ্পত্তির জন্য লীগ-কাউন্সিলের মধ্যস্থতা গ্রহণ করিবে। লীগ-কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বিবদমান রাষ্ট্রের মতঃপূত না হইলেও অন্ততঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে কোনরূপ সংঘর্ষে লিপ্ত হইবে না। চতুর্দশ শর্তে বলা হইয়াছিল যে লীগের সাধারণ এ্যাসেমব্লী অথবা কাউন্সিল প্রয়োজনবোধে কোন বিবাদ স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে উপস্থাপন করিয়া উহার মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে। ষোড়শ শর্তে বলা হইয়াছিল যে লীগের কোন সদস্যরাষ্ট্র লীগের কোন চুক্তিপত্র উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধ সৃষ্টি করিলে অপরাপর সদস্যরাষ্ট্রবর্গ সেই যুদ্ধ নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইবে এবং শান্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে চুক্তিপত্রভঙ্গকারী রাষ্ট্রের সহিত সকল প্রকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবে।

আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে লীগ-অফ-নেশনস্‌-এর দায়িত্ব ছিল ব্যাপক। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদের সমাধান করা ছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করাও ইহার দায়িত্ব ছিল। লীগ-অফ-নেশনস্‌-এর মাধ্যমে যুগ্ম নিরাপত্তার (Collective security) প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা

লীগ-অফ-নেশনস্‌-এর অন্যান্য কার্যাদি (Other activities of the League): নিরস্ত্রীকরণ-নীতি প্রয়োগ করিতে বা যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করিতে লীগ শেষ পর্যন্ত সমর্থ হয় নাই বটে, কিন্তু সামাজিক ও জনহিতকর কার্যাদির ব্যাপারে ইহা আশাতীত সাফল্য অর্জন করিয়াছিল।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক

লীগ-চুক্তিপত্রের ২৩ শর্তে বলা হইয়াছিল যে লীগের সদস্যগণ সমবেতভাবে বিশ্ববাসীর স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য সর্বদা যত্নবান থাকিবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দ্বারা বিশ্বের সর্বত্র রোগনিবারণ ও তাহা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে লীগ-এ্যাসেমব্লী ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি স্থায়ী স্বাস্থ্য-সংস্থা (Permanent Health Organisation) গঠনের প্রস্তাব

রোগ প্রতিরোধ

করে। পূর্বাঞ্চলে কলেরা ও প্লেগের প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধ করিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ম্যালেরিয়া-কমিশন নামে অপর একটি সংস্থা গঠিত হয়।

বিশ্বের যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ব্যাপারে লীগ একটি সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলিকে ইংল্যান্ড, ইটালী, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খাদ্য ও প্রচুর ঋণদান করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে লীগ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাসেলস্-এ একটি অর্থনৈতিক সম্মেলন (International Financial Conference) আহ্বান করে। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল মুদ্রাস্ফীতি (inflation) রোধ করা, স্বর্ণমান নিয়ন্ত্রিত করা, আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে সকল অসুবিধা ছিল সেগুলি দূর করা এবং আন্তর্জাতিক পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে অর্থনৈতিক সম্মেলন কয়েকটি সুপারিশ পেশ করে। তাহা হইল—সকল দেশের মধ্যে শ্রমিক, মূলধন ও পণ্য-দ্রব্যের চলাচল উন্মুক্ত রাখিতে হইবে; প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের পরিবর্তে সহযোগিতামূলক মনোভাব লইয়া সকল দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করিতে হইবে; সকল দেশের বাণিজ্য-শুল্কের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে এবং শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষির উন্নয়নের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

অর্থনৈতিক পুনর্গঠন

এতদ্ভিন্ন নারীসমাজের ও শিশু-স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং দাসত্ব-প্রথা নিবারণ করার ব্যাপারে লীগ-অফ-নেশনস্ যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করিয়াছিল।

সামাজিক উন্নয়ন

১৯২৫ হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লীগ-অফ-নেশনস্ সর্বাধিক সাফল্য লাভ করে। এই সময়ের মধ্যে লীগের মর্যাদা অভাবনীয় বৃদ্ধি পায়। প্রথমতঃ, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লীগের সদস্যরাষ্ট্রবর্গ লীগ-পরিষদে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের পাঠাইত না,—সাধারণ কর্মচারীবৃন্দই প্রতিনিধিত্ব করিতেন। কিন্তু ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সদস্যরাষ্ট্রবর্গের পররাষ্ট্র-মন্ত্রীগণ লীগ-পরিষদে যোগদান করিতে থাকিলে লীগের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়তঃ, এই সময়ের মধ্যে জার্মানী স্থায়ীসদস্য হিসাবে ইহাতে যোগদান করায় ইহার শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়তঃ, এই সময়ের মধ্যে লীগ কতকগুলি আন্তর্জাতিক বিবাদের নিষ্পত্তি করে। চতুর্থতঃ, এই সময়ের মধ্যে কতকগুলি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা গঠন করিয়া লীগ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে।

লীগের সুবর্ণ যুগ

লীগের এই সকল সাফল্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই কার (Carr) ১৯২৫ হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সময়কে লীগের ইতিহাসের সর্বাধিক গৌরবজনক (League at its Zenith") অধ্যায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

১৯.৬. লীগ-অফ-নেশনস্-এর কৃতিত্ব (Achievements of the League of Nations): নানা কারণে লীগ-অফ-নেশনস্ ব্যর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহার

অবদান একেবারে অস্বীকার করা যায় না। প্রথমতঃ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবতার ক্ষেত্রে লীগ অভাবনীয় কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলিকে লীগ নানাভাবে অর্থসাহায্য করিয়া উহাদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে ও বিবিধ সংস্থা গঠন করিয়া লীগ বিশ্বের জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে সাহায্য করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার এবং পরিবহণ ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন প্রভৃতি ব্যাপারে লীগ পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট এক অভিনব অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, লীগ-অফ-নেশনস্-এর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হইল যে ইহা বিশ্বের জনসমাজের নিকট আন্তর্জাতিক সমবায়, সৌহার্দ্য ও আন্তর্জাতিক মনোভাবের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছিল। লীগ বিশ্বের জনগণকে বিশ্বের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করিয়া আন্তর্জাতিকতার প্রয়োজনে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তিকে দমন করার শিক্ষা দিয়াছিল।

তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক সমবায়ের আদর্শ অতি প্রাচীন হইলেও লীগের সংগঠন, উহার কর্মপদ্ধতি ও আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ নূতন ("The concept of an association of nations was old ; the actuality of the League of Nations was new."—Langsam)। কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্তের উপর ভিত্তি করিয়া লীগ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা পূর্ববর্তী যুগে দেখা যায় নাই। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার ব্যাপারে লীগের ব্যর্থতার জন্য লীগকে দায়ী করা যায় না—ইহার জন্য দায়ী ছিল উহার সদস্য-রাষ্ট্রবর্গ যাহারা উহার সংগঠন করিয়াছিল ("The League failed in the end to preserve peace because it could be only what the nations made of it—nothing less and nothing more."—Langsam)।

১১.৭. **লীগ-অফ-নেশনস্-এর ব্যর্থতার কারণ** (Causes of the failure of the League of Nations) : উপরোক্ত কৃতিত্ব সত্ত্বেও লীগ-অফ-নেশনস্ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছিল। ইহার কারণ ছিল—

(১) লীগের আদর্শ ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ

প্রথমতঃ, লীগ-অফ-নেশনস্-এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন দেশের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। প্রথম হইতেই ইহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে স্বাভাবিক সন্দেহ থাকায় ইহা কখনও শক্তিশালী হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই।

(২) পরাজিত রাষ্ট্রবর্গের প্রতিশোধাত্মক মনোভাব

দ্বিতীয়তঃ, বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের প্রতি বিজিত রাষ্ট্রগুলির সন্দেহ এবং জার্মানীর প্রতিশোধাত্মক মনোভাব লীগের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়াছিল।

বিজয়ী রাষ্ট্রের মধ্যে মতানৈক্য

তৃতীয়তঃ, বিজিত ও বিজয়ী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দারুণ মতানৈক্য এবং জার্মানীকে সর্বতোভাবে পঙ্গু করিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা লীগের ন্যায় এক আন্তর্জাতিক সংস্থার সাফল্যের প্রধান অন্তরায় ছিল।

চতুর্থতঃ, বৃহত্তর আন্তর্জাতিক স্বার্থের খাতিরে লীগের কোন সদস্য-রাষ্ট্র উহার জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। জাতীয় স্বার্থের খাতিরে কোন কোন সদস্য-রাষ্ট্র লীগ-চুক্তিপত্রের শর্তাদি ভঙ্গ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। এক কথায় লীগের প্রতি সদস্য-রাষ্ট্রবর্গের অখণ্ড আনুগত্যের অভাব উহার ব্যর্থতার প্রধান কারণ।

আন্তর্জাতিক স্বার্থের খাতিরে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতে রাষ্ট্রবর্গের অসম্মতি

পঞ্চমতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগে যোগদান না করায় এবং রাশিয়া ও জার্মানীকে উহার সদস্য হিসাবে গ্রহণ না করায় প্রথম হইতে লীগের গুরুত্ব বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। ১৯২৫ ও ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে জার্মানী ও রাশিয়াকে লীগের সদস্যভুক্ত করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু অনতিকালের মধ্যে জাপান ও জার্মানী লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করিলে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে উহার গুরুত্ব পুনরায় কমিয়া যায়। বিশ্বের কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের অসহযোগিতা লীগের ব্যর্থতার অপর প্রধান কারণ।

বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের সহযোগিতার অভাব

ষষ্ঠতঃ, লীগের পরিষদে ভোটদানের ব্যাপারে বিশেষ ত্রুটি ছিল। সর্বসম্মতিক্রমে ভোট গ্রহণের নীতি পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি করিত। সকল সদস্যের সমর্থন ব্যতীত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

ত্রুটিপূর্ণ ভোটদান-পদ্ধতি

সপ্তমতঃ, জার্মানীর প্রতি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের তোষণ-নীতি লীগ-অফ-নেশনস্-এর দুর্বলতা ও ব্যর্থতার অপর প্রধান কারণ। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেন ও ফ্রান্সই লীগের কর্তৃত্ব করিত। সুতরাং জার্মানীর প্রতি এই দুই রাষ্ট্রের তোষণ-নীতির ফলে জার্মানীর আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লীগের পক্ষে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয় নাই।

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জার্মান তোষণ-নীতি

অষ্টমতঃ, নিজ সিদ্ধান্ত কার্যকর করার মত উপযুক্ত ক্ষমতা লীগের ছিল না এবং এই কারণে লীগ শান্তিরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। নিজস্ব সৈন্যবাহিনী না থাকায় লীগ আপন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃহৎ শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় নাই এবং ইহাই হইল এই সংস্থার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি। কেলগ্-চুক্তি উপেক্ষা করিয়া জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করিলে লীগের কার্যকারিতার অভাব প্রমাণিত হইয়াছিল। লীগ কেবলমাত্র মৌখিক প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিল। জাপান লীগের দুর্বলতার পরিচয় পাইয়া লীগ পরিত্যাগ করিয়াছিল। ইটালী ইথিওপিয়া দখল করিলে লীগ ইটালীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে সমর্থ হয় নাই এবং ইহা লীগের

নিজ সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ব্যাপারে উপযুক্ত শক্তির অভাব

পক্ষপাতিত্ব ও দুর্বলতার চরম পরিচয়। জাপানের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া ইটালীও লীগ পরিত্যাগ করিতে সাহসী হইয়াছিল (১৯৩৬)।

নিরস্ত্রীকরণ-নীতির প্রয়োগ ব্যাপারে অক্ষমতা

নবমতঃ, নিরস্ত্রীকরণ-নীতি কার্যকর করার ব্যাপারেও লীগ চরম দুর্বলতার পরিচয় দিয়াছিল। ফলে জার্মানী ভার্সাই-সন্ধি উপেক্ষা করিয়া নিজ সামরিক শক্তি ও সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধি করিতে যত্নবান হইয়াছিল। ইহাও লীগের অক্ষমতার অপর এক দৃষ্টান্ত।

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত

১। লীগ-অফ নেশনস্-এর উৎপত্তি, সংগঠন ও কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখিবার ব্যাপারে এই সংস্থার ভূমিকা কি ছিল?
[উঃ ১৯.১., ১৯.২., ১৯.৩., ১৯.৫.]

২। লীগ-অফ-নেশনস্-এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংস্থার সংগঠনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
[উঃ ১৯.৩.]

৩। আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে লীগ-অফ-নেশনস্-এর সাফল্যের মূল্যায়ন কর। [উঃ ১৯.৫.]

৪। লীগ-অফ-নেশনস্-এর ব্যর্থতার কারণ কি? [উঃ ১৯.৮.]

৫। লীগ-অফ-নেশনস্ কেন গঠিত হইয়াছিল? [উঃ ১.৯২.]

বিংশ অধ্যায় |

প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, ১৯৩০-৩৯

(International Situation on the eve of the Second World War)

২০.১. **আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি**ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইওরোপের জনসাধারণ প্রত্যাশা করিয়াছিল যে লীগ-অফ-নেশনস্ যুদ্ধবিধ্বস্ত বিশ্বের শান্তি অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইবে। সন্ধিপত্র রচনা ও সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও বিশ্ব-নিরস্ত্রীকরণের জন্য বিবিধ ব্যবস্থা করার ব্যাপার লইয়াই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া যায়। কিন্তু ১৯৩০-৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিশ্বে পুনরায় এক বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে থাকে এবং সেই সময়ের মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হইয়া যায় (যেমন হইয়াছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দশ বৎসর পূর্বে)। বিশ্বের প্রধান রাষ্ট্রনায়কগণ আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে (League of Nations) কার্যকর করার পরিবর্তে তোষণ-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তোষণ-নীতি আক্রমণকারী রাষ্ট্রবর্গকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই অথবা যুদ্ধের বিভীষিকাও দূর করিতে সমর্থ হয় নাই। অধিকন্তু রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্রমান্বয়ে বিশ্বের কয়েকটি স্থানে যে কয়েকটি ঘটনা সংঘটিত হয় তাহা বিশ্বশান্তি বিপর্যস্ত করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য করিয়া তোলে।

(১) **জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল (১৯৩০-৩১)**ঃ চীনা প্রদেশ মাঞ্চুরিয়ার সহিত জাপানের অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিল। জাপানের উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার বাসস্থানের জন্য ও জাপানী শিল্পোন্নতির জন্য মাঞ্চুরিয়ার লৌহ ও কয়লা জাপানের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল। মাঞ্চুরিয়া হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ ও তথায় জাপানী পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করা জাপানী সাম্রাজ্যবাদের মূল লক্ষ্য ছিল। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে জাপান সরকার জাপানের সমরনায়কগণ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছিলেন। এই সমরনায়কগণ কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া জাপান সরকার মাঞ্চুরিয়া দখল করার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর এক অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া জাপবাহিনী মাঞ্চুরিয়া দখল করে। চীন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নিকট জাপানের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন করে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণের বিশেষ করিয়া গ্রেটব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে মতানৈক্য থাকার ফলে জাপানের বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। জাপান এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যবর্গের

দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া মাঞ্চুরিয়া আপন অধিকারে রাখার উদ্দেশ্যে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে লীগ-অফ-নেশনস্-এর সদস্যপদ ত্যাগ করিল।

পরবর্তী ঘটনাসমূহ লক্ষ্য করিলে ইহাই মনে হয় যে জাপানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে না পারায় বিশ্বরাষ্ট্রবিদ্‌গণ দ্বিতীয় যুদ্ধের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। চীনের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া জাপানের প্রতি তোষণ-নীতি গ্রহণ করিয়া ইওরোপীয় রাষ্ট্রবিদ্‌গণ শুধু যে জাপানের সাম্রাজ্যলিপ্সায় ইন্ধন জোগাইয়াছিলেন তাহা নহে, জার্মানী ও ইটালীকেও অধিকতর পররাজ্যগ্রাসী করিয়া তুলিতে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। জাপানের বিরুদ্ধে ইওরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গ ও আমেরিকা যদি বলপ্রয়োগ করিত তাহা হইলে অতি সহজেই জাপানের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িত, জাপানের সমরবাদী নেতৃবর্গ উহার জনসাধারণের আস্থা হারাইতেন এবং জাপান মাঞ্চুরিয়া হইতে সৈন্যবাহিনী অপসারণ করিতে বাধ্য হইত। ইহার ফলে সম্মিলিত নিরাপত্তার প্রচেষ্টা সফল হইত এবং এক বিরাট ধ্বংসের হাত হইতে বিশ্বের জনসাধারণ রক্ষা পাইত।

(২) **জার্মানীর সামরিক প্রস্তুতি :** ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নাৎসী জার্মানীর যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু হয়। সেই বৎসর রাইক ক্যাবিনেট রাইক প্রতিরক্ষা কাউন্সিল (Reich Defence Council) গঠন করিয়া উহার হস্তে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করার ক্ষমতা ন্যস্ত করে। লীগ-অফ-নেশনস্-এর আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির প্রতি হিটলারের মোটেই আস্থা ছিল না। লীগ-কাউন্সিলের সদস্যপদ তিনি তাঁহার পররাষ্ট্রনীতির প্রধান অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেন। নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারেও তাঁহার কোনরূপ আগ্রহ ছিল না। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হিটলার নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক পরিত্যাগ করিয়া লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেন। তিনি স্পষ্ট ভাবায় ঘোষণা করেন, "লীগ-কাউন্সিল জার্মানজাতির স্বার্থ রক্ষা করিবে এবং বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের সহিত জার্মানজাতির সম-মর্যাদা পুনঃস্থাপন করিবে, এইরূপ আশায় বশবর্তী হইয়া পূর্ববর্তী জার্মান সরকার লীগ-কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই আশা চরিতার্থ করার পরিবর্তে লীগ-কাউন্সিল জার্মানজাতির প্রতি অপমানজনক ও বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করিয়া চলিতেছে। এই অবস্থায় জার্মানদের ন্যায় এক আত্মসচেতন জাতির পক্ষে লীগ-কাউন্সিলে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নহে।" হিটলারের এই ঘোষণা সমগ্র ইওরোপে এক নূতন সংকটের ইঙ্গিত জানায়। পশ্চিমী রাষ্ট্রবিদ্‌দের অনেকেই জার্মানীর অভিযোগের সত্যতা উপলব্ধি করেন এবং জার্মানীর সহিত আপোস-মীমাংসার প্রয়োজনও অনুভব করেন। হিটলার পশ্চিমী রাষ্ট্রবিদ্‌দের এইরূপ মনোভাবের পূর্ণ সুযোগ লইতে ত্রুটি করেন নাই। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঘোষণা করেন যে বলপ্রয়োগ দ্বারা আন্তর্জাতিক বিবাদ

যুদ্ধপ্রস্তুতির পটভূমিকা

জার্মানীর নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক ও লীগ-কাউন্সিল পরিত্যাগ

নিষ্পত্তি করার ইচ্ছা তাঁহার নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জার্মানী কর্তৃক লীগ-কাউন্সিল পরিত্যাগ উহার আক্রমণাত্মক মনোভাবের প্রথম ইঙ্গিত সূচনা করিল এবং এই সময় হইতেই জার্মানীর যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু হইল।

হিটলারের অধিনায়কত্বে নাৎসী জার্মানী জাপানের ব্যাপারে বৃহৎ শক্তিবর্গের দুর্বলতা ও তোষণ-নীতির পরিচয় পাইয়া ভার্সাই ও অন্যান্য সন্ধি-শর্তাদি লঙ্ঘন করিয়া ক্রমশঃ আক্রমণাত্মক হইয়া উঠিতে লাগিল। বিশ্ব-নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক (World Disarmament Conference) ও লীগ-অফ-নেশনস্ হইতে জার্মানী তাহার প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাহার করিলে ইওরোপে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল।

ইওরোপে প্রতিক্রিয়া

জার্মানী সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের নীতি ঘোষণা করিলে ইওরোপের অপরাপর রাষ্ট্রগুলি বিভিন্ন প্রকার মৈত্রীচুক্তি ও জোট বাঁধিতে উদ্যোগী হইল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া, রুমানিয়া ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে একটি আঁতাত গড়িয়া উঠিল। সেই বৎসর ফ্রান্সের প্রচেষ্টায় ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে এক মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হইল এবং ইহার বিনিময়ে ফ্রান্স ও ইটালীর ইথিওপিয়া অভিযানের পরিকল্পনা পরোক্ষভাবে সমর্থন করিল।

ইতিমধ্যে হিটলার জার্মানীকে পুনরায় সামরিক সজ্জায় সুসজ্জিত করার জন্য এক পরিকল্পনা ঘোষণা করিলেন। তথায় বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা পুনরায় প্রবর্তিত হইল এবং সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। ভার্সাই-সন্ধির সামরিক শর্তাদি লঙ্ঘন করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া হিটলার ঘোষণা করিলেন যে অস্ত্রশস্ত্র হ্রাসের নীতি উক্ত সন্ধির স্বাক্ষরকারীগণ একবাক্যে গ্রহণ করিয়াও নিজ নিজ সামরিক শক্তি হ্রাস করেন নাই। উপরন্তু তিনি এইরূপ দাবি করিলেন যে শান্তির সময় রাশিয়ার বিশাল সৈন্যবাহিনী রাখা ও ফ্রান্স কর্তৃক বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন করার ফলে জার্মানীর রাষ্ট্রিয় নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার উপক্রম দেখা দেওয়ায় জার্মানী সামরিক সজ্জায় সুসজ্জিত হওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। লীগ-অফ-নেশনস্ জার্মানীর এই নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিলেও ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ একক বা সম্মিলিতভাবে জার্মানীকে ভার্সাই-সন্ধি পালন করাইতে উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে নাই। উপরন্তু ব্রিটেন এই ব্যাপারে জার্মানীকে সমর্থন করিয়া উহার আক্রমণাত্মক মনোভাবকে আরও পরিপুষ্ট করিল।

সমরসজ্জা

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী-ইথিওপিয়া সংঘর্ষের ফলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সংকটাপন্ন হইয়া উঠিলে হিটলার সেই সুযোগে লোকার্ণো-চুক্তি (১৯২৫ খ্রীঃ) ভঙ্গ করিয়া রাইন অঞ্চল আক্রমণ করিলেন। ইওরোপের প্রায় সকল রাষ্ট্রই জার্মানীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি করিল। কিন্তু ব্রিটেন উহা সমর্থন করিল না। ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে মতানৈক্যের ফলে জার্মানীর পররাজ্যগ্রাস মনোভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল।

রাইন অঞ্চল দখল

পোল-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তি : জার্মানীর আক্রমণাত্মক প্রস্তুতির দ্বিতীয় পর্ব হইল পোল্যাণ্ডের সহিত অনাক্রমণ-চুক্তি সম্পাদন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে জার্মানীর বহু অঞ্চল পোল্যাণ্ডকে দেওয়া হইয়াছিল—যেমন ডানজিগ, সাইলেশিয়া, পোসেন প্রভৃতি। হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে পোল্যাণ্ডের আশঙ্কার কারণ হইল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার অভাবনীয়ভাবে পোল্যাণ্ডের সহিত দশ বৎসরের জন্য অনাক্রমণ-চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। হিটলারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের মিত্রতা হইতে পোল্যাণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল করা। স্মরণ রাখা দরকার যে সম্প্রতি ফ্রান্সের চতুঃশক্তি চুক্তির (Four-Power-Pact) প্রস্তাবে পোল্যাণ্ড অস্বস্তিবোধ করিতেছিল এবং এতদ্ভিন্ন উহার প্রতি জার্মানী ও রাশিয়ার আক্রমণাত্মক মনোভাবও পোল্যাণ্ডের অবিদিত ছিল না। সুতরাং এই অবস্থায় জার্মানীর সহিত অনাক্রমণ-চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া পোল্যাণ্ড রাশিয়ার বিরুদ্ধে স্বীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করিয়া তুলিবার এবং জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে বলসাম্য বজায় রাখিবার সুযোগ পাইল।

উদ্দেশ্য : ফ্রান্সের মিত্রতা হইতে পোল্যাণ্ডকে বিচ্ছিন্ন রাখা

পোল্যাণ্ডের স্বার্থ

বলপূর্বক অস্ট্রিয়া দখলের চেষ্টা : জার্মানীর অনাক্রমণাত্মক নীতির তৃতীয় পর্ব হইল ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ডলফাস্ (Dollfuss)-এর হত্যাসাধন করিয়া বলপূর্বক অস্ট্রিয়া দখল করার প্রচেষ্টা। জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সংযুক্তিকরণ (Anschluss) জার্মানীর ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অস্ট্রিয়ার সংবিধান-সভা জার্মানীর সহিত অস্ট্রিয়ার সংযুক্তিকরণ স্বীকার করিয়াছিল। ফ্রান্স ও চেকোশ্লোভাকিয়ার চাপে মিত্রপক্ষ জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিল। কিন্তু জার্মানীর সহিত সংযুক্ত হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অস্ট্রিয়াবাসীদের মধ্যে দেখা দিল। হিটলার জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সংযুক্তিকরণ সম্পন্ন করিতে যত্নবান হইলেন। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ডলফাস্ অস্ট্রিয়ার নাৎসীগণকে কঠোরভাবে দমন করিতে লাগিলেন। ফলে জনৈক নাৎসী আততায়ী কর্তৃক তিনি নিহত হইলেন। সর্বত্র হিটলারের বিরুদ্ধে এক দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। এই অবস্থায় হিটলার প্রকাশ্যভাবে অস্ট্রিয়ার নাৎসীগণকে নিন্দা করিলেন কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি উপযুক্ত সময়েরও প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অস্ট্রিয়ার সংযুক্তিকরণ আন্দোলন : ডলফাসের হত্যা

ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তি (১৯৩৫) : হিটলারের যুদ্ধ-প্রস্তুতির চতুর্থ পর্ব হইল ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তি সম্পাদন। জার্মানীতে সামরিক আইন প্রবর্তিত হইলে পর ইওরোপে এক দারুণ প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হইয়াছিল। হিটলার তাহা উপলব্ধি করিয়া আপাততঃ নিজ মনোভাব গোপন রাখিতে যত্নবান হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি

জার্মান সামরিক আইন ও ইওরোপে প্রতিক্রিয়া

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ন্যায় ও শান্তির নীতি ঘোষণা করিলেন, অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং ভার্সাই ও লোকার্ণো-চুক্তি রক্ষা করারও প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইতিমধ্যে হিটলার ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন ব্রিটেনের সহিত একটি নৌ-চুক্তি সম্পাদন করিলেন। হিটলার জার্মানীর নৌ-বাহিনীর ও নৌ-বহরের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে ব্রিটেনের সম্মতি লাভ করিলেন। কিন্তু ইহার ফলে ইটালী, ফ্রান্স ও রাশিয়া জার্মানীর মনোভাব সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। ভার্সাই-সন্ধির শর্তাদি পরিত্যক্ত হইল। লণ্ডনে জার্মানীর বিশেষ রাষ্ট্রদূত রিবেনট্রপ (Ribbentrop)-এর কথায় ' It (Anglo-German Naval Agreement) meant the repeal of the armament provisions of the Versailles treaty officially agreed to by Britain"। এই চুক্তি ব্রিটেনের জার্মান-তোষণ নীতির এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

জার্মানীর নৌ-শক্তিবৃদ্ধিতে ব্রিটেনের সম্মতি

(৩) **ইটালী কর্তৃক ইথিওপিয়া দখল (১৯৩৬)ঃ** ভার্সাই-সন্ধি ইটালীর সাম্রাজ্যবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইটালীর ফ্যাসিস্ট সরকার ইটালীর সেই আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করিতে অগ্রণী হইলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে যুদ্ধই জাতির শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র প্রতীক। ইথিওপিয়া অভিযান (১৯৩৫ খ্রীঃ) ইটালীর এই মনোভাবের পরিচায়ক। লীগ-কাউন্সিল ইটালীকে আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত করিল (ইওরোপের কোন বৃহৎ রাষ্ট্রকে লীগ কর্তৃক আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত করার ইহাই হইল সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত) এবং ইটালীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইল। কিন্তু জার্মানীর রণসজ্জায় ভীত ও আতঙ্কিত ফ্রান্স ও ব্রিটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে ইটালীর সহযোগিতার আশায় ইটালীকে অসন্তুষ্ট করিতে সাহসী হইল না। ইতিমধ্যে লীগ-কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে দুর্বলতা ও মতানৈক্য লক্ষ্য করিয়া ইটালী তিনমাস নিষ্ক্রিয় থাকিবার পর পুনরায় ইথিওপিয়া অভিযান আরম্ভ করিয়া উহা দখল করিয়া লইল। অতঃপর ইথিওপিয়া ইটালীর সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। ইটালী জয়যুক্ত হইল এবং সেই সঙ্গে আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে লীগ-অফ-নেশনস্-এর অক্ষমতা প্রমাণিত হইল।

(৪) **রোম-বার্লিন-টোকিও মৈত্রী (১৯৩৬)ঃ** ইহা খুবই স্বাভাবিক যে বিশ্বের তিনটি অতৃপ্ত রাষ্ট্র (জাপান, জার্মানী ও ইটালী) যাহারা ১৯৩১ হইতে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বারংবার বিশ্বশান্তি ব্যাহত করিতেছিল তাহারা পারস্পরিক সাহায্যের জন্য এক মৈত্রবন্ধনে আবদ্ধ হইবে, এবং তাহাই হইল। এস্থলে স্মরণ রাখা দরকার যে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে উপরোক্ত রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মাঞ্চুরিয়া দখল করার জন্য জাপান, ইথিওপিয়া দখল করার জন্য ইটালী এবং রাইন অঞ্চল দখল করার জন্য জার্মানী ইওরোপের সহানুভূতি হারাইয়াছিল। এইরূপ অবস্থার অবসানকল্পে ১৯৩৬

খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী ইটালীর সহিত এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল। সন্ধির শর্তাদি অনুসারে এইরূপ স্থির হইল যে (১) সাম্যবাদের বিরুদ্ধে ইওরোপীয় সভ্যতা রক্ষা করা হইবে, (২) দানিয়ুব অঞ্চলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বজায় রাখা হইবে এবং (৩) স্পেনের রাষ্ট্রীয় ও ঔপনিবেশিক অক্ষুণ্ণতা রক্ষা করা হইবে। জার্মানী কর্তৃক ইটালীর ইথিওপিয়া সাম্রাজ্য স্বীকৃত হইল এবং ইহার বিনিময়ে এই অঞ্চলে জার্মানীকে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে ইটালী স্বীকৃত হইল। হিটলার ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সোভিয়েট রাশিয়া তথা সাম্যবাদের বিরুদ্ধে নিজেকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সহিত কমিউনিস্ট-বিরোধী এক চুক্তিপত্রে (Anti-Commintern pact) আবদ্ধ হইলেন। পরবৎসর ইটালীও এই চুক্তিবন্ধনে আবদ্ধ হইল। এইভাবে ইওরোপের তিনটি অতৃপ্ত রাষ্ট্র একসূত্রে গ্রথিত হইল।

(৫) **জাপানের চীন অভিযান (১৯৩৭):** ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করিলে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ নীতি উৎকট রূপ ধারণ করিল। অতঃপর জাপান সমগ্র চীন গ্রাস করিতে উদ্যোগী হইল। মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারে বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়াই জাপান চীনে আপন অধিকার বিস্তার করিতে অধিকতর উৎসাহী হইয়াছিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তর এইরূপ ঘোষণা করিল যে চীনে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ বা চীন কর্তৃক বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাহায্যলাভের প্রচেষ্টা জাপান কখনই বরদাস্ত করিবে না। মাঞ্চুরিয়ায় আপন অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সমগ্র চীন অধিকার করা জাপানের প্রয়োজন হইল। কিন্তু চীনের অনুকূলে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা থাকায় জাপান পূর্বেই জার্মানীর সহিত সাম্যবাদ-বিরোধী চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল। জাপান অন্ততঃ এইরূপ অনুমান করিয়াছিল যে রাশিয়া চীনের অনুকূলে হস্তক্ষেপ করিলে জার্মানী ও ইটালী উহাকে সাহায্য করিবে। সুতরাং চীনের ব্যাপারে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ মনে করিয়া জাপান চীন অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইল।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া পিপিং এর নিকট চীনা ও জাপানী সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। জাপান সরকার কতকগুলি অপমানজনক শর্তের দাবি জানাইয়া চীন সরকারের নিকট এক চরমপত্র প্রেরণ করিলেন। চীন সরকার উক্ত শর্তগুলির যৌক্তিকতার প্রশ্ন উত্থাপন করিলে জাপান চীনের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিল। এইভাবে চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উত্তরে তিয়েনসিন হইতে দক্ষিণে ক্যান্টন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জাপানের অধিকারভুক্ত হইল।

যুদ্ধারম্ভ (১৯৩৭)

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনের আবেদনক্রমে লীগ-অফ-নেশনস্-এর বৈঠক বসিল। লীগ চীনের প্রতি নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করিল এবং একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া চীনের স্বার্থের পরিপন্থী হইতে পারে এমন সকল কার্য হইতে সদস্য-রাষ্ট্রবর্গকে

বিরত থাকিতে বলা হইল। কিন্তু জাপানকে যুদ্ধোপকরণ ও ঋণদান করার বিরুদ্ধে চীন সরকার যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে উপেক্ষিতই রহিল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে লীগ-কাউন্সিল কেলোগ্-চুক্তি (Kellog Pact, 1922) ভঙ্গ করার অপরাধে জাপানকে অভিযুক্ত করিল বটে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে জাপানের বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল না। বিশ্বশান্তি বজায় রাখিতে লীগ-অফ-নেশনস্-এর অক্ষমতার ইহা হইল তৃতীয় নিদর্শন।

(৬) **জার্মানী কর্তৃক অস্ট্রিয়া গ্রাস (১৯৩৮):** ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানী ও ইওরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি হিটলারের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনায় ইন্ধন যোগাইল। সেই বৎসর জার্মানীর সামরিক ও পররাষ্ট্র বিভাগ হিটলারের কর্তৃত্বাধীনে আসিল। মুসোলিনী 'রোম-বার্লিন মৈত্রী' সংঘে যোগদান করিয়া ঘোষণা করিলেন যে জার্মানীর নিশ্চিত আক্রমণ হইতে অস্ট্রিয়াকে রক্ষা করিতে ইটালী অপারগ। এদিকে গ্রেটব্রিটেনের 'জার্মান-তোষণ' নীতি হিটলারের আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিপুষ্ট করিল এবং হিটলার জার্মানীর সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে অগ্রসর হইলেন।

প্রথমেই তিনি অস্ট্রিয়াকে জার্মানীভুক্ত করিতে উদোগী হইলেন। অস্ট্রো-জার্মান সংযুক্তির ব্যাপারে অস্ট্রিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ গণ-ভোটের প্রশ্ন তুলিলে জার্মানীর নিয়োজিত ও সমর্থিত অস্ট্রিয়ার নাৎসীবাদীগণ ইহার বিরোধিতা করিল। অবশেষে নাৎসীবাদীগণেরই জয়লাভ হইল এবং তাহাদের নেতা ইনকোয়ার্ট (Inquart) তথায় মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াই জার্মানীকে অস্ট্রিয়ায় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করার জন্য আহবান জানাইলেন। ১২ই মার্চ জার্মান সৈন্যবাহিনী অস্ট্রিয়ায় প্রবেশ করিল এবং হিটলার অস্ট্রো-জার্মান সংযুক্তির কথা সরকারীভাবে ঘোষণা করিলেন ("No threats, no hardships, no force can make us break our oath to be united for ever."—Hitler) ফ্রান্স ও গ্রেটব্রিটেন এই সংযুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইল বটে, কিন্তু কোন রাষ্ট্রই অস্ট্রিয়ার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল না। ইহার ফলে জার্মানীর পররাজ্যগ্রাস-স্পৃহা বলবতী হইল, জার্মানী ও ইটালীর মধ্যে যোগসূত্র সুদৃঢ় হইল এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার বিলুপ্তি সূচিত হইল।

(৭) **চেকোশ্লোভাকিয়ার বিলুপ্তিসাধন (১৯৩৮):** জার্মানীর পরবর্তী অভিযান হইল চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে। ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর নাৎসী আন্দোলন অস্ট্রিয়ার ন্যায় চেকোশ্লোভাকিয়াতেও প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। চেক্ সরকার নাৎসীবাদের প্রসারে আতঙ্কিত হইয়া তথাকার নাৎসী দলকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় চেকোশ্লোভাকিয়ার নাৎসী-বাদীগণ তাহাদের পূর্বতন নাৎসীদল ভাঙ্গিয়া দিয়া উহার পরিবর্তে 'সুদেতান জার্মান দল' (Sudetan German Party) নামে আর একটি দল গঠন করিল। জার্মানীর পররাষ্ট্রদপ্তর সুদেতান জার্মানগণকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে লাগিল এবং চেক্-

সরকারের নিকট হইতে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আদায় করার জন্য তাহাদিগকে প্ররোচিত করিতে লাগিল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চেক্-সরকার চেকোশ্লোভাকিয়ার জার্মান-অধ্যুষিত অঞ্চল (সুদেতান) জার্মানীর হস্তে হস্তান্তর করিতে সম্মত হইলেন। চেক্-সরকারের এই শান্তির প্রস্তাবে হিটলার সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। কারণ শুধু সুদেতান অঞ্চলই নহে, সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর তাঁহার লোলুপ দৃষ্টি ছিল। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন হিটলারকে চেক্-সরকার কর্তৃক সুদেতান অঞ্চল প্রদানের প্রস্তাবে রাজী করার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পররাজ্যলোভী হিটলার পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া অক্টোবর মাসে (১৯৩৮ খ্রীঃ) চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করিলেন। এই সময় পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ ছিল শক্তিহীন, লীগ-অফ-নেশনস্ ছিল মৃতপ্রায় এবং সোভিয়েট রাশিয়া ছিল ইওরোপের রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন। ফলে অসহায় চেকোশ্লোভাকিয়া জার্মানীর কবলিত হইল।

ইওরোপে প্রতিক্রিয়া (Reactions in Europe) : জার্মানী কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকৃত হইলে ইওরোপে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। মুসোলিনী বিরক্ত ও চিন্তিত হইলেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে হিটলারের বিরোধিতা করা তিনি নিরর্থক বলিয়া মনে করিলেন। বরং হিটলারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মুসোলিনী আলবানিয়া আক্রমণে উদ্যোগী হইলেন। ব্রিটেনেও জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন ইওরোপে এযাবৎ যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল তাহার পরিবর্তন ঘটিল। পশ্চিম-ইওরোপে কোনরূপ স্থায়ী সামরিক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইবার এবং পূর্ব ইওরোপীয় দেশগুলির নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব গ্রহণ করার নীতি ব্রিটেন যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিতেছিল। সকল আন্তর্জাতিক বিবাদ শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করাই ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ার পরিণাম ব্রিটেনের শান্তিনীতি ও জার্মান-তোষণ নীতির উপর চরম আঘাত হানিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর চেম্বারলেন প্রকাশ্যভাবে হিটলারকে নিছক আক্রমণকারী ও প্রতারক বলিয়া অভিহিত করিলেন। চার্চিল-এর নেতৃত্বে ব্রিটেনের রক্ষণশীল দল জার্মানীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি করিলেন। এই অবস্থায় শান্তিকামী চেম্বারলেন জার্মানীর আক্রমণাত্মক নীতির বিরুদ্ধে ফ্রান্স, রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডকে একটি যুগ্ম-ঘোষণায় আমন্ত্রণ করিতে সম্মত হইলেন। এককথায় চেম্বারলেন ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির সহিত সামরিক চুক্তিবন্ধনে আবদ্ধ হইতে সম্মত হইলেন। তাঁহার কথায় **"Clearly we must make military alliance with any other powers whom we can get to work with us."**

মুসোলিনী কর্তৃক হিটলারের নীতি গ্রহণ

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন

চেম্বারলেনের ঘোষণা

জার্মানী কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ (১৯৩৯): অস্ট্রিয়া ধ্বংস করায় যেমন জার্মানীর পক্ষে চেকোশ্লোভাকিয়া কুক্ষিগত করার পথ সহজ হইয়াছিল, ঠিক তেমনি চেকোশ্লোভাকিয়া ধ্বংস হইলে জার্মানীর পক্ষে পোল্যাণ্ড কুক্ষিগত করা সহজ হইল। হিটলারের সাম্রাজ্যলিপ্সাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করার পর তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন, "After cleaning up Czechoslovakia I was not quite clear whether I should start first against the East and then against the West or vice-versa."

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে পোল্যাণ্ড ছিল জার্মানীর শত্রু। ভার্সাই-সন্ধি অনুসারে জার্মানীর কিছু ভূখণ্ড পোল্যাণ্ডকে দেওয়া হইয়াছিল। জার্মানী তাহা বিস্মৃত হয় নাই। উপরন্তু জার্মানীর ভিতর দিয়া পোলিশ করিডর-এর সৃষ্টি হইলে জার্মানগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল এবং পোল্যাণ্ডের সংখ্যালঘু জার্মানগণের সমস্যা লইয়া উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে তিক্ততা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। যদিও হিটলার ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের সহিত অনাক্রমণ-চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তথাপি উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। হিটলার পোল্যাণ্ডকে জার্মানীর হস্তে ডানজিগ বন্দর প্রত্যর্পণ এবং পূর্ব-রাশিয়ার সহিত জার্মানীর যোগাযোগের জন্য একখণ্ড সংযোগ-ভূমি দাবি করিলেন। পোল্যাণ্ড ইহাতে অসম্মত হইলে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানবাহিনী পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করিল। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইল।

ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা: জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে পোল্যাণ্ডের সহিত চুক্তিবদ্ধ ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেও মুসোলিনীর হস্তক্ষেপের ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে দুইদিন বিলম্ব হইল। মুসোলিনী জার্মানীর সহিত আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স অনতিবিলম্বে পোল্যাণ্ডের সীমান্ত হইতে জার্মানবাহিনীর অপসারণের দাবি করিল। জার্মানী ইহাতে কর্ণপাত না করিলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯৩৯ খ্রীঃ) সরকারীভাবে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিল। এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল এবং পুনরায় মহাযুদ্ধ শুরু হইল।

২০.২. **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ** (Causes of the Second World War)**:** সেরাজিভোর হত্যাকাণ্ড যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ নহে, তেমনি জার্মানী কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ নহে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পশ্চাতে বহুবিধ কারণ ছিল:

(১) জার্মানীর উগ্র জাতীয়তাবাদ এই যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ। ভার্সাই-সন্ধির অপমানজনক শর্তাদি জার্মানীর জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার উপর দারুণ আঘাত

হানিয়াছিল। ভার্সাই-সন্ধিতে জার্মানীর প্রতি বিজয়ী শক্তিবর্গের এক দারুণ প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ করায় মনোভাব জার্মানজাতিকে অত্যন্ত মর্মাহত করিয়াছিল। এই সন্ধি দ্বারা জার্মানীকে নিরস্ত্র করিয়া উহাকে উহার শত্রুর সম্মুখে অসহায় অবস্থায় রাখা হইয়াছিল। জার্মানীর সকল উপনিবেশগুলি কাড়িয়া লইয়া এবং উহার উপর এক বিশাল ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপাইয়া দিয়া উহাকে আর্থিক দৈন্যের মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। জার্মানীর কোন বক্তব্য ও আর্জি না শুনিয়াই জার্মানীকে যারপরনাই অপদস্থ ও হেনস্থা করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সকল দিক দিয়া জার্মানীকে পঙ্গু ও দুর্বল করিয়া রাখা হইয়াছিল। পরাজয়ের প্লানি জার্মানজাতির মনে এক অভূতপূর্ব আত্মচেতনা ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ করিয়াছিল। জার্মানজাতি ভার্সাই-সন্ধি কখনও মনে-প্রাণে স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। ১৯২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে এক দারুণ অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে তদানীন্তন জার্মান সরকারের প্রতি জার্মানজাতির সকল আস্থা বিনষ্ট হয় এবং নাৎসীদলের পরিচালনাধীনে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সমরবাদের উন্মেষ হয়। নাৎসী আন্দোলন জার্মানজাতির মনে এক নূতন আশার সঞ্চার করে এবং এক নূতন পথের সন্ধান দেয়। হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া জার্মানীর আত্মনিয়ন্ত্রণের ও জাতীয়তাবাদের দাবির কথা ঘোষণা করিলে জার্মানজাতির সমরবাদী মনোভাব প্রবল আকার ধারণ করে। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে হিটলার অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের জার্মান ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করিতে যত্নবান হইলে ইওরোপের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংকটের সূত্রপাত হয়। জার্মানীর সামরিক প্রস্তুতি এবং জার্মানী কর্তৃক একে একে রাইন অঞ্চল, অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া বলপূর্বক দখল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ প্রশস্ত করে এবং পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হইলে মহাযুদ্ধ শুরু হয়।

ভার্সাই-সন্ধির অবমাননা: জার্মানীর উগ্র জাতীয়তাবাদ

(২) অপর প্রধান কারণ হইল জার্মানী, রাশিয়া, ইটালী ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই জার্মানী, রাশিয়া, ইটালী ও জাপান ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগদান করিয়া ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীকে সর্বতোভাবে দুর্বল করিয়া রাখা হইয়াছিল, উহার উপনিবেশগুলি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল এবং সেগুলি ব্রিটেন ফ্রান্স ও জাপানের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঔপনিবেশিক জগৎ ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পর্তুগাল ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বণ্টিত হইয়া যায়। বিশ্বের অধিকাংশ কাঁচামাল ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার হস্তগত হয় এবং তাহা হইতে জার্মানী, জাপান ও ইটালী বঞ্চিত হয়। ফলে বিশ্বের উপনিবেশ ও কাঁচামালের উপযুক্ত ভাগ পাইবার জন্য জার্মানী, ইটালী ও জাপানে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ভার্সাই-সন্ধি দ্বারা বিলুপ্ত জার্মানীর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রত্যর্পণের দাবি

জার্মানগণ কখনও পরিত্যাগ করে নাই। উপরন্তু হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানী অতিরিক্ত মাত্রায় পররাজ্য-গ্রাস মনোভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। জার্মানীর নেতৃত্বে 'মধ্য-ইওরোপ ('Middle Europe') গঠন করিতে, হস্তচ্যুত উপনিবেশগুলি আদায় করিতে এবং পূর্ব-ইওরোপে অগ্রসর হইয়া উর্বরশালী রুশ-ইউক্রেন দখল করিতে জার্মানগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।

জার্মানী রাশিয়া, ইটালী ও জাপানের পররাজ্য-গ্রাস লিপ্সা

অপরদিকে সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ ক্ষুদ্র বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি ও দক্ষিণ-ফিনল্যাণ্ড কুক্ষিগত করিবার এবং বল্কানের ভিতর দিয়া ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করিবার পরিকল্পনা করিতেছিলেন। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের ব্যাপারে ভার্সাই-সন্ধি ইটালীয়গণকে হতাশ করিয়াছিল। ইটালী পূর্ব আদ্রিয়াটিক উপকূল, ফরাসী টিউনিশিয়া এবং ফরাসী বন্দর জিবুতি Jibuti দখল করিবার সংকল্প করিতেছিল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে হল্যাণ্ডের আধিপত্য বিনষ্ট করিয়া তথায় আপন আধিপত্য স্থাপন করাই ইটালীর সাম্রাজ্যবাদ নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল। সুদূর-প্রাচ্যে জাপানও এশিয়া ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর হইতে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গকে বিতাড়িত করিয়া সমগ্র এশিয়ায় স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। ইটালী কর্তৃক ইথিওপিয়া আক্রমণ এবং জাপানের মাঞ্চুরিয়া অভিযান উঁহাদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের সাক্ষ্য বহন করে।

সুতরাং বিশ্বের কয়েকটি রাষ্ট্রের উগ্র সাম্রাজ্যবাদী নীতির চরম পরিণতি হইল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

(৩) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে যেরূপ একাধিক রাষ্ট্রজোটের (Political Alliances) উদ্ভব হইয়া সমগ্র বিশ্বকে দুইটি প্রধান সামরিক শিবিরে বিভক্ত করিয়াছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালেও সেইরূপ অবস্থার ব্যতিক্রম হয় নাই। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ শেষ হওয়ার পূর্বেই বিশ্বে দুইটি রাষ্ট্রজোট গড়িয়া উঠিয়াছিল। একদিকে 'অপরিতৃপ্ত' রাষ্ট্র ইটালী, জার্মানী ও জাপান-এর মধ্যে 'রোম-বার্লিন-টোকিও এক্সিস্' গঠন এবং অপরদিকে মিত্র রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে চুক্তি। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স যে মুহূর্তে পোল্যাণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিল, প্রকৃতপক্ষে সেই মুহূর্তেই বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়।

বিশ্ব দুইটি সামরিক শিবিরে বিভক্ত

(৪) ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর একাধিক আন্তর্জাতিক সংকট (International Crisis) ক্রমাগত বিশ্বশান্তি ব্যাহত করিতেছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের পর যদিও সকল রাষ্ট্রই যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক বিরোধ আপোসে নিষ্পত্তি করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু কার্যতঃ তাহা কেহই পালন করিতে যত্নবান ছিল না।

একাধিক আন্তর্জাতিক সংকট

(ক) জাপান এই প্রতিশ্রুতি অগ্রাহ্য করিয়া ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে এবং ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চীন আক্রমণ করে, কিন্তু ইহার জন্য লীগ-অফ-নেশনস্

জাপানকে কোনরূপ শাস্তিদানের ব্যবস্থা করে নাই। (খ) ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী ভার্সাই-সন্ধি ও লোকার্ণো-চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া রাইন অঞ্চলে সামরিক প্রস্তুতি শুরু করে। জার্মানীর এইরূপ ব্যবহারেও লীগ-অফ-নেশনস্ নীরব ছিল। (গ) ইটালীও ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইথিওপিয়া এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আলবানিয়া বলপূর্বক দখল করিয়া লয়। লীগ-অফ-নেশনস্ তখনও ইটালীকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং লীগের অকর্মন্যতাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ।

লীগ-অফ-নেশনস্-এর অকর্মন্যতা

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত

১। প্রাক্-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ ২০.১.]

২। ইওরোপে জার্মানী কর্তৃক চেকোস্লোভাকিয়া দখলের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইয়াছিল ? [উঃ ২০.১.]

৩। "১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইওরোপের ইতিহাসে আন্তর্জাতিক সংকটের সূচনা হয়"—ইহা কতদূর সত্য ? [উঃ ২০.১.]

৪। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি বিশ্লেষণ কর। [উঃ ২০.২.]

একবিংশ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঃ শান্তিচুক্তি

(Second World War : Peace Settlements)

২১.১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আদর্শগত সংঘাত (Ideological Conflicts in the War) ঃ যে আন্তর্জাতিক সংকট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি ঘটায় তাহা ছিল আংশিক আদর্শগত সংঘাত ও আংশিক জাতীয় স্বার্থ। এই দুই সংঘাত বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দের সূচনা করে এবং উহাদের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী জোটের উদ্ভব ঘটায়। রাষ্ট্রীয়-জোট গঠনের মূলে একটি সাধারণ আদর্শ থাকিলেও জাতীয় স্বার্থও উহার মূলে সক্রিয় ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সমগ্র ইওরোপে উদারনৈতিক গণতন্ত্রবাদের জয় হইয়াছিল। হোয়েন জোলার্ণ, হ্যাপসবার্গ ও রোমানফ প্রভৃতি তিনটি প্রাচীন রাজবংশের পতনের পর ইওরোপের প্রায় সকল দেশেই গণতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করা হয়। একমাত্র রাশিয়ায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলশেভিক আন্দোলনে পরিণত হয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্যের এক দশকের মধ্যে ইওরোপে গণতন্ত্র-বিরোধী দুইটি নূতন রাজনৈতিক আদর্শের উদ্ভব হয়। একটি হইল রাশিয়ার সাম্যবাদ ও অপরটি হইল জার্মানী ও ইটালীর ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র। সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের মধ্যে আদর্শগত বিভিন্নতা থাকিলেও এই দুই ধরনের একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সরকার গঠনে আপামর জনগণের অধিকার অস্বীকৃত হয়। সোভিয়েট রাশিয়া, ইটালী ও জার্মানীতে এক-দলীয় সরকার গঠনের আদর্শ গৃহীত হয়। সাম্যবাদী ও ফ্যাসিবাদী আদর্শের দ্রুত প্রসার পশ্চিম ইওরোপে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী হইয়া উঠে। আবার সাম্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের মধ্যেও সংঘাতের উদ্ভব হয় এবং ফ্যাসিবাদ সাম্যবাদী আদর্শ বিচূর্ণ করিতেও তৎপর হয়। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনটি পরস্পর-বিরোধী আদর্শের সংঘাত ঘটে; যথা—সাম্যবাদ, ফ্যাসিবাদ ও গণতন্ত্রবাদ। ইওরোপে কয়েকটি আদর্শগত রাষ্ট্রীয় জোটের উদ্ভব হয়, যথা জার্মানী ও জাপানের মধ্যে কমিউনিস্ট-বিরোধী জোট (Anti-commintern Pact-1936), যাহাতে পরে যোগ দেয় ইটালী। এই জোটের প্রধান লক্ষ্য ছিল সাম্যবাদের প্রসার স্তব্ধ করা। ফ্রান্সে ও স্পেনে গঠিত হয় ফ্যাসি-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট ও জনপ্রিয় সরকার গঠন। এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী জোটের সংগ্রাম প্রকাশ্যে শুরু হয়। স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে (১৯৩৬) জার্মানী ও ইটালী জেনারেল ফ্রাংকো পরিচালিত বিদ্রোহীদের প্রকাশ্যে সমর্থন ও সাহায্য করে এবং অপরদিকে রাশিয়া স্পেনের প্রচলিত সরকারের সাহায্যে অগ্রসর হয়। সুতরাং স্পেনের

গণতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের মধ্যে সংগ্রাম

স্পেনীয় অন্তর্বিপ্লবে সাম্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে সংগ্রাম

অন্তর্বিপ্লব স্পেনের ভিতরে সীমিত না রহিয়া তাহা ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদের সংগ্রামে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে হিটলারের যুদ্ধসঙ্গী মুসোলিনী আদর্শগত সংগ্রামের নূতন মূল্যায়ন করিয়া ঘোষণা করেন, "The struggle between the two Worlds can permit no compromise. Either we or they"। মুসোলিনীর এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে মিত্রপক্ষ (Allied Powers) ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত আতলান্তিক সনদে (Atlantic Charter) উহাদের যুদ্ধ-নীতি ঘোষণা করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট মিত্রপক্ষের যুদ্ধ-নীতি প্রসঙ্গে চারিটি আদর্শের কথা প্রচার করেন, যথা—ভয় হইতে মুক্তি (freedom from fear), অভাব হইতে মুক্তি (freedom from want), ধর্মীয় মুক্তি (freedom of worship) ও রাজনৈতিক মুক্তি (Political freedom)। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ক্যাসাব্লাঙ্কা-সম্মেলনেও (Cassablanca conference) প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল মিত্রপক্ষের উল্লিখিত যুদ্ধ-নীতি পুনরায় যুগ্মভাবে ঘোষণা করেন। বিনা শর্তে এক্সিসশক্তির (Axis Powers) আত্মসমর্পণের দাবি বিশ্লেষণ করিয়া রুজভেল্ট ও চার্চিল বলেন যে মিত্রপক্ষ জার্মানী, ইটালী ও জাপানী জনগণের ধ্বংস কামনা করে না, শুধু উহাদের রাজনৈতিক আদর্শের অর্থাৎ পররাজ্যগ্রাস ও বিজিত দেশের জনগণের উপর বিদেশী শাসনের অবসান কামনা করে। সুতরাং মিত্রপক্ষ ও এক্সিসপক্ষের যুদ্ধের আদর্শের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

মিত্রপক্ষের যুদ্ধ-নীতি

২১.২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি (Character of the Second World War): পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধবিগ্রহের প্রকৃতির তুলনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল একটি "পরিপূর্ণ যুদ্ধ" ("Total War"), যে যুদ্ধে রাষ্ট্রের তথা জাতির সমগ্র শক্তি ও সম্পদ নিয়োজিত হইয়াছিল। রাষ্ট্র এই যুদ্ধে যে সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করিয়াছিল তাহা পূর্ববর্তী যুগের কোনও যুদ্ধে দেখা যায় নাই। সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রতিটি রাষ্ট্রে অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী ও আহার্যের বণ্টন নিয়ন্ত্রিত করা হয়, নাগরিকদের ঘরবাড়ী, কলকারখানা ইত্যাদি যুদ্ধের প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হয়। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের ব্যয়ভার ও যুদ্ধজনিত অসুবিধা সকল নাগরিককে গ্রহণ করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই যুদ্ধ ছিল সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত এবং বিশ্বের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলই ছিল রণাঙ্গন—যেমন বরফাবৃত আর্টিক অঞ্চল, উত্তর-আফ্রিকার মরু-অঞ্চল, ব্রহ্মদেশ ও নিউ-গিয়ানার বনাঞ্চল, আতলান্তিক মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ। তৃতীয়তঃ, সামরিক কৌশলের দিক দিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় ভিন্ন। রণসজ্জা ও ক্ষিপ্রতা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক অভিনব বৈশিষ্ট্য। এই যুদ্ধের অপর বৈশিষ্ট্য হইল আকাশযানের (airplanes) বহুল ব্যবহার। আকাশযানের ব্যাপক আক্রমণের ফলে চিরাচরিত আক্রমণ ও প্রতিরোধ-রীতি একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। আক্রমণের ক্ষেত্রে আকাশযান এক নূতন ঐতিহ্যের সূচনা করে যাহা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ঘটে নাই। চতুর্থতঃ, দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধ ছিল আদর্শগত এক ব্যাপক সংগ্রাম। জার্মানীর নাৎসীগণ নিজেদের মানব-জাতির শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিত এবং এই কারণে বিশ্বের অপর জাতিদের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের কথা প্রচারিত করিত। এই মনোভাবের বশবর্তী হইয়াই নাৎসীগণ বিনা কারণে ও বিনা প্ররোচনায় অপর রাষ্ট্রের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ চালাইতে দ্বিধা করে নাই। নাৎসীবাদের প্রধান কথাই ছিল একদলীয় শাসন কায়েম করা এবং রাষ্ট্রের জনগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অস্বীকার করা। ফলে নাৎসীবাদ পশ্চিম-ইওরোপে প্রচলিত গণতন্ত্রবাদের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠে। হিটলারের যুদ্ধ-সহযাত্রী মুসোলিনী প্রকাশ্যেই ফ্যাসিবাদ ও গণতন্ত্রবাদের মধ্যে আপোস অসম্ভব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন। সুতরাং হিটলার তথা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও সভ্যতার সংগ্রাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক মহান্ বৈশিষ্ট্য। আতলান্তিক সনদ (Atlantic Charter) ও ক্যাসাব্লাঙ্কা-সম্মেলনে মিত্রপক্ষের নেতৃবর্গ এই মহান্ আদর্শের কথা প্রচার করেন। মিত্রপক্ষ ও অক্ষপক্ষের যুদ্ধ-নীতি ছিল পরস্পর-বিরোধী ও অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

২১.৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলী

পোল্যাণ্ড ও বাল্টিক অঞ্চলে যুদ্ধঃ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর কোনরূপ যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। জার্মানীর ক্ষিপ্রগতি অভিযানে সমগ্র বিশ্ব হতবাক্ হইল। সমগ্র পোল্যাণ্ডে জার্মানীবাহিনী পঙ্গপালের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িল এবং জার্মান বিমান-বহর সমগ্র দেশকে বিধ্বস্ত করিল। ইতিমধ্যে ১৭ই সেপ্টেম্বর রুশ-বাহিনী অতর্কিতে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে পোল্যাণ্ডের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িল। রাশিয়া পোল্যাণ্ডের সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্বেত-রুশ (White Russians) অধিবাসীদের রক্ষা করার যুক্তি দেখাইলেও বাস্তবে পোল্যাণ্ডের কিছু অংশ দখল করাই উহার উদ্দেশ্য ছিল। দুইটি প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রতিবেশী শত্রুর আক্রমণে পোল্যাণ্ডের পরাজয় ও ধ্বংস সম্পূর্ণ হইল। রাশিয়া স্বাধীন পোল্যাণ্ডের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার বিরোধী ছিল। সুতরাং জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে পোল্যাণ্ড বণ্টিত হইল। ডানজিগ্ বন্দরটি জার্মানীর ভাগে পড়িল।

জার্মানী ও রাশিয়া কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ
পোল্যাণ্ডের বণ্টন

পোল্যাণ্ডের এক অংশে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করার পর রাশিয়া অতঃপর বাল্টিক রাষ্ট্রগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া উহার পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষিত করিতে অগ্রসর হইল। রাশিয়ার আক্রমণের ভয়ে এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া রাশিয়ার সহিত পরস্পর সাহায্য-মূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হইল এবং উহাদের নৌ ও বিমান ঘাঁটিগুলি রাশিয়ার হস্তে ছাড়িয়া দিল। বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি হইতে অনতিবিলম্বে জার্মান নাগরিকগণকে বিতাড়িত করা হইল।

বাল্টিক ও বল্কান অঞ্চলে রাশিয়ার সম্প্রসারণ

অতঃপর রাশিয়া রুশ ও ফিনল্যাণ্ডের সীমান্তের কতকগুলি অঞ্চল সমর্পণ করার এবং রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার জন্য ফিনল্যাণ্ডকে নিকট দাবি করিল। ফিনল্যাণ্ড কেবলমাত্র সামরিক ঘাঁটি সম্পর্কিত দাবি ছাড়া অপর সকল দাবি স্বীকার করিয়া লইল। রাশিয়া ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করিল এবং ফিনল্যাণ্ডের পতন ঘটিল। ইহার পর রাশিয়া ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের জুন ম্যাসের মধ্যে লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া ও এস্তোনিয়া দখল করিয়া ঐগুলিকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিল।

রাশিয়া কর্তৃক ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ ও দখল (১৯৩৯) রাশিয়া কর্তৃক ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও এস্তোনিয়া দখল (১৯৪০)

বাল্টিক অঞ্চলে যুদ্ধের ফলে রাশিয়ার প্রভূত ক্ষতি হইল এবং রাশিয়ার প্রতি বিশ্বের নৈতিক সমর্থন ক্ষুণ্ণ হইল। কিন্তু রাশিয়ার সাফল্যের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া হইল রুশ-জার্মান সম্পর্কের অবনতি। রাশিয়া কর্তৃক তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্র অধিকৃত হইবার পূর্বেই হিটলার রাশিয়ার প্রতি রুষ্ট হইয়াছিলেন। তদুপরি রাশিয়া জার্মানীর মিত্ররাষ্ট্র ফিনল্যাণ্ড দখল করিলে হিটলার অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করেন। তথাপি হিটলার আপাততঃ রাশিয়ার সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিলেন, কারণ রাশিয়ার নিকট হইতে তিনি সামরিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের আশা করিতেছিলেন। সেই সময় রাশিয়ার পক্ষেও জার্মানীর সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিবার প্রয়োজন ছিল।

বাল্টিক অঞ্চলে রুশ-সাফল্যের ফলাফল

পশ্চিম-ইওরোপে যুদ্ধঃ জার্মানী যখন পোল্যাণ্ডে যুদ্ধ চালাইতেছিল সেই সময় পশ্চিম-ইওরোপে ব্রিটেন ও ফ্রান্স একরূপ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়িয়াছিল।

যুদ্ধের প্রথম দিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নিষ্ক্রিয়তা

পোল্যাণ্ড আক্রমণ সম্পন্ন হইলে হিটলার ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নিকট তাঁহার তথাকথিত 'শান্তির প্রস্তাব' করেন। তাঁহার শর্তগুলি ছিল এইরূপ—(১) পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ পোল্যাণ্ডের বিলুপ্তি স্বীকার করিয়া লইবে, (২) জার্মানী ও রাশিয়াকে পূর্ব ও মধ্য ইওরোপে 'মুক্তহস্ত' প্রদান করিতে হইবে এবং (৩) জার্মানীকে উহার পূর্বতন উপনিবেশগুলি ফিরাইয়া দিতে হইবে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স হিটলারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল এবং জার্মানীর সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার কথা ঘোষণা করিল।

হিটলারের শান্তির প্রস্তাব

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জার্মানী ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রমণ করিলে পশ্চিম-ইওরোপের 'অস্বস্তিকর-শান্তির' (Uneasy peace) অবসান ঘটিল। ইতিপূর্বে জার্মানী ডেনমার্ক ও নরওয়ের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া উহাদের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু হিটলার নরওয়ের নাৎসীদলের নেতা ভিক্দুন-কুইজলিং (Vikdun Quisling)-এর সহিত গোপন আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। কুইজলিং-এর সহিত হিটলারের ষড়যন্ত্র সম্পন্ন হইলে হিটলার মিত্রপক্ষের

জার্মানী কর্তৃক ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখল

দুরভিসন্ধি হইতে ডেনমার্ক ও নরওয়েকে রক্ষা করার অজুহাতে উভয় রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ চালাইলেন। ডেনমার্ক প্রতিরোধের কোন চেষ্টা করিল না। কুইজলিং প্রভৃতি 'পঞ্চম বাহিনীর' (Fifth Collumnists') সমর্থন ও সাহায্যে একমাসের মধ্যে নরওয়ের পতন ঘটিল। ডেনমার্ক জার্মানীর রক্ষণাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইল এবং নরওয়েতে জার্মানীর সমর্থনপুষ্ট স্থানীয় নাৎসীদলের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। ডেনমার্ক ও নরওয়ের সহজ পতন ব্রিটেনে চেম্বারলেন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে এক দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল। ফলে চেম্বারলেন মন্ত্রিসভার পতন ঘটিল এবং রক্ষণশীলদলের (Conservative Party) নেতা উইনস্টন চার্চিল মন্ত্রিসভা গঠন করেন। পার্লামেণ্টে চার্চিল-এর প্রথম বক্তৃতা প্রণিধান-যোগ্য—"I have nothing to offer, but blood, toil, tears and sweat."

ফলাফল

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে জার্মানীর লাক্সেমবুর্গ, বেলজিয়াম ও নেদারল্যাণ্ড অভিযান শুরু হইল। ইতিপূর্বে জার্মানী হল্যাণ্ড (১৯২৬ খ্রীঃ), লাক্সেমবুর্গ (১৯২৯ খ্রীঃ) ও বেলজিয়ামের (১৯৩৫ খ্রীঃ) সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া উহাদের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। মিত্রপক্ষ উপরি-উক্ত তিনটি রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিতে উদ্যত—এই অজুহাতে হিটলার তাঁহার অভিযান শুরু করেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিল। কিন্তু সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত জার্মানবাহিনী সকল প্রতিরোধ-ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। হল্যাণ্ড আত্মসমর্পণ করিল। বেলজিয়াম-রাজ লিওপোল্ডও আত্মসমর্পণ করেন। জার্মানবাহিনী 'মেজিনো-লাইন' (Majinot line) ভেদ করিয়া মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইল। মিত্রপক্ষীয় বাহিনী চরম পরাজয় বরণ করিয়া ডানকার্ক পরিত্যাগ করিল।

জার্মানী কর্তৃক লাক্সেমবুর্গ, বেলজিয়াম ও নেদারল্যাণ্ড দখল

ইহার পর শুরু হইল জার্মানীর ফ্রান্স অভিযান। সোম-এর যুদ্ধে (Battle of Somme) ফ্রান্সের সকল প্রতিরোধ ব্যর্থ হইল। ফ্রান্সের অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া ইটালী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন ফ্যাসিস্ট বাহিনী আলপাইন সীমান্ত অতিক্রম করিল। চারি দিন পর একদল নাৎসী বাহিনী বিনা বাধায় প্যারিস-এ প্রবেশ করিল। ফ্রান্সের সামরিক শক্তির সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিলে প্রধানমন্ত্রী রেনোঁ পদত্যাগ করেন। তাঁহার স্থলে হেনরী-ফিলিপ পেঁতা (Henry Philippe Petais) প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ২১শে জুন ফ্রান্স জার্মানীর সহিত যুদ্ধবিরতি-চুক্তি স্বাক্ষর করিল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে যে রেলওয়ে কামরায় জার্মানী মিত্রপক্ষের নিকট যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা করিয়াছিল, সেই রেলওয়ে কামরায় ফরাসী সরকার জার্মানীর সহিত যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। জার্মানী ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের অবমাননার প্রতিশোধ লইল। যুদ্ধবিরতি

ফ্রান্সের পতন

যুদ্ধবিরতির শর্তাদি

চুক্তির শর্তানুসারে (১) ফ্রান্স উহার অধিকাংশ রাজ্য জার্মানীর সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীনে ছাড়িয়া দিল; (২) ফরাসীবাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল; (৩) ফ্রান্সের সমগ্র সমরোপকরণ জার্মানীকে সমর্পণ করা হইল এবং (৪) শান্তির শর্তাদি স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্যন্ত ফরাসী যুদ্ধ-বন্দীগণকে আটক রাখা হইল। দুই দিন পর ফ্রান্স ইটালীর সহিতও পৃথকভাবে যুদ্ধবিরতি-চুক্তি স্বাক্ষর করিল।* ফ্রান্স দুই অংশে বিভক্ত হইল—'অধিকৃত' (Occupied) ও 'অনধিকৃত' (Un-occupied)। অনধিকৃত অঞ্চলে একটি নূতন ফরাসী সরকার গঠিত হইল। ইহা 'ভিচি সরকার' (Vichy Government) নামে পরিচিত। পেঁতা এই সরকারের সর্বাধিনায়ক হইলেন। পেঁতা সরকার জার্মানী ও ইটালীর সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু দ্য গল্ (Charles de Gaulle)-এর নেতৃত্বে স্বাধীনতাকামী ফরাসীগণ লণ্ডনে একটি 'স্বাধীন ফরাসী সরকার' (Free French Government) স্থাপন করিল।

ফ্রান্সের পতনের ফলাফল : ফ্রান্সের পতনের ফলে প্রথমতঃ, জার্মানী ও ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়ার দায়িত্ব ব্রিটিশ রাষ্ট্রসমবায় (British Commonwealth)-ভুক্ত রাষ্ট্রগুলিকে গ্রহণ করিতে হইল, দ্বিতীয়তঃ, জাপানের আক্রমণাত্মক নীতি অধিকতর উগ্র হইয়া উঠিল। জাপান, জার্মানী ও ইটালীর মধ্যে সম্পাদিত 'ত্রি-শক্তি-চুক্তি' (Tri-Partite Pact) অনুসারে প্রথমতঃ জাপানকে 'বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়ার' এবং জার্মানী ও ইটালীকে ইওরোপের নেতারূপে স্বীকার করা হইল ; দ্বিতীয়তঃ চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রবর্গ পরস্পরকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল ; তৃতীয়তঃ, ফ্রান্সের পতন, মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে ইটালীর যুদ্ধে যোগদান এবং ইওরোপে ব্রিটেনের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলির নিরাপত্তার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'নিরপেক্ষতা-চুক্তির' (Neutrality) শর্তাদি পরিবর্তন করিয়া ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে অধিক পরিমাণে সমরোপকরণ সরবরাহ করার নীতি গ্রহণ করিল। ফলে এক্সিস-শক্তিগুলির বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী হইয়া উঠিল ; চতুর্থতঃ, ফ্রান্সের পতনের পর হিটলার ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করার সুযোগ পাইলেন ; পঞ্চমতঃ, ফ্রান্সের পতনের পর একদিকে হিটলার ও মুসোলিনী ও অপরদিকে হিটলার ও জেনারেল ফ্রাঙ্কোর মধ্যে বিবাদের উৎপত্তি হইল এবং ফ্রাঙ্কো নিরপেক্ষ থাকিবার সংকল্প গ্রহণ করেন।

ব্রিটেনের যুদ্ধ : ফ্রান্সের পতনের পর পশ্চিম-ইওরোপে জার্মানীর বিরুদ্ধে ব্রিটেনকে একক হস্তে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে হইল। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর

---

* **ফ্রান্সের পতনের কারণ :** ফ্রান্সের পতনের কারণ হইল : (১) ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট চুক্তির অবসানের পর হইতে ইওরোপে ফ্রান্সের বিচ্ছিন্নতা, (২) ফরাসী বাহিনীর দুর্বলতা, (৩) ফরাসী সমরনায়কদের ভ্রান্ত নীতি, (৪) ফরাসী বাহিনীর নৈতিক অবনতি, (৫) ফ্রান্সের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার চরম অবনতি এবং (৬) জার্মান-বাহিনীর উন্নত ধরনের রণকৌশল ও সমরোপকরণ।

মাসে ব্রিটেন ও জার্মানীর মধ্যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্রিটেনের যুদ্ধ (Battle of Britain) সংঘটিত হইল। ব্রিটেন চরমভাবে জয়লাভ করিল এবং জার্মানীর অধিকাংশ বিমানবহর বিনষ্ট হইল। ইহার ফলে ব্রিটেন জার্মানীর ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইল।

বল্কান অঞ্চলে যুদ্ধ ঃ জার্মানীর উত্তরোত্তর সাফল্যের ফলে বল্কান রাষ্ট্রগুলি এক্সিস-শক্তিবর্গের প্রতি উহাদের নীতির পরিবর্তন করিল। হাঙ্গেরী ও রুমানিয়া জার্মানীর আশ্রিত রাষ্ট্রে পরিণত হইল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে বুলগেরিয়া এক্সিস-শক্তিগুলির সহিত যোগদান করিলেও নাৎসীবাহিনী বুলগেরিয়ায় প্রবেশাধিকার পাইল। যুগোশ্লাভিয়া এক্সিস-শক্তিগুলির সহিত চুক্তিবদ্ধ হইল। কিন্তু অনতিকাল মধ্যে তথায় এক্সিস-বিরোধী সরকার গঠিত হইল। অপরদিকে গ্রীসও জার্মানীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইল। এই অবস্থায় ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নাৎসীবাহিনী একযোগে যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস আক্রমণ করিল। ব্রিটেনের সমর্থনপুষ্ট হইয়া গ্রীস বিপুলবিক্রমে শত্রুকে বাধা দিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাৎসীবাহিনী যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস দখল করিল।

তুরস্কের পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন ও এক্সিসদলে যোগদান

যুদ্ধের গতি এক্সিস-শক্তিগুলির অনুকূলে যাইতে থাকিলে তুরস্ক উহার নীতির পরিবর্তন করিল। যুদ্ধের প্রথমদিকে তুরস্ক ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সহিত সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্সের পতনের পর এবং বল্কান অঞ্চলে জার্মানীর প্রতিপত্তি স্থাপিত হইলে তুরস্ক জার্মানীর সহিত অনাক্রমণ-চুক্তিতে আবদ্ধ হইল (জুন, ১৯১৪ খ্রীঃ)।

চুক্তি ভঙ্গ করিয়া জার্মানীর রাশিয়া আক্রমণ

পূর্ব-ইওরোপে যুদ্ধ ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল রাশিয়ার উপর জার্মানীর অতর্কিত আক্রমণ। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী ও রাশিয়ার অনাক্রমণ-চুক্তি (Non-Aggression Pact) স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই চুক্তির মূলে হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীর দুই সীমান্তে যুদ্ধ সংঘটিত হইতে না দেওয়া'। পোল্যাণ্ডকে রাশিয়ার সাহায্য হইতে বঞ্চিত করা এবং নিরুদ্বেগে পশ্চিম-ইওরোপে যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া। কিন্তু এই চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়াই জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করিল।

জার্মানীর উদ্দেশ্য

রাশিয়া আক্রমণ করার ব্যাপারে জার্মানীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীর সীমান্তে রাশিয়ার জার্মান-বিরোধী প্রচারকার্য বন্ধ করা, রাশিয়ার ধ্বংস সাধন করিয়া সমগ্র বিশ্বে সাম্যবাদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করা, রাশিয়ার ধ্বংস সাধন করিয়া ইওরোপ মহাদেশে জার্মানীর প্রভুত্ব সুনিশ্চিত করা এবং ইউক্রেনের খাদ্যশস্য ও বাকু-র পেট্রোলিয়াম হস্তগত করিয়া দীর্ঘ-কালব্যাপী যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন জার্মান-বাহিনীর ১৫০টি ডিভিসন রাশিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করিলে রুশ-জার্মান যুদ্ধ শুরু হইল।

ইটালী, রুমানিয়া, শ্লোভাকিয়া হাঙ্গেরী ও ফিনল্যান্ড জার্মানীর সহিত যোগদান করিল। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল যুদ্ধের এই পরিবর্তিত গতি লক্ষ্য করিয়া রাশিয়ার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলেন। ইহার শর্তানুসারে উভয় রাষ্ট্র জার্মানীর বিরুদ্ধে যুগ্মভাবে যুদ্ধ করিতে এবং পরস্পরের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোনরূপ শান্তি স্থাপন না করিতে সম্মত হইল। সেই বৎসর (১৯৪১ খ্রীঃ) ব্রিটেন ও রাশিয়া তুরস্কের প্রতি উহাদের মৈত্রীর কথা ঘোষণা করিল এবং উভয় রাষ্ট্র যুগ্মভাবে পারস্য দখল করিল।

উভয় পক্ষের রাষ্ট্রজোট
রুশ-ব্রিটিশ চুক্তি (১৯৪১)

সোভিয়েট ইউনিয়ন লণ্ডনে নির্বাসিত পোল-সরকারকে স্বীকার করিয়া লইল এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্বাক্ষরিত রুশ-জার্মান চুক্তি বাতিল করিল। সুদূর প্রাচ্যে রাশিয়া জাপানের সহিত নিরপেক্ষতার-চুক্তি (Neutrality Pact) স্বাক্ষর করিল। ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপনের তোড়জোড় করিতে লাগিল। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হইল এবং যুক্তরাষ্ট্র 'লেণ্ড-লীজ-এ্যাক্ট' (Lend-Lease Act)-এর বিধি অনুসারে রাশিয়াকে প্রচুর পরিমাণে সমরোপকরণ দিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

রাশিয়া কর্তৃক রুশ-জার্মান চুক্তি বাতিল ও জাপানের সহিত চুক্তি
রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি (১৯৪১)

রুশ অভিযানের প্রথম পাঁচ মাস পরাক্রান্ত জার্মানবাহিনী ক্রমাগত সাফল্য অর্জন করিয়া সমগ্র বিশ্বে এক দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। নাৎসীবাহিনী লেলিনগ্রাড অবরোধ করিল এবং মস্কোর নিরাপত্তা বিপজ্জনক করিয়া তুলিল। প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিয়াও রাশিয়ার 'লাল-ফৌজ' বিপুল বিক্রমে শত্রুকে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। পোড়ামাটি নীতি' (Scorched earth Policy) অনুসরণ করিয়া রুশবাহিনী শত্রুর ব্যবহারে আসিতে পারে এমন সব কিছুই পোড়াইয়া দিয়া পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিল।

জার্মানীর ক্রমাগত সাফল্য

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। রুশবাহিনী পাল্টা আক্রমণ শুরু করিলে জার্মানবাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইল। তথাপি প্রবল পরাক্রান্ত জার্মানবাহিনী রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল দখল করিল। স্টালিনগ্রাডের নিকট উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে রাশিয়া জয়লাভ করিল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী জার্মান সেনাপতি ভন্-পলুস (Von Paullus) আত্মসমর্পণ করিলেন। ইহার পর জার্মানবাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিল। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের মধ্যে রুশবাহিনী যুদ্ধ-পূর্বকালীন পোল্-সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিল। রুশজনগণের অভূতপূর্ব স্বদেশপ্রীতি ও আত্মনির্ভরশীলতা উহাদের জয়লাভের প্রধান কারণ। রাশিয়ার লাল-ফৌজের কৃতিত্বে সমগ্র বিশ্ব চমৎকৃত হইল।

স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধ জার্মানীর শোচনীয় পরাজয়
জার্মানবাহিনীর রাশিয়া পরিত্যাগ (১৯৪৪)

আফ্রিকা ও নিকট প্রাচ্যে যুদ্ধ ঃ জার্মানী যখন ইওরোপে স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে ব্যস্ত, সেই সময় ইটালী ভূমধ্যসাগর ও আফ্রিকায় যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছিল লাইবিরা আক্রমণ করিয়া ফ্যাসিস্টবাহিনী ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে মিশর আক্রমণ করিল এবং মিশরের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া প্রায় ৬০ মাইল অন্তর্দেশে প্রবেশ করিল। দুই মাস পর ব্রিটিশবাহিনী পাল্টা আক্রমণ করিয়া সমগ্র মিশরীয় উপকূল পুনরুদ্ধার করিল এবং লাইবিয়ার পূর্ব অঞ্চল দখল করিল। কিন্তু জার্মানবাহিনীর সহযোগিতায় ইটালীয়বাহিনী ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের মধ্যে সমগ্র লাইবিয়া পুনরায় দখল করিল। কিন্তু ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে মার্কিনবাহিনীর সহযোগিতায় ব্রিটিশবাহিনী এক্সিস-শক্তিগুলির বিরুদ্ধে নূতন করিয়া অভিযান শুরু করিল। ইরিত্রিয়া, ইটালীয় সোমালিল্যান্ড ও আবিসিনিয়া ব্রিটিশবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইল ইটালী উহার পূর্ব-আফ্রিকার সাম্রাজ্য হারাইল (১৯৪১ খ্রীঃ)। ইহার পর ইংরাজ-বাহিনী সিরিয়া দখল করিল এবং যুদ্ধ-অবসানে উহার স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল।

ইটালীর যুদ্ধাভিযান
লাইবিয়ার যুদ্ধ

মার্কিন সহযোগিতা ও ইটালীর ক্রমাগত পরাজয়:
ইটালী পূর্ব-আফ্রিকার সাম্রাজ্য হারাইল:
নিকট-প্রাচ্যে ইংরাজ-বাহিনীর অগ্রগতি

২১.৪. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঃ ইওরোপে যুদ্ধ শুরু হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। যদিও আমেরিকাবাসী ইওরোপের যুদ্ধে কোনরূপ অংশগ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিল না তথাপি আমেরিকার জনমত বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। সুতরাং যুদ্ধ চলিবার কিছুদিন পরে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস আমেরিকা হইতে যুদ্ধাস্ত্র রপ্তানি করার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া নগদ মূল্যে ("cash and carry") যুদ্ধাস্ত্র বিক্রয় করার নীতি গ্রহণ করিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইহাতে উপকৃত হইল।

নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন

ইওরোপের যুদ্ধ ব্যাপক রূপ ধারণ করিলে আমেরিকার পক্ষে নিরপেক্ষতার নীতি বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিল। নাৎসীবাহিনী একের পর এক দেশ দখল করিয়া চলিলে আমেরিকাবাসী ব্রিটেনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। ফলে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে মার্কিন-কংগ্রেস লেণ্ড-লীজ-এ্যাক্ট (Lend-Lease-Act) পাশ করিয়া মার্কিন সরকারকে এক্সিস-শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলিকে যুদ্ধাস্ত্র দিয়া সাহায্য করার ক্ষমতা প্রদান করিল। এই আইনের ফলে আমেরিকা 'গণতন্ত্রের সামরিক কারখানায়' পরিণত হইল। ইহার কিছুদিন পরেই মার্কিনবাহিনী গ্রীনল্যান্ড, আইসল্যান্ড ও ডাচ্‌-গিয়ানা দখল করিল। মার্কিন বাণিজ্য পোতগুলি জার্মানী সাবমেরিন কর্তৃক অবিরত আক্রান্ত হইতে থাকিলে এক্সিস-রাষ্ট্রগুলির সাবমেরিন ও জাহাজগুলিকে "দেখিবামাত্র গুলিবর্ষণ" ("Shoot on sight") করার আদেশ মার্কিন

নীতির পরিবর্তন

নৌ-বাহিনীকে দেওয়া হইল। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উহার বিপুল সমরোপকরণ লইয়া হিটলারের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তিকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল।

'আতলান্তিক চার্টার' 'Eight-point-Programme'

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে উত্তর আতলান্তিকের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বৈঠকে রুজভেল্ট ও চার্চিল মিলিত হইলেন। এই বৈঠকে উভয় নেতা উভয় রাষ্ট্রের যুদ্ধ ও শান্তি-নীতি হিসাবে আটটি শর্তসম্বলিত (Eight-point Programme) একটি পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করিলেন। শর্তগুলি ছিল এইরূপ ঃ

(১) ব্রিটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পররাজ্য দখল করিবে না ;

(২) প্রত্যেক রাষ্ট্রের জনসাধারণের মতামত গ্রহণ না করিয়া কোনরূপ রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন করা হইবে না ;

(৩) প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের মতানুযায়ী সরকার গঠন করা হইবে ;

(৪) অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে বিজিত বা বিজয়ী সকল রাষ্ট্রের সমান বাণিজ্যাধিকার স্বীকার করা হইবে ;

(৫) সকল জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা স্বীকার করা হইবে ;

(৬) "নাৎসী বর্বরতার অবসানের পর" বিশ্বে সাধারণ শান্তি পুনঃস্থাপন করিতে হইবে ;

(৭) সমুদ্রের উপর সকল জাতির সমান অধিকার স্বীকার করা হইবে এবং,

(৮) আক্রমণকারী রাষ্ট্রগুলিতে নিরস্ত্রীকরণ (de-militarisation) নীতির প্রয়োগ করা হইবে।

জাপান ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্কের অবনতি

সুদূর-প্রাচ্যে যুদ্ধ ঃ ইতিমধ্যে জাপান ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটিতে থাকে। পূর্বেই বলা হইয়াছে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত জাপ-মার্কিন বাণিজ্য-চুক্তির অবসান ঘোষণা করিয়াছিল। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী, ইটালী ও জাপানের মধ্যে ত্রি-শক্তি চুক্তি (Tripartite Pact) সম্পাদিত হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠে। 'ত্রি-শক্তি-চুক্তি' সম্পর্কে রুজভেল্ট মন্তব্য করেন যে, "ইহার পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনও এইরূপ বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় নাই।" এই চুক্তির কথা

আমেরিকায় জার্মানী, জাপান ও ইটালীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির প্রতিক্রিয়া

প্রকাশিত হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানে লৌহ ও ইস্পাত রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেয়। টোজো (Tojo) জাপানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের সহিত একটি চুক্তির প্রস্তাব করেন। মার্কিন সরকার ইহার প্রত্যুত্তরে প্রস্তাব করেন যে (১) সুদূর-প্রাচ্যের সহিত স্বার্থসংশিষ্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অনাক্রমণ-চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে এবং (২) চীন ও ইন্দোচীন হইতে জাপবাহিনী অপসারণ করিতে

হইবে। জাপান এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে। ইওরোপের শক্তিগুলি ইওরোপের যুদ্ধে বিব্রত থাকিলে সেই সুযোগে জাপান সুদূর-প্রাচ্যে উহার সাম্রাজ্যবাদী অভিযান চালাইয়া যাইতেছিল। জাপান পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ বিপন্ন হইয়া উঠে। এই অবস্থায় মার্কিন সরকার জাপানের সহিত বোঝাপড়া করার জন্য ওয়াশিংটনের এক বৈঠকে জাপানকে আমন্ত্রণ জানান। ওয়াশিংটনে জাপান ও আমেরিকার প্রতিনিধিদের মধ্যে শান্তির আলোচনা চলিতে থাকাকালীন অকস্মাৎ হাওয়াই দ্বীপে আমেরিকার নৌ-ঘাঁটি পার্ল বন্দরের (Pearl Harbour) উপর জাপানের প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ শুরু হইল। ইহার পরেই জাপান ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিল। মার্কিন সরকারও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। এইভাবে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হইলে ইওরোপে যে যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহাতে যোগদান করিলে তাহা বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত হইল। পূর্ব হইতেই জাপান দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল দখল করার প্রস্তুতি শুরু করিয়াছিল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জাপান সুমাত্রার তৈলখনি ও সিঙ্গাপুর দখল করিল। ইহার পর জাপান দ্রুতগতিতে জাভা, ব্রহ্মদেশ, নিউ-গিয়ানা ও আন্দামান দখল করিল। জাপান চীন, থাইল্যাণ্ড ও ফরাসী ইন্দোচীনে বিমানঘাঁটি স্থাপন করিয়া অস্ট্রেলিয়ার নিরাপত্তা বিপন্ন করিয়া তুলিল। সর্বত্র মিত্রপক্ষ জাপানের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে লাগিল। যাহা হউক, তখনও পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার দুইটি নৌ-ঘাঁটি অক্ষুণ্ণ ছিল— একটি হইল হাওয়াই (Howaii) ও অপরটি হইল মিড্ওয়ে (Midway)।

জাপানের নিকট আমেরিকার প্রস্তাব

জাপান কর্তৃক দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল দখল

ভূমধ্যসাগরের যুদ্ধ ঃ ভূমধ্যসাগরে ব্রিটেনের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে জার্মানবাহিনীর একটি দল বল্কানের ভিতর দিয়া এবং অপর একটি দল উত্তর আফ্রিকার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। জার্মানবাহিনী বল্কান ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ক্রীটদ্বীপ দখল করিল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান সেনাপতি রোমেল (Rommel)-এর অধিনায়কত্বে জার্মানী ও ইটালীর একটি যুগ্মবাহিনী উত্তর-আফ্রিকায় ইংরাজ-বাহিনীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইল। মিত্রপক্ষ ও এক্সিস-শক্তিবর্গের সেনাপতি-গণের মধ্যে রোমেল-এর নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরাজবাহিনীকে আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করেন। এইরূপ সংকটের সময় জেনারেল মন্টোগমেরীকে (Montgomery) ইংরাজবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করা হইল। এল-এলামেইন (El-Alamein)-এর রণাঙ্গনে মন্টোগমেরী ও রোমেলের মধ্যে এক তুমুল

জার্মানী কর্তৃক বল্কান ও ক্রীট দখল

এল-এলামেইন যুদ্ধ (১৯৪২)

্ধ হইল (নভেম্বর ১৯৪২ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে ইংরাজপক্ষের জয়লাভ হইল। টালিনগ্রাড ও এল্-এলামেইনের যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগান্তকারী ঘটনা।

রকো ও আলজিয়ার্সে ত্রপক্ষের প্রবেশ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অতঃপর ভূমধ্যসাগরের রণাঙ্গনে প্রবেশ করিল। মার্কিন সেনাপতি আইসেনহাওয়ার (Eishenhower) পশ্চিম-ইওরোপে মিত্রপক্ষবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। মিত্রপক্ষবাহিনী মরক্কো ও আলজিয়ার্স-এ বেশ করিল।

ত্তর-আফ্রিকায় জার্মান-হিনীর আত্মসমর্পণ

ইতিমধ্যে মিত্রপক্ষবাহিনী সমগ্র উত্তর-আফ্রিকা দখল করিয়া টিউনিস সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হইল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে টিউনিস-এ প্রায় ৭৫ হাজার জার্মান সৈন্য মিত্রপক্ষের নিকট াত্মসমর্পণ করিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইহা হইল অপর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ত্রবাহিনী কর্তৃক ইটালী াক্রমণ এবং মুসোলিনীর তন (১৯৪৩)

ঃ স্টালিনগ্রাড ও টিউনিস-এর যুদ্ধে এক্সিস-শক্তিবর্গের বিপর্যয় টিলে মুসোলিনী ইটালীর নিরাপত্তার জন্য হিটলারকে রাশিয়ার সহিত সন্ধি স্থাপনের রামর্শ দিলেন। কিন্তু হিটলার ইহাতে অসম্মত হইলেন। এই সময় ইটালীর অভ্যন্তরীণ পরিস্থিত জটিল হইয়া উঠিতেছিল এবং ইটালীর ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে জনমত ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। ইতিমধ্যে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই জুলাই ইংরাজ ও মার্কিন বাহিনী সিসিলি আক্রমণ করিল এবং াহা মিত্রপক্ষের হস্তগত হইল। এই যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ফল হইল মুসোলিনীর পতন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই ইটালীর সম্রাট তৃতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল মুসোলিনীকে দচ্যুত করিয়া বাদোগলিওকে (Badoglio) একটি অ-ফ্যাসিস্ট সরকার গঠনের ক্ষমতা প্রদান করেন। ৯ই সেপ্টেম্বর ইটালী বিনাশর্তে মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিল।

সোলিনীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা

মুসোলিনীর পতন হিটলারকে রুণভাবে আঘাত করিল। তিনি মুসোলিনীকে মুক্ত করিয়া পুনরায় ইটালীতে ফ্যাসিস্ট সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন (১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ খ্রীঃ)।

টালীর উপর ইংরাজ ও ার্কিন বাহিনীর আক্রমণ

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন সেনাপতি ক্লার্ক (Clark)-এর রিচালনাধীনে মার্কিনবাহিনী ইটালীর পশ্চিমাঞ্চলে প্রবেশ করিল। অপর দিকে একদল ইংরাজ সৈন্য আদ্রিয়াটিক উপকূল হইতে ইটালী আক্রমণ করিল। জার্মানবাহিনী বিপুল বিক্রমে বাধা প্রদান করিল। সালার্নো, নেপলস্ ও মন্টি-কাসিনোতে উভয়পক্ষে প্রচন্ড দ্ধ হইল। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন রোম মিত্রপক্ষের হস্তগত হইল। উত্তর-টালী জার্মানীর দখলেই রহিল।

ফ্রান্সের যুদ্ধঃ ইটালীর পতনের পর মিত্রপক্ষ জার্মানী আক্রমণ করার তোড়জোড় শুরু করিল। একমাত্র ফ্রান্সের ভিতর দিয়া জার্মানী আক্রমণ করা সহজ

ছিল। আক্রমণের প্রস্তুতি হিসাবে জার্মানীর উপর ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিমান হানা শুরু হইল। আত্মরক্ষার জন্য জার্মানী সমগ্র উপকূলে সুদৃঢ় দুর্গাদি নির্মাণ করিল। ইতিমধ্যে মার্কিন সেনাপতি প্যাটন ('Patton) জার্মানীর ব্যূহ ভেদ করিয়া প্যারিস অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। ফ্রান্সের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে মিত্রপক্ষের আক্রমণ শুরু হইলে জার্মানবাহিনী জার্মানীর সীমান্তের দিকে পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিল। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে আগস্ট মিত্রপক্ষবাহিনী প্যারিসে প্রবেশ করিলে সমগ্র বিশ্ব চমৎকৃত হইল।

মিত্রপক্ষের জার্মানী আক্রমণের প্রস্তুতি

জার্মানীর যুদ্ধ ঃ মিত্রপক্ষ ফ্রান্সের পুনরুদ্ধারসাধন করিয়া তিন দিক হইতে জার্মানী আক্রমণ করিল। পূর্ব দিক হইতে রুশ-বাহিনী এবং ইটালী ও ফ্রান্সের দিক হইতে মিত্রপক্ষবাহিনী। জার্মানীর পতন আসন্ন হইল এবং জার্মানী উহার মিত্রবর্গ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইতে লাগিল। রুমানিয়া, ফিনল্যান্ড ও বুলগেরিয়া রাশিয়ার সহিত শান্তি স্থাপন করিল। জার্মানীর প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের মধ্যে রাশিয়া ওয়ারস (Warsaw), বুদাপেস্ট ও ভিয়েনা দখল করিল। ইতিমধ্যে মিত্রপক্ষবাহিনী বেলজিয়াম ও হল্যান্ডকে মুক্ত করিয়া জার্মানীতে প্রবেশ করিল। সাময়িক ভাবে জার্মানবাহিনী মার্কিনবাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রুশ ও মার্কিন বাহিনী বার্লিনের সীমান্তে মিলিত হইল। জার্মানী দুইটি অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িল। ২রা মে রুশবাহিনী বার্লিন শহরে প্রবেশ করিল। চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইল জার্মানীর সমগ্র প্রতিরোধ-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িল। সর্বত্র জার্মানবাহিনীর চরম পরাজয় ঘটিতে লাগিল। নাৎসী নেতাগণ একে একে আত্মহত্যা করিতে লাগিলেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে হিটলারের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইল। গোয়েবলস্ (Goebbels) ও হিমলার (Himmler) আত্মহত্যা করিলেন। গোয়েরিং (Goering), রিবেনট্রপ (Ribbentrop), ফন্-প্যাপেন (Von-papen) ও স্ট্রেচার (Streicher) বন্দী হইলেন। মুসোলিনী মিলান শহরে এক ফ্যাসিস্ট-বিরোধী জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন। জার্মানী মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিল।

তিন দিক হইতে জার্মানী আক্রমণ

রুমানিয়া, ফিনল্যাণ্ড ও বুলগেরিয়ার আত্মসমর্পণ

রুশ ও মার্কিন বাহিনী বার্লিনে প্রবেশ (১৯৪৫)

নাৎসী নেতাদের আত্মহত্যা

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে জার্মান প্রতিনিধিগণ মিত্রপক্ষের নিকট বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করার চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। ৮ই মে ইওরোপে মিত্রপক্ষের জয়লাভের সংবাদ প্রচারিত হইল। এক্সিস-শক্তিবর্গের মধ্যে একমাত্র জাপান যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিল।

বিনা শর্তে জার্মানীর আত্মসমর্পণ (১৯৪৫)

প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধ : ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে জাপান উহার শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ইহার পর আমেরিকাও প্রশান্ত মহাসাগরে উহার বিরাট শক্তি পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত সর্বশক্তি নিয়োগ করিল।

মার্কিনবাহিনী কর্তৃক গুয়াদাল খাল দখল (১৯৪২)

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন মিড্‌ওয়ের নৌ-যুদ্ধে আমেরিকা জয়লাভ করিলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হইল। মার্কিন নৌ-সেনাপতি ফ্লেচার (Fletcher) জাপবাহিনীকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করিলেন। জাপানের এই পরাজয়ের ফলে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ নিরাপদ হইল। অস্ট্রেলিয়ার নিরাপত্তার জন্য সলোমন দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত গুয়াদাল খালটি দখল করার প্রয়োজন দেখা দিল। ছয়মাস যুদ্ধ চলিবার পর মার্কিনবাহিনী গুয়াদাল খালটি দখল করিল। ইহার ফলে অস্ট্রেলিয়া নিরাপদ হইল।

ফিলিপাইনের যুদ্ধ

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ম্যাক-আর্থার ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে জার্মানদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করিলেন। পাঁচ মাসের মধ্যে সমগ্র ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ মার্কিনবাহিনী কর্তৃক পুনরধিকৃত হইল। ইহার পর শুরু হইল জাপানী শহরগুলির উপর প্রচন্ড বিমান আক্রমণ। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ও ৯ই আগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি দুইটি শহরে এ্যাটম-বোমা নিক্ষেপ করা হইল।

এ্যাটম্-বোম ও জাপানের আত্মসমর্পণ

যুদ্ধে এ্যাটম-বোমার ইহাই হইল সর্বপ্রথম ব্যবহার। ৮ই আগস্ট রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিল। এই অবস্থায় জাপান বিনাশর্তে মার্কিনবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিল। জাপানের শাসনভার ম্যাক-আর্থারের হস্তে ন্যস্ত করা হইল। জাপানের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটিল।

২১.৫. জার্মানীর পতনের কারণ : (Causes of the fall of Germany) : বিবিধ কারণে জার্মানীর পতন ঘটিয়াছিল ;—প্রথমতঃ, জার্মান সেনাপতিগণের ষড়যন্ত্র এবং সৈন্যবাহিনীর তীব্র অসন্তোষ জার্মানীর পরাজয়ের অন্যতম কারণ। হিটলারের

হিটলারের প্রতি জার্মান সেনাপতি ও জার্মানবাসীর বিরুদ্ধ মনোভাব

একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে জার্মানবাসীগণের মধ্যে এক তীব্র অসন্তোষ দানা বাধিয়া উঠিতেছিল এবং একাধিকবার হিটলারকে হত্যা করার চেষ্টাও চলিয়াছিল। এক সময় বার্লিনে নাৎসী সরকারকে বলপূর্বক উৎখাত করার চেষ্টাও হইয়াছিল। হিটলারের অত্যাচারের ফলে রোমেল-এর মত সেনাপতিও আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গোয়েরিং ও হিমলারও হিটলারের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। সুতরাং হিটলারের বিরুদ্ধে জার্মানীর উচ্চপদস্থ সেনাপতিগণের অসন্তোষ ও নাৎসী সরকারের উচ্ছেদকল্পে উহাদের প্রচেষ্টা প্রভৃতি কারণে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে ক্রমাগত ব্যাঘাতের সৃষ্টি হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ, দীর্ঘকালব্যাপী বিশ্বের প্রধান শক্তিগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার মত উপযোগী সমরোপকরণ, জনবল বা খনিজ সম্পদ জার্মানীর ছিল না। প্রথমদিকে জার্মানীর সাফল্যের কারণ হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সামরিক অপ্রস্তুতি। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নে সমরোপকরণ প্রভৃত পরিমাণে প্রস্তুত হইতে থাকিলে জার্মানীর পক্ষে উহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ চালাইবার মত শক্তির অভাব

তৃতীয়তঃ, জার্মানীর ভ্রান্ত রণ-কৌশল উহার পরাজয়ের অপর কারণ। ইহার জন্য হিটলারই সর্বাধিক দায়ী ছিলেন। তিনি যুদ্ধরত সেনাপতিদের পরামর্শ সর্বদাই উপেক্ষা করিতেন। জার্মান সেনাপতিগণের প্রতি হিটলারের সন্দেহ ও অবিশ্বাস উহাদের কর্মদক্ষতা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হিটলার জার্মানবাহিনীর অধিনায়কত্বের ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের পতনের পর জার্মান সেনাপতিদের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করার পরিবর্তে যদি তাঁহার সমগ্র শক্তি ব্রিটেনের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিতেন তাহা হইলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি অন্যরূপ হইত। এতদ্ভিন্ন নৌ-শক্তি সম্পর্কে হিটলারের কোনরূপ সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না এবং ইহা জার্মানীর পতনের অপর প্রধান কারণ।

জার্মানীর ভ্রান্ত রণ-কৌশল

চতুর্থতঃ, এক্সিস-শক্তিবর্গের মধ্যে সুদৃঢ় আদর্শগত বন্ধন না থাকায় উহাদের পক্ষে সম্মিলিতভাবে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হয় নাই। যতদিন পর্যন্ত জার্মানী জয়লাভ করিয়া যাইতেছিল ততদিন অপরাপর এক্সিস-শক্তিগুলি জার্মানীর সহিত সহযোগিতা করিয়া যাইতেছিল। কিন্তু জার্মানীর পরাজয় শুরু হইলে জার্মানী উহার মিত্রবর্গ কর্তৃক ক্রমে ক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ফ্রান্সের ভি-চি সরকার জার্মানীর দুর্দিনে জার্মানীর প্রতি প্রতারণা করিয়াছিলেন; ফিনল্যাণ্ড রাশিয়া ও গ্রেটব্রিটেনের সহিত যুদ্ধবিরতির চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল এবং রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরীও মিত্রপক্ষের সহিত যুদ্ধবিরতির চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল। উপরন্তু হিটলারের অন্যতম মিত্র ফ্যাসিস্ট ইটালীও জার্মানীকে সাহায্য করার পরিবর্তে উহার স্কন্ধে বোঝাস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনী যুদ্ধের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না এবং মুসোলিনী বারংবার তাঁহার অপ্রস্তুতির কথা হিটলারকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। যুদ্ধ শুরু হইবার তিন বৎসরের মধ্যে তাসের ঘরের ন্যায় ফ্যাসিস্ট ইটালীর রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং জার্মানীকে ইটালী দখল করিতে হইয়াছিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনী নিহত হইলে হিটলারের মানসিক বল একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। জার্মানীর অপর মিত্র জেনারেল ফ্রাঙ্কো নাৎসী জার্মানীর যুদ্ধের আদর্শ কখনই সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন নাই এবং জার্মানীর সহিত সকল সময় সহযোগিতাও করেন নাই। সুতরাং

এক্সিস-শক্তিবর্গের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য ও সহযোগিতার অভাব

এক্সিস-শক্তিবর্গের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য ও উহাদের মধ্যে সহযোগিতার অভাব জার্মানীর পতনের অন্যতম কারণ।

২১.৬. **যুদ্ধকালীন সম্মেলন** (War-time Conferences) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলিতে থাকাকালীন মিত্রপক্ষভুক্ত শক্তিবর্গের মধ্যে একাধিক সম্মেলন ও বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল (১) পরস্পরের মধ্যে সংহতি স্থাপন করা, (২) পরস্পরের সহিত যুদ্ধ-নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা ও ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করা এবং (৩) যুদ্ধ-অবসানে বিশ্বের রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

সম্মেলনের উদ্দেশ্য

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুন সোভিয়েট ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত লেন্ড-লীজ চুক্তি (Lend-Lease-Agreement) স্বাক্ষর করে এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে ইওরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট (Second Front) গঠন করার ব্যাপারে মিত্রপক্ষের যুক্তি সমর্থন করে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন চার্চিল, রুজভেল্ট ও মলটভ উত্তর-আফ্রিকার যুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রুজভেল্ট, চার্চিল ও জেনারেল দ্য গল কাসাব্লাংকায় (Casablanca) এক বৈঠকে মিলিত হইয়া "শত্রুপক্ষের বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ" করার নীতি গ্রহণ করেন। সেই বৎসরের অক্টোবর মাসে হাল, ইডেন, স্টালিন ও মলটভ মস্কো বৈঠকে মিলিত হইয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-পরিচালনা, মিত্রপক্ষের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতা, ইটালী ও অস্ট্রিয়ার সমস্যা ও বিশ্বের সাধারণ নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করেন। আলোচনার ফলে মিত্রপক্ষের মধ্যে সহযোগিতা সুদৃঢ় করার জন্য একটি 'ইওরোপীয় পরামর্শক কমিশন' (Europeon Advisory Commission) এবং ইটালী সম্পর্কে একটি 'পরামর্শক কাউন্সিল' (Advisory Council) নামে দুইটি সংস্থা গঠিত হয়। সেই বৎসরের নভেম্বর মাসে রুজভেল্ট ও চার্চিল স্টালিনের সহিত তেহ্‌রান-বৈঠকে মিলিত হইয়া একটি গোপন সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ইহার দ্বারা ইরানের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়। সেই বৎসর ডিসেম্বর মাসে রুজভেল্ট ও চার্চিল তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ইস্মেত-ইনোনু-র (Ismet Inonu) সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইয়া তুরস্ক ও মিত্রপক্ষের মধ্যে মৈত্রীবন্ধনের কথা পুনরায় ঘোষণা করেন।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি (১৯৪২)

কাসাব্লাংকার বৈঠক (১৯৪২)

মস্কো বৈঠক (১৯৪৩)

তেহরান্ বৈঠক (১৯৪৩)

তুরস্কের সহিত বৈঠক (১৯৪৩)

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটনের সন্নিকটে ডাম্বারটন ওক্স-এ (Dumbarton Oaks) এক বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও চীনের প্রতিনিধিগণ মিলিত হন। বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠান (International World Organisation) গঠন করা। রাশিয়া ও চীন একত্রে এই বৈঠকে যোগদান করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে প্রথমদিকে

ডাম্বারটন বৈঠক (১৯৪৪)

যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও রাশিয়ার প্রতিনিধিগণ আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর রুশ-প্রতিনিধিগণ বৈঠক পরিত্যাগ করিলে চীনা-প্রতিনিধিগণ উহাতে যোগদান করেন। ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯৪৪ খ্রীঃ) রুজভেল্ট ও চার্চিল কুইবেক-এ এক বৈঠকে মিলিত হইয়া জার্মানীর অধিকৃত অঞ্চল সম্পর্কে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ৯ই অক্টোবর চার্চিল, ইডেন, স্টালিন ও মলটভ মস্কোতে এক বৈঠকে মিলিত হইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ায় রাশিয়ার আধিপত্য এবং গ্রীসে ব্রিটেনের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

কুইবেক বৈঠক (১৯৪৪)

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্টালিন ইয়াল্টা (ক্রিমিয়া) বৈঠকে মিলিত হইয়া জার্মানীর অধিকৃত অঞ্চল, ইওরোপের পুনর্গঠন ও জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে চুক্তিবদ্ধ হন। এই বৈঠকে রুজভেল্টের পরামর্শক্রমে স্টালিন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ইহার বিনিময়ে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র পোর্ট আর্থার, সাখালিন ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ রাশিয়াকে প্রদান করিতে সম্মত হয়। ইহা ছাড়া ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র বহির্মঙ্গোলিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লয়। দ্বিতীয়তঃ, বৈঠকের নেতৃবর্গ জার্মানীকে খণ্ডিত করিয়া উহাকে নাৎসী প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে এবং জার্মানীর নিকট হইতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে সম্মত হন। তৃতীয়তঃ, যুদ্ধাপরাধীগণের উপযুক্ত বিচার সম্পর্কেও বৈঠকের নেতৃবর্গ একমত হন। চতুর্থতঃ, জার্মানীর অধিকার হইতে মুক্ত ইওরোপের রাষ্ট্রগুলিকে যথোপযুক্ত সাহায্য করিতে এবং তথায় গণতন্ত্রসম্মত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করার ব্যাপারেও বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পঞ্চমতঃ, পোল্যাণ্ড ও যুগোশ্লাভিয়ায় সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সরকার গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ষষ্ঠতঃ, এই বৈঠকেই এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এইরূপ স্থির হয় যে জার্মানীর বিরুদ্ধে যে সকল রাষ্ট্র যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিল উহাদের প্রতিনিধিগণকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হইবে এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিরাপত্তা-পরিষদ (Security Council)-এর প্রতিটি সদস্য-রাষ্ট্রের ভিটো-ক্ষমতা থাকিবে।

ইয়াল্টা-সম্মেলন (১৯৪৫)

ইয়াল্টা-সম্মেলনের সিদ্ধান্ত

যুদ্ধকালীন সম্মেলনগুলির মধ্যে ইয়াল্টা-সম্মেলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সম্মেলনে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহা যুদ্ধের পরবর্তী কালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। জার্মানীর অবশিষ্টাংশ ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা হইল। চারিটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটি কাউন্সিল গঠন করা হইল। জার্মানী সম্পর্কে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার এই কাউন্সিলকে দেওয়া হইল। বার্লিন শহরটিও উপরি-উক্ত চারিটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত করা হইল।

২১.৭. শান্তির আলোচনা (Peace Negotiations) ঃ

ভূমিকা ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তি সম্পর্কিত আলোচনা সম্পন্ন করিতে দীর্ঘকাল সময় লাগিয়াছিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে জার্মানীর সহিত যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, কিন্তু প্যারিসে শান্তি-সম্মেলন আহ্বান করিতে প্রায় পনেরো মাস সময় লাগিয়াছিল (জুলাই ১৯৪৬ খ্রীঃ)। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দুইটি বৃহৎ শত্রুরাষ্ট্র জার্মানী ও জাপান সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে শান্তির শর্তাদি রচনা করিতে প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন সমর্থ হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ ছিল মিত্র-রাষ্ট্রবর্গের পারস্পরিক আদর্শগত সংঘাত। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় ও আদর্শগত সংঘাতের ফলে মিত্র-রাষ্ট্রবর্গ দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া যায়। একদিকে বিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স এবং অপর দিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন। এই দুইটি রাষ্ট্রজোটের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘাতের ফলে "ঠান্ডা-লড়াই" ('Cold War')-এর উৎপত্তি হয়। যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বে পুনরায় দুইটি পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্রজোটের উদ্ভব হয়, তথাপি যুদ্ধ-অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-শান্তি অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের (U. N. O.) প্রতিষ্ঠা হয়।

পোটস্‌ডাম বৈঠক ও উহার সিদ্ধান্ত

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর পতনের পর পোটস্‌ডাম (বার্লিনের নিকট) বৈঠকের (Potsdam Conference) অধিবেশন শুরু হয়। ইহাতে টুম্যান, এটলি, স্টালিন যোগদান করেন। জার্মানী ও ইওরোপের পুনর্গঠন সম্পর্কে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহা যথাক্রমে দেওয়া হইল।

(১) পাঁচটি রাষ্ট্রের (ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন) পররাষ্ট্র-মন্ত্রীদের লইয়া কাউন্সিল গঠিত হইবে। এই কাউন্সিল ইটালী, রুমানিয়া, বুল-গেরিয়া, হাঙ্গেরী, ফিনল্যান্ড ও জার্মানীর সহিত শান্তি-চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করিবে।

(২) যুদ্ধাপরাধীগণের বিচার ও সমুচিত দন্ডের বিধান করিতে হইবে।

(৩) অস্ট্রিয়ার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইবে না।

(৪) পোল্যান্ডে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সরকার গঠন করা হইবে।

(৫) তেহ্‌রান হইতে মিত্রপক্ষ বাহিনী প্রত্যাহার করা হইবে।

(৬) জার্মানীর সমরবাদ ও নাৎসীবাদ সমূলে বিনষ্ট করিতে হইবে যাহাতে জার্মানী ভবিষ্যতে বিশ্বের শান্তি ব্যাহত করিতে না পারে।

(৭) জার্মানীকে সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্র করিতে হইবে এবং সকল সামরিক শিক্ষা-কেন্দ্রগুলি ও নাৎসী-প্রতিষ্ঠানগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।

(৮) জার্মানীর যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুতকারক কারখানাগুলি মিত্রপক্ষের অধিকারে স্থাপন করিতে হইবে ; নাৎসীদল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে এবং নাৎসী কর্মচারীগণকে কর্মচ্যুত করিতে হইবে।

(৯) আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে জার্মানীর যুদ্ধাপরাধীগণের বিচারের ও দণ্ডের বিধান করিতে হইবে।

(১০) গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর জার্মানীর রাষ্ট্রীয় জীবন পুনর্গঠন করা হইবে; জার্মানীর শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে মিত্রপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হইবে; জার্মানীর শাসন-ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রিক করিয়া স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে।

(১১) জার্মানীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মিত্রপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিতে হইবে; উহার নিকট হইতে সমুচিত যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে হইবে এবং উহা আদায় করার ভার মিত্রপক্ষের এক কমিশনের হস্তে ন্যস্ত করা হইবে।

(১২) জার্মানীর নৌ-বহরগুলি রাশিয়া, ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে বণ্টন করা হইবে; উহার অধিকাংশ সাবমেরিনগুলি বিনষ্ট করা হইবে।

(১৩) যেহেতু জার্মানীর আক্রমণের ফলে রাশিয়া সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, সেইহেতু জার্মানীর নিকট হইতে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের অর্ধাংশ রাশিয়াকে প্রদান করা হইবে।

(১৪) পূর্ব-প্রাশিয়াকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া উহা রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডকে প্রদান করার ব্যবস্থা করা হইবে। পূর্ব-প্রাশিয়ার পশ্চিমাঞ্চল পোল্যান্ডকে প্রদান করা হইবে।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম সাত মাস ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও তাঁহাদের সহকারীগণের মধ্যে ভবিষ্যৎ শান্তি-সম্মেলনে শান্তি-চুক্তির খসড়াগুলির প্রস্তুতির জন্য আলাপ-আলোচনা চলিতে থাকে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ন্যায় ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শান্তি-আলোচনায় 'বৃহৎ চারিজন' ('Big four') সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা ছিলেন বার্নেস (Byrnes), বেভিন, মলটভ ও জর্জ বিদো। কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের বৃহৎ চতুষ্টয়ের মধ্যে যেরূপ সংহতি ও ঐক্য ছিল ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের বৃহৎ চতুষ্টয়ের মধ্যে তাহার একান্ত অভাব ছিল। ইহার প্রধান কারণ ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক আদর্শের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য ছিল। এইরূপ পার্থক্য ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের বৃহৎ চতুষ্টয় (উইলসন, ক্লিমেনশো, লয়েড জর্জ ও অর্লেণ্ডো)-এর মধ্যে ছিল না। তাঁহারা সকলেই ছিলেন ধনতন্ত্রসম্মত গণতন্ত্রের প্রতিনিধি। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের বৃহৎ চতুষ্টয়ের একদিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদী বিপ্লবের আশঙ্কা এবং অপরদিকে সোভিয়েট রাশিয়ার মনে পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইবার আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। দুই পক্ষের মধ্যে এইরূপ পারস্পরিক সন্দেহ ও আশঙ্কা শান্তির শর্তাদি রচনা করিতে বহুবিধ জটিলতার সৃষ্টি করে সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষের মনকষাকষি ও পারস্পরিক

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের 'বৃহৎ চারিজন' (Big four)

১৯১৯ ও ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শান্তি-সম্মেলনের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য

'ঠাণ্ডা-লড়াই' (Cold-war)

সন্দেহ হইতেই 'ঠাণ্ডা-লড়াই'-এর (Cold War) উৎপত্তি হয়।

এইরূপ পরিপ্রেক্ষিতে যদিও অনেক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই, তথাপি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে 'বৃহৎ চারিজন' সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমর্থ হন—যথা ইটালী ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে সীমান্ত সম্পর্কিত সমস্যা, ট্রিয়েস্ট (Triest)-এর সমস্যা, ইটালীর উপনিবেশ-সংক্রান্ত সমস্যা, দানিয়ুবকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিবার সমস্যা এবং শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর শত্রুরাষ্ট্র হইতে সৈন্যবাহিনী অপসারণ করিয়া লইবার সমস্যা। এই সকল ব্যাপারে একদিকে মলটভ ও অপরদিকে বার্নেস (Byrnes) ও বেভিনের মধ্যে দারুণ মতানৈক্যের উদ্ভব হয়।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ন্যায় ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শান্তি-সম্মেলনও ইটালী ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে সীমানা সম্পর্কিত প্রশ্ন অধিকতর জটিলতার সৃষ্টি করে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী জাতিগোষ্ঠী ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে আদ্রিয়াটিক সাগরের উপকূলে অবস্থিত ফিউম শহরটি দাবি করে। সামরিক ও অর্থনৈতিক কারণে যুগোশ্লাভিয়া ইটালীর এই দাবির তীব্র বিরোধিতা করে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে সম্পাদিত এক সন্ধি অনুসারে ফিউম শহরটি ইটালীকে সমর্পণ করা হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর পূর্বোক্ত দাবি ও যুক্তির অনুকরণে যুগোশ্লাভিয়া ট্রিয়েস্ট নগরী দাবি করিয়া বসে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উইলসন ইটালীর দাবি 'অসংগত ও অন্যায়' বলিয়া উহার বিরোধিতা করেন। কিন্তু ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন প্রতিনিধি বার্নেস জাতিগোষ্ঠী নীতির ভিত্তিতে ট্রিয়েস্ট-এর উপর যুগোশ্লাভিয়ার দাবির বিরোধিতা করে। এতদ্ভিন্ন ট্রিয়েস্ট-এর ন্যায় এক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর রাশিয়ার প্রভাবিত রাষ্ট্র যুগোশ্লাভিয়ার হস্তগত হউক মার্কিন প্রতিনিধির তাহাও অভিপ্রেত ছিল না। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শান্তি-সম্মেলন ফিউম নগরীকে 'উন্মুক্ত-নগরী' (Free city) বলিয়া ঘোষণা করিয়া সমস্যার সমাধান করিয়াছিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শান্তি-সম্মেলনও ট্রিয়েস্ট নগরীকে 'উন্মুক্ত-নগরী' বলিয়া ঘোষণা করিয়া সমস্যার সমাধান করা হয়। বৃহৎ চতুষ্টয়ের মধ্যে নানাপ্রকার মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও পাঁচটি পরাজিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সম্পর্কে পাঁচটি সন্ধির খসড়া প্রস্তুত করা হয়।

প্যারিস-সম্মেলন ২৯শে জুলাই (১৯৪৬)

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী বিদো (Bidault) প্যারিসে আহূত শান্তি-সম্মেলন উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের প্রারম্ভিক বৈঠকে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি বৃহৎ চতুষ্টয়ের প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং ইহার ফলে উহারা কিছু সুবিধা লাভ করে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সম্মেলনে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি যেভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছিল ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শান্তি-সম্মেলনে সেই অনুপাতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির প্রতি উদার মনোভাব প্রদর্শন করা হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান প্রতিনিধিগণের নিকট

ভার্সাই-এর সন্ধিপত্র উপস্থাপিত করার পূর্ব পর্যন্ত তাহা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে জানিতে দেওয়া হয় নাই এবং তাহা গ্রহণ বা বর্জন করার অধিকারও বিজিত রাষ্ট্রগুলিকে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শান্তি-সম্মেলনের প্রারম্ভিক বৈঠকে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার ও পাঁচটি সন্ধিপত্রের শর্তগুলি সম্পর্কে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শান্তি-সম্মেলনের প্রারম্ভিক বৈঠকে ইটালী, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণকে উহাদের মতামত ব্যক্ত করার অধিকার দেওয়া হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'বৃহৎ চারিজনে'র আলাপ-আলোচনাগুলি গোপনে সম্পন্ন করা হইয়াছিল এবং জার্মান প্রতিনিধিদের নিকট ভার্সাই-এর সন্ধিপত্র উপস্থিত করার পরও তাহা মিত্রপক্ষের অন্যান্য রাষ্ট্রের জনসাধারণের নিকট রাখা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শান্তি-সম্মেলনের কার্যক্রমে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। সম্মেলনের প্রারম্ভিক বৈঠকেই পাঁচটি সন্ধিপত্রের শর্তগুলি প্রকাশিত করা হয় এবং প্রকাশ্যভাবেই বৈঠকের কার্যাদি পরিচালনা করা হয়। সুতরাং বহু বিষয়ে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শান্তি-সম্মেলন ও ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শান্তি-সম্মেলনের নীতি ও কার্যক্রমের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

এস্থলে স্মরণ রাখা দরকার যে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিস-সম্মেলনকে শুধু সন্ধিপত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনা করার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার একমাত্র 'বৃহৎ চারিজনের' হস্তেই নিবদ্ধ ছিল। প্রথম হইতে প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন দুইটি দলে বা 'ব্লকে' (bloc) বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে ছিল পনেরটি রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থনপুষ্ট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অপরদিকে ছিল শ্লাভ ব্লক* কর্তৃক সমর্থনপুষ্ট রাশিয়া। এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্রজোটের মধ্যে সংহতি ও ঐক্যসাধনের নিমিত্ত ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নিউ ইয়র্ক শহরে পররাষ্ট্র-মন্ত্রিপরিষদের (Council of Foreign Ministers) আর একটি বৈঠক আহূত হয়। প্যারিস শান্তি-সম্মেলনের সুপারিশগুলি মোটামুটিভাবে গৃহীত হয় এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী প্যারিসে ২১টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ এবং ইটালী, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক পাঁচটি পৃথক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

প্যারিসে পাঁচটি পৃথক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর (১৯৪৬)

(১) **ইটালীর সহিত শান্তি-চুক্তি** (Peace Treaty with Italy): ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী মিত্রপক্ষের সহিত যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া সেই বৎসরের অক্টোবর মাসে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শান্তি-চুক্তি ইটালীকে মর্মাহত করে এবং ইহা গ্রহণ করিতে ইটালীকে বাধ্য করা হয়। এই চুক্তির শর্তানুসারে (১) ইটালী উহার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কিছু অঞ্চল ফ্রান্সকে, ডোডেকানিস দ্বীপপুঞ্জ গ্রীসকে এবং ট্রিয়েস্ট ছাড়া পূর্ব-আড্রিয়াটিকের

*শ্লাভ ব্লকের অন্তর্ভুক্ত ছিল—রাশিয়া, শ্বেত-রাশিয়া, ইউক্রেন, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া।

সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ যুগোশ্লাভিয়াকে ছাড়িয়া দেয়, (২) ট্রিয়েস্ট, ইস্ট্রিয়া ও ভেনেসিয়ার একাংশ স্বাধীন অঞ্চল (free territory) বলিয়া ঘোষিত হয়, (৩) ইটালী লাইবিয়া, ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ড ও এরিত্রিয়ার উপর সকল দাবি পরিত্যাগ করে। এই সকল ইটালীয় উপনিবেশগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার পররাষ্ট্র-পরিষদ-এর (Council of Foreign Minister) হস্তে ন্যস্ত করা হয় এবং ইহাও স্থির হয় যে পররাষ্ট্র-পরিষদ এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমর্থ হইলে ইউনাইটেড নেশনস্-এর সাধারণ সভা উহার মীমাংসা করিবে। ইটালীর উপনিবেশগুলি সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত সেগুলির শাসনভার ব্রিটেনের হস্তে ন্যস্ত করা হয়, (৪) ইটালী আলবানিয়া ইথিওপিয়া ও চীনে উহার সকল দাবি পরিত্যাগ করে, (৫) ইটালী রাশিয়াকে ১০০ মিলিয়ন ডলার, যুগোশ্লাভিয়াকে ১২৫ মিলিয়ন ডলার, গ্রীসকে ১০৫ মিলিয়ন ডলার, ইথিওপিয়াকে ২৫ মিলিয়ন ডলার ও আলবানিয়াকে ৫ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে। ইহা ছাড়া, ইটালীতে মিত্রপক্ষের ধনসম্পত্তি বিনষ্টের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানেও ইটালী বাধ্য থাকিবে।

রাষ্ট্রীয় শর্তাদি

অর্থনৈতিক শর্তাদি

(৬) ইটালীর সামরিক শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করা হয়। উহার সৈন্যসংখ্যা দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার, বিমানবাহিনীর সংখ্যা ২৫ হাজার ও নৌ-বাহিনীর সংখ্যা ২২,৫০০-এ সীমাবদ্ধ করা হয়। ইহাও স্থির হয় যে ইটালী দুইটি যুদ্ধজাহাজ, চারিটি ক্রুইজার, দুইশত বিমান ও দেড়শত মালবাহী বিমানের অধিক সাজসরঞ্জাম রাখিতে পারিবে না। ফ্রান্স ও যুগোশ্লাভিয়ার সীমানার নিকটবর্তী ইটালীর সকল দুর্গ ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে। ইউনাইটেড নেশনস্ বা নিরাপত্তা-পরিষদ-এর (Security Council) সহিত ইটালীর সন্ধি না হওয়া পর্যন্ত এই সামরিক শর্তগুলি বহাল থাকিবে এইরূপ স্থির হয়।

সামরিক শর্তাদি

এই সকল শর্তের ফলে ইটালীয়-সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে এবং ইটালী তৃতীয় পর্যায়ের রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

(২) **রুমানিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি** (Peace Treaty with Rumania): ইটালীর ন্যায় রুমানিয়ার সৈন্যসংখ্যা, বিমান ও নৌ-শক্তিও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করা হয়। রুমানিয়া রাশিয়াকে ৩০০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদানে বাধ্য হয়। রুমানিয়া রাশিয়াকে বাসারাবিয়া, বুকোভিনা এবং বুলগেরিয়াকে দক্ষিণ দবরুদজা (Dobrudja) ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরীকে প্রদত্ত ট্রানসিলভানিয়া ফিরিয়া পায়।

(৩) **বুলগেরিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি** (Peace Treaty with Bulgaria): বুলগেরিয়ার সৈন্যসংখ্যা, বিমান ও নৌ-শক্তিও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করা হয়। বুলগেরিয়া গ্রীসকে ৪৫ শত মিলিয়ন ডলার এবং যুগোশ্লাভিয়াকে ২৫ শত মিলিয়ন

ডলার ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য হয়। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও বুলগেরিয়া ঈজিয়ান সাগরে নির্গমনের সুযোগ লাভ করিল না বটে, তবে রুমানিয়ার নিকট হইতে দক্ষিণ দব্রুদ্জা লাভ করে।

(৪) **হাঙ্গেরীর সহিত শান্তি-চুক্তি** (Peace Treaty with Hungary): ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের পর হইতে হাঙ্গেরী যে সকল রাজ্য লাভ করিয়াছিল সেগুলি সে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং দানিয়ুব নদীর দক্ষিণ উপকূলের কিছু অংশ চেকোশ্লোভিয়াকে ছাড়িয়া দেয়। ইহা ছাড়া, হাঙ্গেরী রাশিয়াকে ২০০ মিলিয়ন ডলার এবং যুগোশ্লাভিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে ৫০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ প্রদানে স্বীকৃত হয়। হাঙ্গেরীর সৈন্যসংখ্যা, বিমান ও নৌ-শক্তিও হ্রাস করা হয়।

(৫) **ফিনল্যাণ্ডের সহিত শান্তি-চুক্তি** (Peace Treaty with Finland): ফিনল্যান্ড কেরেলিয়া যোজক, পোস্টামো ও ফিনল্যান্ড উপসাগরের দ্বীপপুঞ্জ রাশিয়াকে ছাড়িয়া দেয়। পূর্বে সম্পাদিত হাঙ্গেরী বন্দোবস্ত রাশিয়া প্রত্যাহার করিলে তাহার বিনিময়ে ফিনল্যান্ড রাশিয়াকে পোরখানা বন্দোবস্ত করে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ফিনল্যান্ডের যে সীমারেখা ছিল তাহা পুনরায় স্বীকৃত হয়। ইহা ভিন্ন ফিনল্যান্ড রাশিয়াকে তিনশত মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে এবং উহার সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিতে স্বীকৃত হয়।

২১.৮. পরাজিত জার্মানী ও মিত্রপক্ষ (Defeated Germany and the Allies): ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর পতনের পর মিত্রপক্ষ সর্বপ্রথম জার্মানীর সহিত সন্ধিপত্র সম্পাদন করিতে অধিক ব্যর্থ হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মিত্রপক্ষ জার্মানীর সহিত সন্ধিপত্র সম্পাদন করার পরিবর্তে অপরাপর ক্ষুদ্র রাষ্ট্রবর্গের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতেই অধিক ব্যর্থ হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শান্তি-সম্মেলনে কিছুদিনের জন্য জার্মানীর সহিত চুক্তি-সম্পাদনের প্রশ্নটি মুলতুবী রাখা হইয়াছিল। ইহার কারণ হইল এই যে, সন্ধিপত্র গ্রহণ ও তাহা কার্যে পরিণত করার মত উপযুক্ত সরকার জার্মানীতে গঠিত না হওয়া পর্যন্ত জার্মানীর সহিত শান্তি স্থাপন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জার্মানীর সহিত শান্তি স্থাপন করার পথে প্রধান অন্তরায় ছিল 'বৃহৎ-চারিজন'-এর মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস।

জার্মানীর সহিত শান্তি স্থাপিত বিলম্বিত হইবার কারণ

ইয়াল্টা-সম্মেলনের সময় হইতে মিত্রপক্ষ জার্মানী সম্পর্কে নানাপ্রকার পরিকল্পনার প্রস্তুতি শুরু করিয়াছিল এবং উহার পর হইতে বৃহৎ চারিজনের মধ্যে কয়েকটি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথমদিকে যুদ্ধের ব্যাপকতা ও উহার ধ্বংসলীলা মিত্রপক্ষের মনে এক দারুণ প্রতিশোধাত্মক মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং মিত্রপক্ষ জার্মানীকে সমুচিত শাস্তিপ্রদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। মিত্রপক্ষ জার্মানীর নিকট হইতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে; জার্মানীর নাৎসীদলকে উচ্ছেদ করিতে এবং উহার শিল্পগুলি ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর ছিল যাহাতে জার্মানীর পক্ষে ভবিষ্যতে যুদ্ধ

করিবার শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। কিন্তু জার্মানীর সহিত শান্তি-চুক্তি বিলম্বিত হইতে থাকিলে জার্মানীর ধ্বংসলীলা ও বর্বরোচিত আচরণের কথা ধীরে ধীরে সকলে ভুলিয়া যাইতে থাকে। উপরন্তু বিধ্বস্ত জার্মানী পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের স্কন্ধে বোঝা-স্বরূপ হইয়া উঠিতে থাকে। এতদ্ভিন্ন জার্মানী সম্পর্কে রাশিয়ার মনোভাব পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিতে থাকে। ফলে জার্মানী সম্পর্কে যে সকল শাস্তিমূলক পরিকল্পনা পূর্বে গ্রহণ করা হইয়াছিল, পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ সেগুলির কঠোরতা কিঞ্চিৎ লাঘব করিল এবং জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিল। জার্মানী ও পশ্চিম-ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি যাহাতে সাম্যবাদী আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত না হয়, তজ্জন্যই ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানী সম্পর্কে উহাদের পূর্ববর্তী মনোভাবের পরিবর্তন করিয়া জার্মানীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল।

অধিকৃত অঞ্চল (Occupied Zones) : ইয়াল্টা-সম্মেলনে চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্টালিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, পরাজিত জার্মানীর চারিটি পৃথক অঞ্চলে ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সামরিক কর্তৃত্ব স্থাপন করা হইবে এবং এই চারিটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সমর-অধিনায়কগণকে (Supreme Military Commanders) লইয়া একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ-সমিতি (Central Control Council) গঠন করা হইবে এবং ইহার প্রধান কার্যালয় হইবে বার্লিনে। জার্মানীর পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন ও ফ্রান্স যথাক্রমে জার্মানীর দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম ও রাইন অঞ্চল দখল করিয়া নিজেদের সামরিক শিবির স্থাপন করে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে রাশিয়া মিত্রপক্ষের অনুকূলে বার্লিনের একাংশ ছাড়িয়া দিলে তৎক্ষণাৎ মিত্রপক্ষ বার্লিনে মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ-সমিতির (Allied Control Council) প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে।

জার্মান যুদ্ধাপরাধী (German War Criminals) : যুদ্ধ অবসানের পর মিত্রপক্ষ জার্মান যুদ্ধাপরাধীগণের বিচারের ব্যবস্থা করিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একটি আন্তর্জাতিক সামরিক আদালত (International Military Tribunal) স্থাপিত হইল এবং বিশ্বের শান্তি ও মানবতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের (plot against peace and humanity) অপরাধে ২৪ জন জার্মান নেতাকে অভিযুক্ত করা হইল। নুরেমবার্গ (Nuremburg) শহরে সামরিক আদালতের বিচার শুরু হইল। ১২ জন জার্মান নেতাকে মৃত্যুদণ্ড, ৩ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ৪ জনকে ১০ হইতে ২০ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। লে (Ley) ও গোয়েরিং (Goering) আত্মহত্যা করিয়া দণ্ডাজ্ঞা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন—কিন্তু রিবেনট্রপ, রোসেমবার্গ ফ্রিক, ইনকোয়ার্ট প্রভৃতি ১৬ জন নেতাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলান হইল। হেস্-কে (Hess) যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। নুরেমবার্গ আদালত সকল প্রকার নাৎসী-প্রতিষ্ঠানগুলির তীব্র নিন্দা করিল।

নুরেমবার্গ বিচারের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি : নুরেমবার্গ বিচারের স্বপক্ষে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ, লীগ-অফ-নেশনস্ ও উহার সদস্য

হিসাবে জার্মানী যে কোন প্রকারে পররাজ্য আক্রমণ অপরাধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত কেলোগ-বিয়াঁ চুক্তিতে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসার জন্য যুদ্ধ-নীতিকে নিন্দা করা হইয়াছিল এবং শান্তিপূর্ণভাবে সেগুলির মীমাংসা করার নীতি গৃহীত হইয়াছিল। জার্মানী, জাপান ও ইটালীসহ বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রই এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছিল। সুতরাং লীগ-অফ-নেশনস্-এর প্রধানতম নির্দেশ ও কেলোগ-বিয়াঁ চুক্তির শর্তভঙ্গের অপরাধে জার্মানীকে অভিযুক্ত করা ন্যায়সংগত হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, নিছক পররাজ্যগ্রাসের লোভে জার্মানী যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত করিয়া বিশ্বের শান্তি ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। চতুর্থতঃ, বহু দেশের বে-সামরিক নাগরিকগণের ধনসম্পত্তি ও প্রাণনাশ করিয়া জার্মানী মানবতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল।

স্বপক্ষে যুক্তি

নুরেমবার্গ বিচারের বিপক্ষে কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ, যুদ্ধের জন্য কোন রাষ্ট্রের নেতৃবর্গকে দায়ী করার কোন নজির আন্তর্জাতিক আইনে নাই। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপরিচালকগণের আদেশ অনুসারেই যুদ্ধ ও যুদ্ধ-প্রসূত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের পক্ষ হইতে যুদ্ধ ও যুদ্ধ-প্রসূত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছিল এবং এই কারণে বিজয়ী রাষ্ট্রের নেতৃবর্গকেও অভিযুক্ত করা ন্যায়সঙ্গত ছিল। চতুর্থতঃ, যুদ্ধ-সংক্রান্ত আইন শুধু যে জার্মান ও জাপানীগণ ভঙ্গ করিয়াছিল এমন নহে, বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গও এই অপরাধ হইতে মুক্ত ছিল না।

বিপক্ষে যুক্তি

নাৎসীবাদের উচ্ছেদ (Denazification) ঃ নাৎসীদল, উহার আইন ও সকল প্রকার সংস্থার ধ্বংসসাধন এবং জার্মানীর সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন হইতে সকল প্রকার নাৎসী প্রভাব বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত ইয়াল্টা-সম্মেলনে গ্রহণ করা হইয়াছিল। নাৎসী নেতৃবর্গ ও উহাদের সমর্থকগণ, নাৎসী সংগঠনের কর্মচারীবৃন্দ এবং নাৎসীদলের সকল সদস্যগণকে বন্দী করার সিদ্ধান্ত পোটস্‌ডাম-সম্মেলনে গ্রহণ করা হইয়াছিল। এক কথায় নাৎসীবাদের সকল প্রভাব সমূলে বিনষ্ট করার সিদ্ধান্ত মিত্রপক্ষীয় নেতৃবর্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ-সমিতি (Allied Control Council) নির্দেশ জারি করিয়া নাৎসী আইনকানুন ও নাৎসী সংস্থাগুলি বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিল, রাষ্ট্রের সকল বিভাগ হইতে নাৎসী সমর্থনকারীগণকে বিতাড়িত করা হইল এবং শিক্ষায়তনগুলিকে সকল প্রকার নাৎসী প্রভাব হইতে মুক্ত করা হইল। জার্মানীতে বিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার অধিকৃত অঞ্চলে নাৎসী দলভুক্ত বা নাৎসীবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এমন বহু জার্মানকে নানাপ্রকার দণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। কিন্তু শীঘ্রই এইরূপ ব্যাপক ধরপাকড় ও শাস্তিদানের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিল। কারণ জার্মানীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নাৎসীবাদের প্রভাব এমন গভীরভাবে পড়িয়াছিল যে জার্মানীর

নেতৃবর্গের ও শাসকগোষ্ঠীর কেহই এই প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না। সুতরাং ব্যাপক ধরপাকড় ও শাস্তিদানের ফলে জার্মানীর প্রশাসনী ব্যবস্থা একরূপ ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। ইতিমধ্যে জার্মানীর পুনর্গঠনের ব্যাপারে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ ও রাশিয়ার সহিত পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের বিবাদের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে মিত্রপক্ষের নাৎসী দমনের জেহাদ ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে নাৎসী সমর্থকদের অনেকেই রাষ্ট্রীয় শাসনকার্যে নিযুক্ত হইবার এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করে।

ইতিমধ্যে জার্মানীর শিক্ষার ক্ষেত্রে নাৎসী প্রভাব বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা চলিল। জার্মানীর যুবসম্প্রদায়কে গণতন্ত্রের আদর্শে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলি হইতে বহু শিক্ষক ও অধ্যাপক জার্মানীতে প্রেরণ করা হইল। কিন্তু এই বিষয়ে মিত্রপক্ষের উদ্দেশ্য বিশেষ সাফল্য লাভ করে নাই। এই প্রসঙ্গে জনৈক মার্কিন সামরিক কর্মচারী ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মন্তব্য করেন, "It is evident to me that Germany will have recovered economically long before she has recovered spiritually. She will have great economic power long before she has developed a democratic sense of responsibility for the use of that power."

জার্মানীর নিরস্ত্রীকরণ (Germany Demilitarisation) : ইয়াল্টা ও পোটস্‌ডাম-সম্মেলনে মিত্রপক্ষ জার্মানীর সমরবাদ ধ্বংস করার ও ভবিষ্যতে জার্মানী যাহাতে পুনরায় বিশ্বের শান্তি ব্যাহত করিতে না পারে তজ্জন্য প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে জার্মানীর সৈন্যবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিয়া জার্মানীকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ করার, জার্মানীর সকলপ্রকার যুদ্ধোপকরণ বিনষ্ট করার এবং জার্মানীর বৃহৎ শিল্পগুলি মিত্রপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে একমাত্র জার্মানীর শিল্প-সংক্রান্ত পরিকল্পনা ছাড়া অন্যান্য পরিকল্পনাগুলি কার্যে পরিণত করা হইল। শিল্প-সংক্রান্ত ব্যাপারে মিত্রপক্ষের মতানৈক্যের উদ্ভব হইল। জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রয়োজনে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর সকল প্রকার শিল্পের উপর মিত্রপক্ষের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করার বিপক্ষে মত প্রকাশ করিল। কিন্তু অপরদিকে ফ্রান্স ও রাশিয়া জার্মানীর সকলপ্রকার শিল্পের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করার পক্ষপাতী ছিল। রুঢ় অঞ্চল লইয়া ফ্রান্সের সহিত ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিবাদ তীব্র আকার ধারণ করিল। রুঢ় ছিল জার্মানীর শিল্প ও খনিজ অঞ্চল এবং জার্মানীর সামরিক শক্তির মূল ভিত্তি। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করিল যে জার্মানীর শিল্পোৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনে রুঢ় অঞ্চলের খনিজ সম্পদের উপর জার্মানীর অধিকার স্থাপন করিতে হইবে এবং এক আন্তর্জাতিক সংস্থার হস্তে শিল্পোৎপাদিত সামগ্রীর বন্টনের ভার ন্যস্ত করিতে

হইবে। ফ্রান্স এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করিল। অবশেষে লণ্ডনের বৈঠকে উভয় পক্ষে এক মীমাংসা হইল এবং রূঢ় অঞ্চলের খনিজ ও শিল্পোৎপাদিত সামগ্রীর পরিদর্শনের ভার একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার (The International Authority for Ruhr) হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। জার্মানীর শিল্পগুলি যাহাতে কোনপ্রকার যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত না করে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার দায়িত্বও এই সংস্থাকে দেওয়া হইল।

পশ্চিম-জার্মানীতে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (Federal Republic of Germany): পশ্চিমী মিত্রবর্গ (ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড) জার্মানীর ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত অঞ্চল তিনটিকে ঐক্যবন্ধ করিতে অগ্রসর হইল। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত লণ্ডন-সম্মেলনে এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল যে সমগ্র জার্মানীর ঐক্যবন্ধন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিম-জার্মানীর জনগণকে পশ্চিম-জার্মানীর জন্য একটি শাসনতন্ত্র রচনার ও সরকার গঠনের অধিকার দেওয়া হইবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম-জার্মান প্রজাতান্ত্রিক সরকার (Federal Republic of Germany) গঠিত হইল এবং একটি শাসনতন্ত্রও রচিত হইল। এই শাসনতন্ত্র অনুসারে দুইটি কক্ষযুক্ত (Federal Diet ও Federal Council) একটি জাতীয় পার্লামেন্ট গঠিত হইল। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে পশ্চিম-জার্মানীতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল। ফেডারেল-ডায়েট ও ফেডারেল-কাউন্সিলের এই যুগ্ম অধিবেশনে থিওডোর হেস (Heuss) পশ্চিম-জার্মান প্রজাতন্ত্রের প্রথম সভাপতি ও এ্যাডেনিওর (Adenauer) চান্সেলার নির্বাচিত হইলেন। সেই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমী মিত্রবর্গ পশ্চিম-জার্মানীর প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া জার্মানীতে উহাদের সামরিক শাসনের অবসান করিল।

পূর্ব-জার্মানীতে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (The German Democratic Republlic): ইতিমধ্যে জার্মানীর রুশ-অধিকৃত অঞ্চলেও অপর একটি জার্মান রাষ্ট্র গঠিত হইল। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির (Socialist Unity Praty) পরিচালনাধীনে, জার্মানীর রুশ-অধিকৃত অঞ্চলে একটি গণ-পরিষদ (People's Council) নির্বাচিত হইল এবং এই পরিষদ একটি শাসনতন্ত্র রচনা করিল। পশ্চিম-জার্মানীতে মিত্রপক্ষের পরিচালনাধীনে পশ্চিম-জার্মান রাষ্ট্র গঠিত হইলে পূর্ব-জার্মানীতে গণ-পরিষদ নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করিল। ১১ই অক্টোবর পূর্ব-জার্মানীতে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হইল এবং বার্লিন ইহার রাজধানী হইল। People's Chamber বা জনসাধারণের সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক একজন মন্ত্রি-রাষ্ট্রপতি (Minister-President) নির্বাচিত করার ব্যবস্থা হইল। গ্রোটওল (Grotowohl) প্রথম মন্ত্রি-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। এইভাবে জার্মানীতে একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইল। এইভাবে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী আদর্শের বিরুদ্ধে জার্মানীকে দ্বি-খণ্ডিত করা হইল। একথা অস্বীকার করা যায় না যে জার্মানীর ব্যবচ্ছেদ জার্মানবাসীর মনঃপূত হয় নাই।

২১.৯. জাপান ও মিত্রপক্ষ (Japan and the Allies) ঃ যুদ্ধ-অবসানে জার্মানী অথবা অস্ট্রিয়ার ব্যাপারে মিত্রপক্ষকে যেরূপ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, জাপানের ব্যাপারে সেইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই, কারণ জাপান একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পরাজিত ও অধিকৃত হইয়াছিল। জাপানের আত্মসমর্পণের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এইরূপ ঘোষণা করিয়াছিল যে জাপান সম্পর্কে মিত্রপক্ষের মতামত বিবেচনা করা হইবে বটে, কিন্তু মিত্রপক্ষের মধ্যে মতানৈক্যের উদ্ভব হইলে সেই ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি প্রয়োগ করিয়া জাপানের পুনর্গঠনকার্য সম্পন্ন করা হইবে। জাপানের পুনর্গঠনকার্য সম্পন্ন করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'সুদূর-প্রাচ্য পরামর্শক কমিশন' (Far Eastern Advisory Commission) নামে একটি সংস্থা গঠন করিল এবং ইহাতে যোগদানের জন্য সুদূর-প্রাচ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রবর্গকে আমন্ত্রণ জানাইল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বার্নেস, বেভিন ও মলটভ মস্কোতে এক বৈঠকে মিলিত হইয়া 'সুদূর-প্রাচ্য পরামর্শক কমিশন' ও 'মিত্রপক্ষ-পরিষদ' (Allied Council for Japan) নামে দুইটি সংস্থা সংগঠন করিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীনে জাপান

মিত্রপক্ষ-পরিষদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ব্রিটেন, নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত প্রতিনিধিত্ব করিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর-অধিনায়ক ম্যাক আর্থার (Mac Arthur) পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। সুদূর-প্রাচ্য পরামর্শক কমিশনের কার্যালয় ওয়াশিংটনে স্থাপিত হইল এবং এগারোটি রাষ্ট্র ইহাতে প্রতিনিধিত্ব করিল। মিত্রপক্ষ পরিষদের কার্যালয় টোকিওতে স্থাপিত হইল। সুদূর-প্রাচ্যে মিত্রপক্ষের সর্বোচ্চ সমর-অধিনায়ক জেনারেল ম্যাক্ আর্থারকে পরামর্শ দান করা ছাড়া মিত্রপক্ষের অন্য কোন ক্ষমতা ছিল না। জাপান সম্পর্কে নীতি গ্রহণের ও কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের মতামত বিবেচনা করার ক্ষমতা সুদূর-প্রাচ্য কমিশনকে দেওয়া হইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জাপান সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা ম্যাক্ আর্থারের হস্তেই নিবদ্ধ রহিল।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইল এবং ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শাসনতন্ত্র বাতিল করা হইল। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে জাপানের সম্রাট নামেমাত্র রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক রহিলেন এবং রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্বশীল এক মন্ত্রিসভার হস্তে ন্যস্ত হইল। নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল। সমাজতন্ত্রী নেতা কাতায়ামা (Katayama) প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন। কিন্তু সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে বিভেদের উদ্ভব হইলে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কাতায়ামা মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলেন এবং ডিমোক্রেটিক দলের নেতা হিতোশী-আশীদা (Hitoshi Ashida) মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন। কিন্তু অচিরে এই মন্ত্রিসভাও পদত্যাগ করিল এবং ইয়োশীদার নেতৃত্বে উদারপন্থী (Liberals) ও গণতন্ত্রী (Democrats) দলের একটি সংযুক্ত মন্ত্রিসভা গঠিত হইল।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শাসনতন্ত্র

যখন জাপানের পুনর্গঠনকার্য চলিতেছিল, সেই সময় জাপানকে সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্রীকরণ করার চেষ্টাও চলিতেছিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে বাধ্যতামূলক ভাবে সৈন্যসংগ্রহের রীতি নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। ইহার পর হাজার হাজার জাপানী যুদ্ধাপরাধীগণের বিচার চলিল এবং নানাপ্রকার দণ্ডে উহাদিগকে দণ্ডিত করা হইল। প্রায় এক লক্ষ সামরিক ও বে-সামরিক কর্মচারীকে পদচ্যুত করা হইল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাপানের নিরস্ত্রীকরণ সম্পূর্ণ হইল।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

জাপানের অর্থনৈতিক জীবনেও সংস্কার প্রবর্তিত হইল। এযাবৎ সমর-নীতি ও বৈদেশিক নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া জাপানের অর্থনৈতিক জীবন পরিচালিত হইত। জাইবাত্সু (Zaibatus) নামে বৃহৎ শিল্পপতিগণের এক সংঘ জাপানের অর্থনৈতিক জীবনের উপর একাধিপত্য চালাইত। ইহার ফলে জাপানের কয়েকজন মুষ্টিমেয় শিল্পপতিগণের হস্তে জাপানের অর্থসম্পদ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে এবং ইহার ফলে জাপানে সমৃদ্ধিশালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্ভব হয় নাই। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন সরকারের নির্দেশক্রমে 'জাইবাত্সু' সংঘের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল এবং সামান্য ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে সেই সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইল। জাপানের কৃষিজীবনেও সংস্কার প্রবর্তিত হইল। এযাবৎ জাপানের কৃষিজীবনেও জমিদারশ্রেণীর প্রভুত্ব বজায় ছিল। কৃষকদের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ জমিদারদের ভূমিদাসে পরিণত হইয়াছিল। উৎপন্নের অর্ধাংশ কৃষকদের নিকট হইতে ভূমিকর হিসাবে আদায় করা হইত। ম্যাক্ আর্থার জাপানের কৃষিজীবন হইতে সামন্ত-প্রথা উচ্ছেদ করিতে বদ্ধপরিকর হন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভূমি-সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ করা হইল। ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর জমিদারি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইল এবং কৃষকদের মধ্যে জমিবণ্টনের ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু জমিদারগণের প্রবল বিরোধিতার ফলে ভূমি-সংস্কার প্রচেষ্টা আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই।

অর্থনৈতিক সংস্কার

জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি (Peace treaty with Japan) : জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পর্কিত আলোচনার জন্য ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুদূর-প্রাচ্য কমিশনের নিকট প্রস্তাব করিল। ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এর সদস্য-রাষ্ট্রবর্গ এই প্রস্তাব সমর্থন করিল। কিন্তু রাশিয়া ইহার বিরোধিতা করিয়া প্রস্তাব করিল যে পশ্চিম-ইওরোপে বৃহৎ চারি রাষ্ট্র (Big four) যেভাবে পরাজিত রাষ্ট্রগুলির সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল, সেইভাবে বৃহৎ চারি রাষ্ট্র অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, রাশিয়া ও চীন কর্তৃক জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। রাশিয়া 'ভেটো' ক্ষমতার বলে সকল প্রকার প্রস্তাব বানচাল করিতে পারে এই আশঙ্কায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিল। যাহা হউক, ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তির খসড়া প্রস্তুত হইল এবং তাহা ৫১টি রাষ্ট্রের নিকট প্রেরণ করা হইল। ভারত এই শান্তি-চুক্তির কিছু পরিবর্তনের

সুপারিশ করিয়া প্রস্তাব করিল যে রিউকিউ ও কোনিন দ্বীপপুঞ্জে জাপানের অধিকারে রাখা হউক, ফরমোশা চীনকে প্রদান করা হউক এবং জাপান হইতে বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী অপসারণ করা হউক। যদিও শান্তি-চুক্তিপত্রে এই সকল প্রস্তাব গৃহীত হইল না, তথাপি মূল চুক্তিপত্রে কিছু সংশোধনী প্রস্তাব সন্নিবিষ্ট করা হইল।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য ৫০টি রাষ্ট্র সান্‌ফ্রান্সিসকো-সম্মেলনে যোগদান করিল। চীন, ভারত ও ব্রহ্মদেশ হইতে কোন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিলেন না। রাশিয়ার প্রতিনিধি গ্রোমিকো এই শান্তি-চুক্তির তীব্র নিন্দা করিলেন। তিনি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, "এই শান্তি-চুক্তি জাপানের জঙ্গীবাদী নীতি পুনরুজ্জীবিত এবং সুদূর-প্রাচ্যে আক্রমণাত্মক মৈত্রীজোটে জাপানের অংশগ্রহণের পথ পুনরায় উন্মুক্ত করিল।" জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি পুনর্বিবেচনা করার যে দাবি গ্রোমিকো উত্থাপন করিলেন তাহা বিপুল ভোটাধিক্যে পরিত্যক্ত হইল।

৫০টি রাষ্ট্র কর্তৃক শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর ও রাশিয়ার বিরোধিতা

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইহার শর্তানুসারে (১) জাপান কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিল, (২) জাপান ফরমোশা, প্যাসকাডোর, কিউরাইল, দক্ষিণ-সাখালিন ও প্রশান্ত মহাসাগরের কতকগুলি দ্বীপপুঞ্জের উপর সকল দাবি এবং চীনে উহার বিশেষ অধিকারসমূহ পরিত্যাগ করিল, (৩) জাপান রিউকিউ ও আমেরিকার অধিকৃত অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জগুলিকে জাতিপুঞ্জের অছি-শাসনাধীনে রাখিতে সম্মত হইল, (৪) শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার ৯০ দিনের মধ্যে জাপান হইতে সকল বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী অপসারিত হইবে, তবে জাপানকে মিত্রপক্ষের কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রবর্গের সৈন্যবাহিনী জাপানে মোতায়েন রাখিবার অধিকার দেওয়া হইল, (৫) জাপান আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদ শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করার আদর্শ গ্রহণ করিল। অবশ্য একমাত্র আত্মরক্ষার ব্যাপারে জাপানকে অস্ত্রধারণের অধিকার দেওয়া হইল, (৬) যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলিকে সাহায্য করিতে জাপান স্বীকৃত হইল; (৭) যুদ্ধ-ক্ষতিপূরণ প্রদানে জাপানের অসামর্থ্য স্বীকৃত হইল; (৮) জাপানের স্বাধীনতা ও জাপানের উপর জাপানী সরকারের সার্বভৌমত্বের অধিকার স্বীকৃত হইল এবং (৯) জাপানী যুদ্ধ-বন্দীগণকে মুক্ত করা হইল।

শান্তি-চুক্তির শর্তাদি

১৯১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দের ভার্সাই-সন্ধির তুলনায় জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি ছিল অধিক উদার ও চুক্তি-রচয়িতাগণের সুষ্ঠু রাজনীতিজ্ঞানের পরিচায়ক। বিজিত রাষ্ট্রের নিকট হইতে এক বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ আদায়ের অসুবিধা ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের রাষ্ট্রবিদ্‌গণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যাহা ১৯১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দের রাষ্ট্রবিদ্‌গণ করিতে পারেন নাই। জাপানের নিকট হইতে এক বিরাট পরিমাণের ক্ষতিপূরণ আদায় করার অথবা উহার সামরিক শক্তি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করার চেষ্টা হয় নাই। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর

শান্তি-চুক্তির সমালোচনা

ন্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের বিদ্রোহী হইবার কোন কারণ ছিল না। এতদ্ভিন্ন জাপানের তদানীন্তন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে জাপানের পক্ষে পুনরায় সমরসজ্জায় সজ্জিত হইবার সম্ভাবনাও ছিল না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের শান্তি-চুক্তি (Peace treaty between America and Japan) : ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যেও একটি শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইহার শর্তানুসারে (১) সুদূর-প্রাচ্যের আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা এবং বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে জাপানের নিরাপত্তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানে সকল প্রকার সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখিবার অধিকার লাভ করিল, (২) জাপানের অভ্যন্তরে সকল প্রকার বিপ্লব ও বিদ্রোহ দমন করার ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দেওয়া হইল, (৩) কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রকে জাপানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার প্রদান না করিতে জাপান স্বীকৃত হইল এবং (৪) উভয় রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে জাপান হইতে মার্কিন বাহিনী অপসারণ করা হইবে এইরূপ স্থির হইল।

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত

১। "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূলে ছিল আদর্শগত সংগ্রাম"—আলোচনা কর। [উঃ ২১.১.]
২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতির মূল্যায়ন কর। [উঃ ২১.২.]
৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের কারণ কি? [উঃ ২১.৫.]
৪। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের পতনের ফলাফল কিরূপ হইয়াছিল? [উঃ ২১.৩.]
৫। আতলান্তিক সনদে মিত্রপক্ষের পরিকল্পনা কি ছিল? [উঃ ২১.৪.]
৬। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সম্মেলনগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ ২১.৬.]
৭। পোটস্‌ডাম বৈঠকের সিদ্ধান্ত কি ছিল? [উঃ ২১.৭.]
৮। মিত্রপক্ষের সহিত ইটালীর শান্তি-চুক্তির শর্তগুলি কি ছিল? [উঃ ২১.৭.]
৯। পরাজিত জার্মানীর সহিত মিত্রপক্ষের আচরণ ও নীতি সংক্ষেপে লিখ। [উঃ ২১.৮.]
১০। নুরেমবার্গ বিচারের সমালোচনা কর। [উঃ ২১.৮.]
১১। মিত্রপক্ষের সহিত জাপানের শান্তি-চুক্তির পটভূমিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তির শর্তাদি কি ছিল? [উঃ ২১.৯.]

২০.

চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লব : চীনা-প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

বিংশ অধ্যায়

(Communist Revolution : Foundation of People's Republic)

২২.১. চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লব (Communist Revolution in China) : ১৯৪৫ ও ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কালে চীনের ইতিহাসের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল চীনের জাতীয়তাবাদী (Nationalist) সরকারের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের বিদ্রোহ ও চীনা-প্রজাতন্ত্রের (Chinese People's Republic) প্রতিষ্ঠা।

যদিও ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও নরওয়ে চীনে উহাদের অতিরাষ্ট্রীক (extra-territorial) ক্ষমতা ত্যাগ করে, তথাপি চীনের জনসাধারণের মধ্যে অন্তর্বিপ্লবের ফলে চীনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগতি বিশেষভাবে বাধিত হয়। ১৯২৯ হইতে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কুয়ো-মিং-তাং বা জাতীয়তাবাদী দল ও কমিউনিস্ট দলের মধ্যে অন্তর্বিপ্লবের বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের আমলে কুয়ো-মিং-তাং দলের ভিতর একটি বামপন্থী কমিউনিস্ট দলের উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় ঐ দুই দলের মধ্যে প্রকাশ্য সংগ্রামের উদ্ভব হয় নাই। চীনের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত বুদ্ধিজীবী ও নির্যাতিত কৃষক সম্প্রদায়কে লইয়া কমিউনিস্ট দল গঠিত ছিল। এই দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে চেন-তু-শি (Chen-Tu-hsien) মাও-সে-তুং (Mao-Tse-Tung) ও চু-তে (Chu-Ten)-এর নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। প্রথমদিকে কমিউনিস্ট দল কুয়ো-মিং-তাং সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। কিন্তু ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে চিয়াং-কাই-শেক রাশিয়ার সহিত মিত্রতা বর্জন করিয়া চীনা-কমিউনিস্টদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার শুরু করিলে উভয়ের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

যাহা হউক, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীন আক্রমণ করিলে সাময়িকভাবে কমিউনিস্ট ও কুয়ো-মিং-তাং দলের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে চিয়াং-কাই-শেক 'জনগণের রাজনৈতিক পরিষদ' (People's Political Council) নামে একটি পরামর্শক সংস্থা গঠন করেন এবং এই সংস্থায় কমিউনিস্ট ও অন্যান্য দলের প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয়। এই ভাবে জাপানের বিরুদ্ধে একটি ফ্রন্ট গঠিত হয়। জাপানের বিরুদ্ধে কুয়ো-মিং-তাং বা জাতীয়তাবাদী দলকে অধিক দায়িত্ব বহন করিতে হইলেও, কমিউনিস্টগণ গেরিলা-যুদ্ধকৌশল গ্রহণ করিয়া জাপ-বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। কিন্তু কমিউনিস্টদের সম্পর্কে কুয়ো-মিং-তাং নেতৃবর্গের যথেষ্ট সন্দেহ থাকায়, উহারা কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ যথাসম্ভব সীমিত রাখার চেষ্টা করেন। কুয়ো-মিং-তাং নেতাদের এই মনোভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়া ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্টগণ

কুয়ো-মিং-তাং ও কমিউনিস্ট সহযোগিতা

কিয়াং-সিও ফুকিয়েন অঞ্চলে কুয়ো-মিং-তাং দলের সহিত আঞ্চলিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই অবস্থায় জাপানের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হয়; এবং এই কারণে চিয়াং-কাই-শেক দুই দলের মধ্যে মধ্যস্থতা করিয়া অন্তর্বিপ্লবের সম্ভাবনা দূর করেন, কিন্তু তাহা হইলেও দুই দলের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কের বিশেষ কোন উন্নতি হইল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চীনের গুরুত্ব

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার নৌ-ঘাঁটি পার্ল বন্দর আক্রমণ করিলে চীন-জাপান যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধের অঙ্গরূপে পরিণত হয়। জাপান ইতিমধ্যেই চীনের উপকূলের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করিয়া লইয়াছিল। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিত্রপক্ষের অধিকাংশ অঞ্চল জাপানের হস্তগত হওয়ায়, পশ্চিমা ভূখণ্ড হইতে চীন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ফলে মিত্রপক্ষের নিকট হইতে কোন সাহায্য চীনে আসা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় চিয়াং-কাই-শেক চুং কিং-এ রাষ্ট্রের প্রধান কার্যালয় সরাইয়া লইয়া যান। এশিয়া ভূখণ্ডে জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য চীনের সাহায্য মিত্রপক্ষের নিকট একান্ত প্রয়োজন ছিল। আকাশপথে সমরোপকরণ ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রী চীনে পাঠাইবার ব্যবস্থা হয় এবং মিত্রপক্ষ নানাভাবে চীনকে সাহায্য করিয়া যাইতে থাকে।

জাপানের বিরুদ্ধে চীনের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সমগ্র বিশ্বকে চমৎকৃত করে। পার্ল বন্দরের পতনের পূর্বে জাপানের চীন-জয় সম্পন্ন হইলে বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি ভিন্ন রূপ ধারণ করিত এবং সমগ্র পূর্ব-এশিয়ায় জাপানের প্রভুত্ব স্থাপিত হইত। চীনের এই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের স্বীকৃতি হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন চীনে তাহাদের বিশেষ স্বার্থ ও অতিরাষ্ট্রিক-ক্ষমতা (extra-territorial right) স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে ও বিশ্বের এক অন্যতম রাষ্ট্র হিসাবে চীনকে স্বীকার করিয়া লয়। এই স্বীকৃতির সুবাদেই চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা-পরিষদে স্থায়ী সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয় এবং ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও সোভিয়েট রাশিয়ার সম-মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত কায়রো-সম্মেলনে রুজভেল্ট ও উইন্স্টন চার্চিলের সহিত চীন-প্রেসিডেন্ট চিয়াং-কাই-শেকও যোগ দেন। ফলে চীনের জাতীয়তাবাদী সরকারের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান চীনে অন্তর্বিপ্লবের পুনরাবৃত্তি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে চীনের অন্তর্বিপ্লব পুনরায় প্রবল আকার ধারণ করে। ইওরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের ও আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও চিয়াং-কাই-শেক তথা কুয়ো-মিং-তাং সরকারের পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হইয়া উঠে। প্রায় কুড়ি বৎসর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া কুয়ো-মিং-তাং সরকার অতিরিক্ত মাত্রায় দুর্নীতিগ্রস্ত, অকর্মন্য ও অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করিতে চীনা সরকারের অক্ষমতা এবং ধনী সম্প্রদায়কে অধিকতর ধনশালী হইবার সুযোগ দেওয়ায় জনসাধারণের আর্থিক দুর্দশা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উপরন্তু দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি

কারণে জনসাধারণের দুর্দশা চরমে উঠিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্টদের প্রভাবও বিস্তারলাভ করিতে থাকে।

১৯৪৫ হইতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনে অন্তর্যুদ্ধ চলে। জাপানের আত্মসমর্পণের সময় চীনের জাতীয়তাবাদী সৈন্যগণের অধিকাংশই দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে অবস্থান করিতেছিল। অপরদিকে কমিউনিস্ট সৈন্যগণ উত্তর ও উত্তর-পূর্ব চীনে অবস্থান করায় জাপানের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব চীনে জাপানের সমুদয় যুদ্ধোপকরণ কমিউনিস্টদের হস্তগত হয়। ইহার ফলে কমিউনিস্টদের শক্তিবৃদ্ধি পায়। উপরন্তু ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনা কমিউনিস্টগণ রুশ সৈন্যবাহিনীর সহিত মিলিত হইবার জন্য মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং এই অঞ্চল হইতে রুশ-বাহিনী অপসারিত হইলে তাহা কমিউনিস্টদের হস্তগত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে চীনা কমিনিউস্টদের সুবিধা ও শক্তিবৃদ্ধি

কমিউনিস্টদের শক্তিবৃদ্ধি হওয়ায় উহারা বিনা সংগ্রামে উহাদের সুযোগ-সুবিধা "প্রতিক্রিয়াশীল" জাতীয়তাবাদীগণের নিকট সমর্পণ করিতে মোটেই রাজী ছিল না। ফলে জাতীয়তাবাদীগণের সহিত কমিউনিস্টগণের উন্মুক্ত সংগ্রামের সূত্রপাত হয়।

উন্মুক্ত সংগ্রামের সূত্রপাত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিয়াং-সরকারকে চীনের আইনসঙ্গত সরকার বলিয়া স্বীকার করে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে চীনের অন্তর্যুদ্ধের অবসানের জন্যও উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে। কমিউনিস্ট ও চীনা জাতীয়তাবাদীগণের মধ্যে আলাপ-আলোচনার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান জর্জ মার্শালকে চীনে প্রেরণ করেন। মার্শাল কমিউনিস্ট ও জাতীয়তাবাদীগণের মধ্যে যুদ্ধবিরতি স্থাপন করিতে সমর্থ হন এবং চুং-কিং-এ একটি সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে চীনের জন্য একটি নূতন শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত করা হয় এবং ইহার দ্বারা স্থির হয় যে এই খসড়া শাসনতন্ত্রের আলোচনার জন্য শীঘ্রই একটি জাতীয়-সভা (National Assembly) আহ্বান করা হইবে।

চীনের অন্তযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ

সর্বদলীয় সম্মেলন

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যদিও কমিউনিস্ট ও জাতীয়তাবাদীগণ যুদ্ধবিরতির আদেশ দিয়াছিল, তথাপি কোন পক্ষই তাহা বজায় রাখিতে উৎসাহী ছিল না। পিপিং-মুকদেন রেলপথ চীনা-কমিউনিস্টদের দখলে থাকায় জাতীয়তাবাদীগণ মাঞ্চুরিয়া পুনর্দখল করিতে অসমর্থ হয়। অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবহরের সাহায্যে জাতীয়তাবাদী সৈন্যগণ মাঞ্চুরিয়ায় অবতরণ করে এবং দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া দখল করে। জর্জ মার্শালের মধ্যস্থতায় চিয়াং-কাই-শেক কমিউনিস্টদের সহিত মীমাংসার জন্য আলাপ-আলোচনা চালাইতে সম্মত হন এবং তিনি কমিউনিস্টগণকে পনেরো দিনের সময় দেন। কিন্তু কমিউনিস্টগণ চিয়াং-এর প্রস্তাবে অসম্মত হয় এবং

জাতীয়তাবাদীগণ কর্তৃক দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া দখল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের প্রতিবাদ

চীনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য মার্কিন সরকারকে অভিযুক্ত করে।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে চিয়াং-সরকার কমিউনিস্টদের সহিত পরামর্শ না করিয়াই জাতীয়-সভা আহ্বান করেন। কমিউনিস্টগণ ইহাতে যোগদান না করায় জাতীয়তাবাদীগণ সভার কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। কিছু দিন বিতর্ক চলিবার পর চিয়াং-কাই-শেক চীনের নূতন শাসনতন্ত্রের কথা ঘোষণা করেন। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে চীনে জাতীয়-সভার জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পিপিং ও তিয়েনসিন ছাড়া সমগ্র উত্তর-চীন এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিল না। উত্তর-চীন ছিল কমিউনিস্টদের অধিকারভুক্ত। নূতন জাতীয়-সভা চীনকে প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিল এবং চিয়াং-কাই-শেক প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হন।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচন : কমিউনিস্টগণ কর্তৃক তাহা বর্জন

ইতিমধ্যে ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্টদের নিকট জাতীয়তাবাদীগণের ক্রমান্বয়ে পরাজয় ঘটিতে থাকে। মাঞ্চুরিয়া পুনরায় জাতীয়তাবাদীগণের হস্তচ্যুত হয় এবং হোপে, সাংহাই, সানসি, হোনান প্রভৃতি প্রদেশগুলি একের পর এক কমিউনিস্টদের হস্তগত হয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে প্রায় এক লক্ষ জাতীয়তাবাদী সৈন্য কমিউনিস্টদের হস্তে বন্দী হয় এবং প্রচুর যুদ্ধোপকরণ উহাদের হস্তগত হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত জাতীয়তাবাদী সৈন্য ও সামরিক কর্মচারীদের নিকট হইতে কমিউনিস্টগণ প্রচুর যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহা জাতীয়তাবাদী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে নিয়োগ করে। উইলিয়াম বুলিট (Wiliam Bullitt) নামে জনৈক আমেরিকার সামরিক কর্মচারীর মতে সেই সময় চীনের জাতীয়তাবাদী সেনাপতিদের অর্ধাংশ এবং জাতীয়তাবাদী সৈনিকদের এক-তৃতীয়াংশ ছিল অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাতীয়তাবাদীগণের বিপর্যয়

চীনের জাতীয়তাবাদীগণের এই বিপর্যয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিল না। রাশিয়ার সহিত 'ঠাণ্ডা-লড়াই' এবং গণতান্ত্রিক দেশগুলির নিরাপত্তা প্রভৃতি কারণে অ-কমিউনিস্ট চীনকে সাহায্য করার প্রয়োজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিদ্‌গণ অনুভব করেন। ফলে মার্কিন কংগ্রেস চিয়াং-সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্যদানের নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু তথাপি চীনে জাতীয়তাবাদীগণের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতে থাকে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মুকদেন চীনা কমিউনিস্টদের হস্তগত হয়। ইহার পর তিন মাসের মধ্যে কমিউনিস্টগণ তিয়েন, পিপিং, সু-চৌ দখল করিয়া ইয়াং-সি নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এই অবস্থায় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে চিয়াং-সরকারকে পুনর্গঠিত করা হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিয়াং সরকারকে প্রচুর ঋণ দান করে। এমন কি চিয়াং-কাই-শেক স্বয়ং আমেরিকায় আগমন করিয়া

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চীনকে সাহায্য করার নীতি গ্রহণ

মার্কিন সরকারের নীতির পরিবর্তন

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নিকট চীনের পরিস্থিতি উপস্থাপন করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আমেরিকায় চিয়াং-সরকারের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকায় মার্কিন সরকার চিয়াং-সরকারকে সাহায্য করিতে বিরত হন এবং ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে মার্কিন সামরিক কর্মচারী ও মার্কিন যুদ্ধ-জাহাজ চীন হইতে অপসারণ করেন।

রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন : চিয়াং কর্তৃক প্রেসিডেণ্ট পদ ত্যাগ (১৯৪৯)

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে চীনে রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। কমিউনিস্ট নেতা মাও-সে-তুং শান্তির শর্ত হিসাবে চিয়াং-কাই-শেক ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের শাস্তির দাবি করেন। চিয়াং-কাই-শেক প্রেসিডেণ্ট-পদ হইতে নিজের অবসরগ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। চীন প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি লি-সুং-জেন (Li-Tsung-Jen) মাও-সে-তুং-এর সহিত আলাপ-আলোচনা করার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন।

কমিউনিস্টদের দ্রুত অগ্রগতি ও কমিউনিস্ট চীন সরকারের প্রতিষ্ঠা

ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট বাহিনী দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। জাতীয়তাবাদী সরকার নানকিং পরিত্যাগ করিলে কমিউনিস্ট নেতাগণ তাহা দখল করে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কমিউনিস্টগণ পিকিং-কে রাজধানী করিয়া চীনে প্রজাতন্ত্রের (Chinese People's Republic) প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে। মাও-সে-তুং এই প্রজাতন্ত্রের সভাপতি নির্বাচিত হন। সেই বৎসরের অক্টোবর মাসে ক্যাণ্টন কমিউনিস্টদের হস্তগত হইলে চীনের মূল ভূখণ্ডে জাতীয়তাবাদীগণের সকল প্রতিরোধ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং অন্তর্যুদ্ধের অবসান ঘটে। চিয়াং-কাই-শেক ও তাঁহার জাতীয়তাবাদী দল ফরমোসা দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তথায়

ফরমোসায় জাতীয়তাবাদীগণের আশ্রয় গ্রহণ : বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক কমিউনিস্ট চীনের স্বীকৃতি : রাশিয়া ও কমিউনিস্ট চীনের মধ্যে চুক্তি

চীনা জাতীয়তাবাদী সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া, ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, ব্রিটেন, ডেনমার্ক ও সুইডেন চীনের কমিউনিস্ট সরকারকে স্বীকার করিল, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহা করিল না। সোভিয়েট রাশিয়া কমিউনিস্ট চীনকে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট চীন ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার শর্তানুসারে উভয় রাষ্ট্র যুগ্মভাবে চীনকে জাপান ও জাপানের মিত্রবর্গের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হয় এবং মঙ্গোলিয়ার প্রজাতন্ত্র ও ইন্দোচীনের ভিয়েতমিন সরকারকে স্বীকার করিয়া লয়।

২২.২. কমিউনিস্টদের সাফল্যের কারণ (Causes of Communist Success) :

চীনের জাতীয়তাবাদী সরকারের বিপুল সম্পদ ও সুসজ্জিত সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি কারণে কমিউনিস্ট দল শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ করে।

প্রথমতঃ, কুয়ো-মিং-তাং দলের ক্রমক্ষীয়মান দুর্বলতা কমিউনিস্টদের সাফল্যের প্রধান

কারণ। জাপানী আক্রমণের ব্যাপকতা ও দীর্ঘকাল ধরিয়া জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জাতীয়তাবাদী সরকারের ধৈর্য ও সম্পদ প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহার ক্রমক্ষীয়মান সামরিক শক্তি কমিউনিস্টদের শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, কুয়ো-মিং-তাং সরকারের ও সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি সেনাবাহিনী পরিচালনার ক্ষেত্রে অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সামরিক ও বে-সামরিক কর্মচারীগণ যুদ্ধোপকরণ ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় নিয়োগ করিয়া সামরিক তৎপরতার পথে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছিল। সামরিক ও বে-সামরিক কর্মচারীদের দুর্নীতি চীনা জনগণের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছিল, যাহার ফলে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চীনা জনগণকে সামিল করা সম্ভব হয় নাই। উপরন্তু কুয়ো-মিং-তাং জনগণের সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া সমর-নায়কও জমিদারদের উপরই অতিরিক্ত মাত্রায় নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে জনগণের নিকট হইতে কুয়ো-মিং-তাং বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। অপরদিকে কমিউনিস্টগণ কৃষক ও সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভে সমর্থ হইয়াছিল এবং দলে দলে লোক কমিউনিস্টদের সহিত যোগ দিয়া কমিউনিস্টদের প্রভাব ও শক্তি বৃদ্ধি করে। তৃতীয়তঃ, কমিউনিস্ট বাহিনী ছিল সুশৃঙ্খল ও সাম্যবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ। জাতীয়তাবাদী সৈন্যদের ন্যায় কমিউনিস্ট সেনারা কখনও বে-সামরিক জনগণ ও নারীদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করে নাই। ফলে কমিউনিস্টদের জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। সুতরাং একদিকে কুয়ো-মিং-তাং দলের দুর্বলতা ও অপরদিকে কমিউনিস্টদের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও জনপ্রিয়তা উহাদের সাফল্য সুনিশ্চিত করে। চতুর্থতঃ, জাপান চীন পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময়, প্রচুর পরিমাণে জাপানী রণসম্ভার কমিউনিস্টদের হস্তগত হয় এবং বহু জাতীয়তাবাদী সৈন্য উহাদের নিকট বন্দী হয়। ফলে উন্নতমানের জাপানী অস্ত্রশস্ত্র কমিউনিস্টদের শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক হয় এবং অপরদিকে লক্ষাধিক সৈন্য হারাইয়া কুয়ো-মিং-তাং সরকার দুর্বল হইয়া পড়েন।

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত চীনে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ ২২.১.]

২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে চীনে কুয়ো-মিং-তাং ও কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ ২২.১.]

৩। চীনে কুয়ো-মিং-তাং এর বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের সাফল্যের কারণ কি? [উঃ ২২.২.]

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান

(U. N. O.)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (The United Nations)

২৩.১. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি (Origin of the U. N. O.)ঃ ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই লীগ-অফ-নেশনস্-এর অস্তিত্ব একরূপ বিলুপ্ত হইয়া যায়। জাপান, ইটালী ও জার্মানীর আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ এবং অপরদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে অপরাপর বৃহৎ শক্তিগুলির নির্লিপ্ততা প্রভৃতি কারণে লীগ-অফ-নেশনস্-এর সমাধি হয়। বিশ্বে বলসাম্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে বৃহৎ শক্তিবর্গ পুনরায় রাষ্ট্রজোট গঠনের ও আঞ্চলিক চুক্তি সম্পাদনের পূর্বতন নীতি গ্রহণ করে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। দ্বিতীয়বার বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা, নূতন নূতন মারণাস্ত্রের ব্যবহার, অগণিত সামরিক ও বে-সামরিক ব্যক্তির প্রাণনাশ ও সম্পত্তির বিনাশ প্রভৃতি ঘটনা বিশ্ববাসীকে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য ব্যাকুল করিয়া তোলে এবং একটি সুগঠিত ও অধিক শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রয়োজন অনুভব করে। কেহ কেহ লীগ-অফ-নেশনস্-কে পুনরুজ্জীবিত করার কথা চিন্তা করে। কিন্তু বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রবিদ্‌গণ বিশ্ববাসীর মনে নূতন আশার সঞ্চার করিতে পারে এমন এক প্রতিষ্ঠান গঠনের সংকল্প গ্রহণ করেন। এই সংকল্প হইতেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয়।

আতলান্তিক চার্টার-এর উদ্দেশ্য

ইউনাইটেড নেশনস্ বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নামে আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের চেষ্টা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই শুরু হইয়াছিল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে লন্ডন-ঘোষণাপত্রে (London Declaration) ব্রিটেন, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রতিনিধিগণ বিশ্বের স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আঞ্চলিক রাষ্ট্রজোটের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রথম প্রস্তাব করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে আতলান্তিক মহাসাগরে একটি জাহাজে (Prince of Wales) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আতলান্তিক-চার্টার (Atlantic Charter) নামে এক সনদ ঘোষণা করেন। এই সনদের উদ্দেশ্যগুলি ছিল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা ; সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও সমতার ভিত্তিতে সকল জাতির মধ্যে সৌহার্দ্য গড়িয়া তোলা ; বিশ্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্থাপন করা এবং জাতীয় স্বাধীনতা, মানুষের

মৌলিক অধিকার ও মর্যাদা স্বীকার করা। এই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আতলান্তিক সনদে ঘোষণা করা হয় যে, (১) সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ ছোট ও বড় সকল দেশের সার্বভৌমত্ব ও সম-অধিকার স্বীকার করিবে, (২) যুদ্ধ বা ভীতি প্রদর্শন করার পরিবর্তে সকল প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্পত্তি করিবে, (৩ চুক্তি-ভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সনদ-স্বাক্ষরকারী অপরাপর রাষ্ট্রবর্গ জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিবে, (৪) পররাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণ করার ব্যাপারে সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনসাধারণের মতামত অগ্রাহ্য করিবে না, (৫) প্রত্যেক দেশের জনসাধারণ নিজেদের ইচ্ছামত শাসনতন্ত্র গঠন করার অধিকার লাভ করিবে, (৬) ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকল দেশের সম-অধিকার স্বীকার করা হইবে, (৭) নাৎসী জার্মানীর পতনের পর সকল দেশ যাহাতে বৈদেশিক আক্রমণের ভয় ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় হইতে মুক্ত হইয়া অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন-কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে সেইরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতে সকলে যত্নবান থাকিবে এবং (৮) অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সাজসরঞ্জাম হ্রাস করিয়া বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিতে সকল রাষ্ট্র সমভাবে যত্নবান থাকিবে।

আতলান্তিক চার্টার-এর শর্তাদি

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ওয়াশিংটন শহরে ২৬টি দেশের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণাপত্র (United Nations Declaration) স্বাক্ষর করেন। এই ঘোষণাপত্রে আতলান্তিক চার্টার-এর সকল শর্তগুলি সন্নিবিষ্ট করা হয়। ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি সমবেতভাবে শত্রুর সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে এবং পৃথকভাবে শত্রুর সহিত যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষর না করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণাপত্র

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের পররাষ্ট্র-মন্ত্রিগণ মস্কো-ঘোষণাপত্র (Moscow Declaration) স্বাক্ষর করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার নিমিত্ত সম-অধিকারের ভিত্তিতে সকল শান্তিকামী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজন স্বীকার করেন।

ইহার পর ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াল্টা (ক্রিমিয়া) নামক স্থানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্টালিন এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এক অধিবেশন আহ্বান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কিরূপ হইবে তাহাও এই সম্মেলনে স্থির হয়।

ইয়াল্টা-সম্মেলন (১৯৪৫)

ইয়াল্টা-সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে জুন মাসে সান্‌ফ্রান্সিস্কো শহরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা ইউনাইটেড নেশনস্-এর প্রথম অধিবেশন বসে। এই অধিবেশন বিশ্বের ৫৫টি রাষ্ট্র ইউনাইটেড নেশনস্-এর চার্টার বা সনদ স্বাক্ষর করে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর হইতে ইউনাইটেড নেশনস্ প্রকৃত কার্যকর হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্মলাভ

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ৫৫টি রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ স্বাক্ষর করিয়াছিল সেই ৫৫টি রাষ্ট্র 'Charter-Members' নামে অভিহিত হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা-পরিষদের (Security Council) সুপারিশক্রমে সাধারণ-সভার (General Assembly) দুই-তৃতীয়াংশ ভোট দ্বারা সমর্থিত যে কোন রাষ্ট্রকে সদস্যরূপে গ্রহণ করার ব্যবস্থাও হয়। ইউনাইটেড নেশনস্-এর সদস্য হইবার শর্ত হইল যে সদস্যপদপ্রার্থী রাষ্ট্রকে 'শান্তি-প্রিয়' হইতে হইবে, সনদের শর্তগুলি মানিয়া চলিতে এবং সনদে সন্নিবিষ্ট দায়িত্বগুলি পালন করিতে সম্মত হইতে হইবে। এস্থলে স্মরণ রাখা দরকার যে, নিরাপত্তা-পরিষদের পাঁচটি প্রধান রাষ্ট্রের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের কুয়ো-মিং-তাং সরকার) 'ভিটো' (Veto) ক্ষমতা রহিয়াছে। এই পাঁচটি রাষ্ট্রের যুগ্ম সমর্থন ভিন্ন কোন নূতন সদস্য গ্রহণ করা সম্ভব নহে। ইউনাইটেড নেশনস্-এর সদস্যপদ হইতে কমিউনিস্ট চীনের বঞ্চিত থাকিবার প্রধান কারণ হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা*।

নূতন সদস্য গ্রহণের শর্ত ও পদ্ধতি

২৩.২. **ইউনাইটেড নেশনস্-এর সংগঠন** : ছয়টি প্রধান সংস্থা লইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত। এই সংস্থাগুলির অধীনে নানা প্রকার শাখা আছে। প্রধান ছয়টি সংস্থা হইল (১) সাধারণ-সভা, (২) নিরাপত্তা-পরিষদ, (৩) দপ্তর, (৪) অছি-পরিষদ, (৫) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ও (৬) আন্তর্জাতিক বিচারালয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য-রাষ্ট্রকে লইয়া সাধারণ-সভা গঠিত। প্রত্যেক রাষ্ট্রের পাঁচজন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। ইহা ভিন্ন প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র প্রয়োজনমত উপদেষ্টা ও বিশেষজ্ঞ লইতে পারিবেন। প্রতি বৎসর সাধারণ-সভার অধিবেশন বসিবে এবং প্রতি অধিবেশনে একজন সভাপতি ও সাতজন উপ-সভাপতি নির্বাচিত হইবেন। নিরাপত্তা-পরিষদ বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের অনুরোধে সাধারণ-সভার বিশেষ অধিবেশনও আহূত হইতে পারে। সাধারণ-সভায় প্রত্যেক রাষ্ট্রের একাধিক ভোট নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চার্টার-এ সন্নিবিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা সাধারণ-সভায় করা চলিবে। ইউনাইটেড নেশনস্ বা নিরাপত্তা-পরিষদের কোন সদস্য অথবা সদস্য নহে এমন কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনার জন্য সাধারণ-সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন করিতে পারিবে। সাধারণ-সভার কোন আইন রচনার ক্ষমতা নাই এবং ইহার সুপারিশগুলি পালন করার ব্যাপারেও কোন বাধ্যবাধকতা নাই। তথাপি ইহার মাধ্যমে বিশ্বের জনমত প্রকাশিত হইবার সুযোগ পায়। আন্তর্জাতিক শান্তি ও

(১) সাধারণ-সভা (General Assembly)

* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার ফলে বহুদিন পর্যন্ত কমিউনিস্ট চীন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করিতে পারে নাই। তবে বর্তমানে চীনের পূর্বতন কুয়ো-মিং-তাং সরকারের পরিবর্তে কমিউনিস্ট চীন এই সংস্থার সদস্যপদ লাভ করিয়াছে।

নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে এমন পরিস্থিতির প্রতি সাধারণ-সভা নিরাপত্তা-পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। নিরাপত্তা-পরিষদের অস্থায়ী সদস্য অছি-পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সকল সদস্য সাধারণ-সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

(২) নিরাপত্তা বা স্বস্তি-পরিষদ (Security Council)

নিরাপত্তা বা স্বস্তি-পরিষদ হইল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যনির্বাহক সমিতি। পাঁচজন স্থায়ী এবং ছয়জন অস্থায়ী—মোট এগারজন সদস্য লইয়া নিরাপত্তা-পরিষদ গঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া ও কমিউনিস্ট চীন হইল স্থায়ী সদস্য। নিরাপত্তা-পরিষদের ছয়জন অস্থায়ী সদস্য দুই বৎসরের জন্য সাধারণ-সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রের 'ভিটো' ক্ষমতা আছে। ভিটো প্রয়োগ দ্বারা যে কোন স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্র নিরাপত্তা-পরিষদে যে কোন সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দিতে পারে। নিরাপত্তা-পরিষদের সদস্য নহে এমন কোন রাষ্ট্র পরিষদের আলোচনায় যোগদান করিতে পারে যদিও উহার ভোটদানের কোন অধিকার নাই। নিরাপত্তা-পরিষদের সভাপতি মাত্র এক মাসের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

পরিষদের দায়িত্ব

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করাই নিরাপত্তা-পরিষদের প্রধান দায়িত্ব ("To the Security Council was entrusted—primary responsibility for the maintenance of international peace and security—Langsam)। বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে পারে এইরূপ সকল বিষয়ে তদন্ত করার এবং সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাহা কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব পরিষদের উপর ন্যস্ত আছে। আইন-সংক্রান্ত বিবাদগুলি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে প্রেরণ করা হইয়া থাকে। সনদ অনুসারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যগণ নিরাপত্তা-পরিষদ কর্তৃক গৃহীত যে কোন সিদ্ধান্ত কার্যকর করিতে বাধ্য থাকেন। কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন করিলে নিরাপত্তা-পরিষদ প্রথমে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যগণকে সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক 'বয়কট' প্রয়োগ করিতে অথবা উহার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পরামর্শ দেয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা ব্যর্থ হইলে নিরাপত্তা-পরিষদ ইউনাইটেড নেশনস্-এর সদস্যগণকে পদাতিক, বিমান ও নৌবহর দিয়া সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতে পারে। সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার ব্যাপারে নিরাপত্তা-পরিষদকে Military Staff Committee-র পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়। যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব Military Staff Committee-র উপর ন্যস্ত করা হইয়া থাকে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোন সদস্য-রাষ্ট্র কোন শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে নিরাপত্তা-পরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত আক্রান্ত সদস্য-রাষ্ট্র নিজের নিরাপত্তার জন্য আঞ্চলিক সামরিক জোট গঠন করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন নিরাপত্তা-পরিষদ সাধারণ-সভার নিকট ইউনাইটেড নেশনস্-এর কোন সদস্যকে বহিষ্কার করার বা নূতন সদস্য গ্রহণ করার সুপারিশ করিতে পারে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি দপ্তর রহিয়াছে। লীগ-অফ-নেশনস্-এর দপ্তরের

অনুকরণে এই দপ্তরটি গঠিত হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে দপ্তরের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কারণ দপ্তরের দক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা নির্ভরশীল। একজন সেক্রেটারী-জেনারেল (Secretary General) কয়েকজন সহকারী সেক্রেটারী ও এক বিশাল সংখ্যক আন্তর্জাতিক কর্মচারী লইয়া এই দপ্তর গঠিত। নিরাপত্তা-পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ-সভা কর্তৃক সেক্রেটারী-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া থাকেন। সাধারণ-সভা, নিরাপত্তা-পরিষদ, অছি-পরিষদ ও অর্থনৈতিক পরিষদে তিনি সেক্রেটারী-জেনারেলের কার্য সম্পাদন করেন। এতদ্ভিন্ন আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন করিতে পারে এমন কোন পরিস্থিতি বা ঘটনার প্রতি তিনি নিরাপত্তা-পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন। দপ্তরটি হইল একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং ইহার কোন কর্মচারী ইউনাইটেড নেশনস্-এর বহির্ভূত কোন রাষ্ট্রের আদেশ বা পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন না। সেক্রেটারী-জেনারেল ও সকল সহকারী সেক্রেটারী-জেনারেলগণ সকল প্রকার কূটনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। দপ্তরের কর্মচারীগণকে উহাদের কার্যের জন্য কোন বিচারালয়ে অভিযুক্ত করা যায় না।

(৩) দপ্তর (Secretariate)

'ম্যাণ্ডেট' রাজ্যসমূহ এবং যে সকল অঞ্চল ইউনাইটেড নেশনস্-এর অধীনে রাখা হইবে সেগুলির শাসনভার অছি-পরিষদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। অছি-ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হইল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা, অছি-শাসনাধীন দেশগুলিকে অগ্রগতির পথে পরিচালিত করা এবং উহাদের স্বাধীনতা লাভে উপযুক্ত করিয়া তোলা। নিরাপত্তা-পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণ এবং সাধারণ-সভা কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যগণকে লইয়া অছি-পরিষদ গঠিত। প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট আছে এবং যে কোন সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলে তাহা কার্যে পরিণত করা হইয়া থাকে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লেক-সাকসেস্ (Lake Success)-এ অছি-পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসিয়াছিল।

(৪) অছি-পরিষদ (Trusteeship Council)

শুধু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শর্তগুলি পালন করার উপরই আন্তর্জাতিক শান্তি নিরাপত্তা নির্ভর করে না। বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি বিষয়ের অগ্রগতির উপরই যথার্থভাবে তাহা নির্ভর করে। এই উদ্দেশ্যে ইউনাইটেড নেশনস্ সাধারণ-সভার পরিচালনাধীনে একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠন করিয়াছে। তিন বৎসরের মেয়াদে সাধারণ-সভা কর্তৃক নির্বাচিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ১৮ জন সদস্যকে লইয়া এই পরিষদ গঠিত। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতার ব্যাপারে এই পরিষদ হইল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যতম অঙ্গ। এই পরিষদের প্রধান কর্তব্য হইল (১) বিশ্বের সকল দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং সেই সম্পর্কে সাধারণ-সভার নিকট রিপোর্ট পেশ করা, (২) সকল দেশের

(৫) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Organisation)

জনগণের মৌলিক মানব-অধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং (৩) সময় সময় আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা। অর্থনৈতিক ও সামাজিক-পরিষদের অধীনে বহু সংস্থা রহিয়াছে। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক, খাদ্য ও কৃষি পরিষদ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা, ইউনাইটেড নেশনস্ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO) ইত্যাদি।

(৬) আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court)

ভূতপূর্ব আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের অনুকরণে জাতিপুঞ্জের আন্তর্জাতিক বিচারালয়টি গঠিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সকল সদস্যই এই বিচারালয়ের সদস্য। নিরাপত্তা-পরিষদের সুপারিশক্রমে এবং সাধারণ-সভার শর্তাধীনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য নহে এইরূপ যে কোন রাষ্ট্র এই বিচারালয়ের অধিবেশনে যোগদান করিতে পারে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য এই বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য। এই বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত বাদী বা প্রতিবাদী পক্ষের মনঃপুত না হইলে সেই পক্ষ নিরাপত্তা-পারষদের নিকট আপীল করিতে পারে। সকল প্রকার আন্তর্জাতিক আইন-সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্রের আইন-সংক্রান্ত বিচারের ভার এই বিচারালয়ের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। পনের জন বিচারপতি লইয়া আন্তর্জাতিক বিচারালয় গঠিত। কোন একটি দেশ হইতে দুই জনের বেশী বিচারপতি নিয়োগ করা যায় না। বিচারপতিগণ নয় বৎসরের মেয়াদে সাধারণ-সভা ও নিরাপত্তা-পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হন।

২৩.৩. **নিরাপত্তা-পরিষদের সহিত সাধারণ-সভার সম্পর্ক :** নিরাপত্তা-পরিষদ (Security Council) ও সাধারণ-সভা (General Assembly)-কে যথাক্রমে ইউনাইটেড নেশনস্-এর সরকারী বিভাগ (Governmental body) ও আলোচনা বিভাগ (Deliberative body) বলা যায়। নিরাপত্তা-পরিষদের প্রধান দায়িত্ব হইল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। অপরদিকে সাধারণ-সভার দায়িত্ব হইল ইউনাইটেড নেশনস্-এর চার্টার-এ সন্নিবিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা করা। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন করিতে পারে এমন কোন বিবাদ বা পরিস্থিতি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের একমাত্র অধিকার হইল নিরাপত্তা-পরিষদের। অবশ্য চার্টার-এর ১৫ ধারা অনুসারে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যাপারে নিরাপত্তা-পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সকল ব্যবস্থার বাৎসরিক রিপোর্ট সাধারণ-সভায় উপস্থাপন করিতে হয়। তবে সাধারণ-সভা নিরাপত্তা-পরিষদের সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে পারে না। কতকগুলি ব্যাপারে সাধারণ-সভা ও নিরাপত্তা-পরিষদ যুগ্মভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যেমন ইউনাইটেড নেশনস্-এর কোন সদস্যকে বহিষ্করণ এবং নূতন সদস্য গ্রহণ করার ব্যাপারে; সেক্রেটারী-জেনারেল নিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিদের নিয়োগ ব্যাপারে। নিরাপত্তা-পরিষদ হইল স্থায়ী কার্যনির্বাহক সংস্থা কিন্তু বৎসরে একবার বার করিয়া সাধারণ-সভার অধিবেশন বসে। অবশ্য ইউনাইটেড নেশনস্-এর সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের কিংবা নিরাপত্তা-পরিষদের অনুরোধে সাধারণ-সভার বিশেষ

অধিবেশনও বসে। সাধারণ-সভা হইল যথার্থ প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা, কিন্তু মাত্র এগারোজন সদস্যকে লইয়া গঠিত নিরাপত্তা-পরিষদকে যথার্থ প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা বলা যায় না।

২৩.৪. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা ইউনাইটেড নেশনস্-এর কার্যাদি (Activities of the United Nations) :

ইউনাইটেড নেশনস্-এর আদর্শ যেমন মহান্ উহার দায়িত্বও তেমন ব্যাপক ও কঠিন। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, মধ্যস্থতার মাধ্যমে ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা, যুদ্ধরত রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে যুদ্ধবিরতি সম্পাদন, আন্তর্জাতিক আইনকানুন প্রণয়ন বা সেগুলির পরিবর্তন, বিশ্বের বৃহত্তর মানবসমাজের সর্ববিধ উন্নয়ন ইত্যাদি ইউনাইটেড নেশনস্-এর কার্যাদির অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমদিকে আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদে হস্তক্ষেপ করিয়া ইউনাইটেড নেশনস্ তেমন আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। তথাপি একথা অস্বীকার করা যায় না যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ইউনাইটেড নেশনস্ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে। লীগ-অফ-নেশনস্-এর ক্ষেত্রে ইহা প্রমাণিত হইয়াছিল যে আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যগণ বিশেষ করিয়া বৃহৎ সদস্য-রাষ্ট্রবর্গ সহযোগিতামূলক মনোভাব প্রদর্শন না করিলে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা সাফল্যলাভ করিতে পারে না। ইউনাইটেড নেশনস্-এর ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

ইউনাইটেড নেশনস্-এর যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি নিরাপত্তা-পরিষদ স্বতন্ত্রভাবে অথবা সাধারণ-সভার সহিত পরামর্শ করিয়া সম্পাদন করে। সুষ্ঠুভাবে নিরাপত্তা-পরিষদের দায়িত্ব পালনের পথে প্রধান অন্তরায় হইল উহার সদস্যদের 'ভিটো' ক্ষমতা। প্রথমদিকে সোভিয়েট রাশিয়া যথেচ্ছভাবে 'ভিটো' ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া নিরাপত্তা-পরিষদের কার্যে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া ৫৭টি ক্ষেত্রে 'ভিটো' ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে ফ্রান্স মাত্র দুইটি ক্ষেত্রে 'ভিটো' ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়াছিল।

প্রতিষ্ঠার পর প্রথম পাঁচ বৎসর ইউনাইটেড নেশনস্ উহার কর্তব্য কার্যাদি সম্পাদনের ব্যাপারে কি করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা নিম্নে আলোচিত হইল।

(১) সোভিয়েট রাশিয়া ও ইরানের মধ্যে বিবাদ

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইরান সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউনাইটেড নেশনস্-এ অভিযোগ আনিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এক চুক্তি অনুসারে সোভিয়েট বাহিনী ইরানে মোতায়েন করা হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধাবসানেও সোভিয়েট রাশিয়া উহার সৈন্যবাহিনী অপসারণ না করিলে এবং ইহা ভিন্ন ইরানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে থাকিলে ইরান অভিযোগ করে। রাশিয়া ইরানের অভিযোগ অস্বীকার করে। এই অবস্থায় নিরাপত্তা-পরিষদ এই বিবাদের আলোচনা কয়েক মাসের জন্য মুলতুবি রাখে। ইতিমধ্যে ইরান হইতে রুশবাহিনী অপসারিত হইলে বিবাদের অবসান হয়।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সোভিয়েট রাশিয়া গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিল যে গ্রীসে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর অবস্থান এবং গ্রীসের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্রিটেনের হস্তক্ষেপ সেই অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। গ্রীস রাশিয়ার এই অভিযোগ অস্বীকার করিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ করে যে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি গ্রীক-সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস-বাদীগণকে সাহায্য করিতেছে। নিরাপত্তা-পরিষদে রাশিয়া, গ্রীস, বিটেন ও যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র উহাদের মতামত ব্যক্ত করে। গ্রীক-সরকার কর্তৃক বিটিশ সৈন্য গ্রীসে আহূত হইয়াছে এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া নিরাপত্তা-পরিষদ এই বিবাদের আলোচনা বন্ধ করে।

(২) গ্রীস ও রাশিয়ার মধ্যে বিবাদ

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইউক্রেন অভিযোগ করে যে ইন্দোনেশীয়গণের বিরুদ্ধে বিটিশ ও জাপ-বাহিনী ব্যবহার করা হইতেছে এবং ইহার ফলে সেই অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এই বিষয়ের তদন্তের জন্য ইউক্রেনের প্রতিনিধিগণ একটি কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব করেন। কিন্তু এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। অপরদিকে নেদারল্যান্ডের প্রতিনিধিগণ ইন্দোনেশিয়ায় ইউনাইটেড নেশনস্-এর হস্তক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেন। ফলে নিরাপত্তা-পরিষদ এই বিষয়ের আলোচনা বন্ধ করে।

(৩) ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ইউক্রেনের অভিযোগ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সিরিয়া ও লেবাননে ইংগ-ফরাসী সৈন্য মোতায়েন করা হইয়াছিল, যদিও উভয় রাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধাবসানে ইংগ-ফরাসী সৈন্য সিরিয়া ও লেবাননে অবস্থান করিতে থাকিলে উভয় রাষ্ট্র ইহার বিরুদ্ধে ইউনাইটেড নেশনস্-এর নিকট অভিযোগ আনে (১৯৪৬ খ্রীঃ)। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিটেন ও ফ্রান্স উহাদের সৈন্যবাহিনী অপসারণ করিয়া লইলে বিবাদের অবসান হয়।

(৪) সিরিয়া ও লেবাননের অভিযোগ

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পোল্যান্ড নিরাপত্তা-পরিষদের নিকট এই অভিযোগ উপস্থাপন করে যে স্পেনের ফ্রাঙ্কো-সরকার শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন করিয়া তুলিতেছেন। পোল্যান্ড প্রস্তাব করিল যে ইউনাইটেড নেশনস্-এর সকল সদস্য-রাষ্ট্র কর্তৃক স্পেনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হউক। স্পেনের পরিস্থিতি তদন্ত করার জন্য একটি সাব-কমিটি নিযুক্ত করা হয়। ফ্রাঙ্কো-সরকার ফ্যাসিবাদী হইলেও তাহা শান্তি বিপন্ন করিতেছেন, কমিটি তাহা স্বীকার করিল না। পোল্যান্ড পুনরায় একই অভিযোগ উপস্থাপন করিলে নিরাপত্তা-পরিষদ এই বিষয়টি সাধারণ-সভার নিকট উপস্থাপন করে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে সাধারণ-সভা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া আন্তর্জাতিক সকল সংস্থা হইতে ফ্রাঙ্কো-সরকারকে বহিষ্কার করিয়া দেয় এবং ইউনাইটেড নেশনস্-এর সকল সদস্য-রাষ্ট্রকে স্পেনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু ইতিমধ্যে স্পেনে ফ্রাঙ্কোর অধীনে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে সাধারণ-সভা উহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে।

(৫) স্পেনের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের অভিযোগ

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ভারত দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করে যে দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকার তথায় সংখ্যালঘু ভারতীয়দের উপর অত্যাচার করিতেছেন। কিন্তু সাধারণ-সভা কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মত হয়।

(৬) দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের অভিযোগ

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে গ্রীসের প্রশ্নটি পুনরায় নিরাপত্তা-পরিষদের নিকট উপস্থিত হয়। ইউক্রেন পুনরায় অভিযোগ করে যে গ্রীসের রাজনীতি বল্‌কান অঞ্চলে শান্তি বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ইহার প্রত্যুত্তরে গ্রীস অভিযোগ করে যে যুগোশ্লাভিয়া, আলবানিয়া ও বুলগেরিয়া গ্রীক-সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবীগণকে প্ররোচিত করিতেছে। উভয় পক্ষের অভিযোগ তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে নিরাপত্তা-পরিষদে কমিশনের রিপোর্ট আলোচিত হয়। নিরাপত্তা-পরিষদের অধিকাংশ সদস্যগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, গ্রীসের কমিউনিস্টভাবাপন্ন বিপ্লবীগণকে যুগোশ্লাভিয়া, আলবানিয়া ও বুলগেরিয়া সাহায্য করিতেছে। কিন্তু কমিশনের সোভিয়েট রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের সদস্যগণ গ্রীসের পরিস্থিতির জন্য গ্রীক-সরকারকে দায়ী সাব্যস্ত করেন। নিরাপত্তা-পরিষদ কোন সিদ্ধান্তে পেঁছিতে অসমর্থ হইলে গ্রীসের বিষয়টি সাধারণ-সভায় আলোচিত হয়। সাধারণ-সভা যুগোশ্লাভিয়া, আলবানিয়া ও বুলগেরিয়াকে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে উহাদের বিবাদ মিটাইয়া ফেলিবার এবং গ্রীসের কমিউনিস্ট বিপ্লবীগণকে কোনরূপ সাহায্য দান না করিবার নির্দেশ দেয়। যুগোশ্লাভিয়া এই নির্দেশ পালন করে। ইতিমধ্যে গ্রীসে কমিউনিস্ট বিপ্লব দুর্বল হইয়া পড়িলে গ্রীসের ব্যাপারটি একরূপ চাপা পড়িয়া যায়।

(৭) পুনরায় গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযোগ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান কর্তৃক ইন্দোনেশিয়া অধিকৃত হইয়াছিল। ইন্দোনেশিয়া ছিল হল্যাণ্ডের একটি উপনিবেশ। যুদ্ধাবসানে জাপানের সৈন্যবাহিনী ইন্দোনেশিয়া ত্যাগ করিলে ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদীগণ তথায় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা অস্বীকার করিলে উভয়-পক্ষে প্রকাশ্য যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়া ও ভারত ইন্দোনেশিয়ার পরিস্থিতি আলোচনার জন্য নিরাপত্তা-পরিষদের নিকট আবেদন করে। নিরাপত্তা-পরিষদ একটি কমিটি নিযুক্ত করে। এই কমিটির প্রচেষ্টায় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হল্যাণ্ড ও ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু অনতিকাল মধ্যে হল্যাণ্ড এই চুক্তিভঙ্গ করিয়া ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে পুনরায় সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই অবস্থায় নিরাপত্তা-পরিষদ ওলন্দাজ-সরকারকে ইন্দোনেশিয়ার সহিত যুদ্ধ বন্ধ করিতে, ইন্দোনেশিয়ার সকল রাজনৈতিক বন্দীগণকে মুক্ত করিতে এবং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যে ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে

(৮) ইন্দোনেশিয়া

ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে নির্দেশ দেয়। হেগ-সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ওলন্দাজ-সরকার ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করিয়া লয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়া ইউনাইটেড নেশনস্-এর সদস্যপদ লাভ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে জাপান কর্তৃক কোরিয়া অধিকৃত হইয়াছিল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কায়রো-সম্মেলনে চীন, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ স্থির করেন যে জাপানের অধিকার হইতে মুক্ত করিয়া কোরিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করা হইবে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত পোর্টস্ডাম-সম্মেলনে কোরিয়া সম্পর্কে কায়রো-সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়। সোভিয়েট রাশিয়াও কোরিয়া সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াছিল।

(২) কোরিয়া

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধাবসানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী কোরিয়ায় প্রবেশ করিয়া তাহা দখল করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে কোরিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে (যথা দক্ষিণাংশ ও উত্তরাংশ অর্থাৎ ৩৮° দ্রাঘিমারেখার উত্তরাংশ)। যাহা হউক, এই দুই অংশকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চলে। কিন্তু রাশিয়া এই বিষয়ে বাধার সৃষ্টি করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইউনাইটেড নেশনস্-এর নিকট কোরিয়ার প্রশ্নটি উপস্থাপন করে। ইউনাইটেড নেশনস্-এর সাধারণ-সভা একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়া উহার তত্ত্বাবধানে সমগ্র কোরিয়ায় এক নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের প্রস্তাব করে। রাশিয়া এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া ইউনাইটেড নেশনস্-এর কোন কমিশনের উত্তর-কোরিয়ায় আগমন নিষিদ্ধ করে। যাহা হউক, ইউনাইটেড নেশনস্ কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনের তত্ত্বাবধানে দক্ষিণ-কোরিয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং তথায় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রজাতন্ত্রের রাজধানী হইল সিওল এবং ইহার প্রথম প্রেসিডেণ্ট সিংগম্যান রী (Syngman Rhee)। সেই বৎসর কোরিয়া ইউনাইটেড নেশনস্-এর সদস্যপদ লাভ করে।

ইতিমধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে উত্তর-কোরিয়ায় 'গণতান্ত্রিক জনসাধারণের প্রজাতন্ত্র' (Democratic People's Republic) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ ও ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠিতে থাকিলে কোরিয়ার পরিস্থিতিও বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে উত্তর-কোরিয়া দক্ষিণ-কোরিয়া আক্রমণ করিলে পরিস্থিতি আরও জটিল হইয়া উঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে নিরাপত্তা-পরিষদ পুনরায় কোরিয়ার পরিস্থিতির আলোচনা শুরু করে। এই আলোচনায় সোভিয়েট রাশিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া যোগদান হইতে বিরত থাকে। নিরাপত্তা-পরিষদের অবশিষ্ট নয়জন সদস্য উত্তর-কোরিয়াকে অভিযুক্ত করিয়া উহাকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার নির্দেশ দেন এবং সেই সঙ্গে ইউনাইটেড নেশনস্-এর সকল সদস্য-রাষ্ট্রকে এই প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য সাহায্যদানের অনুরোধ করেন। ইতিমধ্যে উত্তর-কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ-কোরিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিওল-সরকারের সাহায্যে একদল

মার্কিন সৈন্য প্রেরণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও ইউনাইটেড নেশনস্-এর নির্দেশক্রমে ১৫টি সদস্য-রাষ্ট্র দক্ষিণ-কোরিয়ায় সামরিক সাহায্য প্রেরণ করে। ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট চীন উত্তর-কোরিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়া দক্ষিণ-কোরিয়া আক্রমণ করিলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। ইউনাইটেড নেশনস্ চীনকে 'আক্রমণকারী' দেশ বলিয়া ঘোষণা করে। ইউনাইটেড নেশনস্ কোরিয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া দুই অংশকে ঐক্যবদ্ধ করিতে আজিও সফল হয় নাই।

ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলির ন্যায় কাশ্মীরও ইংল্যাণ্ডের প্রত্যক্ষ অধীনে ছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের অবসান ঘটিলে দেশীয় রাজ্যগুলির উপরও ইংল্যাণ্ডের প্রত্যক্ষ শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের স্বাধীনতা-আইন অনুসারে দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারত-ইউনিয়ন অথবা পাকিস্তানের সহিত সংযুক্ত হইবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীর, জম্মু ও হায়দ্রাবাদ ভিন্ন অপর সকল দেশীয় রাজ্য ভারত-ইউনিয়নে যোগদান করে।

(১০) কাশ্মীর

ভারতের উত্তরে ৮৪,৪৭১ স্কোয়ার মাইল জুড়িয়া কাশ্মীর-জম্মু রাজ্যটি অবস্থিত। উত্তর-পূর্বে তিব্বত, উত্তরে চীন-তুর্কীস্থান, উত্তর-পশ্চিমে তুর্কীস্থানের সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র ও আফগানিস্থান, পশ্চিমে পাকিস্তান এবং দক্ষিণে ভারত-ইউনিয়ন দ্বারা এই রাজ্যটি পরিবেষ্টিত। ইহার শাসক হইলেন হিন্দু, কিন্তু প্রজাবর্গের মধ্যে মুসলমানগণ হইলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কাশ্মীরের মহারাজা সরকারী ভাবে ভারত-ইউনিয়নের সহিত যোগদান করেন।

ভারত-বিভাগের অব্যবহিত পরেই কাশ্মীর দখল করার অভিপ্রায়ে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র শুরু হয়। পাকিস্তান-সরকারের সমর্থনে উপজাতীয় হানাদারদের একাধিক দল কাশ্মীর ও জম্মু আক্রমণ করে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধ এড়াইবার উদ্দেশ্যে ভারতসরকার ইউনাইটেড নেশনস্-এর নিকট একটি স্মারক-লিপি পাঠাইয়া পাকিস্তান কর্তৃক হানাদারগণকে সাহায্যদান বন্ধ করার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। ইউনাইটেড নেশনস্ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কমিশন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করে। কিছুদিন আলাপ-আলোচনা চলিবার পর উভয়পক্ষ যুদ্ধবিরতি স্বীকার করিয়া লয়।

দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কাশ্মীর-সমস্যার কোন সুষ্ঠু সমাধান ইউনাইটেড নেশনস্ করিতে পারে নাই। একের পর এক ম্যাকনাটেন, ডিক্সন, জেরিং প্রভৃতি বিভিন্ন কমিশন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর-সংক্রান্ত বিরোধের অবসান করিবার উদ্দেশ্যে কাশ্মীরে আগমন করিয়া শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ইউনাইটেড নেশনস্ পাকিস্তানকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে কাশ্মীরের ব্যাপারে ইউনাইটেড নেশনস্ ন্যায়নীতি অনুসরণ করে নাই।

২৩.৫. ইউনাইটেড নেশনস্ ও লীগ-অফ-নেশনস্

(The U. N. O. and the League of Nations)

লীগ-অফ-নেশনস্-এর চুক্তিপত্র ছিল ভার্সাই-সন্ধির এক অংশবিশেষ এবং ভার্সাই-সন্ধির সাফল্যের উপর লীগ-অফ-নেশনস্-এর সাফল্য ছিল নির্ভরশীল। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল সেগুলি রক্ষা করার এবং নূতন করিয়া বিশ্বের পুনর্গঠনকার্য সম্পাদন করার উদ্দেশ্য লইয়াই প্রধানতঃ বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গ লীগ-অফ-নেশনস্-এ যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু ইউনাইটেড নেশনস্-এর উদ্দেশ্য কিছু ভিন্ন রূপ। বিজিত রাষ্ট্রগুলির সম্বন্ধে নির্মম সন্ধি চাপাইবার পরিবর্তে বিশ্বে পুনরায় যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইতে না দেওয়ার দৃঢ়সংকল্প লইয়া বিশ্বের ছোট বড় বহু রাষ্ট্র ইউনাইটেড নেশনস্-এ যোগদান করিয়াছে।

উৎপত্তি যাহাই হউক না কেন, লীগ-অফ-নেশনস্ ও ইউনাইটেড নেশনস্-এর মধ্যে আদর্শগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যথা, যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। কোন একটি দেশ বা জাতির স্বার্থ অপেক্ষা বিশ্বের সমগ্র মানবগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশ্য লইয়াই লীগ-অফ-নেশনস্ গঠিত হইয়াছিল ("An eye of the nations to keep watch upon the common interests, an eye that does not slumber, an eye that is everywhere watchful and attentive."—Wilson)। লীগ-অফ-নেশনস্-এর প্রতিষ্ঠাকালে বিশ্ব-সংস্থার যে ধারণা করা হইয়াছিল তাহার প্রকৃত কার্যকর রূপ লাভ ঘটে ইউনাইটেড নেশনস্-এ। ইউনাইটেড নেশনস্-কে লীগ-অফ-নেশনস্-এর পরিপূরক বলা যায়।

লীগ-অফ-নেশনস্-এ যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের প্রাধান্য ছিল, ইউনাইটেড নেশনস্-এও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

ইউনাইটেড নেশনস্-এ ছয়টি প্রধান সংস্থা রহিয়াছে। যথা, সাধারণ-সভা, নিরাপত্তা বা স্বস্তি-পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-পরিষদ, অছি-পরিষদ, আন্তর্জাতিক বিচারালয় ও দপ্তর। লীগ-অফ-নেশনস্-এর প্রধান সংস্থা ছিল তিনটি, যথা, সাধারণ-সভা, কাউন্সিল ও দপ্তর। সুতরাং সংগঠনের দিক দিয়া বিচার করিলে লীগ-অফ-নেশনস্-কে প্রধানতঃ একটি রাজনৈতিক সংস্থা এবং ইউনাইটেড নেশনস্-কে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা বলা যায়। মানবগোষ্ঠীর সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন করাই ইউনাইটেড নেশনস্-এর আদর্শ। ("Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that foundations of peace must be laid")।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ-সভা ও অন্যান্য সংস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হইয়া থাকে। কিন্তু লীগ-অফ-নেশনস্-এর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার নীতি উহার কর্তব্যপালনে বাধার সৃষ্টি করিত। কারণ লীগের

সদস্য-রাষ্ট্রবর্গ উহাদের সার্বভৌমত্বের অধিকার কোন ক্রমেই ক্ষুণ্ণ করার পক্ষপাতী না।

ইহা সত্য যে নিরাপত্তা-পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণের 'ভিটো' ক্ষমতা ইউনাইটেড নেশনস্-এর কর্তব্য সম্পাদনে বাধার সৃষ্টি করিয়া থাকে। কিন্তু লীগ অফ নেশনস্-এর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিও সেইরূপ বাধার সৃষ্টি করিত। এস্থলে স্মরণ রাখা দরকার যে লীগ-কাউন্সিলের সদস্য নহে লীগের এমন সদস্য-রাষ্ট্র কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত কার্যকর করিতে বাধ্য ছিল না। কিন্তু নিরাপত্তা-পরিষদের সিদ্ধান্ত এই প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্য-রাষ্ট্র কার্যকর করিতে বাধ্য।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ-সভা ও নিরাপত্তা-পরিষদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত আছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার দায়িত্ব নিরাপত্তা-পরিষদের উপর ন্যস্ত আছে। কিন্তু লীগ অফ নেশনস্-এর সাধারণ-সভা ও কাউন্সিলের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা ছিল না এবং এই দিক দিয়া ইউনাইটেড নেশনস্-এর তুলনায় লীগের সংগঠন ছিল দুর্বল।

ইউনাইটেড নেশনস্-এর সনদে সমবেত নিরাপত্তা নীতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বিশ্বের কোথাও আক্রমণাত্মক যুদ্ধ শুরু হইলে বা যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হইলে ইউনাইটেড নেশনস্-এর হস্তক্ষেপ করার অধিকার আছে। কিন্তু লীগ অফ নেশনস্ একমাত্র আক্রমণের ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপ করিতে পারিত। প্রয়োজনবোধে ইউনাইটেড নেশনস্ আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে এবং ইউনাইটেড নেশনস্-এর এইরূপ সিদ্ধান্ত উহার সকল সদস্য-রাষ্ট্র পালন করিতে বাধ্য থাকে। কিন্তু লীগ অফ নেশনস্-এর নিজস্ব সৈন্যবাহিনী না থাকায় উহার পক্ষে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার অসুবিধা হইত। ইহা ভিন্ন লীগের সিদ্ধান্ত পালনে উহার সদস্য-রাষ্ট্রগুলির কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না।

কয়েকটি বিষয়ে ইউনাইটেড নেশনস্-এর তুলনায় লীগ অফ নেশনস্ উন্নত ছিল। প্রথমতঃ, লীগ-অফ-নেশনস্-এর সদস্যবর্গের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু ইউনাইটেড নেশনস্-এর সদস্যবর্গের দায়িত্ব সেইরূপ সুনির্দিষ্ট নহে। দ্বিতীয়তঃ, কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা-পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত ইউনাইটেড নেশনস্-এর সদস্যগণের কোন কিছু করার ক্ষমতা নাই। কিন্তু লীগের সদস্যবর্গ লীগ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে অর্থনৈতিক অবরোধ প্রয়োগ করিতে পারিত।

যাহা হউক, লীগ অফ নেশনস্ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নানা-বিষয়ে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানকে লীগ অফ নেশনস্-এর বৃহত্তর সংস্করণ বলিলে ভুল হইবে না।

২৩.৬. ইওরোপে ঐক্যবদ্ধতার আন্দোলন, ১৯৪৪-৫০ (European Integration) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে পাশ্চমী মিত্ররাষ্ট্রবর্গ (Western Allies) ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্কের ক্রম-অবনতি হইতে থাকিলে এবং মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই (Cold War) ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতে থাকিলে ইওরোপে ঐক্যবন্ধতার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার পারস্পরিক বিবাদ ও প্রতিযোগিতার সম্মুখে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে ইওরোপের ঐক্যবন্ধন সুদৃঢ় করা। এই আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ হইল ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস্ ও লাক্সেমবুর্গ-এর মধ্যে সম্পাদিত 'বেনেলুক্স-কাস্টমস্-কনভেনশন' (Benelux Customs Convention)। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই কনভেনশন বা চুক্তি কার্যে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে ডানকার্ক-মৈত্রী সন্ধি (Dunkirk Treaty Alliance) স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স বেনেলুক্স দেশগুলির সহিত ব্রাসেলস-এর সন্ধি (Treaty of Brussels) সম্পাদন করে। ইহার শর্তানুসারে চুক্তিবন্ধ রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিতে স্বীকৃত হয়।

'বেনেলুক্স-কাস্টমস্-কনভেনশন' (Benelux Customs Convention)

ডানকার্ক মৈত্রী-সন্ধি (Dunkirk Treaty Alliance)

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা (European Economic Co-operation) নামে একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয়।* প্যারিসে ইহার কার্যালয় স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল বৈদেশিক সাহায্য ব্যতিরেকে এই সংস্থার সদস্য-রাষ্ট্রবর্গের অর্থনৈতিক মানের উন্নয়ন করা, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা, কৃষি ও শিল্প-ব্যবস্থাকে অধিকতর আধুনিক করিয়া তোলা এবং জাতীয় মুদ্রার মান উন্নয়ন করা। এই সংস্থার মাধ্যমে পরবর্তী কালে পশ্চিম-ইওরোপের জীবনধারণের মান বহুলাংশে উন্নত হইয়াছিল।

ইওরোপীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা (European Economic Co-operation)

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ওয়াশিংটনে উত্তর আতলান্তিক চুক্তি (North Atlantic Treaty) স্বাক্ষরিত হয়। ইহার দ্বারা উত্তর আতলান্তিক চুক্তি-সংস্থা (North Atlantic Treaty Organisation) নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হয়। ইহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, কানাডা, লাক্সেমবার্গ, পর্তুগাল, নরওয়ে, নেদারল্যান্ডস্ প্রভৃতি দেশ যোগদান করে। ইহার শর্তানুসারে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করিতে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে

NATO

* ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতার সদস্য ছিল অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ইটালী, পশ্চিম-জার্মানী, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, লাক্সেমবার্গ, আইসল্যাণ্ড, গ্রীস, নেদারল্যাণ্ডস্, পর্তুগাল, নরওয়ে, তুরস্ক, সুইডেন ও ব্রিটেন। কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহকারী সদস্য রূপে ইহাতে যোগদান করিয়াছিল।

নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাইয়া ফেলিতে সম্মত হয়; পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সকলের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে যত্নবান হইবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে; সমবেতভাবে বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সম্মত হয়; স্বাক্ষরকারী দেশগুলির কোন একটি বৈদেশিক শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইলে স্বাক্ষরকারী সকল দেশই তাহা নিজ নিজ দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলিয়া বিবেচনা করিতে স্বীকৃত হয়।

উপসংহার

সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধেই যে প্রধানতঃ উত্তর আতলান্তিক চুক্তি-সংস্থা গঠিত হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

'ইওরোপের পরিষদ' (Council of Europe)

উত্তর আতলান্তিক চুক্তি-সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুদিনের মধ্যে 'ইওরোপের-পরিষদ' (Council of Europe) নামে আর একটি সংস্থা গঠিত হয় (১৯৪৯ খ্রীঃ)। কানাডা, পর্তুগাল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া NATO-এর অপর সকল সদস্যই এই সংস্থায় যোগদান করে। ইহার উদ্দেশ্য হইল স্বাক্ষরকারী দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং উহাদের ঐক্যবন্ধন আরও সুদৃঢ় করা।

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত

	সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি সম্বন্ধে কি জান?	[উঃ ২৩.১]
২।	সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সংগঠন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।	[উঃ ২৩.২.]
৩।	সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা-পরিষদের সহিত সাধারণ-সভার সম্পর্ক কি?	[উঃ ২৩৩]
৪।	সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের কার্যাদি সংক্ষেপে লিখ।	[উঃ ২৩৪.]
৫।	সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান ও লীগ অফ নেশনস্-এর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈষম্য কি?	[উঃ ২৩.৫.]

চতুর্বিংশ অধ্যায়

যুদ্ধোত্তর ইওরোপ (১৯৪৫-১৯৫০)
(Post-War Europe)

২৪.১ যুদ্ধোত্তর পশ্চিম-ইওরোপের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ (Post-war Democratic Powers of Western Europe)

ভূমিকা : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত অধিকাংশ ঐতিহাসিক ইওরোপে ছয়টি বৃহৎ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। জাতীয় শক্তি ও সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্য ইটালীকে এই ছয়টি বৃহৎ শক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তথাকথিত বৃহৎ শক্তিগুলির দল হইতে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী বাদ পড়িয়া যায় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্স, জার্মানী এবং ইটালীও বৃহৎ শক্তির মর্যাদা হইতে বঞ্চিত হয়। যদিও ফ্রান্স ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পর বৃহৎ চতুঃশক্তির ('Big four') আলাপ-আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয় তথাপি বিশ্বের কূটনীতির ক্ষেত্রে ফ্রান্স প্রথম শ্রেণীর শক্তির মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে আধুনিক কালে একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই প্রথম শ্রেণীর শক্তি হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। যুদ্ধোত্তর বিশ্বের রাজনীতিতে ইওরোপের শক্তি হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়ার পর একমাত্র ব্রিটেনই গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়া আসিতেছে।

পশ্চিম-ইওরোপের তথাকথিত বৃহৎ শক্তিবর্গ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পশ্চিম-ইওরোপের গণতন্ত্রের উপর চরম আঘাত হানিয়াছিল। দীর্ঘকালব্যাপী নাৎসী ও ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে ইওরোপের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গুলিকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। এই সংগ্রামে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধাবসানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে চরম বামপন্থী কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বিপ্লবী আন্দোলনের সম্মুখীন হইতে হয়। দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট জনগণ স্বভাবতঃই সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এই কথা অস্বীকার করা যায় না যে যুদ্ধাবসানে ইওরোপের প্রায় সকল রাষ্ট্রের জনগণকে যুদ্ধপ্রসূত অভাব-অনটন ও দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার অভূতপূর্ব সাফল্যে কমিউনিস্ট আন্দোলন শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছিল। জার্মানী কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হইবার পর বহু দেশে কমিউনিস্টগণ নাৎসী ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়া জনগণের উপর অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

যুদ্ধোত্তর ইওরোপে কমিউনিস্ট প্রভাব ও আদর্শের বিস্তার

সুতরাং, বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিম-ইওরোপের দেশগুলিতে নাৎসী বা ফ্যাসিস্টদের ন্যায় চরম দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের (Right-Wing Reactionaries) অস্তিত্ব একরূপ বিলুপ্ত হইলেও কমিউনিস্ট আদর্শ ও স্থানীয় কমিউনিস্ট দলগুলি রাজনীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। একমাত্র ব্রিটেনেই কমিউনিস্ট প্রভাব বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ইটালী ও ফ্রান্সে কমিউনিস্টদের সংখ্যা ও উহাদের সংগঠন নেহাত নগণ্য ছিল না। পশ্চিম-ইওরোপের প্রায় সকল দেশেই ক্যাথলিক দলগুলির উপরই গণতন্ত্রের যথার্থ শক্তি ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই ক্যাথলিক দলগুলি প্রগতিমূলক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের দাবি উত্থাপন করিলেও রাজনৈতিক গণতন্ত্র, ধর্ম, পরিবার ও ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি রক্ষা করার ব্যাপারে এই দলগুলি ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সমাজতন্ত্রী দলগুলি ছিল গণতান্ত্রিক শক্তি ও আদর্শের ধারক বা বাহক। ব্রিটেনের শ্রমিকদল সহ পশ্চিম-ইওরোপের বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী দলগুলির অধিকাংশই গণতান্ত্রিক অধিকার ও গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিল। অবশ্য সমাজতন্ত্রীদের কিছু অংশ ক্রমশঃ সাম্যবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। গোঁড়াপন্থী দলগুলির মধ্যে ব্রিটেন রক্ষণশীল দল (Conservative) ও ফ্রান্সের র‍্যাডিকাল সোস্যালিস্ট (Radical Socialist) দল বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই পুনরায় উহারা পুনরুজ্জীবিত ও জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে সক্ষম হয়।

গণতন্ত্রের ভরসা

ব্রিটেন (Britain) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। ব্রিটেনের পক্ষে আমদানি-কৃত কাঁচামাল ও খাদ্যের মূল্য প্রদান করা, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত কলকারখানা ও শিল্পগুলিকে পুনর্গঠন করা এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অক্ষুণ্ণ রাখা একরূপ অসম্ভব হইয়া দেখা দিয়াছিল।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে যুদ্ধ চলিতে থাকাকালীন ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ব্রিটেনের শ্রমিক দল (Labour Party) বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিয়া পার্লামেণ্টে প্রবেশ করে। উইনস্টন চার্চিলের নেতৃত্বে রক্ষণশীলদের মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং ক্লিমেণ্ট এট্‌লির (Clement Attlee) নেতৃত্বে শ্রমিক সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়।

রক্ষণশীল নেতা হিসাবে উইনস্টন চার্চিল তথা রক্ষণশীল দলের কৃতিত্ব ব্রিটেনবাসী অস্বীকার বা উপেক্ষা করে নাই। যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের এক বিরাট সমস্যা ব্রিটেনবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রিটেনের শ্রমিক দলকে এই বিরাট দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত বিবেচনা করিয়াই ব্রিটেনের অধিকাংশ নর-নারী শ্রমিক দলকে ক্ষমতার আসনে বসাইল।

সমাজতন্ত্রের আদর্শ রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে শ্রমিক সরকার ব্রিটেনের গুরুভার ও উৎপাদক সামগ্রী শিল্পের জাতীয়করণ করিতে যত্নবান হন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড, রেলপথ, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতি শিল্পগুলি জাতীয়করণ করেন। এমন কি চিকিৎসা-ব্যবস্থাও জাতীয়করণ করা হয়। এইভাবে নানা প্রকার প্রগতিমূলক সামাজিক সংস্কার প্রবর্তন করিয়া শ্রমিক সরকার ব্রিটেনকে যথার্থ জনকল্যাণকামী ও সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত করিতে সক্ষম হন।

জাতীয়করণ নীতির প্রয়োগ

কিন্তু ব্রিটেনের তদানীন্তন সমস্যা ছিল গভীর ও জটিল। বিশ্বযুদ্ধের ফলে ব্রিটেনের বাণিজ্য-পোতগুলির ও বহির্বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল। বিশ্বের অর্থনৈতিক ভারকেন্দ্র হিসাবে ব্রিটেনের গুরুত্ব বিনষ্ট হয় এবং নিউইয়র্ক সেই গুরুত্ব লাভ করে; বিশ্বের সর্বত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন ঘটিতে থাকে এবং ব্রিটেনের নিজস্ব কয়লা ও ইস্পাতের যোগান কমিয়া যাইতে থাকে। এই অবস্থায় ব্রিটেনের প্রধান সমস্যা ছিল স্বদেশে প্রচুর পরিমাণে শিল্পজাত সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং তাহা বিদেশে রপ্তানি করিয়া প্রয়োজনানুপাতে খাদ্যসামগ্রী ও কাঁচামাল আমদানি করা। গুরুভার শিল্পগুলিকে জাতীয়করণ করার ফলে সেগুলিকে অধিকতর ফলপ্রসূ করিয়া তুলিবার এক বিরাট দায়িত্ব শ্রমিক সরকারের উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল। খাদ্যনিয়ন্ত্রণ, আমদানি নিয়ন্ত্রণ, উচ্চহারে শুল্ক ধার্য করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি করার দায়িত্বও সরকারের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। এই সকল কারণে যুদ্ধের পর কয়েক বৎসর ধরিয়া ব্রিটেনকে নানাপ্রকার অসুবিধার ভিতর দিয়া অতিবাহিত করিতে হয়। এমনকি অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পুনর্গঠনকার্যে ব্রিটেনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ঋণ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা গ্রহণ করিতে হয়।

অভ্যন্তরীণ সমস্যা

স্বদেশের দুর্দিনে ব্রিটেনের জনগণ জাতীয় সংহতি, জাতীয় ঐক্য ও ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগের যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিল তাহা বিশ্বের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত জাতীয় বীমা আইন (National Insurance Act) ও জাতীয় স্বাস্থ্য আইন (National Health Service Act) প্রভৃতি সামাজিক উন্নয়নমূলক আইন ব্রিটেনের নিম্ন-সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান অভাবনীয় ভাবে বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। বিদেশ হইতে খাদ্যসরবরাহের ফলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য স্বাভাবিক হইয়া উঠে। কৃষির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করার ফলে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিশেষ উন্নতি ঘটে।

সমাজ-উন্নয়নমূলক আইন

যুদ্ধোত্তর কালে ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংকট ও পূর্বাঞ্চলে জাতীয়তা-বাদী আন্দোলনের ক্রমবিস্তার প্রভৃতি কারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরিবর্তন ঘটে। বহির্বিশ্বে সাম্রাজ্যরক্ষা করার মতো আর্থিক সংগতি ব্রিটেনের সেই সময়

ছিল না। এই কারণে ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলে গ্রীস ও তুরস্ক হইতে স্বীয় সৈন্যবাহিনী অপসারণ করিয়া লয়, প্যালেস্টাইনের অছি-শাসনাধিকার প্রত্যাহার করে এবং ভারত ও ব্রহ্মদেশকে পূর্ণ স্বাধীনতা, সিংহলকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা (Dominion Status) দান করিতে বাধ্য হয়। এই সকল দেশে সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ করার মত সংহতি তখন ব্রিটেনের ছিল না। শ্রমিক সরকারের এইরূপ উদার সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে ব্রিটেনের রক্ষণশীল দল কঠোর সমালোচনা করিয়াছিল। উইনস্টন চার্চিলের ভাষায় "The Labour government scuttled the British Empire"।

সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরিবর্তন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বিটেনের নিকট মধ্য ও সুদূর-প্রাচ্যে ভূমধ্যসাগর ও সুয়েজ খালের সামরিক গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভূমধ্যসাগর-সুয়েজ খাল পথ এক্সিস-শক্তিবর্গের অধিকারে চলিয়া যাওয়ায় বিটেন আক্ষেপও করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধাবসানে এই অঞ্চলে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও দায়িত্ব হ্রাস পাওয়ায় উহার নিকট ভূমধ্যসাগর-সুয়েজ খাল পথের সামরিক গুরুত্বও হ্রাস পায়। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ব্রিটেনের সামরিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইলেও বিটেন কেনিয়া, টাঙ্গানিকা ও ট্রান্সজরডান প্রভৃতি অঞ্চলে বিমানঘাঁটি নির্মাণ করিয়া এক নূতন সামরিক গুরুত্বপূর্ণ পথের প্রতিষ্ঠা করে।

নূতন সামরিক গুরুত্বপূর্ণ পথের প্রতিষ্ঠা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ফলে বিটেনের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটিলেও জাতীয়করণ-নীতির সুফল আশানুরূপ হয় নাই। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল পার্লামেন্টে সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এই নির্বাচনে শ্রমিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ক্ষুণ্ণ হইবার প্রধান কারণ হইল শ্রমিক সরকারে জাতীয়করণ-নীতি বিটেনবাসীকে আশানুরূপ উৎসাহিত করিতে পারে নাই। এতদ্ভিন্ন এই সময় শ্রমিক নেতৃবর্গের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতি-সংক্রান্ত মতানৈক্যের উদ্ভব হইয়াছিল। বেভান (Bevan)-এর নেতৃত্বে শ্রমিক দলের একটি অংশ শ্রমিক দলের গোঁড়াপন্থী নেতৃবর্গের প্রতি আক্রমণ চালাইতে থাকেন। এই কারণে শ্রমিক সরকার জাতীয়করণ-নীতির ব্যাপক প্রয়োগ বন্ধ করিতে বাধ্য হন এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংকটের সমাধানকল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া যাইতে থাকেন। কিন্তু বেভানের নেতৃত্বে শ্রমিকদের বামপন্থী সদস্যগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ব্রিটেনের অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিরোধিতা করিতে থাকেন। এই অবস্থায় পার্লামেন্টে সন্তোষজনক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের আশায় এট্‌লী সরকার ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে বিশেষ সাধারণ নির্বাচনের নির্দেশ দেন। কিন্তু এই নির্বাচনে শ্রমিকদল পরাজিত হয় এবং রক্ষণশীল দল জয়লাভ করিয়া চার্চিল-এর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন করে।

শ্রমিক সরকারের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ : উহার কারণ

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচন ও রক্ষণশীল দল কর্তৃক সরকার গঠন

ফ্রান্স (France) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স সামরিক পরাজয়ের ও বৈদেশিক শত্রুর শাসনের গ্লানি সহ্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনের সহযোগিতা ও এক্সিস-শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক যুদ্ধে যোগদানের ফলে ফ্রান্স জয়লাভ করে।

ইওরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় ফ্রান্সে যুদ্ধপ্রসূত ক্ষতি তেমন হয় নাই বটে, কিন্তু উহার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক ঘোর দুর্যোগ দেখা দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের প্রচুর লোকক্ষয় হইয়াছিল এবং দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে উহার ক্ষতিপূরণ হইবার পরিবর্তে পুনরায় জনসংখ্যার বিনাশ ঘটে। জনসংখ্যার বিনাশের ফলে যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সে এক দারুণ শ্রমিক-সমস্যার উদ্ভব হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ফ্রান্সের আর্থিক সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ হইয়াছিল দ্বিগুণ। ফ্রান্সের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাণিজ্যপোত এবং শিল্প ও কলকারখানার ব্যাপক ধ্বংসের ফলে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সমস্যা ও বিদেশ হইতে খাদ্য ও কাঁচামাল আমদানির সমস্যা প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছিল। উপরন্তু যুদ্ধের সময় জার্মান সৈন্যবাহিনীর ব্যয়নির্বাহের ফলে ফ্রান্সে মুদ্রাস্ফীতি প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। মুদ্রাস্ফীতির ফলে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মুদ্রাস্ফীতি, জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সে শ্রমিক-অসন্তোষ ও সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট দৈনন্দিন ব্যাপারে পরিণত হয়। এতদ্ভিন্ন যুদ্ধের ফলে ফরাসী শাসনতন্ত্রের কাঠামোও ভগ্নপ্রায় হইয়া উঠে। সেই শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পুনঃসংস্কার করা হইবে অথবা উহার পরিবর্তে এক নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করা হইবে—এই প্রশ্নও ফরাসী জনগণের নিকট দেখা দেয়।

ফ্রান্সের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল

১৯৪০-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে মার্শাল পেঁতা-র পরিচালনাধীনে নাৎসী জার্মানীর সমর্থনপুষ্ট তাঁবেদার সরকার গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু যথার্থ স্বাধীনতাকামী ফরাসী জনগণ পেঁতা-সরকারের বিরোধিতা করিয়া যাইতেছিল। এই সময়ের মধ্যে ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে পেঁতা-সরকার তথা জার্মান-বিরোধী রাজনৈতিক সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল। জীবন তুচ্ছ করিয়া এই সকল সংঘের অসংখ্য নরনারী পেঁতা-সরকার ও নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে কখন প্রত্যক্ষ, কখন অপ্রত্যক্ষ ভাবে সংগ্রাম করিয়া যাইতেছিল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে শত্রুর বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রতিরক্ষা-সংঘগুলিকে সম্মিলিত করিয়া জাতীয় প্রতিরক্ষা সমিতি (National Council of Resistance) গঠন করা হইয়াছিল। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে জাতীয় প্রতিরক্ষা সমিতি একটি সনদ প্রকাশিত করিয়া ঘোষণা করে যে স্বদেশের মুক্তিলাভের পরেও বিভিন্ন প্রতিরক্ষা-সংঘগুলির মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা হইবে; দেশদ্রোহীদের সমুচিত শাস্তিবিধান করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা হইবে। ফ্রান্সের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই সনদে ব্যাঙ্ক, বীমা ও বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির জাতীয়করণের কথাও

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের সনদ

ঘোষণা করা হইয়াছিল। ব্রিটেনের শ্রমিক দলের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও ফ্রান্সের জাতীয় প্রতিরক্ষা সমিতির অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল।

শাসনতন্ত্র ও চতুর্থ ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (১৯৪৬)

নাৎসী জার্মানীর পতনের পর ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লীর (National Assembly) নির্বাচন সম্পন্ন হইল। ন্যাশন্যাল এ্যাসেমব্লী দ্য গলের (De Gaulle) নেতৃত্বে সাময়িক সরকার গঠন করিল। দেশব্যাপী অসন্তোষ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে সাময়িক সরকার একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিলেন। এই শাসনতন্ত্র অনুসারে কার্যনির্বাহক সমিতিকে (Executive) দুর্বল ও আইন-পরিষদকে (Legislature) শক্তিশালী করা হইল। দ্য গল এই শাসনতন্ত্রের তীব্র নিন্দা করিয়া পদত্যাগ করিলেন এবং ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত গণ-ভোট নূতন শাসনতন্ত্র বাতিল করিল। নব-নির্বাচিত আইন-পরিষদ পুনরায় একটি শাসনতন্ত্র রচনা করিয়া কার্যনির্বাহক সমিতির ক্ষমতা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সংশোধিত শাসনতন্ত্র গৃহীত হইলে ফ্রান্সে চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের (Fourth French Republic) প্রতিষ্ঠা হইল। এই নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে পূর্বতন চেম্বার অফ ডেপুটিস (Chamber of Deputies)-এর স্থলে একটি National Assembly বা জাতীয়-সভা গঠিত হইল। সকল প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভোট দ্বারা জাতীয়-সভা গঠন করার নীতি গৃহীত হইল। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে পূর্বতন সেনেট (Senate)-এর স্থলে Council of the Republic বা প্রজাতন্ত্র-পরিষদ নামে একটি নূতন সংস্থা গঠিত হইল। এই সংস্থার একমাত্র ক্ষমতা ছিল জাতীয়-সভাকে পরামর্শ দান করা। দুই কক্ষের ভোট দ্বারা পূর্বের ন্যায় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্টকে ৭ বৎসরের জন্য নির্বাচিত করার রীতি অব্যাহত রহিল। তবে তিনি জাতীয়-সভার সম্মতিক্রমে স্বীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন এইরূপ স্থির হইল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কয়েক বৎসর ফ্রান্সের জাতীয় জীবনে এক দারুণ বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল। মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্যসামগ্রী ও শিল্পের জন্য কাঁচামালের প্রবল অভাব এবং রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘাত প্রভৃতি কারণে ফরাসী সরকারকে এক জটিলতম সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাতীয়-সভায় কোন একটি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দল (যথা—'সমাজতন্ত্রী', 'জনপ্রিয় প্রজাতন্ত্রী আন্দোলন' ও 'উগ্র সমাজতন্ত্র')-কে লইয়া সংযুক্ত সরকার গঠন করা হয়। কিন্তু এই তিনটি দলের আদর্শ ও কর্মপন্থা পরস্পর-বিরোধী হওয়ায় সংযুক্ত সরকারের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। সমাজতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রী দল সামাজিক সংস্কারমূলক আইন প্রবর্তনের ও উচ্চহারে শুল্ক ধার্য করার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু উগ্র সমাজতন্ত্রীগণ ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল।

সংযুক্ত সরকার গঠন

যাহা হউক, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও ফরাসী মন্ত্রিসভার

অস্থায়িত্ব সত্ত্বেও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনকার্য পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে। মুদ্রাস্ফীতি শেষ পর্যন্ত সাফল্যের সহিত রোধ করা সম্ভব হয়; কৃষিকার্যের ব্যাপারে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির প্রচলন শুরু হয়। শিল্পজাত সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনকার্য বহুদূর অগ্রসর হয়।

অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন

ইটালী (Italy): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলিতে থাকাকালীন ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট-সরকারের অবসান ঘটাইয়া হিটলারের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান করে, স্যাভয় বংশের রাজতন্ত্র বাতিল করে এবং একটি প্রজাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনা করে।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনীর পতন ঘটিলে রাজা ভিক্টর তৃতীয় ইমানুয়েল (Victor Emmanuel III) মার্শাল বাদোগলিও-কে (Badoglio) প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং বাদোগলিও সরকার সর্বপ্রকারে ফ্যাসিস্টতন্ত্রের উচ্ছেদ করেন। ফ্যাসিস্ট দল, ফ্যাসিস্ট-পরিষদ ও ফ্যাসিস্ট পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। ফ্যাসিস্ট দলের তহবিল ও সেই দলের সকল প্রকার সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। ফ্যাসিস্ট দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং উহাদের দেশদ্রোহিতার সমুচিত দণ্ডবিধানের জন্য একটি উচ্চ আদালতও গঠন করা হয়। কয়েক মাসের মধ্যে মুসোলিনীর সমর্থক ও অনুচরগণের অনেককে মৃত্যুদণ্ডে ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অপরদিকে ফ্যাসিস্ট শাসনাধীনে যে সকল রাজনৈতিক নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, বাদোগলিও সরকার উহাদের মুক্ত করেন এবং যাহারা রাজনৈতিক কারণে মুসোলিনীর আমলে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হয়।

বাদোগলিও সরকার কর্তৃক ফ্যাসিস্টতন্ত্রের সমূলে উচ্ছেদ

বাদোগলিও সরকারকে সামরিক একনায়কতন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এই সরকার সকলপ্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সরকারের সকলপ্রকার বাধানিষেধ সত্ত্বেও ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে ইটালীতে ছয়টি বৃহৎ রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। এই সকল দলগুলি বাদোগলিও সরকারের গণতন্ত্র-বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ হইয়া আন্দোলন শুরু করিল। এই সংযুক্ত সংগঠন 'Committee of National Liberation' (C L N) নামে পরিচিত ছিল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'মুক্ত-ইটালীর' বিভিন্ন শহরে সংযুক্ত সংগঠনের শাখা স্থাপিত হইল। সংযুক্ত সংগঠনের (C L N) অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্যদলগুলি বাদোগলিও-র একনায়কতন্ত্রের বিরোধিতা করার ও রাজা ইমানুয়েলের সিংহাসনচ্যুতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। স্বদেশের বিপর্যয়ের জন্য ইটালীর জনগণ রাজা

বাদোগলিও সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

সর্বদলীয় সংযুক্ত প্রতিরক্ষা সমিতি

ইমান্যুয়েলকে সর্বাংশে দায়ী করিল। কিন্তু মিত্রপক্ষ বিশেষ করিয়া ব্রিটেন যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইটালীতে কোনপ্রকার শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিল না।

বাদোগলিও তাঁহার নেতৃত্বে সর্বদলীয় সরকার গঠনের চেষ্টা করেন। কিন্তু কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট প্রভৃতি দলগুলি বাদোগলিওর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে ইটালীর রাষ্ট্রীয় জীবনে এক অচল অবস্থার উদ্ভব হইল। এই অবস্থার অবসানকল্পে রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল ঘোষণা করিলেন যে মিত্রপক্ষ রোমে প্রবেশ করা মাত্র তিনি সিংহাসন পরিত্যাগ করিবেন। রাজার এই ঘোষণার দ্বারা আশ্বস্ত হইয়া কমিউনিস্ট ভিন্ন অন্যান্য দলগুলি বাদোগলিওর প্রস্তাব অনুসারে একটি সর্বদলীয় সরকার গঠন করিল। কিন্তু বাদোগলিওর দ্বিতীয় সরকার দীর্ঘদিন স্থায়ী হইল না। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মিত্রপক্ষ রোমে প্রবেশ করিলে রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বীয় পুত্র দ্বিতীয় হামবার্ট (Humbert)-এর অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। বাদোগলিও তাঁহার তৃতীয় মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রোম ও নেপলস্-এর সংযুক্ত সংগঠনের নেতৃবর্গের বিরোধিতার ফলে তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

বাদোগলিওর দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা

বাদোগলিওর পতনের পর ফ্যাসিস্ট শাসনের পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী আইভানো-বনোমি (Ivanoe-Bonomi) সংযুক্ত সংগঠনের মনোনীত সদস্যগণকে লইয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন। কিন্তু শীঘ্রই বনোমির মন্ত্রিসভায় দলগত বিবাদ-বিসম্বাদ শুরু হইল। সোস্যালিস্ট মন্ত্রীগণ সোভিয়েট রাশিয়ার অনুকরণে ইটালীতে আঞ্চলিক সরকার গঠনের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু বনোমি এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলে মন্ত্রিসভায় সংকট দেখা দিল।

বনোমি সরকার

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মিত্রপক্ষের জয়লাভ ও নাৎসী জার্মানীর পতনের পর ইটালীর নাৎসী ও ফ্যাসিস্টগণ আত্মসমর্পণ করিল। ইটালীর ভবিষ্যৎ সরকার গঠনের ব্যাপারে সংযুক্ত প্রতিরক্ষা সমিতি (C L N)-এর অন্তর্ভুক্ত সদস্য দলগুলির মধ্যে মতানৈক্যের উদ্ভব হইল। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ইটালীর প্রধান মন্ত্রী-পদে প্যারি (Parri) নির্বাচিত হইলেন। প্রায় সকল দলের প্রতিনিধিগণকে লইয়া প্যারির মন্ত্রিসভা গঠিত হইল।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ভিক্টর তৃতীয় ইমানুয়েল সিংহাসন ত্যাগ করিলে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় হামবার্ট সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু ইটালীর জনগণ প্রজাতন্ত্র স্থাপনের অনুকূলে মত প্রকাশ করিলে দ্বিতীয় হামবার্ট সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। প্রথমদিকে কমিউনিস্ট-শাসিত প্রজাতন্ত্রের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। কারণ সেই সময় ফ্যাসিবাদের প্রতি জনগণের প্রতিক্রিয়া প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল এবং যুদ্ধবিজয়ী সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্য ও সমর্থনে ইটালীর তদানীন্তন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের কথাও অনেকে চিন্তা করিয়াছিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধান

রাজতন্ত্রের অবসান
প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

সভার নির্বাচনে ৫৫৬টি আসনের মধ্যে কমিউনিস্টগণ ১০৪টি আসন দখল করিল এবং নেনির (Nenni) নেতৃত্বে সোস্যালিস্টগণ ১১৫টি আসন দখল করিল। সোস্যালিস্টগণ কমিউনিস্টদের সহিত সরকার গঠনের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু কমিউনিস্টগণ ও সোস্যালিস্টদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ইটালীর অন্যতম রাজনৈতিক দল খ্রীষ্টান ডেমোক্রেটগণ গ্যাসপেরির (De Gesperi) নেতৃত্বে অন্যান্য উদারপন্থী ও দক্ষিণপন্থীগণ কমিউনিস্ট-বিরোধী সরকার গঠনে সমর্থ হইল (১৯৪৭ খ্রীঃ)।

গ্যাসপেরি ইতিপূর্বে সম্পাদিত মিত্রপক্ষের সহিত শান্তি-চুক্তির অনুমোদন লাভ করিলেন ; ইটালী হইতে ব্রিটেন ও আমেরিকার যুগ্মবাহিনীর প্রত্যাহারের ব্যাপারে সফল হইলেন এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে একটি নূতন শাসনতন্ত্র চালু করিলেন। এই শাসনতন্ত্র অনুসারে একটি চেম্বার অফ ডেপুটিস (Chamber of Deputies), সেনেট ও আঞ্চলিক প্রতিনিধিসভার প্রতিনিধিগণকে লইয়া নূতন সরকার গঠিত হইল। পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত প্রেসিডেণ্টের কার্যকাল ৬ বৎসর করা হইল। মন্ত্রিসভাকে আইন-পরিষদের নিকট দায়িত্বশীল করা হইল। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ অংশগ্রহণ করিয়াছিল। ইটালীকে অর্থ-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া এবং ইটালীকে ট্রিয়েস্ট প্রত্যর্পণের আশা প্রদান করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইটালীর জনগণকে রাশিয়ার পরিবর্তে পাশ্চমী রাষ্ট্রবর্গের প্রতি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইল। ফলে সাধারণ নির্বাচনে গ্যাসপেরির নেতৃত্বে খ্রীষ্টান ডেমোক্রেট দল বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিল। গ্যাসপেরি পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নূতন সরকারের কার্যভার গ্রহণ করিলেন এবং ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শাসনতন্ত্র
১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচন

যুদ্ধপ্রসূত সমস্যার যুদ্ধোত্তর ইটালীর একমাত্র সমস্যা ছিল না। কলকারখানার পুনর্গঠন, ক্ষতিপূরণ দান ও কমিউনিস্টদের বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ দমন করা ছাড়াও ইটালীর সমস্যা ছিল উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার স্থান সংকুলান, কৃষি ও শিল্প সংস্কার। জনগণের নিকট প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ইটালীর সরকার ভূমি-সংস্কারের ব্যাপারে বিশেষ সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নানাবিধ সাহায্যদানের ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে কিছু উন্নতি ঘটে এবং বেকারের সংখ্যা হ্রাস পায়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইটালী বিশ্বের দরবারে পুনরায় আত্মমর্যাদা পুনঃস্থাপন করিতে সমর্থ হয়।

যুদ্ধোত্তর ইটালীর সমস্যা

পশ্চিম-ইওরোপের অন্যান্য ক্ষুদ্ররাষ্ট্র : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়ার প্রভাবমুক্ত ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, সুইজারল্যাণ্ড ও সুইডেন। জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ, সামরিক ও নৌ-শক্তি এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বের দিক দিয়া এই সকল রাষ্ট্র ইওরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির তুলনায় ছিল নগণ্য। বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমী শক্তিবর্গ রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিম-ইওরোপের এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা

সর্বাংশে সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। নেদারল্যাণ্ডস্, বেলজিয়াম ও লাক্সেমবুর্গ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সহিত প্রতিরক্ষামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সুইজারল্যাণ্ড ও সুইডেন নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করে।

হল্যাণ্ড

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত হল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ছিল সুবিস্তৃত এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও, নূতন গিয়ানার অর্ধাংশ ও বহু ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পশ্চিম ভূমণ্ডলে দক্ষিণ-আমেরিকার উত্তর উপকূলে ডাচ্ গিয়ানা ও ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ হল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের সম্পদের উপর নেদারল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক জীবন একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক জীবনে এক দারুণ বিপর্যয় আনিয়াছিল। উপরন্তু ইন্দোনেশিয়া হস্তচ্যুত হইয়া যাওয়ার ফলে হল্যাণ্ডের প্রভূত ক্ষতি হয়। যুদ্ধের পর ক্যাথলিক ও শ্রমিক দল সরকার গঠন করে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের রানী উইলহেলমিনা (Wilhelmina) সিংহাসন ত্যাগ করিলে তাঁহার কন্যা জুলিয়ানা (Juliana) সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বেলজিয়াম

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বেলজিয়ামের কৃষিপ্রধান দেশ এবং উহার জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগের উপজীবিকা ছিল কৃষি। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে বেলজিয়ামের শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। যুদ্ধের সময় বেলজিয়াম নাৎসী জার্মানীর কবলিত হইয়াছিল এবং ইওরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় বেলজিয়ামের যুদ্ধপ্রসূত অর্থনৈতিক সমস্যাও জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। যুদ্ধের পর ক্যাথলিক সোস্যালিস্টগণ সরকার গঠন করে এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনকার্যে বেলজিয়াম দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। নতুন মুদ্রানীতি গ্রহণের ফলে মুদ্রাস্ফীতির অবসান ঘটে এবং বহির্বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বেলজিয়ামের সিংহাসনে রাজা লিওপোল্ড (Leopold)-এর পুনঃস্থাপনের সমস্যা অমীমাংসিত রহিয়া যায়। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসীগণ যুদ্ধবন্দী হিসাবে রাজা লিওপোল্ডকে জার্মানীতে কারারুদ্ধ করিলে বেলজিয়ামের পার্লামেন্ট লিওপোল্ড-এর ভ্রাতা প্রিন্স চার্লসকে রাজ্যের অভিভাবক হিসাবে নির্বাচিত করে। যুদ্ধাবসানে লিওপোল্ড মুক্তিলাভ করিলে তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁহার সহিত বেলজিয়ামের নেতৃবর্গের আলোচনা শুরু হয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়ামের তদানীন্তন মন্ত্রিসভা রাজা লিওপোল্ডকে দেশদ্রোহী রূপে ঘোষণা করিয়াছিল। লিওপোল্ডের উপর যে সকল বিধিনিষেধ আরোপিত ছিল লিওপোল্ড তাহা প্রত্যাহার করার দাবি করেন। কিন্তু বেলজিয়ামের নেতৃবর্গ এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন। এই অবস্থায় রাজা লিওপোল্ড ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে বেলজিয়াম সরকার ও পার্লামেন্ট তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল। সোস্যালিস্ট, কমিউনিস্ট ও অধিকাংশ উদারপন্থীগণ লিওপোল্ড-এর পুত্রের অনুকূলে লিওপোল্ডের সিংহাসন

ত্যাগের দাবি করিল। অপরদিকে ক্যাথলিকগণ লিওপোল্ড-এর পুনঃস্থাপন সম্পর্কে গণভোট গ্রহণের প্রস্তাব করিল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে গণভোট গ্রহণ করা হইল এবং বেলজিয়ামবাসীর শতকরা ৫৮ জন সিংহাসনে লিওপোল্ড-এর পুনঃস্থাপনের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিল। কিন্তু বেলজিয়ামে লিওপোল্ড প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী অশান্তির সম্ভাবনা দেখা দিলে লিওপোল্ড তাঁহার পুত্রের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন (১৯৫১ খ্রীঃ)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ডেনমার্কের শাসনতন্ত্রে প্রগতিমূলক সংশোধন প্রবর্তন করা হইয়াছিল। প্রাপ্তবয়স্ক ও নারীদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষকে অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক করা হইয়াছিল। ফলে ইংল্যান্ডের ন্যায় ডেনমার্ক রাজতন্ত্র শাসিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ডেনমার্কের অর্থনৈতিক জীবনে যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল।

ডেনমার্ক

দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে ডেনমার্ক প্রধানতঃ কৃষি-প্রধান দেশরূপে পরিগণিত হইলেও সেই সময়ের মধ্যে শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। উহার কৃষকগণ মাখন, ঘি প্রভৃতির উৎপাদনের বিশেষত্ব অর্জন করিয়াছিল এবং দুগ্ধজাত সামগ্রী উহার প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য ছিল। কৃষকগণের সুবিধার জন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানের বহু সমবায় সমিতি গঠন করা হইয়াছিল এবং এই সকল সমিতির মাধ্যমে কৃষিজাত সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় চলিত। ডেনমার্কের কৃষকগণের শতকরা ৯০ ভাগ সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান অধিকৃত দেশগুলির ন্যায় ডেনমার্ক দুঃখ-দুর্দশা ভোগ না করিলেও যুদ্ধের কুফল হইতে ডেনমার্ক সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পায় না। উহার বাণিজ্যতরীর প্রায় অর্ধাংশ বিনষ্ট হয় এবং শিল্প ও কলকারখানার যথেষ্ট ক্ষতি হয়। এতদ্ভিন্ন নাৎসী বাহিনীর ব্যয়নির্বাহ বাবদও ডেনমার্ককে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়।

নাৎসী জার্মানী কর্তৃক অধিকৃত হইবার সময় হইতে ডেনমার্কে জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা আন্দোলন শুরু হইলে ও প্রথমদিকে তাহা তেমন ব্যাপক আকার ধারণ করিতে পারে নাই। যুদ্ধের শেষ দুই বৎসরে ডেনমার্কের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি সংঘবদ্ধভাবে জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা আন্দোলন ব্যাপক ও শক্তিশালী করিয়া তোলে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে জার্মানবাহিনী ডেনমার্ক পরিত্যাগ করিলে একটি নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৯৪৫, ১৯৪৭ ও ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে তিনবার পার্লামেন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি নির্বাচনে সোস্যালিস্টগণ অধিকসংখ্যক আসন দখল করে, যদিও পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। ১৯৪৭ হইতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সোস্যালিস্টগণ সংখ্যালঘু হইয়াও মন্ত্রিসভা গঠন করে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ডেনমার্ক পশ্চিমী শক্তিগুলির সহিত মিত্রতা স্থাপন করে এবং উত্তর আতলান্তিক চুক্তি-সংস্থায় (NATO) যোগদান করে।

২৪.২. যুদ্ধোত্তর পূর্ব-ইওরোপের কমিউনিস্ট একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (Post-War Communist Dictatorship in Eastern Europe):

কমিউনিস্টগণ সাধারণভাবে কমিউনিস্ট আদর্শকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক (Economic Democracy) আদর্শ বলিয়া দাবি করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সর্বত্র কূটনীতি ও অস্ত্রের সাহায্যেই সাম্যবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। পূর্ব-ইওরোপের এক বৃহৎ অঞ্চলে সাম্যবাদী রাষ্ট্র বা সাম্যবাদী সরকার গঠনের ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়া উহার সৈন্যবাহিনী হ্রাস করার পরিবর্তে উহার সাহায্যে প্রতিবেশী ও সংলগ্ন দেশগুলিতে কমিউনিস্ট সরকার গঠনে যত্নবান হয়। যুদ্ধের সময় রাশিয়া ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও এস্তোনিয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া সেগুলিকে সরাসরি রাশিয়ার সহিত সংযুক্ত করে।

রাশিয়ার নূতন সাম্রাজ্যবাদী নীতি

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পর রাশিয়া পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, আলবানিয়া ও পূর্ব-জার্মানীতে রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল সাম্যবাদী সরকার গঠন করে। ইয়াল্টা-সম্মেলনে রাশিয়া পোল্যান্ডে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধাবসানে রাশিয়া সেই প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া পোল্যান্ডে কমিউনিস্ট সরকার গঠন করে।

রুশ-অধিকৃত ও রুশ-প্রভাবিত অঞ্চলে রাশিয়ার তাঁবেদার রাষ্ট্রগঠনের ব্যাপারে একটি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। যথা—প্রথমে প্রচলিত সরকারকে ফ্যাসিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল রূপে অভিহিত করিয়া তৎস্থলে 'পপুলার ফ্রন্ট' (Popular Front) নামে অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয় এবং এই সরকারের প্রকৃত ক্ষমতা কেবলমাত্র কমিউনিস্ট মন্ত্রীদের হস্তেই নিবদ্ধ রাখা হয়। অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রিসভার একমাত্র কমিউনিস্ট মন্ত্রীগণকেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রচারবিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। ইহার পর কমিউনিস্ট মন্ত্রীগণ রাশিয়ার প্ররোচনায় ও সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতার নেতৃত্বে অ-কমিউনিস্ট মন্ত্রীগণকে অপসারণ করিয়া নিরঙ্কুশ কমিউনিস্ট একনায়কতন্ত্র স্থাপন করে। ইহার পরের পর্যায় হইল সোভিয়েট রাশিয়ার অনুকরণে নূতন শাসনতন্ত্রের রচনা এবং নিয়মিত গণ-ভোটের মাধ্যমে উহার প্রবর্তন। অবশেষে সংঘবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টি (সংখ্যালঘু হইলেও) রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা হস্তগত করিয়া সকল বিরোধী দলগুলিকে দমন করে। কমিউনিস্ট শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পর স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, আদালত, সংবাদপত্র ও যানবাহন প্রভৃতির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা এবং চার্চ ও জনগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার দমন করা সহজ হয়। স্থানীয় তাঁবেদার কমিউনিস্ট সরকার অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েট রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতে বাধ্য হয়।

তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে রাশিয়া কর্তৃক অনুসৃত বিশেষ পন্থা

পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ প্রথমদিকে রাশিয়ার এই নূতন সাম্রাজ্যবাদী নীতি এবং প্রতিবেশী দেশসমূহে উহার কর্তৃত্ব বিস্তারে বাধা প্রদান করে নাই। ইহার কারণ ছিল এই যে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ বিশ্বাস করিত যে রাশিয়ার সহিত যুদ্ধকালীন সহযোগিতা যুদ্ধের পরেও অব্যাহত থাকিবে এবং ইয়াল্টা ও পোর্টস্‌ডাম সম্মেলনে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রাশিয়া পালন করিবে। ইয়াল্টা ও পোর্টস্‌ডাম সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং রাশিয়ার প্রতিশ্রুতিতে আস্থা স্থাপন করিয়া পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ যুদ্ধাবসানে নিজেদের সৈন্যবাহিনী ও যুদ্ধোপকরণের পরিমাণ হ্রাস করে। ইহার ফলে রাশিয়ার সংলগ্ন অঞ্চলে উহার সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হয়। রাশিয়া বলপূর্বক চেকোশ্লোভাকিয়ার নিকট হইতে পূর্ব পোল্যান্ড, উত্তর-পূর্ব প্রাশিয়া এবং রুমানিয়ার নিকট হইতে বুকোভিনা ও বেসারাবিয়া দখল করিলে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ রাশিয়াকে বাধা প্রদান করে নাই। পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ পূর্ব-মধ্য ইওরোপে রাশিয়ার সামরিক কর্তৃত্ব একরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছিল এবং প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করার ইচ্ছাও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের ছিল না।

রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রতি পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক বাধাপ্রদান না করার কারণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়া পোল্যান্ডের জনৈক কমিউনিস্ট নেতা বলেসলাভ বেরাট (Boleslav Beirut)-এর পরিচালনাধীনে পূর্ব পোল্যান্ডে সোভিয়েট-পন্থী সাময়িক সরকার গঠন করে। এই সাময়িক সরকারে অ-কমিউনিস্ট মন্ত্রী গ্রহণ করা হইবে এবং মুক্ত-নির্বাচন নীতি গ্রহণ করা হইবে—স্ট্যালিনের এই প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করিয়া রুজভেল্ট ও চার্চিল বেরাট সরকারের প্রতি স্বীকৃতি দান করেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে বেরাট সরকার পোল্যান্ডের এক বৃহৎ অংশ রাশিয়াকে সমর্পণ করেন। পরবৎসর পূর্ব পোল্যান্ডে নিরঙ্কুশ সাম্যবাদী শাসনের প্রতিষ্ঠা করা হয়। কয়েকজন অ-কমিউনিস্ট নেতাকে মন্ত্রী-পদে নিযুক্ত করা হয় বটে, কিন্তু কোন ক্ষমতা তাঁহাদের দেওয়া হয় নাই। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পুলিস, সৈন্যবাহিনী ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যগণের পরিচালনাধীনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নব-নির্বাচিত ন্যাশানাল এ্যাসেম্বলী রাশিয়ার অনুকরণে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করিয়া বেরাটকে প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত করে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব-পোল্যান্ডের কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রী দল দুইটিকে সংযুক্ত করা হয় এবং অ-কমিউনিস্টগণকে কঠোর হস্তে দমন করা হয়। রাজনীতিতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার বিরুদ্ধে ক্যাথলিক চার্চকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় এবং ক্যাথলিক যাজকগণকে গ্রেপ্তার করা হয়। জনৈক রুশ-জেনারেলকে পোল্যান্ডের জাতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। এইভাবে সর্বপ্রকারে পোল্যান্ড রাশিয়ার তাঁবেদার-রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

পোল্যাণ্ড

পোল্যান্ডের ন্যায় হাঙ্গেরীও রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টি হইতে রক্ষা পায় নাই। সংখ্যালঘু কমিউনিস্টদের প্রভাব ও রুশ-বাহিনীর উপস্থিতি সত্ত্বেও হাঙ্গেরী ১৯৪৫

খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক শাসন রক্ষা করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লীতে গণতান্ত্রিক দলগুলি সাফল্য লাভ করিয়া হাঙ্গেরীর প্রখ্যাত গণতন্ত্রী নেতা নেগির (Nagy) নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন করে এবং একটি উদারনৈতিক প্রজাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করে। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় কমিউনিস্টগণ রাশিয়ার সমর্থনপুষ্ট হইয়া বলপূর্বক নেগি সরকারের পতন ঘটাইয়া শাসনক্ষমতা দখল করে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে রাশিয়ার অনুকরণে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয় এবং রাশিয়ার সহিত হাঙ্গেরীর ঘনিষ্ঠ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সকল প্রকার গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণতন্ত্রীগণকে দমন করা হয়।

হাঙ্গেরী

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ ডিমিট্রভ (George Dimitrov) নামে জনৈক কমিউনিস্ট নেতা রাশিয়া হইতে বুলগেরিয়ায় প্রত্যাগমন করিয়া সোভিয়েট বাহিনীর সাহায্যে শাসন-ক্ষমতা বলপূর্বক দখল করেন এবং রাজা দ্বিতীয় সাইমনকে সিংহাসনচ্যুত করেন। সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে নির্বাচনের প্রহসন করিয়া কমিউনিস্টগণ বুলগেরিয়ায় তথাকথিত 'জনগণের প্রজাতন্ত্র' (People's Republic) গঠন করিয়া সকল প্রকার বিরোধী দল ও সংগঠনগুলিকে দমন করে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বুলগেরিয়ায় সোভিয়েট রাশিয়ার অনুকরণে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করা হয়।

বুলগেরিয়া

রুমানিয়ার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম অনুসৃত হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রুমানিয়ার কমিউনিস্টগণ নির্বাচনের প্রহসন করিয়া সোভিয়েট বাহিনীর সাহায্যে শাসন ক্ষমতা দখল করিয়া রাজা মাইকেলকে (King Michael) সিংহাসনচ্যুত করে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অপর সকল রাজনৈতিক দলগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা হয় এবং রাশিয়ার অনুকরণে শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করা হয়।

রুমানিয়া

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত

১। ১৯৪৫ হইতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্রিটেনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা কর। [উঃ ২৪. ১.]

২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি কি ছিল? ফ্রান্স ইহার সমাধান কিভাবে করিয়াছিল? [উঃ ২৪. ১.]

৩। ১৯৪৫ হইতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পূর্ব-ইওরোপে সাম্যবাদের অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [উঃ ২৪. ২.]

৪। ১৯৪৫ হইতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পূর্ব-ইওরোপে রাশিয়ার নব্য-সাম্রাজ্যবাদের অগ্রগতি বর্ণনা কর। [উঃ ২৪. ২.]

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

আমেরিকার ইতিহাস
(History of America)

পূর্বাভাষ : আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এক দিনে গড়িয়া উঠে নাই। ইওরোপের নানা দেশ হইতে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি বিভিন্ন সময়ে আমেরিকা মহাদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস বিশ্ব-ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরীক্ষা ("It is the greatest Political experiment in history and the greatest Social and economic ventures as well")। ইওরোপের ইতিহাস ও আমেরিকার ইতিহাসের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। আমেরিকার ইতিহাস "একটি ক্রমোন্নতি ও বিস্তারের ইতিহাস" যাহা একটি শতাব্দীর মধ্যেই পরিপূর্ণতা লাভ করে। আমেরিকার ইতিহাস একটি শতাব্দীর ইতিহাস, কিন্তু ইওরোপের ইতিহাস হাজার বৎসরের ইতিহাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আমেরিকার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ছিল না বলিলেই চলে। ইহার দুইটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, উনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বরাষ্ট্র-নীতির প্রাণকেন্দ্র হইতে বহুদূরে আমেরিকার অবস্থিতি এবং দ্বিতীয়তঃ, ইওরোপীয় রাষ্ট্রনীতি হইতে আমেরিকার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আত্মগোপনতা। সামরিক প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা হইতে মুক্ত থাকায় আমেরিকা স্বীয় অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানকল্পে অধিকতর মনোযোগী হইতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ সুযোগ হইতে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ বঞ্চিত ছিল। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থেই উহারা নিয়ত ব্যস্ত থাকিত।

অপরদিকে, ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির ন্যায় প্রাচীন ঐতিহ্যের অবকাশ আমেরিকার ছিল না। ইওরোপের ন্যায় আমেরিকার না ছিল রোমান সাম্রাজ্য, মধ্যযুগীয় সামন্ত-প্রথা বা রেনেসাঁ। একমাত্র ভৌগোলিক বন্ধন ব্যতীত আমেরিকার অধিবাসীগণের মধ্যে কৃষ্টিগত ও ভাষাগত কোন বন্ধন ছিল না বলিলেই চলে। উহার জাতীয় জীবন ও জাতীয় সমৃদ্ধি দেড়শত বৎসরের অধিক নহে। আমেরিকার সমস্যা ও প্রয়োজনও ছিল ইওরোপ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং স্বতন্ত্র ভাবেই আমেরিকা ইহার সমাধান করিয়াছিল।

২৫.১. স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে আমেরিকার সমস্যা : ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকার তেরটি ইংরাজ উপনিবেশগুলির বিদ্রোহ হইতে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। পরবৎসর উপনিবেশগুলি পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত ভার্সাই-সন্ধি অনুসারে ইংল্যান্ড আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লয়। কিন্তু শান্তি স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্মুখে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়।

(১) অর্থনৈতিক সমস্যা

স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি অতিরিক্ত মাত্রায় ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় অচল অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ব্রিটিশ

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত উপনিবেশগুলির পক্ষে আমেরিকার সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করা নিষিদ্ধ হয়। ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রবর্গও তাহাদিগকে সর্বপ্রকার বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করে। স্পেনীয় বন্দর তাহাদের নিকট রুদ্ধ হয় এবং ফ্রান্স এযাবৎ যে সকল সুবিধা আমেরিকাবাসীকে দিয়া আসিতেছিল তাহাও প্রত্যাহার করা হয়। অর্থনৈতিক সংকট চতুর্দিকে বিদ্রোহের সূচনা করে।

(২) রাজনৈতিক সমস্যা

অর্থনৈতিক সমস্যার সহিত রাজনৈতিক সমস্যাও প্রকট রূপ ধারণ করে। যুদ্ধের সময় আমেরিকার তেরটি উপনিবেশ ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উহাদের মধ্যে আঞ্চলিক মনোবৃত্তি পুনরায় দেখা দেয়। বিভিন্ন উপনিবেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ঈর্ষা এতই প্রবল হইয়া দেখা দেয় যে যুদ্ধের সময় স্থাপিত রাষ্ট্রসংঘ (confederation of states) প্রায় ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠে। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই যে সাময়িক শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছিল তাহাও অনেকের মতে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। এই সকল কারণে অনেকেই এইরূপ ধারণা করিয়াছিল যে নবলব্ধ স্বাধীনতা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র রক্ষা করিতে পারিবে না। সাময়িক শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের শাসনভার সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ সমন্বয়ে একটি কংগ্রেসের উপর অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে রাষ্ট্রগুলির অবিশ্বাস এতই প্রবল ছিল যে উহারা কংগ্রেসের হস্তে রাষ্ট্রের যথার্থ ক্ষমতা প্রদান করিতে সম্মত ছিল না। বস্তুতঃ যুদ্ধ বা শান্তি স্থাপন করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকায় সর্বত্র বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

কিন্তু কয়েকটি কারণে আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অনিবার্য বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা দূর হয়। প্রথমতঃ, আমেরিকার বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল। দ্বিতীয়তঃ, বাণিজ্যিক স্বার্থের খাতিরে উহাদের মধ্যে একতার নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। তৃতীয়তঃ, পশ্চিমাঞ্চলের লোক-বিরল অংশে আমেরিকার সকল রাষ্ট্রেরই স্বার্থ জড়িত ছিল। এই অঞ্চলের সমস্যা সুষ্ঠুভাবে সমাধান করার জন্য উহাদের মধ্যে একতার প্রয়োজন ছিল। এই সকল কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হইতে সমর্থ হইয়াছিল এবং অল্পকালের মধ্যেই সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব-রাজনীতিতে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়।

নূতন সংবিধান

ফিলাডেলফিয়া-সম্মেলন, ১৭৮৭ : আমেরিকা মহাদেশের অন্তর্গত প্রতিটি রাষ্ট্র নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শুল্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় আঞ্চলিক মনোভাবাপন্ন হইয়া পড়িলে এই সমস্যার সমাধানের জন্য একটি কন্‌ভেনশন আহ্বান করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ ওয়াশিংটনের সভাপতিত্বে ফিলাডেলফিয়া শহরে সম্মেলনের বৈঠক বসে। বিভিন্ন উপনিবেশ তথা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ এক নূতন সংবিধান রচনায় ব্রতী হন এবং একটি সংবিধান রচিত হয় যাহার ফলে আমেরিকার অধিবাসীগণ একটি স্বতন্ত্র জাতি রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

সম্মেলনের প্রতিনিধিদের সম্মুখে সমস্যা ছিল অত্যন্ত জটিল। তাঁহাদিগকে বহুবিধ পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘাত ও আঞ্চলিক মনোবৃত্তির সহিত আপোস করিতে হয়। প্রতিটি রাষ্ট্র উহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর ছিল। সুতরাং প্রতিটি রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের সমস্যাই ছিল প্রধান। ইহা ভিন্ন বড় রাষ্ট্রগুলির প্রতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বাভাবিক ঈর্ষা এবং উত্তর-আমেরিকার বাণিজ্য-প্রধান রাষ্ট্র ও দক্ষিণ-আমেরিকার কৃষি-প্রধান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘাতও সম্মেলনের সম্মুখে অপর জটিল সমস্যা ছিল। যাহা হউক, সংবিধান-রচয়িতাগণ ছিলেন বাস্তববাদী এবং তাঁহারা সকলের সমর্থনযোগ্য একটি সংবিধান রচনা করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করেন এবং এই সংবিধান বিশ্বের নিকট এক আদর্শ হইয়া থাকে।

নিয়ন্ত্রণ ও আপোস-মীমাংসার ভিত্তির উপর নূতন সংবিধান রচিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির সমন্বয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয়। প্রতিটি অংগ বা আঞ্চলিক রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কতকগুলি ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা সংরক্ষিত হয় এবং অন্য রাষ্ট্রগুলিকে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। এইভাবে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দুই ধরনের আইনকানুন রচনার ব্যবস্থা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—কংগ্রেস বা আইন-পরিষদ, প্রেসিডেণ্ট বা কার্যনির্বাহক সমিতির প্রধান এবং সুপ্রীম কোর্ট বা বিচার-বিভাগ। ফিলাডেলফিয়া-সম্মেলনে গৃহীত সংবিধান অনুযায়ী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নামে (United States of America) এক যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র (Federal Republic) প্রতিষ্ঠিত হয়। জর্জ ওয়াশিংটন হইলেন ইহার প্রথম প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি। উপনিবেশগুলি সংবিধানটি মানিয়া লইলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ঐক্যের পথে অগ্রসর হয়।

২৫.২. আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত কারণ (Causes of the Civil War):

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হইল উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে গৃহযুদ্ধ। উত্তর-আমেরিকা ছিল শিল্প-প্রধান ও দক্ষিণ আমেরিকা ছিল কৃষি-প্রধান অঞ্চল। উত্তর-আমেরিকায় শিল্পের উত্তরোত্তর প্রসার ঘটিতে থাকিলে উত্তরের রাষ্ট্রগুলি শিল্পের সংরক্ষণ করার প্রয়োজন অনুভব করে। উহাদের লক্ষ্য হইল শিল্পোৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়ের জন্য বৃহত্তর বাজারের সম্প্রসারণ করা ও বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে শিল্পগুলিকে রক্ষা করার জন্য শুল্ক-প্রাচীরের (Tariff-walls) সৃষ্টি করা। আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলে চাষ ও গবাদি পশুর ব্যবসা ছিল অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান ভিত্তি। পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের চাহিদা ছিল সস্তা জমি, কিন্তু উত্তরাঞ্চলের চাহিদা ছিল কলকারখানা ও শিল্পের জন্য সস্তা মজুর।

(১) অর্থনৈতিক বিরোধ

দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কার্পাস চাষ এবং ইহার জন্য এই অঞ্চলের ক্ষেত্রস্বামীদের (Planters) লক্ষ্য ছিল সস্তা দাস-মজুর। শিল্পজাত পণ্যের জন্য দক্ষিণাঞ্চল ছিল উত্তরাঞ্চলের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এই কারণে এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির দাবি ছিল সস্তায় পণ্যসামগ্রী লাভ করা এবং এই কারণে উহারা উত্তরাঞ্চলের শিল্পসংরক্ষণ নীতির ঘোর বিরোধী ছিল। দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল দাস-মজুর। কিন্তু উত্তরাঞ্চল দাস-প্রথার-বিরোধী ছিল। দক্ষিণাঞ্চল ছিল অবাধ বাণিজ্যের প্রবল সমর্থক। সুতরাং অর্থনৈতিক স্বার্থে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হইয়া দেখা যায়।

(২) দাস-প্রথা সম্পর্কে মতান্তর

দাস-প্রথার প্রশ্ন লইয়া উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে বিরোধ চরমে উঠে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হইয়াছিল যে 'মানুষ মাত্রই সমান'; কিন্তু আমেরিকার নিগ্রো-ক্রীত-দাসদের সম্পর্কে এই ঘোষণা কার্যকর করা হয় নাই। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় একমাত্র ম্যাসাচুসেট্‌স্ ও প্যানসিলভানিয়া ছাড়া আমেরিকার সকল রাষ্ট্রেই দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু উত্তর-আমেরিকায় দাস-মজুরের প্রয়োজন না থাকায় এই অঞ্চলের জনমত দাস-প্রথার বিরুদ্ধে ক্রমেই সংঘবদ্ধ হইয়া উঠে। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে উত্তর-আমেরিকার দাস-প্রথা বিলুপ্ত করা হয়। কিন্তু কাপাস-শিল্প রক্ষার অভিপ্রায়ে দক্ষিণী রাষ্ট্রসমূহ এই প্রথা বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর হয়। মিসৌরী-চুক্তি (১৮২০ খ্রীঃ) দ্বারা উভয় পক্ষে এক আপোস-মীমাংসা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই এবং উভয়পক্ষে বিরোধ চলিতে থাকে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে দাস-প্রথার বিরোধী আব্রাহাম লিঙ্কন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে।

(৩) রাজনৈতিক বিরোধ

দীর্ঘকাল যাবৎ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হেতু উত্তরাঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের সকল ব্যাপারে প্রাধান্য ভোগ করিয়া আসিতেছিল। এই কারণে দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীগণের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে উত্তরাঞ্চলের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্যের কোনও উপায় নাই।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে দক্ষিণী রাষ্ট্রবর্গ যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিলে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নের উদ্ভব হইল। যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী সদস্য-রাষ্ট্রসমূহ আবশ্যকবোধে যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে কি না এই সম্পর্কে শাসনতান্ত্রিক কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল না। দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিল যে কতকগুলি সুবিধাভোগের বিনিময়ে তাহারা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যোগদান করিলেও কোন প্রকারেই তাহারা স্ব স্ব রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বা স্বাতন্ত্র্যের বিলুপ্তি স্বীকার করে নাই বা ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকারও বিসর্জন দেয় নাই। কিন্তু উত্তরাঞ্চল এইরূপ দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করিল না। ফলে দক্ষিণী রাষ্ট্রবর্গ যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসংঘ গঠন করিল। কেন্দ্রীয়

সরকার জাতীয় সংহতি ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষার্থে অবশেষে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ বাধিয়া যায়।

যুদ্ধের ঘটনাবলী (Incidents of the War) : ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। উত্তরাঞ্চলের অধীনে ছিল অধিকসংখ্যক সৈন্য, সম্পদ এবং সমরোপকরণ প্রস্তুত করার জন্য অধিকসংখ্যক কারখানা। অধিকন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বাহিনীও তাহাদের অধিকারে থাকায় সমুদ্রের উপর তাহারা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দক্ষিণাঞ্চলের সামরিক বল অপেক্ষাকৃত কম হইলেও তাহারা অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধ ছিল এবং তাহাদের সেনাপতিদ্বয় লী এবং জ্যাকসন, ছিলেন সামরিক প্রতিভায় অদ্বিতীয়। দক্ষিণাঞ্চলের আরও একটি সুবিধা ছিল। ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণী উত্তরাঞ্চলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হইলেও তথাকার বিত্তশালী শ্রেণীর লোকেরা দক্ষিণী রাষ্ট্রসঙ্ঘকে (Confederacy of South) গোপনে নানাভাবে সাহায্য দান করিতেছিল।

উত্তর অঞ্চলের শক্তি ও সুযোগ-সুবিধা

যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রাগার (Fort Sumner) দক্ষিণী রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধের প্রথমদিকে দক্ষিণাঞ্চল অধিকতর সাফল্য অর্জন করে এবং উত্তরাঞ্চল ভার্জিনিয়ার ভিতর দিয়া দক্ষিণী রাষ্ট্রসঙ্ঘকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়। এই অবস্থায় লিঙ্কন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সকল রাষ্ট্রের দাসগণকে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব করিয়া এক ঘোষণাপত্র জারী করেন। যুদ্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হিসাবেই তিনি এইরূপ করেন। তিনি এই মর্মে ঘোষণা করেন, "If I could save the Union without freeing any slave, I would do it and if I could do it by freeing all the slaves, I would do it, and if I could save it by freeing some and leaving other alone, I would also do that"। ১লা জানুয়ারী ১৮৬৩ সালে লিঙ্কনের ঘোষণা কার্যকর করা হয়।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে দক্ষিণী রাষ্ট্রবর্গ ক্রমাগত পরাজয়ের সম্মুখীন হইতে থাকে। জ্যাকসনের মৃত্যু এবং গোটিসবার্গের যুদ্ধে সেনাপতি লীর পরাজয়ে দক্ষিণীদলের জয়ের সকল আশা বিলুপ্ত হয়। যুদ্ধের শেষ বৎসরে উত্তরাঞ্চলের সেনাপতিদ্বয় শেরম্যান ও গ্রাণ্ট, জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়া দখল করেন। দক্ষিণী সেনাপতি লী ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন এবং সঙ্গে সঙ্গে গৃহযুদ্ধেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

২৫.৩. গৃহযুদ্ধের ফলাফল (Results of the Civil War) : দক্ষিণী রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরাজয়ের ফলে আমেরিকা মহাদেশের অখণ্ডতা রক্ষা পাইল এইং বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে অতঃপর যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয় অংশগ্রহণের অবকাশ পাইল। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব বিলুপ্ত হইল এবং অতঃপর যুক্তরাষ্ট্র হইতে কোনও রাষ্ট্রের বিযুক্তি আইনতঃ অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইল।

(১) যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা

দাস-প্রথা আমেরিকা হইতে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইল এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শ অনুসারে আমেরিকার সকল শ্রেণীকে স্বাধীন ও সম-রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইল।

(২) দাস-প্রথার বিলুপ্তি

দাস-প্রথার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলে কৃষিবাণিজ্যের (বিশেষ করিয়া কার্পাস তুলার চাষ) যথেষ্ট ক্ষতি হয়। এই অবস্থায় দক্ষিণাঞ্চল বাণিজ্য ও শিল্প প্রসারের প্রতি অধিক মনোযোগী হইল। ইহার ফলে দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক ও সমাজজীবনে পরিবর্তন ঘটিল এবং শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য উত্তরাঞ্চলের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িল।

(৩) দক্ষিণাঞ্চলে শিল্পের প্রসার

শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিকদের সহিত নিগ্রোদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম-অধিকার স্বীকৃত হইলেও যুক্তরাষ্ট্র হইতে নিগ্রো-বিরোধী মনোভাব বা উহাদের সমস্যার সমাধান হইল না। দাস-প্রথা বিলুপ্ত হইলে দক্ষিণাঞ্চলে নিগ্রোদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কায় তথায় শ্বেতকায়গণ বহু গুপ্তসমিতি গঠন করিয়া নিগ্রো-দমনে উদ্যোগী হইল। এই সকল সমিতির মধ্যে Ku-Klux -Klan নামক সমিতিটি সর্বাধিক অন্যতম। কুসংস্কারভাবাপন্ন নিগ্রোগণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া উহাদের মনে ভীতি ও সন্ত্রাসের সঞ্চার করাই এই সমিতিগুলির উদ্দেশ্য ছিল। নিগ্রোগণ দাসত্ব হইতে মুক্তি হইল বটে, কিন্তু নিরক্ষরতাহেতু বহু দিন পর্যন্ত উহারা রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিল।

নিগ্রো সমস্যা

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মনরো-নীতি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতির মূল ভিত্তি ছিল। কিন্তু গৃহযুদ্ধের পর আমেরিকা মহাদেশের জনগণ নিজেদের সামরিক শক্তি সম্পর্কে অধিক আস্থাবান হইয়া উঠিল এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার নীতি বর্জন করিয়া সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ক্রমেই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল।

পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন

২৫.৪. গৃহযুদ্ধের পর আমেরিকা (America after the Civil War):

গৃহযুদ্ধের অবসানে মার্কিন সরকার অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনে ব্রতী হন। আব্রাহাম লিঙ্কনের পরবর্তী প্রেসিডেণ্ট অ্যান্ড্রু জনসন (Andrew Johnson) দক্ষিণাঞ্চলের প্রতি লিঙ্কনের বিঘোষিত আপোস-নীতি অনুসরণ করেন। কিন্তু এই নীতি অনুসরণ করিতে যাইয়া প্রেসিডেণ্ট জনসনকে রিপাব্লিকান দলের ঘোর বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। মার্কিন কংগ্রেসে রিপাবলিকান দল ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে মার্কিন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের উদার-নীতি বাতিল করিয়া দক্ষিণ-আমেরিকার ক্রীতদাসদের মুক্তির ভিত্তির উপর দক্ষিণ-আমেরিকার পুনর্গঠনের সুপারিশ করে। মার্কিন সংবিধানের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ ধারার সংশোধন করিয়া মুক্ত ক্রীতদাসগণকে আমেরিকার নাগরিক অধিকার দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে ঘোষণা করা হয় যে জাতি, বর্ণ ও অঞ্চল নির্বিশেষে যুক্তরাষ্ট্রের কোন মানুষকেই নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে না।

উত্তরাঞ্চলের পুনর্গঠন

১৮৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পুনর্গঠন আইন (Reconstruction Act) দ্বারা ঘোষণা করা হয় যে যতদিন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলি চতুর্দশ সংশোধন গ্রহণ না করিতেছে ততদিন সেই রাজ্যগুলিকে বিজিত রাজ্য হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং তথায় সামরিক গভর্নর নিযুক্ত রহিবেন। দক্ষিণের কতকগুলি রাজ্য চতুর্দশ সংশোধন গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিলে তথায় সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীনে নিগ্রো শাসন প্রবর্তিত হয়। এই সুযোগে উত্তরাঞ্চলের কিছু নীতিজ্ঞানশূন্য নেতা দক্ষিণের শ্বেতকায়দের উপর রাজনৈতিক অত্যাচার ও সামাজিক নিপীড়ন করার জন্য নিগ্রোগণকে উত্তেজিত করে—যাহা 'কৃষ্ণ-সন্ত্রাস' (Black Terror) নামে অভিহিত। ফলে দক্ষিণ-আমেরিকায় প্রশাসনিক দুর্নীতি ও কুশাসন শুরু হয় এবং সরকারী কর্মচারীগণ সরকারী তহবিল তছনছ করে। এই অবস্থায় দক্ষিণের শ্বেতকায়গণকে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়াসী হইতে হয় এবং উহারা নিগ্রোদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। উহারা বহু গুপ্ত-সমিতি গঠন করিয়া সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ শুরু করে। এই সকল গুপ্ত-সমিতির মধ্যে কু-ক্লাক্স-ক্লান (Ku-Klux-Klan) ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। নিগ্রোদের উপর এই গুপ্তসমিতি সন্ত্রাস চালাইয়া উহাদের মধ্যে প্রবল আতঙ্কের সৃষ্টি করে ও বহু নিগ্রো হতাহত হয়। ইতিমধ্যে দক্ষিণাঞ্চল হইতে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হইলে তথাকার শ্বেতকায়গণ নিজেদের নিরাপত্তার বিধান নিজেরাই করিতে সক্ষম হয়। সরাসরিভাবে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংশোধন প্রত্যাখ্যান না করিয়া দক্ষিণের শ্বেতকায়গণ নিগ্রোদের ভোটাধিকার খর্ব করে এবং সামাজিক ভাবে উহাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে।

দক্ষিণে নিগ্রো শাসন

ক্রমে দক্ষিণী-শ্বেতকায়গণ নূতন পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লয়। উহারা বৃহদাকার কৃষি-জমিদারি ভাঙিয়া দিয়া মুক্ত শ্রমিকদের সাহায্যে তুলা-চাষে ব্রতী হয়। ইতিমধ্যে দক্ষিণে শিল্পের প্রসার ঘটিলে, দক্ষিণীগণ নিজেদের শিল্প গড়িয়া তোলে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্ব-নির্ভর হইয়া উঠে। রেলপথের সম্প্রসারণ ঘটিলে দক্ষিণের বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে এবং সেই সঙ্গে আঞ্চলিক অর্থনীতিরও অবসান ঘটে। সমগ্র আমেরিকা মহাদেশে আঞ্চলিকবাদের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটে।

অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন (Internal Development) : গৃহযুদ্ধের পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন দ্রুত সম্প্রসারিত হয়। পশ্চিমে মিসিসিপি অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকে এবং এই সময়ের মধ্যে কলোরাডোয় স্বর্ণখনি ও রকি (Rockies) অঞ্চলে মূল্যবান খনিজ-সম্পদ আবিষ্কৃত হয়। এই নব-আবিষ্কৃত অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য মার্কিন কংগ্রেস ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে 'আবাসভূমি-আইন' (Homestead Act) নামে একটি আইন প্রবর্তন করিয়া ঘোষণা করে যে যাহারা এই অঞ্চলে পাঁচ বৎসর বসবাস করিয়া খনিজ-সম্পদের উন্নয়নের সাহায্য করিবে উহাদের ১৬০ একর জমি দান করা হইবে। পশ্চিমাঞ্চলের দিকে সম্প্রসারণের জন্য যোগাযোগ ও যানবাহনের উন্নয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই উদ্দেশ্যে রেলপথের সম্প্রসারণ শুরু হয় এবং ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মহান্ মহাদেশীয়

রেলপথের কাজ সম্পূর্ণ হয়। ইহার পর মহাদেশের ভিতরে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে রেলযোগাযোগ ব্যবস্থা জোরদার করা হয়।

মিসিসিপি অঞ্চলে শ্বেতকায়দের বসতি শুরু হইলে উহাদের সহিত স্থানীয় রেড-ইণ্ডিয়ান নামক উপজাতিদের সংঘর্ষ শুরু হয়। লুসিয়ানা অঞ্চল ক্রয় করার সময় রেড-ইণ্ডিয়ানদের আরও পশ্চিমের দিকে তাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং উহাদের জন্য কিছু অঞ্চল সংরক্ষিত রাখা হয়। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরীয় রেলপথের নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইলে সংরক্ষিত অঞ্চলগুলিতে শ্বেতকায়দের অনুপ্রবেশ শুরু হয়। ফলে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য রেড-ইণ্ডিয়ানগণ অস্ত্রধারণ করিলে উভয়পক্ষে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রেড-ইণ্ডিয়ানগণ পরাস্ত হয় এবং মূল্যবান জমি-জায়গা উহাদের হস্তচ্যুত হয়।

গৃহযুদ্ধের সময় যুদ্ধ-শুল্কের ব্যাপক প্রচলন ও যুদ্ধজনিত লাভ প্রভৃতি কারণে উত্তর-আমেরিকায় প্রতিটি শিল্প অভাবনীয়ভাবে অগ্রগতি লাভ করে। উত্তর-আমেরিকার শিল্পোৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর বিক্রয়ের জন্য অভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসারও সেই সঙ্গে ঘটে। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তি-বিদ্যার প্রয়োগের ক্ষেত্রে মার্কিনীরা বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে। শিল্পের ও শিল্পোৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলিকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করার জন্য উচ্চহারে শুল্ক-প্রাচীরের সৃষ্টি করা হয় এবং এই শুল্ক-প্রাচীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি হইয়া উঠে। ক্রমে পশ্চিমাঞ্চলে বড় বড় শিল্প-নগর গড়িয়া উঠে। পিটস্‌বার্গ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অন্যতম কেন্দ্র হইয়া উঠে। মোটর শিল্পের জন্য ডেট্রয়ট (Detroit) এই যুগেই প্রসিদ্ধি লাভ করে।

শিল্প-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি নূতন সমস্যারও উদ্ভব হয়। বড় বড় পুঁজিপতিগণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া যুগ্ম-পরিচালনায় বড় বড় কলকারখানা ও যৌথ কারবার গড়িয়া তোলে। এইভাবে গোষ্ঠীগত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিলে ছোট ছোট শিল্পসংস্থা প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে অসমর্থ হয় এবং এবং এই ধরনের বহু সংস্থা বিলুপ্ত হইয়া যায়। যে সংস্থাগুলি কোন রকমে টিকিয়া ছিল, সেইগুলি শেষ পর্যন্ত বড় বড় যৌথ-সংস্থাগুলির সহিত আপোস করিয়া বৃহদাকার যৌথ-সংস্থা বা ট্রাস্ট (Trust)-এর পত্তনে সহায়ক হয়। যথা স্ট্যান্ডার্ড তৈল কোম্পানী (Standard Oil Company), মার্কিন ইস্পাত করপোরেশন (U. S. Steel Corporation) ইত্যাদি। এই ট্রাস্ট-সংস্থাগুলি অনতিকাল মধ্যেই একচেটিয়া ব্যবসায় পরিণত হয় এবং ফলে পণ্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি পায়। মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে মার্কিন জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের উদ্ভব হয় এবং ট্রাস্ট-সংস্থাগুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা হয়।

নূতন শিল্প-সমস্যার উদ্ভব

কতকগুলি পুঁজিপতির হস্তে মূলধন সঞ্চিত হইতে থাকিলে সেই সঙ্গে শ্রমিকগণও

বিভিন্ন গোষ্ঠীতে দলবদ্ধ হইতে থাকে। কলকারখানায় শ্রমের উন্নয়নের জন্য শ্রমিক-সংঘ গঠিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক-সংঘগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিল 'নাইটস্-অফ লেবার' (Knights of Labour) ও 'আমেরিকান ফেডারেশন অফ লেবার' (American Federation of Labour)। মালিক ও শ্রমিক সংঘর্ষের ফলে ক্রমেই শিল্পে ধর্মঘটের সূত্রপাত হয়। মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধান করা মার্কিন অর্থনীতির এক অন্যতম সমস্যা।

শ্রমিক-সমস্যা

অভিবাসন সমস্যা (Immigration Problem): আমেরিকা মহাদেশ হইল বিদেশীদের আগমনস্থল এবং নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তুলনামূলকভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অফুরন্ত সম্পদে আকৃষ্ট হইয়া অগণিত মানুষ এই মহাদেশে আসিয়া বসবাস শুরু করে। গৃহযুদ্ধের অবসানের পর ইওরোপ হইতে এক বিশাল জনস্রোত আমেরিকার পূর্ব উপকূলে আসিয়া আছড়াইয়া পড়ে। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ব্রিটেন এবং পশ্চিম ও উত্তর ইওরোপের বহু মানুষ আমেরিকায় আগমন করিয়া বসবাস শুরু করে। কিন্তু ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপ অর্থাৎ ইটালী, দক্ষিণ-রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে বহু মানুষ আমেরিকায় আগমন করে। এই সকল বিদেশীদের আগমনের ফলে এক বিরাট সমস্যার উদ্ভব হয়। অভিবাসন-সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে মার্কিন কংগ্রেস কতকগুলি আইন প্রবর্তন করে। দণ্ডিত অপরাধী, দরিদ্র, বিকলাঙ্গ, অশিক্ষিত, সন্ত্রাসবাদী প্রভৃতি লোকদের আগমন নিষিদ্ধ করা হয় এবং প্রতিটি দেশ হইতে আগত অভিবাসীদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়।

আমেরিকার পূর্ব উপকূলে অভিবাসীদের অধিকাংশই ছিল ইওরোপীয়। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে অভিবাসীদের অধিকাংশই ছিল চীনা ও জাপানী। চীনা ও জাপানী মজুরদের হার ছিল খুবই সস্তা। এই শ্রমিকগণ দলে দলে আমেরিকায় আসিতে আরম্ভ করিলে দারুণ শ্রমিক সমস্যার উদ্ভব হয় এবং আমেরিকার শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের রাজ্যগুলির চাপে মার্কিন কংগ্রেস ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন পাস করিয়া চীনা অভিবাসীদের আগমন নিষিদ্ধ করে। দশ বৎসর পর অপর একটি আইনের বলে আমেরিকায় স্থায়ী বসবাসকারী নহে এমন চীনা অভিবাসীগণকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সহিত সম্পাদিত এক চুক্তি অনুসারে জাপানী অভিবাসীগণকেও একই কারণে বহিষ্কার করা হয়।

২৫.৫. গৃহযুদ্ধের পর আমেরিকার পররাষ্ট্র-নীতি
(Foreign Policy of America after the Civil War)

উনবিংশ শতকের শেষার্ধ: গৃহযুদ্ধের সময় পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতি তেমন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। ১৮২৩ হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ

পর্যন্ত মনরো-নীতি অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার বিচ্ছিন্ন থাকার নীতিই অনুসৃত হইয়া আসিতেছিল এবং তাহা সমগ্র মহাদেশের কল্যাণসাধনই করিয়াছিল। গৃহযুদ্ধের ফলে যুক্তরাষ্ট্র সংহতি লাভ করে এবং জাতীয় ঐক্য-চেতনা যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতিকে অতঃপর যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করে। বিশ্ব-রাজনীতিতে নির্লিপ্ত থাকার নীতি পরিত্যক্ত হয়।

রিপাব্লিকান দল আমেরিকার জাতীয় ঐক্য বিশ্বের নিকট ঘোষণা করার অভিপ্রায়ে বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের মেক্সিকো অভিযান যুক্তরাষ্ট্রকে সেই সুযোগ দেয়। গৃহযুদ্ধ সমাপ্ত হইলে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ফরাসী সম্রাটকে মেক্সিকো হইতে ফরাসী সৈন্য অপসারণ করিতে বাধ্য করেন।

যুক্তরাষ্ট্র ও তৃতীয় নেপোলিয়ন

গৃহযুদ্ধের সময় দক্ষিণী-রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক ইংল্যাণ্ডের 'আলাবামা' নামক রণতরীটি স্থলের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল। যুদ্ধ অবসানে যুক্তরাষ্ট্র সরকার আমেরিকার নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিবার অভিযোগে ইংল্যাণ্ডকে অভিযুক্ত করিয়া ক্ষতিপূরণ দাবি করে। ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন আমেরিকার অনমনীয় মনোভাব লক্ষ্য করিয়া ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য হন।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ড

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সাত মিলিয়ন ডলার মূল্যে আমেরিকা রাশিয়ার নিকট হইতে আলাস্কা ক্রয় করে। অর্থনৈতিক দিক দিয়া এই বন্দোবস্ত আমেরিকার পক্ষে লাভজনক হয়।

রাশিয়ার নিকট হইতে আলাস্কা ক্রয়

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও ভেনিজুয়েলার মধ্যে সীমানা-সম্পর্কিত বিরোধের সুযোগ লইয়া যুক্তরাষ্ট্র সরকার মনরো-নীতির সম্প্রসারণ এবং ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের উপর ইংল্যাণ্ডের আধিপত্য খর্ব করার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হন। আমেরিকার তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ক্লিভল্যাণ্ড ভেনেজুয়েলার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া ঘোষণা করেন যে "আমেরিকা মহাদেশে যুক্তরাষ্ট্র সরকারই একমাত্র অধিপতি।" সুতরাং মহাদেশ সম্পর্কিত সকল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার যুক্তরাষ্ট্রের আছে। অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইংল্যাণ্ড ও ভেনেজুয়েলার মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয় এবং আমেরিকার ল্যাটিন রাষ্ট্রগুলির উপর যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অভিভাবকত্ব স্বীকৃত হয়। এই ঘটনার পর হইতে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়।

ভেনেজুয়েলার ব্যাপার

অতঃপর আমেরিকার পররাষ্ট্র-নীতি সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে রূপান্তরিত হইতে থাকে। বহির্জগতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগঠনে যুক্তরাষ্ট্র উদ্যোগী হয় এবং শীঘ্রই সুযোগও উপস্থিত হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার অন্তর্গত স্পেনের সাম্রাজ্যভুক্ত কিউবার (Cuba) অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ লইয়া প্রেসিডেন্ট ক্লিভল্যাণ্ড কিউবার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার হুমকি দেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের এক রণতরী হাভানা

স্পেনের সহিত যুদ্ধ (১৮৯৮)

বন্দরে এক দুর্ঘটনার ফলে বিনষ্ট হইলে যুক্তরাষ্ট্র সরকার স্পেনকে উহার জন্য দায়ী করিয়া কিউবার স্বাধীনতা দাবি করে। কিন্তু স্পেন ইহাতে অসম্মত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আমেরিকার নৌ-শক্তির নিকট স্পেন পরাজিত হয় এবং প্যারিসের সন্ধি (১৮৯৮ খ্রীঃ) দ্বারা স্পেন আমেরিকার রক্ষণাধীনে কিউবার স্বাধীনতা স্বীকার করে এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত পোর্টোরিকো, প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত গুয়াম ও ফিলিপাইন আমেরিকাকে সমর্পণ করে।

স্পেন ও আমেরিকার এই যুদ্ধ আমেরিকার পররাষ্ট্র-নীতির ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদের সূচনা করে। কিউবাকে স্পেনমুক্ত করিতে গিয়া আমেরিকা নিজেই কিছু ভূখণ্ড গ্রাস করে। আমেরিকার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ভিত্তি এইভাবে রচিত হয়। পোর্টোরিকো অধিকারের ফলে ক্যারিবিয়ান উপসাগরের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয় এবং ফিলিপাইন অধিকারের ফলে জাপানের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হয়। স্পেন-আমেরিকান যুদ্ধের সময় সামরিক কারণে যুক্তরাষ্ট্রে হাওয়াই (Howaii) দ্বীপ দখল করিয়া তথায় কয়লা ও নৌ-ঘাঁটি স্থাপন করে (১৮৯৮)।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তৃতি

এইভাবে প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক তৎপরতার সূত্রপাত হয়। পরবৎসর ইংল্যান্ড ও জার্মানীর সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়া যুক্তরাষ্ট্র সামোয়ান দ্বীপপুঞ্জ দখল করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে চীনের ঘটনাবলীর প্রতি যুক্তরাষ্ট্রকে অধিক মনোযোগী হইতে হয়। অতঃপর যুক্তরাষ্ট্রের নীতি হইল চীন সম্পর্কে 'উন্মুক্ত দ্বার নীতি' (open door policy) অনুসরণ করিয়া চীনসাম্রাজ্যে আমেরিকার বাণিজ্যিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা। সুদূর-প্রাচ্যে জাপানের অগ্রগতি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগের কারণ হয় এবং এই কারণে রুশ-জাপান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যস্থতার ভূমিকা গ্রহণ করে। ওয়াশিংটন সম্মেলনে আমেরিকার জাপানী-ভীতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তথাপি যুক্তরাষ্ট্র জাপানের প্রতি শান্তির-নীতি অনুসরণ করিয়া চলে।

সুদূর-প্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নূতন সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিলেও, পশ্চিম ভূমণ্ডলে ইওরোপীয় দেশগুলিকে কোন প্রকার ভূখণ্ড দখল ও প্রতিপত্তি বিস্তারের মোটেই পক্ষপাতী ছিল না। পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্র 'মনরো-নীতি' (Monroe-Doctrine) ঘোষণা করিয়া ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির প্রচলিত সুযোগ-সুবিধা ক্ষুণ্ণ করিয়া নিজের সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার নীতি গ্রহণ করে। মধ্য-আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান সমুদ্র-উপকূলে মনরো-নীতির প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কিউবা-র স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্পেনের সহিত যুদ্ধ করিয়া যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত কিউবার উপর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি স্থাপন করে। ইহার পর পানামা খালের ব্যাপারেও যুক্তরাষ্ট্র একই নীতি গ্রহণ করে। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে একটি চুক্তি অনুসারে পানামা খালের উপর ইংল্যান্ড ও আমেরিকার যৌথ কর্তৃত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তি অমান্য করিয়া

পানামা খালের উপর একক কর্তৃত্ব স্থাপন করে। মধ্য-আমেরিকার অন্তর্গত নিকারাগুয়া রাজ্যটিকেও যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। এইভাবে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন উপায়ে বহির্বিশ্বে উপনিবেশ ও কয়লা-ঘাঁটি গড়িয়া তোলে।

২৫.৬. বিংশ শতকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতি (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত): রাজ্যবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকাবাসীগণ অধিকতর সাম্রাজ্যবাদী হইয়া উঠে। শক্তিবৃদ্ধি হেতু যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশঃ মনরো-নীতির আদর্শ বিসর্জন দিয়া বিশ্ব-রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতে অগ্রসর হয়। থিয়োডোর রুজভেল্ট (১৯০১-৯ খ্রীঃ) যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর হইতেই আমেরিকার এই নূতন নীতি সক্রিয় হইয়া উঠে।

এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়ায় রুজভেল্ট যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র ব্যাপারে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন। তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের অন্যতম শক্তিতে পরিণত করা। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আলাস্কা রাশিয়ার নিকট হইতে ক্রয় করা হইয়াছিল। কিন্তু কানাডা ও আলাস্কার মধ্যে সীমানা লইয়া বিরোধের সৃষ্টি হইলে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করিয়া ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থানুকূলে এই বিরোধের মীমাংসা করেন।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও পররাষ্ট্র-নীতি

পানামা খাল সম্পর্কে তিনি বলিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত 'ক্লেটন-বুলওয়ার' (Clayton-Bulwar Treaty) নামক এক সন্ধি অনুসারে ইহা স্থির হইয়াছিল যে ভবিষ্যতে পানামা খাল নির্মিত হইলে সন্ধি-স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রদ্বয় এককভাবে উহার উপর একচ্ছত্র আধিপত্য দাবি করিবে না। কিন্তু আতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পানামা খাল সর্বতোভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। রুজভেল্টের প্রচেষ্টায় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত 'হেপাউন্সফোট' সন্ধি (Haypouncefote Treaty) অনুসারে ইংল্যাণ্ড পানামা খালের উপর উহার বিশেষ অধিকার পরিত্যাগ করিতে সম্মত হয়। কিন্তু কলোম্বিয়ার সরকার (পানামা ছিল কলোম্বিয়ার অন্তর্গত একটি প্রদেশ) হেপাউন্সফোট সন্ধির বিরোধিতা করিয়া খাল খননের ব্যাপারে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় বল ও কৌশলের সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্র পানামা খাল-সন্নিহিত ভূখণ্ড দখল করিয়া তথায় স্বীয় আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং পানামার স্বাধীনতা কলোম্বিয়ার নিকট হইতে আদায় করে। নব স্বাধীনতালব্ধ পানামার নিকট হইতে সন্নিহিত অঞ্চল ক্রয় করা হয় এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে খালের খননকার্য শেষ হয়। অতঃপর ল্যাটিন আমেরিকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিয়া যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা মহাদেশে প্রাধান্য লাভ করে।

পানামা খাল

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট রুশ-জাপান যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়া উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি স্থাপন করেন। তাঁহার এই সাফল্যের জন্য তাঁহাকে নোবেল প্রাইজ প্রদান করা হয়। এস্থলে স্মরণ রাখা দরকার যে রুজভেল্টের মধ্যস্থতার ফলে জাপানকে কূটনৈতিক পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল এবং এই কারণে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধিতার সূত্রপাত হয়।

রুশ-জাপান যুদ্ধে রুজভেল্টের মধ্যস্থতা

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মরক্কোকে কেন্দ্র করিয়া জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিলে আলজিয়ার্সে যে আন্তর্জাতিক বৈঠক আহূত হয় আমেরিকা তাহাতে যোগদান করিয়া বিবদমান রাষ্ট্রের মধ্যে সাময়িকভাবে শান্তি স্থাপন করিতে সাহায্য করে। মনরো-নীতি বর্জন করিয়া আমেরিকা যে বিশ্বরাষ্ট্রে পরিণত হইতে ইচ্ছুক আলজিয়ার্স-এর বৈঠক তাহার পরিচায়ক।

আলজিয়ার্স বৈঠক ও যুক্তরাষ্ট্র

বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কিছুদিন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিল, যদিও মিত্রশক্তিকে প্রচুর ঋণদান করিয়া তাহাদিগকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করিতেছিল। কিন্তু ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান সাবমেরিন কর্তৃক আমেরিকার কয়েকটি বাণিজ্যজাহাজ বিধ্বস্ত হইলে যুক্তরাষ্ট্র মনরো-নীতি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে আমেরিকা বিশ্ব-রাজনীতিতে প্রকাশ্যভাবে অবতীর্ণ হয়। একথা অনস্বীকার্য যে আমেরিকার যোগদানের ফলে মিত্রশক্তি অতি সহজেই জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে প্রেসিডেণ্ট উইলসন এক গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আদর্শবাদী এবং তাঁহার প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল জগৎ হইতে যুদ্ধের সম্ভাবনা দূরীভূত করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্যারিসের বৈঠকে চৌদ্দ-দফা-সম্বলিত একটি মীমাংসাপত্র উপস্থাপিত করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় লীগ অফ নেশনস্ পরিকল্পনাটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে এই লীগ অফ নেশনস্ হইতে যুক্তরাষ্ট্র সরিয়া দাঁড়ায় এবং ভার্সাই-সন্ধির শর্তসমূহ কার্যকর করার দায়িত্বগ্রহণেও অসম্মত হয়। কারণ উইলসনের ইওরোপীয় নীতি ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক সমর্থিত না হওয়ায় আমেরিকার জনসাধারণ ভবিষ্যতে ইওরোপের ব্যাপারে জড়িত না হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করে। উপরন্তু যুদ্ধকালীন ঋণ পরিশোধ করিতে ইংল্যাণ্ডের অসম্মতি এবং ভার্সাই-সন্ধি দ্বারা জার্মানীর প্রতি ঘোরতর অবিচার আমেরিকার জনসাধারণকে ভার্সাই-সন্ধি তথা ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। এই কারণে যুক্তরাষ্ট্র ইওরোপের ব্যাপারে বিচ্ছিন্ন থাকাই শ্রেয় মনে করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যোগদান

ভার্সাই-সন্ধি ও যুক্তরাষ্ট্র

২৫.৭. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার ইতিহাস

অভ্যন্তরীণ ইতিহাস (Internal history) ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি চারি বৎসর অন্তর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং এই নির্বাচন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের এক অন্যতম প্রধান ঘটনা। এই নির্বাচনের ব্যাপারে আমেরিকার জনগণের এক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রত্যক্ষ দায়িত্ব রহিয়াছে। একমাত্র দূরদৃষ্টি ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন এবং কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিই এই পদের প্রার্থী হিসাবে বিবেচিত হইয়া থাকেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের প্রেসিডেণ্ট-পদের নির্বাচন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট-পদের নির্বাচনে আমেরিকার দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল—রিপাব্লিকান (Republican) ও ডেমোক্রেট (Democrat) প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। রিপাব্লিকান ও ডেমোক্রেট দলের মনোনীত প্রার্থী হইলেন যথাক্রমে হার্ডিং (Harding) ও কক্স (Cox)। হার্ডিং ও কক্স উভয়েই ছিলেন ওহিয়ো (Ohio) রাষ্ট্রের নাগরিক ও অধিবাসী। তাঁহারা উভয়েই সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সাংবাদিক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। উভয়েই দুইটি সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহারা চারিত্রিক মাধুর্যের ও সবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন এবং বহুকাল পর্যন্ত উভয়ে পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। নির্বাচনকালে হার্ডিং যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটের সদস্য ছিলেন এবং কক্স ওহিয়ো রাষ্ট্রের গভর্নর-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

রিপাব্লিকান বনাম ডেমোক্রেট

হার্ডিং ও কক্স

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রিপাব্লিকান ও ডেমোক্রেট পার্টি সমবেতভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিল এবং উভয়ের পররাষ্ট্র-নীতি প্রায় একই রকম ছিল। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ অফ নেশনস্ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতির ব্যাপার লইয়া এই দুইদলের মধ্যে এক দারুণ মতভেদের উদ্ভব হয়। ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন ছিলেন ডেমোক্রেট পার্টির সদস্য ও লীগ অফ নেশনস্-এর প্রতিষ্ঠাতা। এই কারণে রিপাব্লিকান পার্টি লীগ অফ নেশনস্-এর বিরোধিতা করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক লীগ অফ নেশনস্-এর সদস্যপদ পরিত্যাগ করায় আমেরিকার জনগণের অনেকে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। এতদ্ভিন্ন উইলসনের ইটালীয় ও জার্মান নীতিও আমেরিকাবাসীর মনঃপূত হয় নাই। এই সকল কারণে আমেরিকার জনগণ রিপাব্লিকান পার্টির প্রার্থী হার্ডিংকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করে এবং বিপুল ভোটাধিক্যে হার্ডিং কক্স-কে পরাজিত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্বাচিত হন।*

১৯২০ হইতে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রিপাব্লিকান পার্টি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং ও তাঁহার দুই উত্তরাধিকারী—যথাক্রমে ক্যালভিন্ কুলিজ (Calvin

* "It was Wilson rather than Cox that was so overwhelmingly defeated in 1920"—Elson—History of the U. S. A,—P 963.

Coolidge) ও হুভার (Hoover)-এর আমলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অভ্যন্তরীণ নীতির লক্ষ্য ছিল স্বদেশের স্বাভাবিক অবস্থা ("return to normalcy") ফিরাইয়া আনা এবং পররাষ্ট্র-নীতির লক্ষ্য ছিল বিশ্ব-রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা।

নূতন সরকারের সম্মুখে অভ্যন্তরীণ সমস্যা

শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পর যুক্তরাষ্ট্রের নূতন সরকারের সম্মুখে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দেয়। শারীরিক কারণে কর্তব্য-পালনে অক্ষম সৈনিকদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা, প্রচলিত কর-আইনের সংশোধন করা এবং দেশের শিল্প-গুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনা।

জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মার্কিন কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল—জার্মানীর সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পন্ন করা, অভ্যন্তরীণ শুল্কের স্বার্থানুকূলে কর-আইনের পুনর্বিবেচনা করা এবং সৈনিকদের অতিরিক্ত দেয় বাটার (bonus) পরিমাণ নির্ধারিত করা। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করিয়া উহাদের সহিত যুদ্ধের অবসান ঘটায়।

'ইমিগ্রেশন আইন'

যুদ্ধাবসানে সৈনিকগণ দলে দলে কলকারখানা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে থাকিলে এবং যুদ্ধাবসানে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে দলে দলে ইওরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে শ্রমিকগণ আমেরিকায় আসিতে আরম্ভ করিলে এক দারুণ শ্রমিক সমস্যার উদ্ভব হয়। এই অবস্থায় মার্কিন সরকার ইওরোপীয় শ্রমিকদের আগমন সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে 'ইমিগ্রেশন আইন' (Immigration Law) বিধিবদ্ধ করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই আইন কঠোরভাবে বলবৎ রাখা হয়।

বাজেট আইন, কর আইন

ইওরোপের অনেক দেশে সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কে বাজেট আইন (budget law) বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাহা ছিল না। সুতরাং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম বাজেট আইন প্রবর্তন করা হয়। সেই বৎসর যুদ্ধকালীন কর-আইনের সংশোধন করা হয়। অতিরিক্ত করের মাত্রা হ্রাস করা হয় এবং বিলাস-সামগ্রীর উপর নূতন হারে কর ধার্য করা হয়।

বাণিজ্য-শুল্ক

প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনের রক্ষণশীল দলের ন্যায় আমেরিকার রিপাব্লিকান দলও পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সর্বদাই যত্নবান ছিলেন। অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মার্কিন শিল্পপতিগণকে একচেটিয়া অধিকার প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং মার্কিন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ইওরোপের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মার্কিন সরকার বাণিজ্য-শুল্কের হার অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি করেন। এই নূতন

বাণিজ্য-শুল্কের বিরুদ্ধে ডেমোক্রেটিস সংবাদপত্রগুলি এমন কি বিখ্যাত রিপাব্লিকান দলের মুখপত্র 'নিউ-ইয়র্ক-ট্রিবিউন' (New Yrok Tribune) পর্যন্ত জোর সমালোচনা শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে নূতন বাণিজ্য-শুল্ক রিপাব্লিকান সরকারের জনপ্রিয়তা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ করে এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মার্কিন সেনেটের নির্বাচনে রিপাব্লিকান দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়।

ইতিমধ্যে শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে এক দারুণ অশান্তির উদ্ভব হয়। যুদ্ধের সময় মুদ্রাস্ফীতি ও দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীর মূল্যস্ফীতি ঘটিয়াছিল এবং শ্রমিকদের মজুরীর হারও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধাবসানে পণ্য-সামগ্রীর মূল্য ও শ্রমিকদের মজুরীর হার হ্রাস করা হইলে শ্রমিকদের মধ্যে এক প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। হাজার হাজার কলকারখানা বন্ধ করা হইলে শ্রমিকগণ ধর্মঘট করে। শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক-আন্দোলনেরও উদ্ভব হয়। যুদ্ধের সময় ইওরোপে আমেরিকার কৃষিজাত সামগ্রীর প্রচুর চাহিদা থাকায় উহার মূল্য অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধাবসানে সেই চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় কৃষিজাত সামগ্রীর মূল্য হ্রাস পায়। ফলে কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। এই অবস্থায় মার্কিন সরকার বিভিন্ন অঞ্চলে যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া কৃষকদের আর্থিক দুরবস্থার কিছু লাঘব করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃষি-ঋণ আইন (Agricultural Credit Act) পাস করিয়া কৃষকগণকে স্বল্প-মেয়াদী ঋণ-দানের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে হার্ডিং-এর মৃত্যু হইলে উপরাষ্ট্রপতি ক্যালভিন কুলিজ (Calvin Coolidge) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হন (১৯২৪ খ্রীঃ)। কুলিজের শাসনকালে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটে। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে নূতন কর-আইন (New Tax Law) পাস করিয়া প্রচলিত করের হার হ্রাস করা হয়। নূতন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ক্ষেত্রে এক নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। কুলিজের শাসনকালকে আমেরিকার শিল্প-জগতে গৌরবময় যুগ বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে বৃহৎ শিল্পপতিগণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। এলসন (Elson)-এর কথায় "Big business was in the saddle, it ruled the country"।

ক্যালভিন কুলিজ (১৯২৪-১৯২৮)

কুলিজের শাসনকালে জাতীয় ঋণের পরিমাণ হ্রাস করা হয়। আয়করের হারও হ্রাস করা হয়। কৃষির উন্নয়নকল্পেও কয়েকটি আইন পাস করা হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ইমিগ্রেশন (Immigration Law) আইন কঠোরভাবে কার্যকর করা ইওরোপে বিশেষ করিয়া জাপানে এক দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট-পদের নির্বাচনে রিপাব্লিকান দল পুনরায় জয়লাভ করে এবং এই দলের মনোনীত প্রার্থী হুভার প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হন। হুভার

ছিলেন যেমন কর্মিষ্ঠ তেমনি কর্তব্যপরায়ণ। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা ইঞ্জিনীয়ার। ইঞ্জিনীয়ারিং পরিকল্পনা রচনার ব্যাপারে বহুবার তাঁহার কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রাজনৈতিক দলের নেতা হিসাবে মোটেই সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে "He could run a department or set of departments with great skill ; he could organize forces to meet an emergency ; but he could not direct a party or guide public opinion"। কোনরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইবার মতো ধৈর্য তাঁহার ছিল না। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন রক্ষণশীল। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তিনি উচ্চ বাণিজ্য-শুল্কের ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য প্রসারের পক্ষপাতী ছিলেন।

হুভার (১৯২৮-১৯৩২)

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের পর প্রথম নয় বংসর রিপাব্লিকান শাসনাধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক অগ্রগতি চলিয়াছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইওরোপে প্রচুর পরিমাণে কৃষিজাত ও শিল্পজাত সামগ্রী রপ্তানি করার ফলে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পায়, শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটে এবং উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার ঢেউ আমেরিকা মহাদেশেও আসিয়া পেঁছায়। কৃষিজাত সামগ্রী অতিরিক্ত মাত্রায় উদ্বৃত্ত হইয়া পড়ায় উহার মূল্য অভাবনীয় ভাবে কমিয়া যায় এবং কৃষিজীবীগণের শিল্পজাত সামগ্রী ক্রয় করার ক্ষমতা কমিয়া যায়। অপরদিকে ইওরোপের চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পজাত সামগ্রী স্ফীত হইয়া উঠিতে থাকে। ফলে কলকারখানা বন্ধ হইয়া যায় এবং শ্রমিকদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের অর্থনৈতিক মন্দা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন এইরূপ অর্থনৈতিক মন্দার যুগ চলিতেছিল সেই সময় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচন আসিয়া পড়ে। রিপাব্লিকান দল ও ডেমোক্রেট দল যথাক্রমে হুভার ও ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টকে (Franklin Roosevelt) প্রেসিডেন্ট-পদের জন্য মনোনীত করে। রুজভেল্ট ছিলেন ভূতপূর্ব মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্টের নিকট আত্মীয়। ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট কিছুকাল নিউ-ইয়র্ক আইনসভার সদস্য এবং প্রেসিডেন্ট উইলসনের আমলে নৌ-বিভাগের সহ-সচিব ছিলেন। ইহার পর তিনি নিউ-ইয়র্কের গভর্নর-পদে নিযুক্ত ছিলেন। রুজভেল্ট তাঁহার নির্বাচনী বক্তৃতায় জনগণের নিকট এক নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। তাঁহার এই পরিকল্পনা "New Deal" নামে অভিহিত। তিনি মার্কিনজাতির পুনরুজ্জীবন ও সমৃদ্ধির ভবিষ্যদ্বাণী করেন। Langsam-এর কথায় "He (Roosevelt) prophesied that the nation would revive and prosper"। রুজভেল্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংকটের জন্য হুভার সরকারকে সর্বতোভাবে দায়ী করেন। কারণ তাঁহার মতে হুভার সরকার অনর্থক জনগণের মনে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ভ্রান্ত

রুজভেল্ট

ধারণা সৃষ্টি করিয়া অর্থনৈতিক সংকটের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। অপরদিকে রিপাব্লিকান দলও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবার জন্য নানাপ্রকারে জনগণের সমর্থন লাভে যত্নবান হয়। এমন কি উহারা ক্যালভিন কুলিজ ও ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট থিওডোর রুজভেল্টের বিধবা পত্নীর প্রকাশ্য সমর্থনও লাভ করে। কিন্তু ডেমোক্রেট দলের মনোনীত প্রার্থী ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট শেষ পর্যন্ত বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্বাচিত হন।

ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের শাসনাধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কার্য নূতন করিয়া শুরু হয়। বহুবিধ অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করিয়া রুজভেল্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনার প্রতি জনগণের আস্থা ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন। তিনি ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবর্তে সমবায়-মূলক ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে অসম প্রতিযোগিতা ও বিপজ্জনক উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা প্রতিরোধ করার পক্ষপাতী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে National Industrial Recovery Act (NIRA) বিধিবদ্ধ করেন। এই আইনের প্রধান লক্ষ্য ছিল - ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার নীতি প্রয়োগ করা; শ্রমিকগণকে সংঘবদ্ধ হইয়া উহাদের দাবি-দাওয়া আদায় করার অধিকার প্রদান করা এবং শ্রমিকগণের উপর মালিকগণের কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ করা। এই আইনের ফলে শিল্পপতি ও শ্রমিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া পড়ে।

NIRA

অর্থনৈতিক পুনর্গঠন-কার্যে তত্ত্বাবধানের জন্য প্রেসিডেণ্ট National Recovery Administration (NRA) নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মকর্তাগণকে লইয়া এই সংস্থা গঠিত হয়।

NRA

অতঃপর সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠন কার্য দ্রুত-গতিতে চলিতে থাকে। কারখানা-আইন অনুসারে কলকারখানায় শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয় এবং উহাদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়। উত্তরোত্তর কলকারখানা ও শিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে বেকারের সংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকে। প্রথম-দিকে রুজভেল্টের অভ্যন্তরীণ নীতির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা সত্ত্বেও ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন কংগ্রেসের নির্বাচনে ডেমোক্রেট দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় এবং রুজভেল্ট তাঁহার নীতির সমর্থন লাভ করেন।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি

১৯৩৬, ১৯৪০ ও ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রেসিডেণ্ট-পদের নির্বাচনে ডেমোক্রেট দলের প্রার্থী হিসাবে ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট জয়লাভ করিয়া এই মহান্ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

২৫.৮. দক্ষিণ-আমেরিকার ইতিহাস (South America) দক্ষিণ-আমেরিকায় স্পেন ও পর্তুগালের উপনিবেশ : পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে দক্ষিণ-আমেরিকায় স্পেন ও পর্তুগালের বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।

দক্ষিণ-আমেরিকার আবিষ্কারের সহিত ভাস্কো-ডা-গামা, ব্যালবোয়া ফ্রান্সিস্কো, কার্টেজ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে জড়িত। পর্তুগীজগণ অ্যামাজান নদী ও ব্রেজিল দেশটি আবিষ্কার করিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। দক্ষিণ-আমেরিকার অবশিষ্ট অংশে স্পেনের এক বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। ইওরোপীয়দের বসবাসের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতার বিনাশ ঘটে এবং ইওরোপীয় সভ্যতা বিস্তারলাভ করে। প্লাটা (Plata) অঞ্চলে পর্তুগীজদের সহিত সংঘর্ষ চলা সত্ত্বেও স্পেনীয় ঔপনিবেশিকগণ নিজেদের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বহু নূতন শহরের পত্তন করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে স্পেনীয়গণকে ওলন্দাজ, ইংরাজ ও ফরাসীদের সহিত সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছিল। দক্ষিণ-আমেরিকার অধিকাংশ স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনিগুলি স্পেনীয়দের হস্তগত হওয়ায় সেইযুগে স্পেন সর্বাধিক সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ব্রেজিলে হীরকখনি আবিষ্কৃত হইলে উহা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ হীরকের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়।

দক্ষিণ-আমেরিকায় স্বাধীনতা-আন্দোলন ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে দক্ষিণ-আমেরিকাস্থ স্পেন ও পর্তুগালের উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা-আন্দোলন শুরু করে। ইহার পশ্চাতে কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির স্বাধীনতালাভে দক্ষিণ-আমেরিকাস্থ স্পেনের উপনিবেশগুলিও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা-আন্দোলন শুরু করে। দ্বিতীয়তঃ, স্পেনের অত্যাচারী শাসনও ঔপনিবেশিকদের মনে এক দারুণ ঘৃণার সঞ্চার করিয়াছিল এবং স্বভাবতঃই উহারা স্বাধীনতাকামী হইয়া উঠিতে থাকে। তৃতীয়তঃ, স্পেনীয় উপনিবেশগুলি একমাত্র স্পেন ব্যতীত অন্য কোন দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারিত না। কিন্তু নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময় স্পেনীয় সরকারের নির্দেশ অমান্য করিয়া উহারা ইংল্যাণ্ডের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল। নেপোলিয়নের যুদ্ধের অবসানে স্পেনীয় উপনিবেশগুলি মাতৃভূমির অধীনতাপাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। চতুর্থতঃ, ফরাসী বিপ্লবের গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আদর্শ দক্ষিণ-আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশগুলিকেও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। পঞ্চমতঃ, নেপোলিয়ন কর্তৃক স্পেন বিজয় ও স্পেনের রাজবংশের দুর্বলতা ও স্পেনীয় উপনিবেশগুলির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ইন্ধন যোগাইয়াছিল।

স্পেনীয় উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা-আন্দোলন

আন্দোলনের কারণ

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের দক্ষিণ-আমেরিকাস্থ পেরু উপনিবেশে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ দেখা দেয়। স্পেনীয় সরকার অমানুষিক অত্যাচার করিয়া বিদ্রোহ দমন করেন বটে, কিন্তু ঔপনিবেশিকগণের অভাব-অভিযোগ দূর করার চেষ্টা করিলেন না। ইওরোপে নেপোলিয়নের যুদ্ধ চলিতে থাকাকালীন স্পেনীয় উপনিবেশগুলি পুনরায় বিদ্রোহী হয়। উপনিবেশগুলি 'ভেনিজুয়েলা কন্‌ফেডারেশন' (Venezuela Confederation) নামে একটি যুক্তরাষ্ট্র

আন্দোলনের প্রথম পর্ব

স্থাপন করে (১৮১০ খ্রীঃ)। ভেনিজ্যুয়েলা, মেক্সিকো, চিলি প্রভৃতি উপনিবেশ-গুলিতে যথাক্রমে মিরান্দা, মিগুয়েল, হিদালগো, বার্নাডো ও হিগিনস্ নামক নেতৃবৃন্দের পরিচালনাধীনে বিদ্রোহ শুরু হয়। মিরান্দার সহকর্মী ছিলেন সাইমন বলিভার নামক জনৈক অভিজ্ঞ যোদ্ধা, কিন্তু স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীল দলের সাহায্যে স্পেন সহজেই এই বিদ্রোহ দমন করে। মিরান্দা ও হিদালগো-কে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। বার্নাডো ও বলিভার পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন।

আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত স্পেনের গণ-অভ্যুত্থানের সুযোগ লইয়া স্পেনীয় উপনিবেশগুলি পুনরায় বিদ্রোহী হয়। ইতিপূর্বে সান মার্টিনের নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা স্বাধীন হইয়াছিল (১৮১৬ খ্রীঃ)। তাঁহারই চেষ্টায় চিলি ও পেরু স্বাধীন হয় (১৮২১ খ্রীঃ)। বলিভারের পরিচালনাধীনে ভেনিজ্যুয়েলা স্বাধীন হয়। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে মেক্সিকো স্বাধীন হয়। এইভাবে দক্ষিণ-আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করে। স্পেন উপনিবেশগুলিকে পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে ইওরোপীয় রাষ্ট্রসংঘের (Concert of Europe) সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তাঁহার মনরো-নীতি ঘোষণা করিয়া ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গকে আমেরিকার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দেন। সুতরাং ইওরোপীয় রাষ্ট্রসংঘ স্পেনকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে পারে নাই। ফলে স্পেনীয় উপনিবেশ-গুলির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহে।

মেক্সিকো স্বাধীনতা লাভ করিলেও উহার অভ্যন্তরীণ গোলযোগের অবসান হয় নাই। সেই সুযোগে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন মেক্সিকোর নব-প্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্রের বিলুপ্তিসাধন করিয়া স্ব-মনোনীত প্রার্থী ম্যাক্সিমিলিয়ানের অধীনে একটি নূতন রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৬৪ খ্রীঃ)। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের চাপে ফরাসী সম্রাট মেক্সিকো হইতে ফরাসীবাহিনী অপসারণ করিতে বাধ্য হন। মেক্সিকোবাসী ম্যাক্সিমিলিয়ানকে হত্যা করিয়া পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে।

পর্তুগীজ উপনিবেশ ব্রেজিলের স্বাধীনতা লাভ

স্পেনীয় উপনিবেশগুলির ন্যায় দক্ষিণ-আমেরিকার পর্তুগীজ উপনিবেশ ব্রেজিলেও স্বাধীনতা-আন্দোলন শুরু হইয়াছিল। উত্তর-আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা লাভ এবং ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে ব্রেজিলবাসীও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন পর্তুগাল আক্রমণ করিলে উহার রাজা ষষ্ঠ জন্ পলায়ন করিয়া ব্রেজিলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার অধীনে ব্রেজিল একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ষষ্ঠ জন্ তাঁহার পুত্র পেড্রোকে ব্রেজিলে রাখিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। পর্তুগালের পার্লামেন্ট ব্রেজিলকে পুনরায় উপনিবেশ বলিয়া ঘোষণা করিলে এবং পেড্রোকে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার নির্দেশ দিলে ব্রেজিলবাসী বিদ্রোহী হয়। উহাদের বিরোধিতার ফলে পেড্রো পর্তুগালে ফিরিয়া যাইতে পারিলেন না। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রেজিলবাসী পেড্রোকে ব্রেজিলের সিংহাসনে

স্থাপন করে। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগাল ব্রেজিলের স্বাধীনতা স্বীকার করে। ব্রেজিলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

দক্ষিণ-আমেরিকার পরবর্তী ইতিহাস (উনবিংশ শতাব্দী)ঃ স্বাধীনতা লাভের পর স্পেনীয় উপনিবেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন বলিভার। তাঁহার চেষ্টায় কয়েকটি উপনিবেশকে সম্মিলিত করিয়া কলোম্বিয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। কিন্তু বৈদেশিক আক্রমণের ভীতি না থাকায় এবং উপনিবেশগুলির পরস্পর ঈর্ষা ও স্বার্থ-সংঘাত প্রভৃতি কারণে সেইগুলিকে সংঘবদ্ধ করা সম্ভব হইল না। শীঘ্রই কলোম্বিয়া রাষ্ট্রের অবসান ঘটে এবং প্রতিটি রাষ্ট্র স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে উপনিবেশগুলিতে সামরিক একনায়কতন্ত্রের (Military Dictatorship) উদ্ভব হয়। সামরিক শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে দক্ষিণ-আমেরিকার সর্বত্র এক দারুণ অশান্তির উদ্ভব হয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দেয়। এই পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-আমেরিকায় রাজ্যবিস্তারে উদ্যোগী হয় এবং মেক্সিকো যুদ্ধের (১৮৪৬-৪৮ খ্রীঃ) ফলে মেক্সিকোর এক বৃহৎ অংশ যুক্তরাষ্ট্রের কুক্ষিগত হয়। এই সময় হইতেই দক্ষিণ-আমেরিকার উপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তারলাভ করিতে থাকে। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত 'নিখিল-আমেরিকা সম্মেলনে' (Pan American Conference) প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ-আমেরিকার উপর যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়। ইহার পর হইতে দক্ষিণ-আমেরিকার অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া পড়ে।

দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিকে সম্মিলিত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা

একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব

দক্ষিণ-আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য বিস্তার

২৫.৯. দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে দক্ষিণ-আমেরিকা (South America between the two World Wars)ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি সামান্যই অংশগ্রহণ করিয়াছিল বটে কিন্তু উহার প্রতিক্রিয়া গুরুতর হইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে দক্ষিণ-আমেরিকায় বাণিজ্য ও শিল্পের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ ও রসদ যোগান দিয়াছিল। ইহার ফলে এই অঞ্চলে বহু নূতন কলকারখানা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবার সুযোগ আসিয়াছিল, গ্রামাঞ্চল হইতে শিল্প-প্রধান শহরগুলিতে জনসমাগম বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণী সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ পাইয়াছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে বিশ্ব-রাজনীতির অনিশ্চয়তাহেতু দক্ষিণ-আমেরিকার বৈদেশিক বাণিজ্য মন্দা হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ইওরোপে দক্ষিণ-আমেরিকার খাদ্য ও খনিজ পদার্থের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় উহার বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে উহার রপ্তানির পরিমাণ

যাহা ছিল ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তাহা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণ-আমেরিকায় ফ্রান্স, ইটালী ও ব্রিটেনের বাণিজ্য একরূপ বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু জাপান ও জার্মানীর বাণিজ্যের পরিমাণ অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে দক্ষিণ-আমেরিকায় শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি ঘটে নাই। শিল্পের দিক দিয়া দক্ষিণ-আমেরিকা ছিল অনগ্রসর। কিন্তু ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের পর বিদেশ হইতে শিল্পজাত সামগ্রী আমদানি করার পথে বহুবিধ অন্তরায়ের সৃষ্টি হইলে দক্ষিণ-আমেরিকায় শিল্পের উন্নতি ঘটিতে থাকে। আমদানি শুল্কের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে তথায় কলকারখানা স্থাপনে বাধ্য করে। ফলে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শিল্পোৎপাদনের দিক দিয়া দক্ষিণ-আমেরিকা একরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠে। সিল্ক ও পশম উৎপাদনের দিক দিয়া আর্জেণ্টিনা এবং কার্পাস-জাত বস্ত্রাদির উৎপাদনের দিক দিয়া মেক্সিকো স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠে। খনিজ সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে চিলি, বলিভিয়া, পেরু ও মেক্সিকো অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। এমন কি দক্ষিণ-আমেরিকা হইতে শিল্পোৎপাদিত সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইতে থাকে।

দক্ষিণ-আমেরিকার আধুনিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার ক্রমবিকাশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি দক্ষিণ-আমেরিকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি ছিল গ্রাম। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের পর শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-আমেরিকায় নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার দ্রুত বিকাশ ঘটিতে থাকে এবং গ্রামাঞ্চলের উপর শহরের প্রভাব দ্রুত বিস্তারলাভ করিতে থাকে।

দক্ষিণ-আমেরিকার আধুনিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমোন্নতি। ঔপনিবেশিক যুগে দক্ষিণ-আমেরিকায় বণিক্ ও শ্রমিক শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল বটে, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জমিদারশ্রেণীর তুলনায় উহাদের রাজনৈতিক প্রভাব বিশেষ কিছু ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু শিল্পোন্নতি ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এমন কি বুদ্ধিজীবী ও ক্ষুদ্র বণিক্‌শ্রেণীও রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্রমশঃ গুরুত্ব অর্জন করিতে থাকে। শিল্পোন্নতি ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধির ফলে দক্ষিণ-আমেরিকার অর্থনৈতিক মান পশ্চিম-ইওরোপের অর্থনৈতিক মানের সমপর্যায়ে উন্নীত হইতে থাকে।

বৈদেশিক মূলধনের আমদানি বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধ মধ্যবিত্তশ্রেণীর আবির্ভাবের ফলে দক্ষিণ-আমেরিকার সর্বত্র শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দ্রুত ঘটিতে থাকে। রাজনীতির ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং উহাদের প্রচেষ্টায় শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দক্ষিণ-আমেরিকার বহু রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও প্রশাসনী সংস্কার প্রবর্তিত হয়। এই সংস্কারগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হইল উরুগুয়ে (Uruguay)-র ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্র

অনুসারে প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভার নিম্নকক্ষের হস্তে অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং রাষ্ট্রের প্রধান কার্যকর্তার (Chief Executive) বিশেষ ক্ষমতাগুলি হ্রাস করা হয়। এই শাসনতন্ত্র অনুসারে অভিজাতমূলক উপাধি ও বংশানুক্রমিক পদমর্যাদার অবসান করা হয়। চার্চের উপর হইতে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করা হয়, ভোটাধিকার সম্প্রসারিত করা হয় এবং সংবাদপত্রের ও ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। শ্রমিকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য নানাপ্রকার আইন রচিত হয়। কতকগুলি বিশেষ ধরনের শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়।

দক্ষিণ-আমেরিকার কলোম্বিয়া রাষ্ট্রেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রবর্তন করা হয়। বহুকাল রক্ষণশীল (Conservative) দলের শাসনাধীনে থাকিবার পর ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে উদারপন্থীগণ (Liberals) কলোম্বিয়ার শাসনক্ষমতা লাভ করে। এই উদারপন্থী সরকারের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হইল কলোম্বিয়ার কৃষি-সম্পদের পুনর্বিন্যাস।

বলিভিয়া, ইকুয়েডার ও ক্যারিবিয়ান দেশগুলিতেও প্রগতিমূলক সামাজিক আইন-কানুন প্রবর্তিত হয়। আন্দিয়ান রাষ্ট্রগুলিতে (Andean States) রেড-ইণ্ডিয়ান নাগরিকদের জীবনধারণের মান উন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও সংস্কার প্রবর্তন করা হয়। 'প্যান-আমেরিকান-ইউনিয়ন (Pan American Union) নামক সংস্থার উদ্যোগে একাধিক রেড-ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কিন্তু একমাত্র মেক্সিকো ছাড়া সর্বত্র উহাদের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই।

ব্রেজিল

দক্ষিণ-আমেরিকার অন্যতম দেশ হইল ব্রেজিল। পর্তুগীজগণ সর্বপ্রথম ব্রেজিলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ব্রেজিলের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হইল বাহিয়া (Bahia), পার্নামবুকো (Pernambuco) ও রাই-ডি-জানেরিও (Rio-de-Janeiro)।

ব্রেজিলের রাজনৈতিক অগ্রগতি অর্থনৈতিক প্রভাব দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। দীর্ঘকালব্যাপী অর্থনৈতিক কারণে ব্রেজিলের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ব্রেজিলের অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি ছিল রবার ও রবার-জাত সামগ্রীর উৎপাদন। সুতরাং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ব্রেজিলের উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি সমগ্র ব্রেজিলের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করিত। কিন্তু এই সময়ের পর হইতে রবারের স্থলে কফির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইলে ব্রেজিলের রাজনীতিতে দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। ব্রেজিলের যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব লইয়া কফি-উৎপাদনকারী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এক দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্ভব হয়। ব্রেজিলে জাতীয় রাজনৈতিক দল বা পার্টি বলিয়া কিছুই ছিল না। প্রত্যেক রাষ্ট্রের পৃথক পৃথক রাজনৈতিক দল ছিল। প্রত্যেক অঙ্গ-রাষ্ট্রের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ব্যাপক ও প্রবল থাকায় ব্রেজিলের রাজনীতিতে জটিলতার মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সকল অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলি নিজেদের

ইচ্ছামত বাণিজ্যশুল্ক ধার্য করিতে পারিত এবং সৈন্যবাহিনী পোষণ করিতে পারিত। অনেক ক্ষেত্রে অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা ব্রেজিলের যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী হইয়া উঠিত। ব্রেজিলের রাজনীতিতে জনসাধারণের কোনরূপ গুরুত্ব ছিল না বলিলেই চলে। কারণ একমাত্র শিক্ষিতগণই ভোটদানের অধিকার লাভ করিত এবং ইহাদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ব্রেজিলে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী কমিউনিস্টগণের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। ব্রেজিলের যুক্তরাষ্ট্র সরকারের* দক্ষিণ-পন্থীদের স্বার্থ ও ক্ষমতা কায়েম করার উদ্দেশ্যে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও সৈন্য-বাহিনী সর্বেসর্বা হইয়া উঠে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ব্রেজিলে নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে এবং জার্মান-নাৎসী ও ইটালীয় ফ্যাসিস্টগণ তথায় শক্তিশালী সংস্থার প্রতিষ্ঠা করে। এই নাৎসী ও ফ্যাসিস্টগণ ব্রেজিলে জোর প্রচারকার্য চালাইতে থাকে এবং ব্রেজিলের বহু নরনারী উহাদের সমর্থকে পরিণত হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ফ্যাসিস্ট ও উহাদের বিরোধী দলগুলির মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা দৈনন্দিন ব্যাপারে পরিণতি লাভ করে। ফলে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট ভার্গাস (Vargas)-এর পরিচালনাধীনে ব্রেজিলের দক্ষিণ-পন্থী যুক্তরাষ্ট্র সরকার সকল রাজনৈতিক দলগুলিকে কঠোর হস্তে দমন করেন এবং তথায় ভার্গাস তাঁহার একনায়কতন্ত্র স্থাপন করেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভার্গাস পশ্চিমী শক্তিগুলির অনুকূলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেন।

ল্যাটিন আমেরিকার অপর অন্যতম রাষ্ট্র হইল মেক্সিকো। পোর্ফিরিও দিয়াজ (Porfirio Diaz, 1877-1911)-এর একনায়কতন্ত্রের শাসনাধীনে মেক্সিকো অর্থ-নৈতিক অগ্রগতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। ইহার ফলে মেক্সিকোর অভ্যন্তরীণ শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে এবং বিদেশী মূলধন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে ভবিষ্যৎ অশান্তির বীজ নিহিত ছিল। দেশের অধিকাংশ তৈল খনিজ সম্পদ বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। কৃষি-জমির অতি সামান্য অংশই স্থানীয় অধিবাসীদের দখলে ছিল। শ্রমিকদের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না।

১৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে দিয়াজ ক্ষমতাচ্যুত হইয়া দেশত্যাগী হন। ইহার পর কৃষকগণ কৃষি-জমির দাবি এবং শ্রমিকগণ উচ্চহারে মজুরি ও অন্যান্য দাবিদাওয়া উত্থাপন করিতে থাকিলে রাজনৈতিক আন্দোলন সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মেক্সিকোতে অন্তর্যুদ্ধ চলিতে থাকে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। এই শাসনতন্ত্রকে জাতীয়তা-বাদী, বিদেশী-বিরোধী ও শ্রমিক-পন্থী বলিয়া অভিহিত করা যায়। ইহাতে শ্রমিকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, কৃষি-জমির সংস্কারসাধন করা হয় এবং বিদেশী জমিদার ও শিল্পপতিগণের উপর নানা প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ

* ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রেজিলের যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

করা হয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জমিদার ও যাজক সম্প্রদায় এবং বিদেশী শিল্পপতিদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মেক্সিকোর অভ্যন্তরীণ শান্তি অব্যাহত থাকে এবং মেক্সিকো ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

২৫.১০. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতি, ১৯১৯-১৯৫০ (Foreign policy of U. S. A.): গৃহযুদ্ধের (১৮৬১-৬৫ খ্রীঃ) পর হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উহার নিরপেক্ষতার ও না-হস্তক্ষেপ নীতির পরিবর্তন করিয়া ইওরোপ তথা বিশ্বের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছিল। Palmer ও Perking-এর মতে অন্যান্য দেশের ন্যায় আমেরিকার পররাষ্ট্র-নীতি উহার নিজস্ব ভৌগোলিক পরিবেশ, ঐতিহাসিক বিচার-বিবেচনা, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রথা ও সামরিক এবং অর্থনৈতিক শক্তির উপর নির্ভরশীল।

জার্মানী কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ আক্রমণের ফলস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদান করিয়াছিল এবং মিত্রপক্ষের জয়লাভ সহজ করিয়াছিল।* মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসনের চৌদ্দ-দফা শর্ত (Fourteen points) যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়া শান্তির পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শান্তি-সম্মেলনে উইলসন এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শান্তি-চুক্তিগুলির খসড়া রচনায় উইলসন বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। উইলসন ছিলেন মানবধর্মী ও আদর্শবাদী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করার মূলে তাঁহার প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবী হইতে যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করা, পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা রক্ষা করা এবং দৃঢ় ভিত্তির উপর আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপন করা। যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি ও সহযোগিতার মাধ্যমে সকল প্রকার আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসার জন্য তিনি লীগ অফ নেশনস্ নামক আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের সুপারিশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার একান্ত চেষ্টায় ভার্সাই-এর চুক্তিতে লীগ অফ নেশনস্ নামক সংস্থার চুক্তিপত্র (League Covenant) সন্নিবিষ্ট হয়। ইওরোপের পুনর্গঠনের ব্যাপারে দুইটি বিশেষ নীতি গৃহীত হইয়াছিল—আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকার। এই দুইটি নীতির উদ্ভাবক ছিলেন প্রেসিডেন্ট উইলসন।

---

* **আমেরিকায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল (Results of the First World War in America):** আমেরিকার পক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ভালই হইয়াছিল। যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত দক্ষিণ-আমেরিকার সম্পর্কের উন্নতি হইয়াছিল। এই সম্পর্কের উন্নতির ফলে শুধু যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত দক্ষিণ-আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্যের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটিয়াছিল এমন নহে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি দক্ষিণ-আমেরিকার দীর্ঘ বিদ্বেষের ও অবিশ্বাসের অবসান ঘটিয়াছিল। বিশ্বের ক্ষুদ্র দেশগুলির প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদার মনোভাবের প্রকাশ দক্ষিণ-আমেরিকার দেশগুলিকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং এই কারণে দক্ষিণ-আমেরিকার ১৩টি দেশ মিত্রপক্ষের অনুকূলে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও জার্মানীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্কের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষকে প্রচুর অর্থসাহায্যের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অর্থভাণ্ডারে পরিণত হইয়াছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

প্রকৃতপক্ষে উইলসনের আদর্শবাদী চৌদ্দ-দফা শর্ত ও চারি নীতির উপর ভিত্তি করিয়া লীগ অফ নেশনস্ নামক আন্তর্জাতিক সংস্থার চুক্তিপত্র রচিত হইয়াছিল। ইওরোপ উইলসনের প্রস্তাব মোটামুটিভাবে গ্রহণ করিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহা অগ্রাহ্য করে। মার্কিন সেনেট (Senate) কর্তৃক ভার্সাই-সন্ধি তথা লীগ অফ নেশনস্-এর চুক্তিপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত না হইবার প্রধান কারণ ছিল এই যে উইলসন ছিলেন ডেমোক্রেট দলভুক্ত এবং তিনি প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে আমেরিকার রিপাব্লিকান দলের নেতৃবর্গকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেন নাই। মার্কিন সেনেট আমেরিকার পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালনা করিয়া থাকে। এই সময় মার্কিন সেনেট রিপাবলিকান দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। সুতরাং প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে উইলসন রিপাব্লিকান দলকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ রিপাব্লিকান দল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মার্কিন সেনেট যে উইলসনের নীতি অগ্রাহ্য করিবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। এতদ্ভিন্ন মার্কিন জনগণের এক বৃহদংশ প্যারিসের সন্ধি ও লীগ-চুক্তিপত্রের তীব্র নিন্দা করে। মার্কিন জনগণ অনেকের মত জার্মানীর প্রতি অন্যায়মূলক আচরণের নিন্দা করে। আবার কেহ কেহ ইংল্যাণ্ডের লাভে ক্ষোভ প্রকাশ করে। কিন্তু মার্কিন জনগণের সর্বাধিক আক্রমণ হইয়াছিল লীগ-চুক্তিপত্রের দশম ধারার উপর। এই দশম ধারায় লীগের সদস্য-রাষ্ট্র-গুলির ভৌমিক অখণ্ডতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। লীগ অফ নেশনস্ কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালিত হইলে আমেরিকার সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনায় মার্কিন জনমত ভার্সাই-সন্ধি তথা লীগ-চুক্তিপত্রের তীব্র বিরোধিতা করে। উইলসন এই বলিয়া মার্কিন জনমতকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে লীগ-কাউন্সিলে সর্ববাদী সম্মতিক্রমে ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি ভিন্ন কোন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। লীগ-চুক্তিপত্র সম্বন্ধে মার্কিন জনগণের ভ্রান্ত ধারণা দূর করার উদ্দেশ্যে উইলসন মহাদেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে রিপাব্লিকান দলের প্রার্থী হার্ডিং প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্বাচিত হন। মার্কিন সেনেট ভার্সাই-সন্ধি ও লীগ-চুক্তিপত্র বর্জন করে। মার্কিন সরকার আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন থাকিবার নীতি গ্রহণ করেন।

মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ভার্সাই-সন্ধি ও লীগ-চুক্তিপত্র বর্জনের কারণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে লীগ-চুক্তিপত্র গ্রহণ করিল না বটে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাববিস্তারের ভয়ে ভীত দক্ষিণ-আমেরিকার প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি লীগ অফ নেশনস্-এ যোগদান করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তৃতির পথ রুদ্ধ করিতে উদ্যোগী হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে চিলি, বোলিভিয়া ও পেরু নামক রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক বিবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনা করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার সম্পর্কে দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির আশঙ্কার

ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ট্যাকনা (Tacna) নামক স্থানটির কর্তৃত্ব লইয়া দক্ষিণ-আমেরিকার উপরি-উক্ত তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ শুরু হইলে পেরু ও বোলিভিয়া বিবাদের মীমাংসার জন্য লীগ-কাউন্সিলের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে পেরু অভিযোগটি লীগ-কাউন্সিল হইতে উঠাইয়া লইতে বাধ্য হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-আমেরিকার অপর রাষ্ট্র পানামা কোস্টারিকার আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লীগ-কাউন্সিলের নিকট অভিযোগ করিলে পুনরায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে পানামা অভিযোগটি উঠাইয়া লইতে বাধ্য হয়। এই সকল কারণে লীগের প্রতি দক্ষিণ-আমেরিকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি আস্থা হারায়। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ বা ল্যাটিন আমেরিকায় লীগ অফ নেশনস্-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তৃতির পথে বাধার সৃষ্টি করিয়া দক্ষিণ-আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীয় প্রভুত্ব বজায় রাখিতে যত্নবান হইয়াছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটিন আমেরিকা

সরকারীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগ অফ নেশনস্-এর সদস্যপদ গ্রহণ না করিলেও বে-সরকারীভাবে মার্কিন সরকার লীগের সহিত সহযোগিতা করিয়া যাইতে থাকেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদের সমাধান সম্পর্কে আলাপ-আলোচনায় বে-সরকারীভাবে অংশ গ্রহণ করার কথা মার্কিন সরকার ঘোষণা করেন (১৯২১ খ্রীঃ)। এই নীতি অনুসরণ করিয়া অতঃপর লীগ কর্তৃক আহূত সকল নিরস্ত্রীকরণ ও অর্থনৈতিক সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দর্শক প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে থাকে। ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত আলোচনায় বে-সরকারীভাবে মার্কিন বিশেষজ্ঞগণ অংশ গ্রহণ করিতে থাকে। ১৯২৪ হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ২২টি আন্তর্জাতিক বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দর্শক প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি বিশেষ শর্তাধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে অংশ গ্রহণে সম্মত হয়। কিন্তু লীগের সদস্যভুক্ত না থাকায় লীগ-কাউন্সিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অন্যান্য সদস্য-রাষ্ট্রের সহিত সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার প্রদানে অসম্মত হইলে স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে যোগদান করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার (I. L. O.) সদস্যপদ গ্রহণ করে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য স্বাক্ষরিত কেলগ্-ব্রিয়াঁ-চুক্তিতে (Kellog-Briand pact) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারী কেলগ্-এর নামানুসারে এই চুক্তির নামকরণ করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক লীগের সহিত সহযোগিতা

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিচ্ছিন্ন থাকিবার ও লীগ অফ নেশনস্-এ যোগদান না করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে নৌ-শক্তির প্রতিযোগিতা-হেতু উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি, ইঙ্গ-জাপান মৈত্রীর (Anglo-

Japanese Alliance, 1902) ভিত্তির উপর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের শক্তিবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে সুদূর-প্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভবিষ্যৎ শান্তির জন্য বিশ্ববাসী উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল এবং প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রবিদ্‌গণ বিশ্ববাসীকে ভবিষ্যৎ শান্তির আশ্বাস দিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে নিরস্ত্রীকরণের নীতিও মোটামুটিভাবে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের পর নিরস্ত্রীকরণ নীতি যথার্থ কার্যকর করার পরিবর্তে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সামরিক প্রতিযোগিতা পুনরায় শুরু হয়। সুতরাং একদিকে সুদূর-প্রাচ্যে আমেরিকার স্বার্থহানির আশঙ্কা এবং অপরদিকে সামরিক প্রতিযোগিতা প্রভৃতি কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটনে একটি সম্মেলন আহ্বান করে। এই সম্মেলনে নয়টি রাষ্ট্র যোগদান করে (ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইটালী, জাপান, চীন, হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও পর্তুগাল)। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান ও ইটালীর মধ্যে পঞ্চশক্তি চুক্তি (Five Power-Treaty) স্বাক্ষরিত হয়। ইহার শর্তানুসারে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলি উহাদের নৌ-শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস করিতে এবং দশ বৎসরের মধ্যে বৃহদাকারের যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ না করিতে সম্মত হয়। এতদ্ভিন্ন এই চুক্তির দ্বারা পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের নৌ-আধিপত্য স্বীকৃত হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী ও ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট যথাক্রমে নবম-শক্তি চুক্তি (Nine Power Treaty) ও চতুঃশক্তি চুক্তি (Four-Power Treaty) স্বাক্ষরিত হয়। এই দুই চুক্তিপত্রে উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যের কথা ঘোষিত হয় এবং ইহা ছাড়া সুদূর-প্রাচ্যে চীনের অধিকার রক্ষা করার এবং চীন ও অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে সমান সুযোগ-সুবিধা রক্ষা করার কথাও ঘোষিত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আহূত ওয়াশিংটন-সম্মেলনের উদ্দেশ্য

সম্মেলনে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ

ওয়াশিংটন-সম্মেলনে সম্পাদিত চুক্তিপত্রগুলি বিশ্বের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সামরিক ক্ষেত্রে এই চুক্তিপত্রগুলির গুরুত্ব যাহাই হউক না কেন বিশ্ববাসীর মনে ইহার প্রতিক্রিয়া গভীরভাবে দেখা দিয়াছিল। বিশ্ববাসীর মনে এই চুক্তিপত্রগুলি শান্তির আশা বলবতী করিয়াছিল এবং সাময়িকভাবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্কের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।* ওয়াশিংটন-সম্মেলনে যোগদানকারী জাপানের প্রতিনিধি ব্যারণ কেটো-এর (Baron Kato) কথায় "In Japan, we realised that a new spirit of moral consciousness had come out in the world". ।"†

ওয়াশিংটন-সম্মেলনের গুরুত্ব

ইতিমধ্যে দক্ষিণ-আমেরিকার প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির পরিবর্তন ঘটিতে

* Elson—History of the U. S. A. P. 968

† Ibid P. 968

থাকে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের পর দক্ষিণ-আমেরিকার প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরিবর্তন হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ-নীতির পরিবর্তে উদার নীতির দ্বারা দক্ষিণ-আমেরিকা হইতে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে অতঃপর যত্নবান হয়। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট দক্ষিণ-আমেরিকা তথা সমগ্র বিশ্বের প্রতি তাঁহার 'সৎ-প্রতিবেশী নীতি'র (Good Neighbour Policy) কথা ঘোষণা করেন। তাঁহার ভাষায় "He would dedicate his nation to the policy of the good neighbour." ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত সপ্তম প্যান-আমেরিকা-সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র না-হস্তক্ষেপ নীতির (Policy of non-intervention) কথা ঘোষণা করে। মার্কিন সেক্রেটারী হাল (Hull) ঘোষণা করেন যে ভবিষ্যতে মার্কিন সরকার ল্যাটিন আমেরিকার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই নূতন নীতির পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন সেনেট ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রোটকল (Protocol) পাস করে। অতঃপর সৎ-প্রতিবেশী-নীতির প্রয়োগ চলে। হাইতি (Haiti) হইতে মার্কিন নৌ-বাহিনী প্রত্যাহার করা হয়। ১৯০৩ হইতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কিউবার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপত্তি অবাধে চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি (১৯০৩ খ্রীঃ) বাতিল করা হয় এবং কিউবার একটি নৌ-ঘাঁটি ভিন্ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর সকল প্রকার সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পানামার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার যে অধিকার লাভ করিয়াছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহা প্রত্যাহার করে (১৯৩৬ খ্রীঃ)। নিকারাগুয়া-রাষ্ট্রের সহিত মিত্রতা বজায় রহে এবং ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মেক্সিকোর সহিত নূতন করিয়া মিত্রতা স্থাপিত হয়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে মেক্সিকো সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের যে সকল কৃষি-জমি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন, মেক্সিকো সরকার উহার জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানে সম্মত হন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে (Dominican Republic) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য-শুল্ক আদায় করার যে অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিল ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাহা প্রত্যাহার করেন।

দক্ষিণ-আমেরিকার উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিত্যাগ

'সৎ-প্রতিবেশী নীতির কথা ঘোষণা (১৯৩৩)

'সৎ-প্রতিবেশী-নীতি' অনুসরণ করার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ল্যাটিন আমেরিকার পরস্পর সম্পর্ক বন্ধুত্বমূলক হইয়া উঠে। এই সম্পর্ক স্থায়ী করার জন্য ল্যাটিন আমেরিকার অধিবাসীগণের মন হইতে মনরো-নীতির ভীতি দূর করার প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং সমগ্র মার্কিনজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটিন আমেরিকার মধ্যে কয়েকটি নিখিল আমেরিকা (Pan America) সম্মেলনের অধিবেশন বসে। ১৯৩৬

'প্যান-আমেরিকানিজম'

খ্রীষ্টাব্দে বুনো আয়ারস্ (Buenos Aires) সম্মেলনে সম্মিলিত নিরাপত্তা-চুক্তি (Collective Security Convention) স্বাক্ষরিত হয়। ইহার দ্বারা আমেরিকা মহাদেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন করিতে পারে এমন সকল প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করার নীতি গৃহীত হয়। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে লিমা নগরে প্যান-আমেরিকা-সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশনে একটি ঘোষণাপত্র (Lima Declaration) স্বাক্ষরিত হয়। ইহার শর্তানুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহ বিদেশী শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে পরস্পর সাহায্যের শপথ গ্রহণ করে। এইভাবে আমেরিকা মহাদেশে মনরো-নীতির রূপান্তর ঘটে।

১৯১৯ হইতে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাধারণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব-রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার নীতি গ্রহণ করিলেও একথা বলা যায় না যে এই সময়ের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগ অফ নেশনস্ তথা ইওরোপের সহিত সম্পূর্ণ অসহযোগিতা করিয়া চলিয়াছিল। প্রেসিডেন্ট কুলিজ (১৯২৪-২৮ খ্রীঃ) ও হুভার (১৯২৮-৩২ খ্রীঃ)-এর আমলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগ অফ নেশনস্-এর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করিয়াছিল। লীগ কর্তৃক আহূত সকল নিরস্ত্রীকরণ ও অর্থনৈতিক সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগদান করিয়াছিল। সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক বৈঠকে ও সম্মেলনে মার্কিন দর্শক প্রতিনিধিগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন। যদিও মার্কিন প্রতিনিধিগণ বৈঠকে ও সম্মেলনে যোগদান করিয়া আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অনেক সময় নিজেদের সুপারিশও পেশ করিয়াছিলেন তথাপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন বৈঠকের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দায়িত্ব স্বীকার করে নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু নাগরিক লীগ অফ নেশনস্-এর বেতনভুক্ত কর্মচারী ছিলেন এবং অনেকে লীগ কর্তৃক নিযুক্ত বিভিন্ন কমিশনেও সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বিশ্বের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সময়ের মধ্যে ইওরোপের সহিত সহযোগিতা করিতে দ্বিধা করে নাই। ১৯২৪ ও ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বে-সরকারীভাবে মার্কিন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নৌ-শক্তি সীমায়িত করার ব্যাপারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কুলিজের পরামর্শক্রমে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে জেনেভা-সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন-নৌ-চুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

রুজভেল্টের শাসনাধীনে আমেরিকার সহিত ইওরোপের সম্পর্ক

১৯১৯ হইতে ১৯৩২ পর্যন্ত ইওরোপের সহিত আমেরিকার বে-সরকারী সহযোগিতা

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনে মার্কিন নাগরিকগণের নিরাপত্তা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। চীনের জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিস্টদের

কার্যকলাপে বিদেশীদের ধন ও প্রাণ বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং মাকিন নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া নানকিং-এ একদল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিল। চীনের জাতীয়তাবাদীগণ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনিয়া বিদেশীগণের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে মার্কিন বাহিনী চীন হইতে অপসারণ করিয়া লওয়া হয়।

চীনে হস্তক্ষেপ

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে রুজভেল্ট প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হইলে ইওরোপীয় তথা বিশ্ব-রাজনীতি সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশঃ ইওরোপের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে থাকে।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কেরেনস্কি (Kerensky)-র পতনের পর সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট রাশিয়ার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের প্রয়োজন উপলব্ধি করিলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয় এবং ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় স্থাপিত হয়। রাশিয়া স্বীয় রাষ্ট্রে মার্কিন নাগরিকগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।

রাশিয়ার সহিত সম্পর্ক স্থাপন

প্রেসিডেন্ট থোমাস জেফারসনের আমল হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যেক দেশের ও জাতির মৌলিক স্বাধীনতার দাবি করিয়া আসিতেছিল। সুতরাং এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবা ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতা স্বীকার করে। ইতিপূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সকল শর্তে কিউবা, কলোম্বিয়া, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশগুলির সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিল সেই সকল শর্তে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কানাডার সহিত সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধি অনুসারে উভয় রাষ্ট্র পরস্পরকে নানা প্রকার বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের সহিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধি স্বাক্ষর করে।

কিউবা ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতার স্বীকৃতি

রুজভেল্টের আমলে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জেনেভায় অনুষ্ঠিত নিরস্ত্রীকরণ-সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে নৌ-শক্তি সীমায়িত করা সম্পর্কে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে চুক্তিতে ইতিপূর্বে আবদ্ধ হইয়াছিল উহারও অবসান ঘটে। ব্রিটেন ও আমেরিকার সমতুল্য নৌ-শক্তি বৃদ্ধি করার যে দাবি জাপান উত্থাপন করে ব্রিটেন ও আমেরিকা তাহা অগ্রাহ্য করিলে জাপানও ইতিপূর্বে সম্পাদিত নৌ-সন্ধি বাতিল করে।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ইওরোপের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমশঃ আশঙ্কার মাত্রা বৃদ্ধি করিতে থাকে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইথিওপিয়ার উপর ইটালীর আক্রমণ সমগ্র বিশ্বে তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। লীগ অব নেশনস্ ইটালীকে আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত করে। এক সময়

ইওরোপীয় যুদ্ধের সম্ভাবনা পুনরায় দেখা দেয় যদিও শেষ পর্যন্ত ইওরোপের অনেক রাষ্ট্র ইথিওপিয়ার উপর ইটালীর দাবি স্বীকার করিয়া লয়। ইওরোপীয় যুদ্ধের সম্ভাবনা আপাততঃ দূর হইলেও ইওরোপীয় যুদ্ধে কোন প্রকারে জড়িত হইবার বিরুদ্ধে মার্কিন জনগণ মতামত ব্যক্ত করে। মার্কিন জনগণ সকল প্রকার আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ ও বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকিবার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে। ফলে ১৯৩৫ হইতে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাধিক নিরপেক্ষতামূলক আইন (Neutrality Acts) প্রণয়ন করিয়া চলে। এই আইনগুলির উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধরত কোন রাষ্ট্রকে আমেরিকা হইতে অর্থ সাহায্যদান বা উহার সহিত বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা।

২৫.১১. **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ** (U. S. A. and the Second World War)**ঃ** ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ইওরোপে পুনরায় যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি হইতে থাকে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সুস্পষ্টভাবেই অনুভব করেন যে হিটলারের আক্রমণাত্মক মনোভাব শীঘ্রই ইওরোপ তথা সমগ্র বিশ্বে পুনরায় বিপর্যয় আনিবে। সুতরাং তিনি ইওরোপের যুদ্ধ-পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতি পরিবর্তন করার প্রয়োজন সম্পর্কে মার্কিন জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিতে থাকেন। তিনি এই বলিয়া মার্কিন জনগণকে বুঝাইতে থাকেন যে দুই শতক কাল ধরিয়া অনুসৃত বিচ্ছিন্ন থাকিবার নীতি ইওরোপের ভবিষ্যৎ বিপর্যয় হইতে আমেরিকাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। অধুনা প্রবর্তিত নিরপেক্ষতামূলক আইনগুলি রুজভেল্ট সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই এবং ইওরোপের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিরপেক্ষতামূলক আইনগুলি বাতিল করার জন্য মার্কিন কংগ্রেসের নিকট আবেদন করেন যাহাতে জার্মান সমরবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ইওরোপের রাষ্ট্রগুলিকে মার্কিন সরকার সাহায্য করিতে পারেন। ফ্রান্সের পতন (১৯৪০ খ্রীঃ) ঘটিলে এবং ইটালী হিটলারের সহিত যোগদান করিলে সমগ্র ইওরোপের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও আশঙ্কিত হইয়া উঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক্সিস-শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে এক প্রবল জনমতের সৃষ্টি হয়। মার্কিন জনগণ ইহাই অনুভব করিল যে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের ন্যায় গণতান্ত্রিক দেশগুলির পতন ঘটিলে এক্সিস-শক্তিবর্গের আক্রমণ হইতে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমেরিকাও নিরাপদ থাকিবে না। প্রকৃতপক্ষে ইতিমধ্যে এক্সিস-শক্তিবর্গের ঘোষণা "এই বিশ্বে লুপ্তপ্রায় গণতন্ত্রের কোন স্থান নাই"—মার্কিন জনগণকে ইওরোপের গণতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল করিয়া তুলিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এক্সিস-শক্তিবর্গ কর্তৃক শৃঙ্খলাবদ্ধ ইওরোপের দেশগুলির মুক্তিসাধনের নৈতিক দায়িত্বও মার্কিন জনগণ অনুভব করিয়াছিল। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন কংগ্রেস বাধ্যতামূলক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন ও উহার কারণ

সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন করে। ইহার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডার সহিত যুগ্ম-প্রতিরক্ষা সংস্থা গঠন করে। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী ব্রিটেনের উপর বিমান-আক্রমণ শুরু করিলে মার্কিন জনগণের অধিকাংশই বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলির অনুকূলে যুদ্ধে যোগদানের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে। হিটলারের সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র বিশ্বের ধ্বংসসাধনে বদ্ধপরিকর—এই সত্য উপলব্ধি করিয়া প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আমেরিকাকে সামরিকভাবে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনকে সাহায্য করার জন্য প্রয়োজনীয় লেন্ড-লীজ (Lend-Lease) আইন-প্রণয়ন করেন। এইভাবে ইওরোপের যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন ঘটায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক প্রস্তুতি

উত্তরোত্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তদানীন্তন আন্তর্জাতিক সংকটে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে থাকে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসে তাঁহার বাৎসরিক বক্তৃতায় "Four Freedom"-এর কথা ঘোষণা করেন—যথা, (১) বাক্-স্বাধীনতা, (২) প্রত্যেক জাতির ধর্মীয় স্বাধীনতা, (৩) দারিদ্র্যের অবসান ও (৪) মিত্রশক্তি এবং সমস্ত স্বাধীনতাকামী দেশগুলিকে ভীতি হইতে মুক্তিদান।

"Four Freedom"

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাধারণ জাতীয় নীতির ভিত্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশ্বের শান্তির আশা প্রকাশ করিয়া প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও প্রধান মন্ত্রী চার্চিল একটি যুগ্ম-বাণী প্রচার করেন। ইহাতে আরও ঘোষণা করা হয় যে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন দেশের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনপ্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ বা আঞ্চলিক পরিবর্তন সাধন করিবে না। এই ঘোষণাপত্রই আতলান্তিক চার্টার ('Atlantic Charter) নামে অভিহিত এবং এক্সিস-শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দেশগুলির যুদ্ধনীতি রূপে পরিগণিত হয়।

আতলান্তিক চার্টার (১৯৪১)

ইতিমধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ বিপন্ন হইয়া উঠে। এশিয়ায় জাপানের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ সুদূর-প্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ বিপন্ন করিয়া তোলে। জাপান ইন্দোচীনের নৌ-ঘাঁটি ব্যবহার করার জন্য ফ্রান্সের ভিচি-সরকারকে বাধ্য করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উহার তীব্র প্রতিবাদ করে এবং জাপানে তৈল ও ইস্পাত রপ্তানি বন্ধ করে। জাপানকে নানাভাবে প্রতিহত করার চেষ্টা করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুদূর-প্রাচ্যে শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে জাপানের সহিত আলাপ-আলোচনা শুরু করে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ব্যক্তিগতভাবে জাপানের সম্রাটের নিকট শান্তির জন্য আবেদন করেন। কিন্তু ইহার প্রত্যুত্তরে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর জাপানী বিমানবহর অতর্কিতে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পার্ল বন্দর (Pearl Harbour) আক্রমণ করে। ফলে মার্কিন

জাপানের সহিত সংঘর্ষ

জাপান কর্তৃক পার্ল বন্দর আক্রমণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যোগদান (১৯৪১)

যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যোগদান করিতে বাধ্য হয় এবং অতঃপর ইওরোপীয় যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়।

২৫.১২. **বিশ্বনেতৃত্ব লাভের সংগ্রাম** (Struggle for world Leadership): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের বিশ্ব-রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্বে পূর্ব-ইওরোপীয় রাষ্ট্রজোটের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের মধ্যে এক কৃত্রিম যুদ্ধচাপ (War-tension) ও ঠাণ্ডা লড়াই (Cold War)। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-বিপ্লবের সময় হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি সোভিয়েট রাশিয়া ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর সম্পর্ক ছিল বিদ্বেষপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিছক পরিস্থিতির চাপেই এবং নাৎসী ও ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলির ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সহিত সোভিয়েট রাশিয়ার এক সাময়িক মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছিল। এই প্রয়োজন মিটিয়া গেলেই পুনরায় রাশিয়ার সহিত পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সম্পর্ক পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষপূর্ণ হইয়া উঠে। নাৎসী ও ফ্যাসিবাদের ধ্বংসের পর সাম্যবাদ ও গণতন্ত্রবাদের মধ্যে পুনরায় বিবাদ ও বিদ্বেষের সূত্রপাত হয়। এই দুই পরস্পর-বিরোধী আদর্শগত সংগ্রামের নেতৃত্ব করিল যথাক্রমে সোভিয়েট রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। রাশিয়া ও আমেরিকা নিজ নিজ তাঁবেদার রাষ্ট্রের নেতৃত্ব করিয়া আধুনিক বিশ্বকে দুইটি পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্রজোটে বিভক্ত করিয়া ঠাণ্ডা-লড়াই-এর পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা অনস্বীকার্য যে উভয় রাষ্ট্রই যুদ্ধপ্রসূত ধ্বংস হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া স্থায়ী শান্তি স্থাপনে উদ্গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু উভয়ের কর্মপন্থা ও নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকায় বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই রাশিয়া রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক এই তিনভাবে পূর্ব-ইওরোপে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া রাশিয়ার তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র যুগোশ্লাভিয়া রাশিয়ার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইওরোপের এক বিরাট অংশ সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাবাধীন হইয়া পড়ায় বিশ্বের অন্যতম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে তাহা অস্বস্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে সাম্যবাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিহত করার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অগ্রণী হইল এবং যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের (Western bloc) উদ্ভব হইল।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান (Truman) আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের প্রসার প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে যে নীতির কথা ঘোষণা করেন—তাহা 'ট্রুম্যান ডক্ট্রিন'

(Truman Doctrine) নামে পরিচিত। ট্রুম্যান ঘোষণা করেন যে "যাহারা সশস্ত্র সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অথবা বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করিতেছে সেই সকল স্বাধীন জনগণকে সাহায্য করা মার্কিন সরকারের আন্তর্জাতিক নীতির সূত্র বলিয়া গৃহীত হইবে।" গ্রীস, তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি দেশের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে রাশিয়া সেই সকল দেশে স্বীয় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিলে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ট্রুম্যান-ডকট্রিন ও মার্শাল-প্ল্যান (Marshall Plan) ঘোষিত হয়। সেই সময় গ্রীসের সংখ্যালঘু বিপ্লবীগণ গ্রীসের প্রতিবেশী কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি —বুলগেরিয়া, আলবানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার সমর্থনপুষ্ট হইয়া এথেন্সের আইনসম্মত সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা-যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান স্পষ্টই অনুভব করিয়াছিলেন যে গ্রীসের অন্তর্যুদ্ধের সুযোগে তথায় কমিউনিস্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠালাভ করিবে। এই কারণে তিনি তদানীন্তন গ্রীক সরকারকে প্রচুর অর্থ-সাহায্য মঞ্জুর করেন। গ্রীসের ন্যায় তুরস্কেও কমিউনিস্ট প্রভাব বিস্তারলাভ করিতেছিল। সুতরাং ইহা প্রতিরোধ করার জন্য তুরস্ককেও প্রচুর অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য করা হইল। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের যে কোন অংশে শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট হইলে তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থও বিপন্ন করিয়া তুলিবে—ইহাই ছিল 'ট্রুম্যান-ডকট্রিন'-এর মূল কথা।

ট্রুম্যান-ডকট্রিন' ঘোষণা (১৯৪৭)

উদ্দেশ্য

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ট্রুম্যান-ডকট্রিন-এর ব্যাপক প্রয়োগ হিসাবে মার্শাল পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সেই বৎসরের শেষের দিকে বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক অবনতির ফলে পশ্চিম-ইওরোপের দেশগুলিতে এক দারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের উদ্ভব হইয়াছিল। এই বিপর্যয়ের সুযোগে পশ্চিম-ইওরোপের দেশগুলিতে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটিতে পারে এই আশঙ্কায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গকে অর্থনৈতিক সাহায্য দানের এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিল। মার্কিন সেক্রেটারী জর্জ মার্শাল দারিদ্র্য, নৈরাশ্য ও বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য ইওরোপকে অর্থনৈতিক সাহায্যদানের কথা ঘোষণা করেন। মার্শাল-এর ভাষায় "The United States would do whatever it is able to do to assist in the return of normal economic health in the world without which there can be no political stability and no assured peace". ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার পররাষ্ট্র-মন্ত্রিগণ মার্শাল পরিকল্পনা আলোচনার জন্য প্যারিসে এক বৈঠকে মিলিত হইলেন। রুশ পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মলটভ মার্শাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া ইহাকে "মার্কিন অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের পন্থা" বলিয়া অভিহিত করিলেন। ফলে রাশিয়া ও উহার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলি মার্শাল পরিকল্পনা গ্রহণে অসম্মত হইল। কিন্তু পশ্চিম-ইওরোপের দেশগুলি ইহা গ্রহণ করিলে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার কংগ্রেস একটি আইন পাস

মার্শাল পরিকল্পনা (১৯৪৭)

করিয়া ইওরোপীয় পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনা (European Recovery Programme) গ্রহণ করিল। ইহার শর্তানুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চারি বৎসরের জন্য ইওরোপের ১৮টি দেশকে সকলপ্রকার অর্থনৈতিক সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইল। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের পরিবর্তে মার্শাল পরিকল্পনার সাহায্যে রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিরোধ করাই আমেরিকার উদ্দেশ্য ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচ্ছন্নতার অবসান: উত্তর-আতলান্তিক-চুক্তি (১৯৪৯)

এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব-রাজনীতিতে ক্রমশঃ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার নীতি অতঃপর ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। আতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হইল। সুতরাং জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের (U. N. O.) ভিত্তির উপর পশ্চিম-ইওরোপের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতার প্রয়োজন মার্কিন জনগণ অনুভব করিল। এই উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম-ইওরোপের দেশগুলি 'উত্তর আতলান্তিক-চুক্তি' (North Atlantic Treaty) স্বাক্ষর করিল। উত্তর আতলান্তিক-চুক্তি সংস্থাকে (N. A. T. O.) প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'বিচ্ছিন্ন থাকিবার নীতি' পরিত্যাগ করিয়া বিশ্ব-রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের নীতি গ্রহণ করিয়াছে।

নির্বাচিত প্রশ্নমালা ও উত্তর-সংকেত

১। "বিংশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত আমেরিকা ইওরোপ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছিল"—এই মন্তব্যের আলোচনা কর। [উঃ ২৫.৫]

২। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর [উঃ ২৫.২]

৩। গৃহযুদ্ধের পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের বিবরণ দাও। [উঃ ২৫.৪.]

৪। গৃহযুদ্ধের পর হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতি পর্যালোচনা কর। [উঃ ২৫.৫, ২৫.৬.]

৫। বিংশ শতকের প্রথম দুই দশকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতি পর্যালোচনা কর [উঃ ২৫.৬.

৬। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ইতিহাস সংক্ষেপে লিখ। [উঃ ২৫.৭.]

৭। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ল্যাটিন আমেরিকার সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ ২৫.১০]

৮। ১৯১৯ হইতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতি পর্যালো— কর। [উঃ ২৫,১

৯। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা বর্ণনা [উঃ ২৫,১